রামমোহন রায়ের সমাধি মন্দির

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 609. May, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

৫১ বর্ষ। ৬০৯ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩২১। মে, ১৯১৪। ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

	*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	ম	শু	সো	শু	ম	শু
শেঃ	৩১	৩১	৩২	৩২	৩১	৩০
	বৃ	র	বৃ	সো	বৃ	শ
	†A	M	J	Jy.	Au.	S
‡	14	15	15	17	18	18
আঃ	বু	শু	সো	বু	শ	ম
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	বৃ	র	ম	শু	সো	বু

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২১ সাল।
ফসলী ১৩২১—২২।
হিজরী ১৩৩১—৩২।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৪—১৫।
শকাব্দ ১৮৩৬।
সংবৎ ১৯৭১—৭২।
মগী ১১৭৬—৭৭।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৮৫—৮৬।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	র	ম	বু	শু	শ	সো
শেঃ	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
	সো	ম	বৃ	শু	র	ম
	O	N	D	J	F	M
	18	17	16	15	13	15
আঃ	বৃ	র	ম	শু	সো	সো
শেঃ	31	30	31	31	28	31
	শ	সো	বৃ	র	র	বু

ম	শু	সো	শু	ম	শু
বু	শ	ম	শ	বু	শ
বৃ	র	বু	র	বৃ	র
শু	সো	বৃ	সো	শু	সো
শ	ম	শু	ম	শ	ম
র	বু	শ	বু	র	বু
সো	বৃ	র	বৃ	সো	বৃ

§ ১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

র	ম	বু	শু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	শু
শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শ	সো	ম	বৃ	শু	র

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	২৩	২১	২০	১৭	১৪	১৩
পূঃ,	২৬	২৫	২৩	২১	১৮	১৭
কৃঃ এঃ,	৮	৬	৫	৩,৩১	৩০	২৮
অঃ,	১২	১১	৯	৭	৪	২

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা
কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা
*** ২৩শে বৈশাখ বুধবার ও ২১এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, শুক্ল একাদশী। ২৬শে বৈশাখ শনিবার ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার পূর্ণিমা।
৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার ও ৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার কৃষ্ণ একাদশী।
১২ই বৈশাখ শনিবার ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ-বৈশাখ মঙ্গলবার আরম্ভ ও ৩১শে বৃহস্পতিবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল, আরম্ভ বুধবার শেষ ৩০শে বৃহস্পতিবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, ২রা বুধবার, ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ২রা শনিবার ইত্যাদি।

বৈশাখ মঙ্গলবার } ১, ৮, ১৫,
জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার } ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	১২	১২	১৩	১৩	১৩	১৩
পূঃ,	১৬	১৬	১৭	১৭	১৭	১৭
কৃঃ এঃ,	২৮	২৭	২৮	২৭	২৭	২৭
অঃ	২	১	২	১	২	১

*** ১২ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ও ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার শুক্ল একাদশী। ১৬ই কার্ত্তিক সোমবার ও ১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার পূর্ণিমা।

২৮শে কার্ত্তিক শনিবার, কৃষ্ণ-একাদশী। ২রা কার্ত্তিক সোমবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নব বর্ষের চিন্তা।

১। স্বভাবের যেরূপ নিয়ম তাহাতে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। একটী বৃক্ষ জন্মিল, পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিল, পরে তাহা রসহীন হইয়া—পত্র-পুষ্প-ফল বিহীন হইল—শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আবার তাহাতে নূতন পত্র, পুষ্প ও ফল দেখা দেয় কেন? প্রতিবর্ষে ত এইরূপ হইতেছে। মৃত্যুর মধ্যে যে অমৃতের বীজ রহিয়াছে ইহা তাহারই পরিচয়।

২। মানবজীবন বৃক্ষ ও পশুপক্ষীর জীবন অপেক্ষা কি উৎকৃষ্ট নয়, তবে এ জীবনের মৃত্যু কোথায়? "করিয়া দুখ অন্ত সুবসন্ত (হৃদে) জাগে।"

৩। নববর্ষ, নব বসন্ত, ভগ্ন প্রাণে নূতন উৎসাহ আনিয়া দেয়।

৪। এই জীবনের রস লইয়া সঙ্কল্প, সাধনা ও বিশ্বাস দ্বারা আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারি।

৫। বিশ্বামিত্রের সাধনা—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবেন—যাহা হইবার নয়, তাহাই হইতে হইবে। কি দৃঢ় সঙ্কল্প, কি কঠোর সাধনা, কি পরিণাম-ফলে বিশ্বাস—তাহাকে ব্রহ্মা অন্য বর দিতে আসিলেন—ঋষি কিছুতেই সম্মত নয়। শেষে ব্রহ্মা আপনার যজ্ঞসূত্রে তাহাকে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণ করিলেন। তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ হইলেন।

৬। আমাদের জীবনের লক্ষ্য সাধনের জন্যও সেইরূপ সঙ্কল্প, সাধনা ও বিশ্বাস অবলম্বন করিতে পারিলে আমরা কেন কৃতকার্য্য হইতে পারিব না? মনুষ্য যাহা করিয়াছে, মনুষ্য তাহা করিতে পারে।

৭। সকল দেশের, সকল কালে মনস্বীরা এইরূপে মহৎ লক্ষ্য সাধন করিয়াছেন। আমরা নিরাশ ও জড়তায় না হইয়া জীবনের পথে চলিয়া অমৃতের অধিকারী হইব।

হিন্দুশাস্ত্র—

৮। প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা
চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্ম
ঘাতকঃ॥

উত্তম মানবজন্ম এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়।

৯। একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে
হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং
শ্রেয়োধিগচ্ছতি॥

প্রতিদিন নির্জনে একাকী আত্মহিত চিন্তা করিবেক, একাকী আত্মহিত চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

১০। যদ্দুষ্করং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং
যচ্চ দুস্তরম্।

তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপোহি
দুরতিক্রমঃ ॥

যাহা দুষ্কর, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুর্গম ও যাহা দুস্তর, সে সকলই তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তপঃপ্রভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

১১। কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ
পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্তে
পূয়তে তু সঃ ॥

পাপকর্ম্ম করিয়া সন্তপ্ত হইলে সেই পাপ হইতে মানব মুক্তি লাভ করে। "এরূপ কর্ম্ম আর করিব না।" বলিয়া যে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সে পবিত্র হয়।

১২। মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো
নাস্তি পাপহা।
ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপেভ্যস্ত্বৎ-
প্রসাদাৎ মহেশ্বর।

হে মহান্ ঈশ্বর, আমার সমান মহাপাতকী নাই এবং তোমার সমান পাপহারী কেহ নাই, অতএব আমাকে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ কর।

খৃষ্টান্ শাস্ত্র—

১৩। Take care of your heart, for out of it are the issues of life.

তোমার হৃদয় পবিত্র রাখিতে যত্নশীল হও, কারণ জীবনের উৎস সকল ইহা হইতে উৎসারিত হয়।

১৪। Verily I say unto you, a man cannot be saved unless he is born again.

আমি সত্য সত্য বলিতেছি তোমরা পুনর্জ্জাত না হইলে মুক্তি পাইবে না।

১৫। For if ye live after the flesh ye shall die; but if ye through the spirit mortify the deeds of the flesh ye shall live.

যদি তোমরা ইন্দ্রিয়ের অনুগ না হইয়া চল, তোমরা মরিবে। কিন্তু যদি তোমরা আত্মার মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়জনিত কার্য্য সকলকে দমন করিতে পার, তোমরা জীবন পাইবে।

১৬। For as many as are led by the spirit of God, they are the sons of God.

যতগুলি লোক ঐশ্বরিক-ভাব দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা ঈশ্বরের সন্তান।

১৭। The spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God.

আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের আত্মার সহিত পরমাত্মা তাহার সাক্ষী।

১৮। And if children then heirs, heirs of God and joint heirs with Chirst, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together.

যদি আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তাহা হইলে উত্তরাধিকারী, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী হইলে আমরা যিশুখৃষ্টের সম-উত্তরাধিকারী, তাঁহার সঙ্গে কষ্টভাগী হইলে তাঁহার সহিত একত্র গৌরবেরও অধিকারী হইব।

১৯। For I reckon that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.

ভবিষ্যতে যে মহিমা প্রকাশিত হইবে, তাহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমানের কষ্ট গণনার মধ্যেই আসে না।

২০। Create in me, O God, a holy heart and renew a right spirit within me.

হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে পবিত্র হৃদয়ের উদয় করিয়া দেও এবং আমার অন্তরে সত্যভাব নবীভূত কর।

মুসলমান শাস্ত্র—

২১। ঈশ্বরবিশ্বাসী চির-আশান্বিত, চির-উৎসাহবান্ ও চির-উন্নতিশীল।

জেন্দাভেস্তা—

২২। ঈশ্বর জীবদিগকে অতি সুন্দর, অতি মহৎ ও উন্নতিশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—সে এইজন্য যে তাহারা পৃথিবীকে উন্নতিশীল করিবে, পুরাতন হইতে দিবে না, মৃত্যু হইতে দিবে না, দূষিত ও পূতিগন্ধময় হইতে দিবে না। কিন্তু তাহারা এই মর্ত্ত্যধামকে চিরজীবন্ত করিবে—চির-ফলপ্রদ করিবে এবং ইচ্ছানুরূপ সুন্দর রাজ্যে পরিণত করিবে। এইজন্য মৃতব্যক্তিরা পুনরুত্থান করিবে এবং জীবিতেরা সেই অমরত্ব লাভ করিবে যাহাদ্বারা তাহাদের ইচ্ছামত পৃথিবীকে সুন্দর স্বর্গধাম করিয়া তুলিবে।

ওঁ সত্যমেব জয়তে।

নব বর্ষের বাসনা।

আজি, নূতন বরষে, পরম হরষে,
সাজায়ে এনেছি ডালি।
নবীন চন্দনে, মথিয়ে পরাণে,
পূরায়ে অর্ঘ্যস্থালী।
মাথাব চরণে, তীব্র আশা মনে,
রয়েছি দুয়ার খুলি'।
এস এস হরি, প্রাণতৃপ্তিকারী,
রয়েছি নয়ন মেলি'।
বর্ষ পরে বর্ষ, বিষাদ ও হর্ষ,
লয়ে আসে যায় চলি'।
কেঁদে হেসে দিন, শুধু হয় ক্ষীণ
রেখেছ চরণে ঠেলি'।
বায়ুর পরশে মেঘ যায় ভেসে,
বর্ষেনাক ধারা গুলি।
শূন্য সিংহাসন, করিব বহন,
বল দেব বল খুলি'।
এনে বিশ্বগেহে দিয়ে শত স্নেহে
সদা রহ কুতূহলী।
আমি শূন্য মনে, রহি অন্বেষণে,
পথ কি দিবে না বলি?
নববর্ষ সনে, আশা জাগে মনে,
নব প্রাণ পাব বলি'।

না হয়ে সফল, নিয়ত বিফল,
অতৃপ্ত পিয়াসে জ্বলি।
দিবে নাক দেখা রব চির একা,
মহৎ আকাঙ্ক্ষা দলি' ?
নহে মনোলোভা, এই বিশ্বশোভা,
পরাণ না রহে ভুলি'।
সদা চিত ধায় আছহে যেথায়
অব্যক্ত অজ্ঞেয় বলী।

তাই এ নূতনে ডাকি প্রাণপণে
এনে দিবে পদধূলী।
সার্থক নূতন বাসনাপূরণ
এস হে প্রাণ উজলি'।
নবীন পরাণ লয়ে নব জ্ঞান
সকলি দিবহে ডালি।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন

৪র্থ প্রস্তাব।

মিথ্যা কথাকে সর্ব্বদা এরূপ গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া ভাবিবেন যে, আপনার সন্তানের পক্ষে তাহা করা অসম্ভব হইবে। সন্তানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিবেন—আমার সন্তান কখন মিথ্যা কথা বলিবে না।' সে অমনি আনন্দে মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া বলিবে—'না মা! আমি কখন মিথ্যা কথা বলিব না'। আর জননীগণ ইহাও মনে রাখিবেন যে, পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে বালক-বালিকারা কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শিখে না, সে জন্য তাহাদিগকে ঐ সময় হইতে সত্য কথা বলিতে অভ্যস্ত করাইলে, তাহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলিবে না।

শিশুকে যত স্বাধীনতা দিয়া প্রেমের দ্বারা শিক্ষা দিবেন, তত সে মিথ্যা কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিবে। ভয় ও দুর্ব্বলতা মিথ্যার জন্ম-দাতা, এজন্য সন্তানকে সর্ব্বদা দৃঢ়তার সহিত নিজের কথা ও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে শিখাইবেন, আর ভুলিয়াও কখন সন্তানদিগের নিকট আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও নিজেদের কথা বজায় রাখিবেন। মাতার প্রতিজ্ঞা-পালন ও ক্লেশ-স্বীকার দেখিয়া সন্তানও নিজের প্রতিজ্ঞা ও কথা রাখিতে শিখিবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশীয় তরুণবয়স্ক পিতামাতারা অতি অল্পই জানেন যে, তাঁহাদের শিক্ষা ও প্রকৃত যত্নের অভাবে, শিশুর কত নৈতিক জ্ঞানের বীজ বিনষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে পিতামাতারা আগে আপনা-দিগকে সকল বিষয়ে পারদর্শী ও যথার্থ-রূপে শিক্ষিত করিবেন।

শিশুদিগকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা কথা

বলা বা অন্য কোন প্রকারে প্রতারণা করা অত্যন্ত অন্যায়। তাহাদিগকে কোন কথা বাড়াইয়া বলাও পিতামাতার উচিত নহে, এবং শিশুগণও যাহাতে ওরূপ না বলে সে বিষয়ে তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন। কোন বিষয় বাড়াইয়া বলা পাপ না হইলেও উহা অসত্য, এবং অভ্যাস করিলে শিশুকে পরজীবনে উহার জন্য অনেক কষ্টে পড়িতে হইবে। শিশুগণ সম্পূর্ণ পরিষ্কার বোধশক্তির অভাবে প্রায় সর্ব্বদাই সকল বিষয়ের বর্ণনা বাড়াইয়া করে। দশ হাজার পিতামাতার কাছে যত শুনায়, তাহার তত বোধ হয় না, কেননা সে ত জানে না, একশ' কত? সেজন্য সে যদি বলে—"আমি বড় হয়ে অমুককে দশ হাজার টাকা দিব," বা "ওখানে দশ হাজার লোক ছিল," তাহাতে আপনার অবিশ্বাস হইলেও উহা হাসিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন, আর উহাতে কোন দোষ ধরিবেন না। সেইরূপ দূরত্বের পরিমাণেও শিশুরা বাড়াইয়া থাকে। কোন দ্রব্য সে হাতে না পাইলে অনায়াসে বলে ওটা মেঘের মত উচুঁতে আছে. তাহার কাছে মেঘ অতি দূরে নয়। কেননা সে প্রতিরাত্রে মার কোলে বসিয়া হাত বাড়ইয়া চাঁদ ধরিতে চায়, আর জননী ইচ্ছা করিলেই চাঁদকে নীচে আনিতে পারেন, এই তার বিশ্বাস। সুতরাং সন্তানদের ওরূপ কথা অযথার্থ হইলেও উহা মিথ্যা নয়। সে জন্য ঐ সকল কথা হাসিয়া আদরে গ্রহণ করাই পিতামাতার কর্ত্তব্য। কিন্তু সন্তান যখন কোন দ্রব্য বা দৃশ্য দেখিয়া তাহা অত্যন্ত বাড়াইয়া বলে, তখন তাহাকে স্মরণ করাইয়া সকল কথা ঠিক করিয়া বলিতে শিখাইবেন, তাহা হইলে সে নিজেই নিজের ভুল শুধরাইয়া লইবে। কোন বিষয় সে যদি ভুলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ভয়ে বা লজ্জায় মিথ্যা বলিতে দিবেন না, বরং মিষ্ট কথায় ও বিনা তাড়নায় তাহাকে সত্য ঘটনা স্মরণ করিতে বলিবেন। শিশুকে কোন কার্য্য বা বিষয় গোপন রাখিতে শিক্ষা দিবেন না। কেননা, কথা বা কার্য্য গোপন রাখার অভ্যাস, বিলম্বে অন্যান্য নৈতিক জ্ঞানের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। সে কারণে অতি অল্প বয়সে কোন বিষয় গোপন রাখিবার চেষ্টা পাইলে শিশুর মনে অসত্যবাদিতার অঙ্কুর জন্মাইবার সম্ভাবনা। সত্যবাদিতা মানুষের নৈতিক স্বভাবের মূল স্বরূপ। সেজন্য উহার উপর অন্যান্য সমুদায় সদ্‌গুণের চর্চ্চা ও বৃদ্ধি একান্ত নির্ভর করে। প্রথম হইতেই শিশুকে সুশিক্ষা দিলে সে উহাতে আপনা হইতে অভ্যস্ত হইবে।

সত্যবাদিতা হইতে আমরা সহজেই লজ্জার কাছে আসি। শিশুকে লজ্জা শিখাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কেবল তাহার চক্ষু ও কর্ণকে সমুদায় অশ্লীল দৃশ্য ও কথা হইতে সযত্নে দূরে রাখুন ও তাহার শরীরকে পবিত্র রাখিতে শিক্ষা দিন। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ সে

কোন নির্দ্দোষ লজ্জার কাজ করে, তবে তাহা পুনরায় করিতে নিষেধ করুন। একবার ইহাতে 'ছি!' বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিলে, সে উহা আর কখনও করিবে না। এই বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার নাই, কেননা, শিশু লজ্জা বোধ করিবে কেন? ঈশ্বর তাহাকে যেমন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সেইরূপই হইয়াছে। আর এ জগতে শিশুপ্রকৃতির ন্যায় কোন্ দৃশ্য অধিক মনোহর? সেজন্য শিশুকে গৃহের মধ্যে বা সাধারণ স্থানে অধিক কাপড় পরাইয়া তাহাকে কষ্ট দিয়া তাহার সৌন্দর্য্যের হানি না করিয়া সহজভাবে আরামে খেলিতে দেওয়া জ্ঞানী লোকের কাজ।

সত্যবাদিতা যেমন শিশুর নৈতিক স্বভাবের পুষ্প-স্বরূপ, লজ্জাকে তেমনি উহার কলিস্বরূপ বলা যাইতে পারে। পিতামাতার বিশেষ যত্ন বিনাও উহা একটু একটু করিয়া শিশুর চরিত্রে প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রথম হইতে পিতামাতা যত সতর্ক হইয়া সন্তানকে দূষিত দ্রব্য ও আচার-ব্যবহার হইতে দূরে রাখিয়া শুধু সুন্দর, পবিত্র, মিষ্ট দৃশ্য ও আলাপে ঘিরিয়া রাখিবেন, ততই সে লজ্জাকর কাজ বা বিষয়ের সঙ্গে একেবারে অপরিচিত থাকিবে। সন্তানকে যেরূপ সুন্দর করিতে ইচ্ছা করেন, পিতামাতা নিজে সেইরূপ হইলেই শিশুর জন্য আর কোন ভাবনা থাকিবে না।

বালকবালিকাদিগকে সর্ব্বদা পৃথক রাখিতে চেষ্টা করিবেন না, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা একত্র লালিত হইলে তাহারা যে অধিকতর সৎ, শিষ্টাচারী ও সচ্চরিত্র হয়, তাহা আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার উদাহরণে স্পষ্ট জানিতে পারি। ঐ সকল দেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একত্র শিক্ষিত হয়। স্কুল হইতে কলেজ পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়েরা একভাবে ও এক সঙ্গে জ্ঞান-সুধা পান করে। সেজন্য ঐ সমস্ত দেশের ন্যায় আর কোন দেশে পুরুষেরা স্ত্রীলোককে অত মান্য করিয়া চলে না। অন্যান্য অনেক প্রকৃত ও উত্তম ঘটনার মধ্যে এই বিষয়টীতেও এ দেশবাসীদিগের ঐ সকল দেশের লোকের নিকট হইতে উপদেশ ও আদর্শ লওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের লোকেরা এখনও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ঐ পবিত্র ভ্রাতাভগিনী-ভাব বুঝিতে অক্ষম। কাজেকাজেই তাঁহারা যেমন অসময়ে বালকবালিকাদিগের মনে দাম্পত্য প্রেমের উদ্রেক করেন, সেইরূপ অকালেই তাহাদের মনে অস্বাভাবিক লজ্জারও বীজ রোপণ করেন।

পুত্রকন্যাদিগের লজ্জার জন্য পিতা-মাতার কোনরূপ উতলা হইবার আবশ্যকতা নাই, স্বাভাবিক বিধানানুসারে তাহাদের শরীর ও মন প্রস্ফুটিত হইলে, লজ্জা আপনা হইতেই তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে। প্রথম হইতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে বালকবালিকারা মিথ্যা লজ্জাবশে অকালে পরস্পরের কাছ হইতে ভয়ে পলাইবে না বা পরস্পরের সঙ্গে

নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। কিন্তু কোন অপবিত্র কথা বা ক্রীড়ার নিকটস্থ হইবামাত্র তাহাদের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিবে, ঘৃণা বা রাগে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইবে।

৫ম প্রস্তাব।

যখন কোন ভাষায় "ঈশ্বর" শব্দ শুনা যায়, উহা আপনা হইতে চক্ষুকে উপর দিকে ফিরায়। কিন্তু শিশু কিরূপে উপর দিকে তাকাইতে শিখিবে? মানুষের নৈতিক জ্ঞানের উচ্চতম পুষ্টিসাধনের ফল ধর্ম্ম, এবং শিশু অতি সুন্দররূপে তাহার প্রথম আভাস পায়। গল্প বা কল্পনা দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বা ভক্তি শিক্ষা দিবেন না, কিন্তু উচ্চতম ও পবিত্রতম ভাব ও কার্য্যের দ্বারা সে যেন উহা অনুভব করিতে পারে। কোন অসাধারণ নৈসর্গিক ঘটনা, বা হর্ষ, ভয় ও দুঃখের সময় ঈশ্বরের নাম করিলে, শিশু নিজেই কোনও মহাকাণ্ড বা অসাধারণ শক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের নাম যোগ দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে শিখিবে। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কারক মেধাবী নিউটন বাল্যকাল হইতে এরূপভাবে ধর্ম্মের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের নাম শুনিবামাত্র, তিনি মাথার টুপি খুলিয়া জগৎপিতাকে নমস্কার করিতেন। সে কারণে পরমাত্মার নামের সঙ্গে শিশুকে পবিত্রতা ও ভক্তিভাব বুঝিতে দিলে ঐ বিশুদ্ধ বাতাসের নীচে তাহার মনে অতি উচ্চ ও পবিত্র ভাবের উদয় হইবে। অনন্ত জ্ঞান অল্পে অল্পে বোধগম্য নয়। কিন্তু সময়ে শিশুর আত্মা ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে সে অবশেষে উহা মনে ধারণা করিতে ও অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে।

অনন্ত ও অজ্ঞেয় সমুদায় বিশ্ব শিশুতে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, নতুবা কথা দ্বারা কখনও তাহার মনে ঐ ভাবের সঞ্চার করা যাইত না। সেই কারণে যখন মাতার পবিত্র আত্মা শিশুর পবিত্র আত্মার সহিত কথা কহেন, শিশু তখন উহা বুঝিতে সক্ষম হয়। কেননা প্রকৃত ঘটনার পূর্ব্বে যেমন কল্পনার সৃষ্টি, দোষের পূর্ব্বে নির্দ্দোষিতার আবির্ভাব, সেইরূপ শিশুর মনে অপবিত্রতার পূর্ব্বে পবিত্রতার উদয় হয়। সন্তান যখন মাতার কাছ হইতে কোন দ্রব্য পাইলে উল্লাসে মাতার গলা ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করে। ও তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাকে ঐ দ্রব্যের জন্য জগৎপিতাকে নমস্কার করিতে শিখাইবেন। তাঁহার দয়া ও ইচ্ছা বিনা আপনার উহা দিবার কোন ক্ষমতা নাই, এবং তিনি আপনার অপেক্ষা কত মহত্তর—শিশুর মনে এই জ্ঞান বদ্ধ করিয়া দিবেন। তাহাকে বলিবেন যে, সে ভাল সন্তান হইলে ও মার কথা শুনিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, কেননা তিনি আমাদিগের সকল কাজ দেখিতে পান। পরে তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে উঠিবার ও রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ও তাঁহার কথা ভাবিতে শিখাইবেন যত ॥

সরল ভাষা সে বুঝিতে পারে, তাব প্রার্থনা তত সরল ও ছোট হওয়া আবশ্যক। শিশুকে যোড়হস্তে ও ঊর্দ্ধমুখে এক মুহূর্ত্ত মাত্র ঐ পবিত্র দেবতার জ্যোতি বুঝিতে দিবেন, তাহা হইলে সে বড় হইয়া কখন ঐ মহাজ্যোতি ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইবে না।

আহারের পর শিশু যেন আহার-দাতাকে ধন্যবাদ দিতে শিখে। বাহিরে খেলিবার সময় শিশু যেন জানিতে পারে যে, মাঠ, বন, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, আকাশ, পশুপক্ষী—সকলই সেই পরম পিতার মনোহর সৃষ্টি। তাহাকে পুষ্পের সৌন্দর্য্য দেখাইবেন, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও গঠনে তাহারা কি অনুপম পদার্থ, কত অসীম জ্ঞান দ্বারা পশুপক্ষিগণ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কেমন তাহার নিজের হস্তপদের মত নড়ে তাহাকে বুঝাইবেন। ইহা দেখাইয়া তাহাকে বলিবেন যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ কোন পদার্থ বা জীব সৃজন করিতে সমর্থ নয়। এইরূপে কোন অলীক জ্ঞান ও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কোনরূপ ভয় বা শঙ্কা উৎপাদন ব্যতীত শিশুর সরল আত্মা ঈশ্বর-প্রেমে ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়।

জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর ইহা অপেক্ষা গভীরতর বিষয় সকল শিশুকে বুঝাইবার প্রয়াস করা বৃথা, ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ জীবনের পূর্ণ অবস্থার জন্যই রাখা ভাল।

উপরে লিখিত মূল কথাগুলি শিশু-দিগকে নৈতিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার ভিত্তি স্বরূপ। পিতামাতা তাহাদিগকে যত্ন ও আদরের সহিত পালন করিবেন, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন তাহাদের কথা তাঁহাদিগের মন হইতে অপসৃত না হয়। তাঁহারা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, শিশুকে সম্পূর্ণ মানুষ করিবার ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, সে জন্য তাঁহাদের জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তও এই সৎকার্য্যে ব্যয় করা আবশ্যক। আর শিশুর অবস্থা ভাবিয়া আপনাদিগকে তাহার সমান মনে করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহাকে যে উপদেশ দেন বা যে কাজ করিবার আজ্ঞা করেন, তাহা তাহা-দিগের বুঝিবার উপযুক্ত করিয়া বলিবেন। কেননা, তাহারা সকল বিষয় নিজেদের উপযোগী করিয়া লইয়া তাহার ভাব গ্রহণ করিতে অপারক।

শিশুর শিক্ষা সকল দিকেই সমান হওয়া উচিত, তাহাতে তাহার শরীর, মন ও প্রকৃতি এককালে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হইবে। ঐরূপে শিক্ষা দিলে বাল্যকালে যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, পরজীবনে তাহা হইতে সুফল জন্মিয়া পিতামাতাকে আনন্দিত ও পুরস্কৃত করে। জলের মধ্যে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় পিতামাতা শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের ছবি দেখিতে পাইবেন, এবং উচ্চ আশার সহিত, যাহার অন্তরে ধর্ম্ম-নীতির বীজ বপন জন্য তাঁহারা প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, তাহার চিরমঙ্গলের জন্য পরম পিতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

শোকাশ্রু।

(ভারতগৌরব জষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জননী জগত্তারিণী দেবীর পরলোক গমনে)

কি শুনিনু—বজ্রধ্বনি,
চলি গেছ দিদিমণি,
সমস্ত অবনীমাঝে তুমি নাকি নাই?
আজি সেই পূত স্নেহ,
সে পবিত্র দিব্য দেহ,
সবি নাকি গঙ্গাতীরে হয়ে গেছে ছাই। ১

কি শুনিনু—গেছ তুমি,
ধরা করি মরুভূমি,
আঁধারি সে রাজপুরী আনন্দ-ভবন,
সেই কথা সেই হাসি,
সেই করুণার রাশি,
সবি নাকি ফুরায়েছে জন্মের মতন? ২

শুনিয়া স্নেহের ভাষা
কভু যে মিটেনি আশা,
দীন দেশে তুমি যে গো অমূল্য রতন,
কত ব্যথী গিয়া ছুটি
চরণে পড়েছে লুটি,
আদরে আশ্বাসে বক্ষে করেছ গ্রহণ। ৩

শত তাপ-তপ্ত হিয়া,
স্নেহ কত জুড়াইয়া,
করিয়াছ শুষ্ক প্রাণ কত সুশীতল,
তব দ্রব করুণায়,
ভাসাইয়া আপনায়,
পেলে কত দগ্ধ-হিয়া আরাম নির্ম্মল। ৪

শিশু সম সরলতা,
বুকভরা মধুরতা,
ভুলিবার কথা সে কি মানব-জীবনে?
দেখেছে যে একবার
সার্থক জীবন তার,—
দেবতা-দর্শন তার পার্থিব নয়নে! ৫

দেবীরূপা সাধ্বী সতী,
ধর্ম্মশীলা পুণ্যবতী,
দয়াময়ী তপস্বিনী পর-হিত-রতা,
উদারতা বিশ্বোদর,
চিত্তে নাহি আত্ম পর,
তোমার সংসারে মাখা করুণা মমতা। ৬

তাই দেবি! বিধাতার
পেলে শুভ পুরস্কার,
দেবতুল্য পতিপুত্র—যোগ্য পরিজন,
তাই তুমি পেলে দিদি,
"আশু" দেশোজ্জ্বল নিধি,
মহারত্ন-প্রসবিনী উজলি ভুবন! ৭

আর না লিখিতে পারি,
ঝরিছে নয়নবারি,
তোমা বিনা শূন্য আজি সমস্ত হৃদয়,
আমাদের হেথা ফেলে,
সত্য তুমি চলি গেলে,
পতি পুত্র কন্যা যথা অমর-আলয়? ৮

লেখিকা শ্রীমা—

ঈশ্বরকে কোথায় অন্বেষণ করিতে হইবে?

অনন্ত কাল ধরিয়া কত যোগী, ঋষি, মুনি সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অন্বেষণে ব্যস্ত রহিয়াছেন! কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ বেলাভূমিকে আঘাত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গেল!—কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি? কোথায় তিনি? –'কোথা গেলে পাব হরি, কোথা গেলে পাব হরি?'—

আহা! যদি জানিতাম কোথায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়! 'O that I knew where I might find God!' কত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা জব (Job) ঐ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত করিয়া গিয়াছেন!!—ইহা কি কেবল মহাত্মা জবেরই নিভৃত হৃদয়-কন্দরের কথা? না না, মানব-জাতিরই ঐ বাক্য—'হায় যদি জানিতাম কোথায় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়!'

যদি মানবপ্রাণের ভাষা অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুগে যুগে প্রতিনিয়তই জীবনপথে বিভ্রান্ত, বিপর্যাস্ত পথিকও ঐ কথা বলিতেছে—'হায় যদি জানিতাম কোন্ স্থানে গমন করিলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়!' ঐ সংসারভারে ভারাক্রান্ত নরনারীর হৃদয়ের বাণী যদি কদাপি শিক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় সেই স্থানেও সেই একই কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে—'হায় যদি জানিতাম কোন্ স্থানে গমন করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব?' যদি গভীর সন্দেহ-সাগরে নিমজ্জিত আমাদিগের পৃথিবীবাসী ভ্রান্ত ভ্রাতার প্রাণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে দেখা যায় সে স্থানেও সেই একই কথা—'O that I knew where I might find Him'! সকল দেশে, সকল কালে, মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনিতে, তাহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে সেই এক পুরাতন বাণী—'O that I knew where I might find Him.'

জগতের সমুদায় ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, মানব তাহার শুষ্ক ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া কখনও তুষ্ট থাকিতে পারে না। যত দিন মানব তাহার জীবন্ত, জাগ্রত দেবতার উপর প্রেম, বিশ্বাস ও প্রীতি স্থাপন করিতে না পারে, ততদিন সে অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যতদিন পর্য্যন্ত সে তাহার কল্পনার দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন্ত পরমেশ্বরে প্রীতি অর্পণ করিতে না পারে, তত দিন সে শান্তিলাভ করিতে পারে না।

ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিবার জন্য জগতে নানা যুক্তিপূর্ণ তর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু গভীর গবেষণা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এক মানবাত্মার সাক্ষ্যই ভগবৎসত্তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যুক্তি তর্ক কদাপি তাঁহার সত্তা প্রমাণ

করিতে সক্ষম নহে। এই জন্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।—' 'মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।' তাঁহারা আরও বলিয়াছেন 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা'—তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' ভগবান্‌কে জানিবার জন্য মানবপ্রাণের ব্যাকুলতাই একমাত্র উপায়।

তীরস্থ ভূমিকে প্লাবিত করিবার জন্য উত্তাল তরঙ্গমালা-সমাকীর্ণ উদ্বেলিত জলধিবক্ষ যখন সন্দর্শন করা যায়, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও মহতী শক্তি ইহার মূলে কার্য্য করিতেছে। তদ্রূপ যখন মানবের চিন্তা এবং ভাবের স্রোত কোনও উচ্চ আশা বা কোনও মহত্ত্বের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তখন স্পষ্টই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, কোনও ঐশী শক্তি মানবাত্মাকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবার জন্য কার্য্য করিতেছে। যখন আমরা ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করি, যখন ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ করি, তখন মানবপ্রকৃতির এই প্রধান অভাব দেখিতে পাই—'হায় যদি জানিতাম কোন্ স্থানে গমন করিলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়!' ইহাই মানবের প্রধান অভাব যে, সে জানে না ভগবৎসন্দর্শন কোথায় লাভ হয়। এই নিমিত্তই সে ভীষণ আর্ত্তনাদ করে—'হায় যদি জানিতাম কোথায় ঈশ্বর লাভ হয়!'

এই প্রশ্নের তিনটী উত্তর আছে। যথাক্রমে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।—

১। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, ছিল না, হবে না, হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে জানিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা জানি, নাস্তিকবাদ কখনই জয়লাভ করিতে পারে না। ধ্বংসোন্মুখী মানবপ্রকৃতির ইহা লক্ষণমাত্র। হিরণ্যকশিপুর ধ্বংসের প্রাক্‌কালে সেও এই নাস্তিকবাদ প্রচার করিয়াছিল, শিশুপালবধের সময়েও তাহাই হইয়াছিল। মানবজাতির ধ্বংসের সূত্রপাত এই স্থানেই। ইউরোপে ফরাসীবিদ্রোহও ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যত দিন মনুষ্যপ্রকৃতিতে প্রলয় উপস্থিত না হইতেছে, তত দিন নাস্তিকবাদ কখনও জয়ী হইতে পারিবে না। মানব-জীবনে ধর্ম্ম এরূপ ওতঃপ্রোতঃভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, মানবের সমুদয় মানসিক ও নৈতিক গঠনপ্রণালীকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন না করিয়া ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করা যায় না। ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের লক্ষণ। ইহা ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। এই জন্যই প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

ধর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষত্ব, ধর্ম্মে যাহারা হীন তাহারা পশুর সমতুল্য।

২। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—বাস্তবিকই সকল শক্তির মূলে একটী অনন্ত শক্তি আছে। সকল শক্তিই সেই এক অনন্ত শক্তি হইতে উৎসারিত হইতেছে। সেই শক্তিকে যদি তোমরা —ঈশ্বর—এই আখ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা প্রদান করিতে পার। কিন্তু সেই ঈশ্বর দুরবগাহ রহস্যের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। তিনি অজ্ঞাত ও অগম্য, কেহ তাঁহাকে জানে নাই এবং জানিতেও পারে না। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, যতই অন্বেষণ কর না কেন, তিনি তোমার চেষ্টার অতীত, তিনি তোমার অন্বেষণের পর পারে।

কিন্তু ইহা কি কখনও সম্ভবপর যে, মনুষ্য সেই অদ্বিতীয় প্রেমময় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার অন্বেষণে বিরত হইবে? নাস্তিকের যতই সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক উপস্থিত থাকুক না কেন, যুগে যুগে মানব ঈশ্বরের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিবেই থাকিবে। তুষারাবৃত হিমপ্রদেশস্থিত উত্তরমেরু আবিষ্কারের জন্য কত নাবিক তাহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিল, কত ভীষণ দুঃখের ভার মস্তকে গ্রহণ করিল, আর সামান্য নাস্তিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মানব ঈশ্বরচিন্তা হইতে বিরত হইবে—ইহা কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য? এই অন্বেষণশীল আত্মা পরমাত্মার অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইবে, ইহা কি কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

"ভুলায়েছ যারে প্রলোভনে,
সে কি শ্রান্ত হবে তব অন্বেষণে?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে,
কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার?"—

বাস্তবিকই ইহা অতিশয় যথার্থ কথা।

৩। এক্ষণে তৃতীয় উত্তর। এই উত্তরটীই সকলের গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় এবং সকলকে বিচারপূর্ব্বক ইহার গ্রহণ বিষয়ে অনুরোধ করিতে ইচ্ছা হয়। তৃতীয় উত্তর এই যে—ঈশ্বর আছেন, এবং মানুষ ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ও তাঁহাকে জ্ঞাত হয়।

আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যাইতেছি না। আমি নাস্তিকের যুক্তিখণ্ডনে প্রয়াসী নহি। কিন্তু মানব ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করে এবং তাঁহা ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে কদাপি সক্ষম হয় না—এই বিশ্বাস করিয়া সরলভাবে তাঁহাকে কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতে একবার চেষ্টা করিব।

প্রকৃতি রাজ্যে ঈশ্বর।

মানব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রকৃতিরাজ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছে। এই প্রকৃতির মধ্যেই মনুষ্য সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই প্রকৃতির নানা বিচিত্র শক্তি মানবের প্রাণে বিভিন্ন দেব দেবীর ভাব জাগরিত করিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় মানবজাতি শিশুর ন্যায় অতিশয় সরলমতি ছিল—প্রত্যেক দ্রব্যই

তাহাদিগের নিকট প্রাণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইত। সূর্য্য একজন দেবতা, তিনি আকাশ-মার্গে প্রতিদিন তাঁহার রথ চালনা করিতেছেন। প্রত্যেক কৌতুক-প্রদ শিলাখণ্ডও তাহাদিগের দেবতা। অসামান্য কাষ্ঠফলক তাহাদিগের কোনও অশরীরী দেবাত্মার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপে মানবের চিন্তাতে গগনবিহারী অসংখ্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল ও যাবতীয় পার্থিব পদার্থ অসংখ্য দেবদেবী বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। যদিও প্রকৃতিপূজা অন্ধ নীতিবিগর্হিত ও অতিশয় জঘন্য বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি জগতে ইহাই এক সময়ে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে ক্রমে মানব-হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে,তাহাদের জীবন, শক্তি ও সামর্থ্য অপেক্ষা এক বৃহত্তর জীবন, শক্তি ও সামর্থ্য বিদ্যমান আছে ও তাহার নিকট তাহারা অধীনতা স্বীকার করিতে ও তাহার পূজা করিতে বাধ্য। কিন্তু এই প্রকৃতিপূজার মধ্যে যে জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য মানবের হৃদয় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে—তাঁহাকে সে প্রাপ্ত হয় নাই। বলিতে কি, মানব যখন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিল তখনও সে কেবল প্রকৃতির ঈশ্বরকে পূজা করিত, তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিত এবং তাহার নিকট ভীত ও শঙ্কিত হইত, কিন্তু কদাপি তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিত না। সে তাঁহার চরণতলে অবনত হইত, তাঁহার দাস হইয়া থাকিত, কিন্তু কদাপি তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিত না। বাস্তবিকই, প্রকৃতি সৌন্দর্য্য, শক্তি ও দয়ার আধার এক ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে, কিন্তু তৎসহকারে আবার মানবের দুর্ব্বলতার প্রতি তাঁহার নির্দ্দয়তা, তাহার পাপের প্রতি তাঁহার কঠোরভাব এবং তাহার প্রার্থনার প্রতি তাঁহার বধিরতা প্রকাশ করিয়া দেয়। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ এক শাসন-কর্ত্তাকে প্রকটিত করে, কিন্তু ইহা সেই অনন্ত দয়াময় পিতাকে ব্যক্ত করে না।

ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বর।

অনেকে বলিবেন, কেন অপর একটী স্থানে আমরা ঈশ্বরের অধিকতর আশ্চর্য্য-জনক প্রকাশ দেখিতে পাই। প্রকৃতি-রাজ্য অধ্যয়ন করিয়া তুমি যাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হও, বিশ্বের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল তদপেক্ষা অনেক অধিক ঈশ্বরতত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারে।

বাস্তবিকই ইহা অতিশয় সত্য কথা। জগতের বাহ্যিক নিয়মপ্রণালীর মধ্যে আমরা যেরূপে ঈশ্বরপ্রকাশ দর্শন করি, ইহাদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিকতর, উচ্চতর ও গভীরতর ঈশ্বরপ্রকাশ দেখিতে পাই। বাইবেল গ্রন্থে তুমি মানবাত্মাকে অধ্যয়ন করিতে পার, এবং যখন তুমি জীবন্ত আত্মার নিকটে আগমন কর, তখনই তুমি ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত হও। ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে অতিশয় মূল্যবান্ ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

জগতের মধ্যে বাইবেল এক মহাগ্রন্থ। ইহার প্রতি পত্রে ঈশ্বর-প্রেরণার বহ্নি উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ কি? ইহা মানবের ঈশ্বর অন্বেষণের ইতিহাস মাত্র। যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানবাত্মা কিরূপ ব্যাকুলভাবে—'কোথায় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারি?'—এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাই আমাদিগের নিকট প্রকাশ করে। কিরূপে মানবজাতি জগতের ভীতিপদ শক্তিনিচয়ে সন্তোষ লাভ না করিয়া অনন্ত প্রেম এবং সেই অনন্ত পিতার আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই সাক্ষীরূপে ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিরূপে অপরাপর মানব ঈশ্বরের জন্য অন্বেষণ করিয়াছে, ইহা তাহাই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। কিন্তু আমরা যদি সেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে বাসনা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আপনাপনি তজ্জন্য অন্বেষণ করিতে হইবে, আপনাপনি তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। মহাত্মা ডেবিডের প্রার্থনা সকল, ঈশার সঙ্গীতাবলী ও জবের (Job) সংগ্রাম ও সংশয়ের কাহিনী আমরা আপনারা কিরূপে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারি তাহাই বলিয়া দেয়। যদি কেহ বলেন, 'এই ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বিশ্ববিধাতার স্বলেখনীনিঃসৃত,' তথাপি পিপাসু আত্মা কখনই সেই বাণীতে প্রীত হইতে পারেন না। পরমেশ্বর সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি বলিয়াছিলেন তাহা মানবাত্মা জানিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু তিনি অদ্য আমাদিগকে কি বলিতেছেন, তাহাই জানিবার জন্য ব্যগ্র। জীবন্ত ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশা, মুষা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাকুলাত্মার নিকট তিনি যেরূপ স্বতথ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্যও তিনি আমাদিগের ব্যাকুলাত্মাকে স্বকীয় বাণী শ্রবণ করাইবেন। ব্যাকুলাত্মা অনন্ত জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া, ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিশ্বনিয়ন্তার সিংহাসন আত্মহৃদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—'হে প্রভো, তোমার বাণী শুনাও, তোমার দাস সে বাণী শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে'।

আমাদিগের কোনও প্রাণসম সখা যখন বিদেশে বাস করেন, তখন তাঁহার লেখনীবিনিঃসৃত পত্রসমূহ আমাদিগের নিকট কতই না মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন সেই বন্ধুবর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হয়েন, যখন তাহাকে আলিঙ্গন করি, যখন তাঁহার প্রেমমুখ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতে থাকি, তখনকার সে আনন্দের কি সীমা আছে? যদ্যপি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ঈশ্বরের লেখনীপ্রসূতই হইয়া থাকে, তথাপি সেই সকলের অধ্যয়নাপেক্ষা একটী প্রকৃষ্টতর বস্তু আছে। সেই প্রকৃষ্টতর বস্তু জীবন্ত ঈশ্বরের স্পর্শলাভ, সেই ঐশী সত্তার স্পর্শ, এবং সেই

পরমাত্মার সহিত বিশ্রম্ভালাপ। এইজন্যই আমরা বুঝিতে পারি কিরূপে ব্যাকুলাত্মা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া কাঁদিয়া উঠেন, "আহা, আমিও কি ঐ ঋষি,ভগবৎব্যাকুল মহাত্মা-দিগের ন্যায় ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না? তাঁহারা ত ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, "হায়! আমি যদি জানিতাম কোন্ স্থানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়?"

মহাজনদিগের মধ্যে ঈশ্বর।

কেহ কেহ বলেন, মহাজনদিগের মধ্যেই কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মধ্যেই, মানবাত্মার মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাদিগের কার্য্যাবলীর মধ্যেই, সেই অজ্ঞেয় পরমেশ্বরের পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা ভগবানের অবতার। তাঁহাদিগের এইরূপ বলিবার কারণ কি, তাহা একবার চিন্তা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে, সেই মহাত্মাদিগের অকৃত্রিম প্রেম, অকপট করুণা, আশ্চর্য্যজনক শুদ্ধভাব এবং তাঁহাদিগের সত্যপরায়ণতা এই সকল ঐশ্বরিক গুণ। তাঁহাদিগকে অবতার বলিবার কারণ ভগবদিচ্ছার সহিত তাঁহাদিগের স্বভাবের আশ্চর্য্য মিলন। তাঁহারা তাঁহাদিগের গভীর ধর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত নিরন্তর সহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভ করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতেন এবং কায়মনোবাক্যে তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নশীল থাকিতেন। তাঁহাদিগের মনুষ্যপ্রকৃতি, ঐশ্বরিক প্রকৃতির সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে সেই মহানন্দের মহোৎসবে তাঁহারা গাহিয়া উঠিয়াছিলেন,—'সোহহম্'—আমিই সেই ব্রহ্ম; I and my father are one'...আমি এবং আমার পিতা এক। এই জন্যই যখন অন্যান্য মানব তাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বর-প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন তাঁহারা স্বকীয় মার্গ তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মা খৃষ্ট বলিয়াছিলেন,—'Live such a life as I am living and you will find God as your father.'—আমার ন্যায় জীবন অতিবাহিত কর, তোমরাও তোমাদিগের পিতৃরূপে ঈশ্বরের দর্শন প্রাপ্ত হইবে।' I am the door,' 'I am the way'—আমি পিতৃভবনে যাইবার দ্বার, আমিই তাহার পন্থা। বাস্তবিকই ইহা অতিশয় সত্য কথা। যে ব্যক্তি পিতার ভবন দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তিই আগন্তুককে সেই গৃহে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতে পারে। ইহাতে আত্মশ্লাঘা নাই। ইহা কর্ত্তব্যের আহ্বান। কিন্তু এই মহাজনগণ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই মত বিশ্বাসে কেহ কখনও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। যদি তাঁহারাই পিতৃভবনের দ্বার হয়েন, তাহা হইলে কেবলমাত্র তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম ও পূজা করিয়া সন্তুষ্ট থাকা কোনও ক্রমে উচিত নহে। দ্বার দেখিয়াই যদি সন্তুষ্ট

হইয়া তাহার পূজায় জীবন অতিবাহিত করি, তবে মন্দিরে প্রবেশ করিব কিরূপে? তীর্থ পর্যাটন করিতে যাইলাম, প্রবেশের দ্বার দেখিলাম, দ্বারের পূজা করিয়া ফিরিলাম, মন্দিরের মধ্যে দেবতাকে দেখিলাম না! হায়রে মানব-জীবন!

আমার তীর্থের ফল হইল কি? ক্ষুদ্র মানবের দুর্গতি দেখিয়া মহাজনগণ আপনাদিগের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া, নিগূঢ় সত্য, মানবের মুক্তির সোপান আবিষ্কার করিলেন, মানবকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হতভাগ্য মানব তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ধরিল, তাঁহাদিগকে ফলপুষ্পে পূজা করিতে লাগিল। তাঁহাদিগকে ফলপুষ্পে পূজা করিলে, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিলে, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয় না। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করা আবশ্যক। এ স্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। (১) অকূল সাগরে নিমজ্জিত হইতেছি, এরূপ সময়ে এক সন্তরণপটু ব্যক্তি ঘাটের পথ আমাকে দেখাইয়া দিল। আমি যদি ঘাটের পথে গমন না করিয়া তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরি, তবে কি উভয়ের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয় না? (২) আমি কলিকাতা হইতে দিল্লি যাত্রা করিব। ষ্টেসনে গেলাম, দিল্লির পথ জানেন এরূপ এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট দিল্লিগমনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার বিদিত পন্থা বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, টিকিট ক্রয় কর, সম্মুখে যে বাষ্পীয় শকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহাতে আরোহণ কর, তুমি আচিরে দিল্লি পৌছিবে। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইলাম, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। কিন্তু টিকিট ক্রয় করা দূরে থাকুক, আমি তাঁহার চরণ দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিলাম, তাঁহার নানা প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে ফলপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ট্রেনে উঠিলাম না। তাহা হইলে কি আমার দিল্লিগমন হইল? জ্ঞানিগণ আমাকে বিকৃতমস্তক বলিয়া হাসিতে হাসিতে দিল্লি প্রস্থান করিলেন।

অদ্য যদি সেই মহাত্মাগণ এই ধরাধামে তাঁহাদিগের পার্থিব শরীর অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকিতেন ও দেখিতেন শত শত নরনারী হৃদয়ের আবেগে তাঁহাদিগকে পরম পিতা জগদীশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে, তাহা হইলে তাঁহারা কি আজ গভীর আত্মবেদনায় ক্রন্দন করিয়া বলিতেন না?—'হে শিষ্যবর্গ তোমরা কি করিতেছ? আমাদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইও না, একবার মন্দিরে প্রবেশ কর। আমি যে দ্বার, আমি যে পন্থা, আমাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিও না। একবার জীবন্ত দেবতার মন্দিরে প্রবেশ কর, প্রেমময় অনন্ত পিতা তোমাদিগের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিবেন।'

এই বিশ্বের মহাজনগণ ঐশ্বরিক গুণ

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে আমাদিগের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকেও ঈশ্বরের গুণ লাভ করিয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। মন্দিরের দ্বার অতিশয় সৌন্দর্য্যময় হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র মন্দিরে, যে স্থানে ঈশ্বর সন্দর্শন লাভ করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, যেস্থানে প্রেমময়ের অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্তি লাভ করে, সেই পুণ্যময় স্থানে প্রবেশ হইতে আমাদিগকে আকৃষ্ট করা কদাপি ন্যায়সঙ্গত নহে।

মানবাত্মায় ঈশ্বর।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মস্বরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যেই সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

স্বকীয় আত্মার মধ্যেই কেবল মানব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়। যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য ঈশ্বরকে আপনার আত্মকোষের মধ্যে দর্শন করিতে না পারে, ততদিন সে তাঁহাকে কুত্রাপি দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যখন সে একবার তথায় তাঁহাকে দর্শন করে, তখন সে সর্ব্বত্র—মহাজনভিতরে, ধর্ম্মগ্রন্থনিচয়ের প্রতি পৃষ্ঠায়, তাঁহার প্রকাশ দর্শন করে এবং প্রকৃতির ভীষণতাও তখন তাহার নিকট অনন্ত প্রেমময় পিতার প্রেমের শাসন বলিয়া উপলব্ধি হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ সকলও এইরূপেই, ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। উপনিষদ্ বলিতেছেন,

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—

'জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।' বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—'Blessed are the pure in heart, for they shall see God.'—পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবেন। 'God is love; and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him.'—ঈশ্বর প্রেমময়; যিনি প্রেমেতে বাস করেন, তিনি ঈশ্বরে বাস করেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে বাস করেন। এতদ্দ্বারা ইহা বলা হইতেছে না যে, ঈশ্বর বিষয়ে সমুদায় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, কিন্তু এইরূপে মানব আপন আত্মার অভিজ্ঞতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার অত্যাবশ্যক জ্ঞানফল প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়। ঈশ্বরবিষয়ক এই, যে জ্ঞান, মানব তাহার অভিজ্ঞতার দ্বারা, তাহার বহুদর্শিতার দ্বারা, লাভ করে, তাহা অতিশয় মূল্যবান। প্রত্যেকেই তাহার অধিকারে সমর্থ। ইহা কেবল সাধুদিগের নহে, ইহা কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা দার্শনিকের নহে, ইহা শ্রমজীবী কৃষকদিগের, ইহা শ্রান্ত-

ক্লান্ত অবলা রমণীগণের, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগেরও 'অধিকারের সামগ্রী। এই ধর্ম্মই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ সম্পত্তি। যে কোনও মানবের হৃদয় নির্ম্মল প্রেমে স্পন্দিত হয়, আত্মা বিমলতা লাভ করিবার জন্য নিরন্তর উন্মুখ, সেই ব্যক্তিই এই ধর্ম্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত। ইহা পৌরহিত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না, কিন্তু অধিকতর ঐশ্বরিক জীবন ও দেবত্ব লাভের জন্য ব্যগ্র মানবদিগের সমান অধিকারের বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করে। মহাজনগণ মানবজাতির এই সর্ব্বোচ্চ ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মানবজাতির এই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বজনীন ধর্ম্মই খৃষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন, যখন তিনি বলিয়াছিলেন 'Thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babies.'—(হে পিতঃ), তুমি এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব বিজ্ঞ, জ্ঞানীদিগের নিকট লুক্কায়িত রাখিয়াছ, এবং শিশুদিগের নিকট তাহা প্রকাশিত করিয়াছ।" ঈশ্বর-প্রাপ্তির সরল মার্গ মানবহৃদয়। সত্য এবং প্রেমের প্রেরণা দ্বারা বিশোধিত এবং শিশুর ন্যায় সরল হৃদয়ই ঈশ্বর-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহা হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম এই জ্ঞান লাভ করি যে ঈশ্বর-লাভের জন্য আমাদিগের প্রত্যেক অন্বেষণের মধ্যে, প্রেমময় পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন। আমরা বলি মানব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু ঐ মহাজনবাণীর প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা বলিতেছেন,—"যাঁহারা অকপট আত্মাতে, সত্যভাবে ঈশ্বরের পূজা করিবে, প্রেমময় পিতা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই অন্বেষণ করিতেছেন। ভগবান্ যদি দুর্ব্বল মানবকে না চাহিতেন, তবে মানব কখনই তাঁহাকে চাহিতে পারিত না। মানব-প্রকৃতিতে ভগবানের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা এও ই ব্যাকুলতাই তাঁহার সত্তার এবং তাঁহার ব্যগ্রতার (প্রকৃষ্ট) প্রমাণ। তিনি যে কেবল ব্যাকুল প্রার্থনার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন তাহা নহে, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া মানবের প্রার্থনার ভাব উদ্দীপিত করেন। যখন ব্যাকুল আত্মা ক্রন্দন করিয়া উঠে, 'হায়রে যদি জানিতাম কোন স্থানে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়' তখন আমরা যেন নিশ্চিতরূপে জানি যে, ভগবান আর অধিক দূরে নহেন।

এক্ষণে, এই প্রবন্ধের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে ;—

(১) আমরা সকলেই ঈশ্বর লাভের আবশ্যকতা বোধ করি।

(২) আমাদিগের জন্য আমরা আপনারাই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিব।

(৩) আমাদিগের উচ্চ প্রকৃতির মধ্যে, আমাদিগের আত্মার বিশুদ্ধির মধ্যে, আমাদিগের গভীর হৃদয়ের প্রেম ও চিত্তের সত্যের মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিব।

(৪) সর্ব্বশেষে আমরা এই তত্বে উপনীত হইব যে, কৃপাময় হরি সর্ব্বদাই আমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন এবং আমাদিগকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। আমরা ভগবানকে ধরিয়াছি, কারণ তিনি আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের সমাজ।

আজ কাল "সমাজ-সংস্কার" "সমাজ-সংস্কার" বলিয়া একটা কথা শুনা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমাজের উন্নতি-কল্পে মনপ্রাণ সহযোগে কেহই অগ্রসর হন না। এই জন্যই "বাঙ্গালীর কেবল বাক্যাড়ম্বর মাত্র সার" বলিয়া একটা অপবাদ আছে। আমাদের বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ মুখে যাহা বলিয়া থাকেন, কার্য্যে ত তাহা করিতে সক্ষম হন না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী রাজনীতির পরিচর্চ্চা করিতেছেন, স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য ব্যগ্রতা জানাইতেছেন, কিন্তু হায়! আমাদের নিজেদের সমাজমধ্যে যে সকল অত্যাচার হইতেছে, যে সকল দোষ রহিয়াছে এবং যাহা স্বদেশবাসিগণ ইচ্ছা করিলেই দূরীভূত করিতে পারেন, সে বিষয়ে কেহই মনোযোগী নহেন। 'বাঙ্গালীর অনৈক্যই সকল অনিষ্টের মূল।'

আমাদের সমাজ-মধ্যে বাল্য-বিবাহ, বর-পণ, প্রভৃতি যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের অগ্রে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। নচেৎ আমাদের দেশের কখনও মঙ্গল সাধন হইবে না।

কন্যাদায়-গ্রস্ত হইয়া কত গৃহস্থ যে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর যদি কিঞ্চিন্মাত্র সাহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে কদাপি এপ্রকার ঘটিতে পারিত না। সকলকেই এক সময়ে না এক সময়ে কন্যাদায়ে বিব্রত হইতে হয়, কিন্তু পুত্রের বিবাহকালে তাঁহারা সে কথা বিস্মৃত হইয়া যান এবং কন্যা-পক্ষের নিকট হইতে এত অধিক পণ চাহিয়া বসেন যে, তাহাতে নিজে কন্যার বিবাহে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহার "সুদ সমেত" আদায় করিবার চেষ্টা করেন। এ সকল কি নির্ম্মমতা নহে? বাঙ্গালীর হৃদয়ে একতা ও সহানুভূতি থাকিলে কি এ প্রকার পৈশাচিক কার্য্য করিতে অভিলাষ হয়?

কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্যক্তি বরপণ প্রদান করিতে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, অথচ না দিলে কন্যার বিবাহ হয় না। অগত্যা তাঁহাকে ভিটা মাটি বিক্রয় করিয়াও বরকর্ত্তার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয়।

দরিদ্র বঙ্গবাসীর ইহাতে যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতে-

ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাপি এ মোহ কেহই পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত নহেন।

দ্বারভাঙ্গার জেলা-কোর্টের উকিল বাবু *রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়, এ সম্বন্ধে একটি* সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য-পুত্র বাবু মনোমোহন দত্তের বিবাহে, তিনি পাত্রীপক্ষকে পীড়ন-পূর্ব্বক টাকা কড়ি কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি এ বিষয়ে যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছেন, আমাদের বঙ্গবাসী সকলেরই তাহার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

বিবাহ মানব-জীবনের একটী প্রধান সংস্কার। সেই বিবাহ এখন যেন পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি যত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন, তিনি তদনুযায়ী সুপাত্র পাইবেন।

আধুনিক শিক্ষাভিমানী যুবকের অভি-ভাবকগণ কন্যাপক্ষের নিকট অত্যধিক অর্থ দাবি করিয়া বসেন—ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে ?

পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিরাশিতে ভূষিত করা, কেবল কি কন্যাপক্ষের নিকট তাহাকে অধিক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য ?

কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লোকে ইহাকে অপমানের পরিবর্ত্তে গৌরব বলিয়া মনে করে।

আবার এদিকে কন্যা যদি একটু বয়ঃস্থা হইয়া পড়ে, সমাজ তাহাকে শত ধিক্কার দিবে। লোকের গঞ্জনায় কন্যার পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সমাজে মুখ দেখান ভার হয়। এ সকল আরও নিষ্ঠুরতার কার্য্য। এক দিকে বরকর্ত্তার টাকার পীড়ন ও অন্য দিকে সমাজের *লাঞ্ছনা, এই দুই কারণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া* কত সময়ে কতজনে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এইজন্যই বাঙ্গালীর গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে বাঙ্গালী যেন কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।

সমাজের এই সকল অত্যাচার নিবারণ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে ? পুরাণ ইতিহাসাদি দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে পুরাকালে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না।

যদিও সাধারণ লোকের মধ্যে সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যে সকল রাজকুমারী স্বয়ম্বরা হইতেন, যৌবনপ্রাপ্ত হইবার পর তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে। ১০।১১ বৎসরের বালিকাগণ কখনও স্বয়ম্বরা হইবার উপযুক্তা নহে। ১০।১১ বৎ-সরের ছোট ছোট বালিকাগণ কি স্বীয় পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে সমর্থা হয় ?

বাল্য-বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। শাস্ত্রে যদি বাল্যবিবাহেরই নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলে সে কালের ধর্ম্মাত্মা আর্য্য রাজগণ শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া কখনই অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেন না। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ধন, এমন

কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি এই সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত শাস্ত্রোপদেশ অন্যথা করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেন ? কখনই না। তবে দেখা যাইতেছে যে, কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশের লোকেরাই এই বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়াছেন, এবং বরপণ বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন নিজেরাই করিতেছেন।

যিনি ইহ জীবনের সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী, যিনি হিন্দুর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, জীবন বিচ্ছিন্ন হইলেও যাঁহার সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না, সেই পত্নী গ্রহণকালে পত্নীর পিতৃকুলকে এরূপভাবে নিপীড়িত করিয়া অর্থ গ্রহণ করা কি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য ?

স্নেহলতা ও নিভাননী প্রভৃতি বালিকার এ লোমহর্ষণ আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়াও কি আমাদের সমাজের চক্ষু উন্মিলিত হইবে না ?

সরল বালিকাদ্বয়ের অকালে এ আত্মাহুতির জন্য দায়ী কে ? আমাদের নিষ্ঠুর সমাজমধ্যে কি এমন কোন নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি নাই, যিনি এই পাশবিক উপায়ে অর্থ-গ্রহণ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বালিকাটীকে পুত্রবধূরূপে স্বগৃহে আনয়ন করেন ? ছি ছি! ইহা কি লজ্জার কথা!

যে আর্য্যসন্তানগণ অক্লেশে রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতেন, আজি তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত সন্তানগণ সামান্য অর্থলোভ পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া বালিকাহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন।

ভগবান্ করুন,সমাজে আর যেন এরূপ নারীহত্যা না ঘটে। নিষ্ঠুর সমাজ যেন এই দেব বালাদ্বয়ের রক্ত পান করিয়াই সন্তুষ্ট হয়। আমাদের সমাজের লোকে মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাউক। এ কুপ্রথা অচিরে আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত হউক।

এই স্বর্গীয় দেববালাদ্বয় এরূপে আত্মাহুতি দিয়া সমাজকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, রমণীর কত সহিষ্ণুতা ও রমণীহৃদয়ে আজও কত অপ্রমেয় বল আছে।

নারী শুধুই জগতের হেয়, অবজ্ঞেয়, অপদার্থ জীব নহে। রমণী ইচ্ছা করিলে আজও অসাধ্য সাধন করিতে পারে। অতএব এস ভগ্নীগণ! এস সমাজ হইতে এ কুপ্রথা দূর করিতে আমরা সচেষ্ট হই। এস,আমরা পণ করি আমাদের স্ব স্ব পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যাপক্ষকে পীড়নপূর্ব্বক কদাপি অর্থ গ্রহণ করিব না। আমরা সকলে একযোগে যদি এ কার্য্য করি, তবে অবশ্যই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। সরলা বালিকারা তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কোমল প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া জগৎসমক্ষে চিরদিনের জন্য আপনাদের মহত্ত্ব স্থাপন করিয়া গেল, আর আমরা কি সামান্য অর্থ লোভ

সংবরণ করিয়া জগতে একটু মনুষ্যত্ব দেখাইতে সক্ষম হইব না ? হায় ! সমাজের এই নিষ্ঠুরাচরণের জন্য যাঁহারা আজ কন্যারত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণে কি নিদারুণ কষ্ট! আর যাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে, সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। এস ভগ্নীগণ আমরাই এ শুভকার্য্যে অগ্রসর হই। জগৎ দেখুক, রমণী দুর্ব্বল হইলেও অক্ষম নহে। আমরা আর্য্যরমণী, আমাদের কার্য্য দেখিয়া জগৎ তাহা প্রত্যক্ষ করুক। এস ভগ্নীগণ! এ কলঙ্ক দূর কর। নারীর ব্যথা নারী ভিন্ন কে বুঝিবে ? স্নেহলতা ও নিভাননীর পবিত্র রক্তে সমাজের এ কলঙ্ক ধৌত হইয়া যাউক।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

রাঁচি ভ্রমণ।

১৪ই মার্চ্চ শনিবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাঁচি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বহু দিবসের সাধ এক্ষণে পূর্ণ হইল। অনেক দিন হইতে আশা করিয়াছিলাম যে রাঁচি দর্শন করিব, ভগবানের ইচ্ছায় সে অভিলাষ পূর্ণ হইল। আমরা যখন গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িতে বিলম্ব ছিল। গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দেখিলাম যে তথায় তিলমাত্র স্থান নাই। রমণীগণের মধুর কলধ্বনিতে গাড়ী মুখরিত হইতেছিল। আমরা যে উপবেশন করিতে পাইব তাহার কোনরূপ আশাই ছিল না। যাহা হউক প্রাণে এত উৎসাহ হইয়াছিল যে, তাহার মধ্যেই কোন রূপে স্থান করিয়া লইলাম। তৎপরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, প্রথমে মন্থর গতিতে ক্রমশঃ তীব্রবেগে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। সে দিন প্রতিপদ তিথি ছিল, সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই চন্দ্রমা গগনে উদিত হইয়া কোমল আলোকরাশিতে সমগ্র ধরণীকে ধৌত করিতেছিল। মনে হইল যেন ধরণী দেবী শুভ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা স্বীয় শরীরকে আবৃত করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে ধান্য-ক্ষেত্র। তাহার উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। কি নিস্তব্ধতা! অদূরে গ্রামের আলোক সকল দেখা যাইতেছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এইরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়া মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। পরে গাড়ীর আরোহিগণ সকলেই যে যাহার শয়নের নিমিত্ত স্থান করিয়া লইলেন, আমি এক মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। কত গ্রাম, কত ক্ষেত্র, কত নদী অতিক্রম করিয়া ট্রেন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমশঃ নিশাকরের শুভ্রজ্যোতিঃ স্পষ্টরূপে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছিল।

এতক্ষণ সমগ্র গাড়ী মধুর হাস্যধ্বনিতে ও কলরবে পূর্ণ হইয়াছিল. এক্ষণে দেখিলাম সকলেই নিদ্রিত। রাত্রি বারটার সময় গাড়ী খড়্গপুরে আসিয়া পৌছিল। সেই সময় আমি একবার গাড়ীর চতুর্দ্দিক দেখিয়া বুঝিলাম যে. শয়ন করিতে পারিব না। তখন সকলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছিলেন, কেহ কেহ নাসিকাধ্বনি দ্বারা সমগ্র গাড়ীখানি কম্পিত করিতেছিলেন। খড়্গপুরে গাড়ী অনেক ক্ষণ থামিয়াছিল। অনেক যাত্রী আরোহণ করিলেন এবং অনেকে অবতরণ করিলেন। পান ও সিগারেট বিক্রেতা প্রভৃতি যে যার নিজ দ্রব্য উৎকৃষ্ট বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তৎপরে গাড়ী ছাড়িল, এবং পুনরায় তাহার বিশাল দেহ লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে ট্রেন অনেক ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। ঐ সকল ষ্টেশনে গাড়ী এত অল্পক্ষণ থামিতেছিল যে, ভাল করিয়া ঐ সকল স্থানের নাম পড়িতে পারিতেছিলাম না। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মত আসিল,তখন আমি একটু শয়ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে যিনি যাইতেছিলেন, তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া আমায় নিদ্রা যাইতে বলিলেন। আমি একটু শয়ন করিলাম, তৎপরে অকস্মাৎ কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উত্থান করিয়া দেখিলাম যে, গাড়ী আদ্রায় উপস্থিত হইয়াছে। আদ্রায় গাড়ী অতি প্রত্যূষে আসিয়া পৌঁছে। দেখিলাম সবে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে তরুণ অরুণ উদিত হইয়া স্বীয় সহস্র রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতেছে। বিহঙ্গের মধুর কাকলী ধ্বনিত হইতেছিল, এবং সুশীতল সমীরণ বহিতেছিল। পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দুসমূহ সূর্য্যের রশ্মিতে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। আদ্রা একটী প্রকাণ্ড ষ্টেশন, এস্থানে অনেক লোকের সমাগম দেখিলাম। তাহার বেশীর ভাগই হিন্দুস্থানী, কেহ কেহ তাহাদের বিশাল পাকড়ী, ভুঁড়ী ও লোটা লইয়াই ব্যস্ত। তৎপরে গাড়ী ছাড়িলে আমরা সকলে নিজ নিজ দ্রব্য ঠিক করিতে লাগিলাম, কারণ ইহার পরেই পুরুলিয়া, সেই স্থানে আমাদের গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। রাঁচি অবধি ট্রেণের লাইন আছে; তৎপরে হাজারিবাগে যাইতে হইলে সুরপুরে যাইতে হয়। আমরা পুরুলিয়ায় অবতরণ করিলাম ও রাঁচির গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। রাঁচির গাড়ী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ভিতরে বসিবার অনেক বেঞ্চ আছে। গাড়ী যে সকল ষ্টেশনে থামিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ঝালদা নামক ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ থামিল। এই ঝালদায় জল পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত পাইপ আছে। নিকটে একটী নদী আছে, তাহা হইতে জল গ্রহণ করিয়া পাইপ দ্বারা নির্ম্মল করিয়া tankএ রাখা হয়। তৎপরে যাহা দেখিলাম, সে দৃশ্য

জীবনে ভুলিতে পারিব না। গাড়ী ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে লাগিল। উঃ কি ভীষণ অরণ্য, যতদূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় কেবলই অরণ্য। তৎপরে পর্ব্বতশ্রেণী আরম্ভ হইল। এক ধারে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, অপর ধারে গভীর পিচ্ছিল খাদ। যদি কোনরূপে ট্রেণ একবার তাহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়, তাহা হইলে সহস্র হাত দূরে ঐ ভীষণ খাদের মধ্যে পতিত হইয়া একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই অঞ্চল "জোন্নাহার জঙ্গল" বলিয়া বিখ্যাত। বাস্তবিক সেই ভীষণ অরণ্যের ভিতর দিয়া কোন রূপে বাটীতে পৌঁছিয়া আহারাদি করিলাম। যে বাটীতে ছিলাম সেইটী ঠিক রাঁচি সহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত ক্ষেত্র, পশ্চিম ধারেও ক্ষেত্র। উহার মধ্যে রাঁচি আদালত সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। একটী বড় আদালত দেখিলাম, সেইখানে জজ্ ও মুন্সেফ বসেন। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী আদালত দেখিলাম। সেই ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে রাস্তা। বাটীর পশ্চিম দিক দিয়া কিছু দূর গমন করিলে Treasury House দেখা যায়। আর একটী নূতন Treasury House নির্ম্মিত হইতেছে, উহা আমাদের বাটীর এত নিকটে, যে জানালায় দণ্ডায়মান হইলে রাজমিস্ত্রীগণ কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাইতাম। ঐ বাটীটি শীঘ্র নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত রাত্রিতে অবধি মিস্ত্রীগণ কার্য্য করিত। তাহাদের কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত রাত্রিতে ঐ স্থানটী আলোকিত করা হইত। তৎপরে লাট সাহেবের ভবন দেখিবার জিনিষ। ইহা একতালা বাটী, বিস্তীর্ণ উদ্যান। এই বাটীর সম্মুখ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহা Pretoria Road নামে খ্যাত। এই রাস্তাটী রাঁচির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। লাট সাহেব তখন এখানে ছিলেন না, বাঁকীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা শুনিলাম তিনি শীঘ্রই আসিবেন। ইহার অনতিদূরে Staff quarters। এস্থানে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ অবস্থান করেন। এই বাটী সমূহ সরকারী ব্যয়ে নির্ম্মিত। তৎপরে জজ্ সাহেবের বাটী। আমাদের বাটীর নিকট দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে, তাহা Upper Bazar নামে খ্যাত। "পিচু বাজার" নামে বাজার সর্ব্বাপেক্ষা জনতাপূর্ণ ও প্রধান ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। ইহার নিকটেই প্রতি বুধ ও শনিবারে হাট বসে। তৎপরে Ranchi Office ও Ranchi Zilla School, এই দুইটী উল্লেখ যোগ্য। এই দুইটী পরস্পরের সম্মুখীন ভাবে অবস্থিত। School এর প্রধান শিক্ষক সাহেব। এখানে অনেক গুলি ছাত্র অধ্যয়ন করে। শুনিলাম স্থানের সঙ্কুলন না হওয়াতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। Post office এর গৃহ লাল ইট দ্বারা নির্ম্মিত। এস্থানে দুটার সময় ডাক যায় ও সেই সময়েই পত্রাদি বিলি হয়। এস্থানে পুস-পুসের চলন দেখিলাম। অধিবাসীগণ প্রায়ই কোল, বেহারী ও হিন্দুস্থানী ও দেখিলাম।

আজ কাল অনেক কোল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। আমাদের বাটীর উত্তর পশ্চিম কোণে "ডেপুটী মহল" অবস্থিত। এস্থানে ডেপুটীও সব ডেপুটীগণ অবস্থান করেন এই স্থানের উত্তর-পশ্চিম কোণে মোরাবাদী পাহাড় অবস্থিত। আমরা এক দিবস এই পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম গাড়ী, পুসপুস অথবা পদব্রজে সেখানে যাওয়া যায়। এই মোরাবাদী পাহাড়ের উপর শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের বাটী আছে। পাহাড়ের মধ্য দিয়া সুন্দর সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দ্বারা উঠিয়া দেখিলাম ঠাকুর মহাশয়দের বাটীর প্রাচীর আরম্ভ হইয়াছে। কিয়ৎদূর গমন করিয়া একটু সমতল ভুমির উপর দেখিলাম ঠাকুরমহাশয়দের বাটী নির্ম্মিত। চতুর্দ্দিকে উদ্যান, সম্মুখে ফটক, প্রস্তরে "শান্তিধাম" নাম খোদিত আছে। তাহার পর ফলফুলে শোভিত রাস্তা গমন করিয়াছে। উহার নিকটেই একস্থানে উপবেশনের নিমিত্ত মর্ম্মর প্রস্তরের বেদী নির্ম্মিত রহিয়াছে। তৎপরে ইঁহাদের বাটী দেখিলাম। ইহার পশ্চাৎভাগে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত একটী সুন্দর নিভৃত উদ্যান দেখিলাম। সেই স্থানটী কি সুন্দর, এমন রম্য যে তাহা বর্ণনাতীত। তৎপরে আমরা উহার শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম। বরাবর সিঁড়ির ধাপ গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের নিমিত্ত মর্ম্মর প্রস্তরের বেদী দেখিলাম। তৎপরে একেবারে শিখরদেশে আরোহণ করিলাম। সেখানে দেখিলাম একটী চাতাল, তদুপরি থাম, তাহার উপর ছাদ। বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদীকা আছে। এই স্থানে উপাসনাদি হয়। যিনি আচার্য্য তিনি এই চাতালের ভিতর বসেন, উহার ভিতর অনুন্য ৩০।৩৫ জন লোক বসিতে পারে। এতদ্ভিন্ন বহির্ভাগে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদী আছে। এই স্থানে আগমন করিলে কি যে ভক্তি রসে মন আপ্লুত হয়, তাহা অবর্ণনীয়। সেই নির্জ্জন পর্ব্বতোপরি এই মনোহর স্থানে যদি মহাপাপীও গমন করে, তাহারও মন অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিচলিত হইবে। সেই স্থানে আমার আত্মীয়া উপাসনা করিলেন। ইহার ভিতর একটি lantern ঝুলান আছে, রাত্রিতে ইহা জ্বালান হয়। পর্ব্বতোপরিস্থ এই আলো দূর হইতে দেখা যায়। তৎপরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহণ করিলাম। সেই স্থানে একটী বংশদণ্ড রোপিত আছে তাঁহার উচ্চভাগে নিশান ও "ওঁকার" লেখা আছে। তৎপরে উহার একটু নিম্নে অবতরণ করিলে একটী গুহা দেখা যায়, সেস্থানে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আছে। এস্থানে গীতা পাঠ হয়। তৎপরে ঐ গুহার পশ্চাৎভাগে একটি কুঞ্জবন আছে। তাহার চতুর্দ্দিক লতা পাতা দ্বারা বেষ্টিত। উহার ভিতর গমন করিলে কেমন একটি সুমিষ্ট গন্ধ অনুভব করা যায়, তথায় পবন মৃদু মৃদু গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই

পর্ব্বতের সমুদায়ই সুন্দর। প্রকৃতির ভিতর ভগবানের কারুকার্য্যকলাপ দর্শনে বিস্মিত হইলাম। ক্রমে সন্ধ্যাদেবী অবতীর্ণ হইয়া তামসজালে সমগ্র পৃথিবীকে আবৃত করিলেন। বিহঙ্গমগণ স্বীয় স্বীয় নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। ক্রমে গগনে তারকা রাজি দীপ মালার ন্যায় সারি সারি শোভা পাইতে লাগিল। সেই পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধ ভাগে দৃষ্টিপাত করিলে অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। সন্ধ্যা হইতেই সেই lanternটী জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। তৎপরে আমরা পর্ব্বত হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিলাম। আমরা যখন বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম তখন সেই lantern এর আলোক আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইতেছিলাম। এমন কি আমাদের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াও সুদূরস্থিত সেই আলোকের ক্ষীণ রশ্মি আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল। এই মোরাবাদী পাহাড়ের নিকটেই গোঁদা পাহাড় বলিয়া একটী পাহাড় আছে, সেইটী মোরাবাদী অপেক্ষা একটু উচ্চ।

এক দিবস আমরা রাঁচি পাহাড়ে গমন করিয়াছিলাম, ইহা অতি নিকটে। পদব্রজে অনায়াসে গমন করা যায়, কিন্তু আমরা গাড়ী করিয়া গিয়াছিলাম। কিয়ৎদূর গমন করিয়া গাড়ী হইতে আমাদের অবতরণ করিতে হইল। কারণ ঐ স্থান হইতে রাঁচি পাহাড়ের রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে। পর্ব্বতটীকে বেষ্টন করিয়া রাস্তাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা উঠিতে উঠিতে বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম, যে উচ্চে আরোহণ করিতেছি। কিয়ৎদূর রাস্তা গিয়াছে, তৎপরে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। সেই সোপানশ্রেণী দ্বারা আরোহণ করিতে একটুও ক্লান্তি বোধ হইল না। এই রাঁচি পাহাড়ও মোরাবাদী অপেক্ষা উচ্চ। কিয়ৎদূর সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইলাম যে অদূরে জলরাশির ন্যায় কি রহিয়াছে। তৎপরে অবগত হইলাম ঐটী রাঁচি হ্রদ। ইহা এই পাহাড়ের খুব নিকটে বলিয়া বোধ হইল। কারণ আমরা সোপানোপরি দণ্ডায়মান হইয়া স্পষ্টরূপে ঐ হ্রদটীর সমস্তই দেখিতে পাইলাম। তখন সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন, তাঁহার রশ্মিসমূহ ঐ জলরাশির উপর পতিত হইয়া সমগ্র জলরাশিকে উজ্জ্বল করিতে ছিল। দূর হইতে ঐ জলরাশি সূর্য্যের রশ্মিতে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। ঐ হ্রদের আয়তন অতি বৃহৎ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে উহা প্রায়ই সমান। আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলিবোট্ দেখিলাম, অনেকে কৌতুকের নিমিত্ত ঐ বোটে আরোহণ করেন এবং দেখিলাম দুই তিনটী বোট্ ইতস্ততঃ জলের উপর সঞ্চরণ করিতেছে। তৎপরে একটী ঘাটের নিকটে মন্দিরের ন্যায় একটী বাটী দেখিলাম। বোধ হয় ঐ স্থানে পূজা দিয়া লোকে জলে অবগাহণ করিতে অবতীর্ণ হয়। তখন ঐ হ্রদের অনেক জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

আমরা ঐ সোপানোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সমস্তই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতে ছিলাম। তৎপরে পুনরায় সোপান শ্রেণীতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে স্থানে সোপানশ্রেণী শেষ হইয়াছে, সেইস্থানে একটী প্রস্তর ফলকে, যাঁহারা ঐ সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণের ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম খোদিত রহিয়াছে। তৎপরে একটী গুহা অবলোকন করিলাম। সেই স্থানে একটী প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে। তদুপরি একটী পদ অঙ্কিত রহিয়াছে। শুনিলাম যে উহা হনুমানের পদচিহ্ন। হনুমান যখন লক্ষ্মণকে শক্তিশেল হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতের অনুসন্ধানে গমন করেন, প্রত্যাগমন কালে তিনি নাকি এই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। আমরা এত উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলাম যে নিম্নের সমুদায় গ্রাম অবিকল পুতুলের গৃহ বোধ হইতেছিল। সেই সমস্ত এত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছিল যে, তাহা দর্শনে বেশ আমোদ অনুভব করিতেছিলাম। শিখর দেশে আরোহণ করিয়া তদুপোরি এক স্থানে দেখিলাম, প্রস্তর সমূহ সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত রহিয়াছে। তৎপরে অবগত হইলাম যে কোলগণ এই প্রস্তর সমূহকে দেবদেবী বোধে অর্চ্চনা করে। দুই তিনটী পয়সাও ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপর পতিত রহিয়াছে। উহার নিকট একটী গর্ত্তের ন্যায় দেখিলাম এই স্থানটীও সিঁদুর দ্বারা রঞ্জিত। এতদ্ভিন্ন কড়ি, পয়সা প্রভৃতিও সেখানে রহিয়াছে। ঐ গর্ত্তের ভিতর নাকি এক পাহাড়ী সর্প অবস্থান করে, তাহাকে কোলেরা ঐ পাহাড়ের দেবতা বোধে পূজা করে। উক্ত মহাপ্রভুর নিমিত্ত উহারা ঐ গর্ত্তের সম্মুখে দুধ কলা প্রভৃতি রাখিয়া যায়। সেই মহাপ্রভু নাকি কখন কাহারও দৃষ্টি গোচর হন নাই, তিনি মনুষ্যের সম্মুখে বহির্গত হন না। কি অন্ধ বিশ্বাস! উহার ভিতর সর্প বাস্তবিক আছে কি না কেহই অবগত নহে। যাহা হউক সর্ব্বোচ্চে একটী শিবলিঙ্গের মন্দির রহিয়াছে। এই স্থানে এই পাহাড়ের একটু ইতিবৃত্ত বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে কোল দস্যুগণ এই পাহাড়ে লুক্কাইত ভাবে অবস্থান করিত এবং রাঁচি ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি দুর্গম পথে দস্যুবৃত্তি করিত। তাহারা এরূপ অজেয় ছিল যে, তাহাদিগকে কেহই ধরিতে পারিত না। যেস্থানে শিবলিঙ্গের মূর্ত্তি রহিয়াছে সেই স্থানে পূর্ব্বে কালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। দস্যুগণ ঐ বিজন পর্ব্বতে কালীমাতার অর্চ্চনা করিত। কিম্বদন্তি আছে যে এই রাঁচি পাহাড়ের নিম্ন দেশে এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে, তাহা একেবারে ডুরেণ্ডা অবধি গমন করিয়াছে। দস্যুগণকে যখন ইংরাজগণ ধরিতে আসিতেন, তখন উহারা ঐ গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই উহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আমরা সেই শিবলিঙ্গের মন্দিরের নিকট উপবেশন করিলাম। দেখিলাম ইহার অপর পার্শ্ব দিয়া আর

একটী রাস্তা গমন করিয়াছে। অবশ্য তাহাতে সোপানশ্রেণী নাই। এই স্থানে অনেকক্ষণ অবস্থান করিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শণ করিয়া আমরা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলাম। ক্রমশঃ

কুমারী মণিকা বালা রায় চৌধুরী।

ফুল।

ফুলটি কেমন দেখ্‌তে ভাল,
যখন গাছে রয়,
দু'দিন পরে শুকিয়ে গেলে—
সেরূপ আর নয়।
পাতা সব তা'র ঝরে ঝরে
ভূতলশায়ী হয়!
রূপের শোভা ক'দিন তাই,
সকলি হয় লয়!
মধুর-ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে,
মধুপ ভগ্নমন।
প্রজাপতি আর নাহি আসে,
করিবারে নর্ত্তন।
রবির আলোতে চিকন ভাল,
দেখ্‌তে হ'ত ফুল,
গাছের সম্পদ ছিল যখন,
সুসমায় অতুল।
ফুলের সঙ্গেই সকল গেছে—
গাছের শোভা চলে,
এরূপ প্রকার সকল ঘটে,
নরের ধরাতলে।

শ্রীভু, মো, ঘো।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এল্, টি ও বি, টি, পরীক্ষার ফল—বিগত মার্চ্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে গৃহীত এল্, টি ও বি টি, পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এল্, টী, পরীক্ষা।

প্রথম বিভাগ।

গার্‌রুড কনকলতা লভডে—ডাওসেশন কলেজ্। ইনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পাশ।

(ইংরাজি বর্ণ মালানুসারে)

বিশ্বাস, সুষমা—ডাওসেশন্ কলেজ্।
ঘোষ মেরী—লরেটো হাউস্।
ঘোষ্ মুক্ত প্রভ—ডাওসেশন্ কলেজ্।

বি, টি পরীক্ষা।

প্রথম বিভাগ।

(গুণানুসারে)

বসু ষ্টেলা—ডাওসেশন কলেজ্।
ল্যাংলি ইনেজ্—নন্ কলিজিয়েট্।
লিউইস্ ডরোথিয়া ইলিয়েনর—নন্ কলিজিয়েট্।
লডজে জোয়ান্না—নন্ কলিজিয়েট্।

ইহারা যথাক্রমে সপ্তদশ, অষ্টাদশ, বিংশ ও একবিংশ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পাশ।

(ইংরাজি বর্ণমালানুসারে)

বাগ্‌চি সুশীলা বালা—ডাভ্‌শেসন্‌ কলেজ। জভ্‌ডে মার্গারেট লবঙ্গলতা—ঐ রায় ক্লেরিস্ গাটুড্—ডাভসেশন্ কলেজ্ দিন দিন রমণীগণের উন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছে।

দান—হুগলি জেলার অন্তর্গত উত্তর পাড়ার জমিদার রায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর হাওড়ার জেনারেল্ হাঁসপাতালে ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডের (Indian ward, রোগী সেবিকাগণের বাসাবাটী নির্ম্মাণার্থ ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই দান প্রশংসনীয়।

কালা বোবা চোর—সম্প্রতি কলিকাতায় গঙ্গা নামক এক কালা বোবা চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগ এই যে গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে সে ১৬নং পটোয়ার বাগানে এক স্বর্ণকারের দোকানে চুরি করিয়াছিল। কলিকাতার কালা বোবা ইস্কুলের (Deaf and Dumb School) প্রিন্সিপ্যাল (Principal) শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কালা বোবা আসামীর সঙ্কেত মূলক এজাহার আদালতকে ও সাক্ষীর এজাহার সঙ্কেতে কালা বোবা আসামীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন বিচারে আসামীর তিন মাস কাল সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। লোকে বলে বোবার শত্রু নাই, অর্থাৎ যে বোবা সে কাহারও সপক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলিতে পারে না, সুতরাং কেহই তাহার শত্রু হইতে পারে না। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় রিপুকুলের প্রভাবে আজ এই বেচারার কি দুর্দ্দশা ঘটিল।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল্ মহাশয় আদেশ করিয়াছেন যে কলিকাতা সহরের কোনও বাটীতে বা স্থানে চটের থলে মজুত রাখিলে বা গাঁট বাঁধা কল করিলে, সেই সকল বাটী ও স্থান গুদাম বলিয়া পরিগণিত হইয়া লাইসেন্স প্রাপ্ত গুদামের ক্রিয়াধীন হইবে। ফায়ার ব্রিগেড্ একট্ (Fire Brigade Act) ও এই সকল স্থানে প্রচলিত হইবে।

২। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ভারতবর্ষের ষ্টেট্‌সেক্রেটারী মহাশয় আদেশ করিয়াছেন যে ইণ্ডিয়ান্ মেডিক্যাল্ সর্‌ভিস্ (Indian Medical Service) হইতে নির্ব্বাচিত অফিঃ ডেপুটী স্যানিটারী কমিশনারগণ অর্থাৎ সরকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ অতঃপর পূর্ব্বের মাসিক ১৭৫ টাকা বেতনের স্থানে মাসিক ২৫০ (আড়াই শত টাকা) বেতন প্রাপ্ত হইবেন। এবং গ্রীষ্মকালে

কোনও শৈল শীতাবাসে গমন করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিতে পারিবেন। এই সময় কর্ম্মোপলক্ষে অন্য স্থানে যাইতে হইলে তাঁহারা স্পেশাল্ কন্‌সেশন্ (Special concession) এবং ভ্রমণ ব্যয় প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত পরীক্ষা পরিদর্শনাদির জন্য তাঁহারা এক একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরীও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

৩। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে সম্প্রতি বিহার গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে রাঁচি সহরের সরকারী মহল্লার সমগ্র ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারিদিগের বাটীতে কোনও নূতন ব্যক্তি আসিলে ছয় ঘণ্টার মধ্যে তাহার নাম, পরিচয় এবং অন্যান্য বিবরণ আফিসের অধ্যক্ষের নিকট লিখিয়া দিয়া আসিবেন। ইহার অন্যথা করিলে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে। আফিসের অধ্যক্ষ এরূপ নবাগত ব্যক্তিকে বাড়ীতে স্থান দেওয়া যদি যুক্তি সঙ্গত মনে না করেন তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বাটী হইতে অবিলম্বে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীকে আদেশ করিতে পারিবেন। এই আদেশ ২৪ ঘটার মধ্যে প্রতিপালিত না হইলে আশ্রয় দাতা কর্ম্মচ্যুত হইবেন।

বামারচনা

মাতৃদেবী।

স্নেহময়ি মাতঃ সাধ্বি গুণবতি
অপার তোমার স্নেহের ভারতী
স্মরিয়া নিয়ত মম ক্ষুদ্র মতি
বিপুল-পুলক-উচ্ছাসে ভাসে।
ও মুখের শান্ত সুমধুর ভাষে,
অধরের স্নিগ্ধ সুধাময় হাসে
প্রীতি শুক-তারা হৃদে পরকাশে
অশান্তি বিষাদ যাতনা নাশে। ১

দেবি! তোমা সম নিরুপম স্নেহ,
বিশাল ধরায় বিতরিতে কেহ
পারে না কো কভু, এ হৃদয় দেহ
পরিপুষ্ট তব অতুল স্নেহে।
পড়েছিনু যবে দীন শিশু বেশে
অজানা অচেনা এ ভূতল দেশে,
তুমিই তখন স্নেহোচ্ছাসে ভেসে
নিয়াছিলে অঙ্কে সে জড়-দেহে। ২

লয়ে শিবময় নব নব আশা,
ঢেলে প্রাণভরা স্নেহ ভালবাসা
নিবারিয়া ছিলে শৈশব-পিপাসা
হৃদি পয়োধির পীযূষ দানে?
রেখে আমাপরে—চারু দুটি আঁখি
রাখিতে সতত অমঙ্গল ঢাকি,
না কাঁদিতে আহা বুকে করে রাখি
করিতে গো সান্ত্বনা আকুল প্রাণে ৩

আগেত বুঝিনে কি স্নেহ অতুল,
অমরায় যার নাহি মিলে তুল,

কি স্নেহ পাথার অনন্ত অকূল,
জননী-মরমে সতত ম্রাজে!
ত্রিদশ-কুসুম জীবন-জীবন
জীবন-তরুতে ফুটি পুত্র ধন
প্রদানিল মোরে সে জ্ঞান-রতন
ঢালি সেই স্নেহ হৃদয় মাঝে। ৪

পক্ষিনীর সম করি আবরণ
স্নেহ-পক্ষ-পুটে,—করেছ পালন,
করেছ মা কত নিশা জাগরণ
কত আবদার সয়েছ নিতি।
হাসিতে হাসিতে অতলের জলে
স্বার্থ বিসর্জ্জন করি কুতূহলে
অসীম স্নেহের কুহকের বলে
সাধিয়াছ মোর আরাম প্রীতি। ৫

কিশোর কালেতে মধুর বচনে
মুদ্রিয়াছ নীতি-উপদেশ মনে,
সাজায়ে দিয়েছ বিদ্যার ভূষণে
হওনি কুণ্ঠিত অর্থ ব্যয়ে।
শুভে সুমঙ্গলে উলসিত মন
দুঃখে ক্লেশে সম বিষাদে মগন
রোগে কাতরতা দেয় দরশন
স্নেহার্দ্র গরল নয়নদ্বয়ে। ৬

শিব-আকাঙ্ক্ষিনী জগত-মাঝার
তোমা হেন দেবি! কোথা পাব আর?
এ সংসার মাঝে তুমি মা, আমার
সতত শীতল শান্তির বারি।
পরম দয়াল বিভুর চরণে
এ মিনতি মাতঃ করি এক মনে
ও স্নেহ ছায়ায় ভরি আজীবনে
যেন মা পরাণ জুড়াতে পারি। ৭

গিয়াছেন পিতা, যাইবার তরে
করিছ তপস্যা তুমি প্রাণ ভরে
কে জানে কখন (তাই ভয় করে)
পলাবে কাটিয়া স্নেহের ডোর।
এর (ই) মধ্যে তব হয়েছে কি দশা
নাহি কোনও সাধ অভিনব আশা
হারায়ে সে মণি হারায়েছ দিশা
স্বপ্নেও লাগে না উষার ঘোর। ৮

সে দিনও ছিলে মা যেন রাজ রাণী
অকাল বৈধব্যে এবে তপস্বিনী!
পূত ব্রহ্মচর্য্যে করেছ সঙ্গিনী,
পতিপদ চিন্তা করেছ সার।
স্বরগেতে পিতা যোগাসনে বসি
করিছেন ধ্যান ঈশ-রূপ-শশী,
ভাতিছে তথায় তব প্রেম-রশ্মি
উজলি চরণ-সরোজ তাঁর। ৯

শ্রীমতি ক্ষীরোদ কুমারী (ঘোষ) দাসী

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

কবি মানকুমারী বসু

৺ বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 610. June, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১০ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। জুন, ১৯১৪। | ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সুর বাঁধা।

বহু ভাবে ভাবি আমি
বহু মাঝে ধাই,
বহুকে ধরিতে গিয়া
সবারে হারাই।
নাহি জানি একে মন
হইলে অটল,
এক-মাঝে বহু সাজে
পাইব সকল।

জীবনের সুর যদি
একে বাঁধা রয়,
জানিও জীবন কভু
না হইবে ক্ষয়।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী
বোলপুর।

শিশু জীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

ফ্রোবেলের ধারা মতে শিশুশিক্ষা।

১

বিখ্যাত জর্ম্মণ-পণ্ডিত মহাত্মা ফ্রোবেল শিশুস্বভাব উত্তমরূপে বুঝিয়া শিশুদিগকে সামান্য বস্তুর দ্বারা শিক্ষা দিবার রীতি প্রথম প্রচার করেন ও উহা কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে ফরাসী ও জর্ম্মণ দার্শনিক রুসো ও পেষ্টেলোজি ইউরোপীয় পুরাতন ধারামতে অসম্পূর্ণ ও অনিষ্টকারী শিশু-শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রোবেলই প্রথম ঐ পুরাতন রীতি-নীতি ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের ও নিজের জ্ঞানের দ্বারা জর্ম্মণীতে প্রকৃত

শিশু-শিক্ষার জন্য ঐ নূতন প্রথা প্রচার করেন ও বালকবালিকাদিগের নিমিত্ত নিজেই স্কুল স্থাপন করেন।

শিশুর জন্মের সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয় সকল খুলিয়া যায় ও সে বহির্জগতের সকল বিষয়ের আভাস ও ধারণা প্রাপ্ত হয়। ঐ নূতন ভাবগুলির ক্রমে পুষ্টি সাধন করিয়া উহাদিগকে মানসিক জ্ঞানের অবস্থায় আনা ফ্রোবেলের প্রধান লক্ষ্য। ঐ কার্য্যে তিনিই এ জগতে প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,—রুসো পুরাতন শিশুশিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছেন : সাধারণ বালকবালিকাদের প্রকৃত শিক্ষায় আমাদের দেশের ত কথাই নাই, ইউরোপেরও প্রায় সর্ব্বত্রই অত্যন্ত অবহেলা দেখা যায়। ঐরূপ শিক্ষায় কেবল মস্তিষ্কের অনুশীলন হয়, কিন্তু শরীরের সামান্য ইন্দ্রিয়-সকল, মনোবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তিগুলি এরূপ অপরিপুষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে যে, প্রাপ্ত বয়সেও লোকে কোন অন্ধকার গৃহে একা থাকিলে বা গুপ্ত শব্দাদি শুনিলে ভয়ে উপস্থিত-বুদ্ধি হারাইয়া অজ্ঞান শিশুর মত একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে। নাক, কান ও ত্বকাদি উপযুক্ত চালনা দ্বারা যে কত পরিপুষ্ট হয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবের কত ক্ষতিপূরণ করে, তাহা আমরা অন্ধদিগের জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি। খেলার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল কিরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, রুসো তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। মহাত্মা ফ্রোবেল চারিদিকের ঐ সকল স্বাভাবিক সংকেত বুঝিয়া জীবনারম্ভ হইতেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের পুষ্টি সাধনে যত্নবান হন। দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শ—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞান, সুশ্রাব্য ও মধুর শব্দ—এ সমস্তই তাঁহার শিক্ষার ধারার মধ্যে উচ্চ স্থান পাইয়াছে। শিশুর দোলার ভিতরে তা'র মুখের উপর কোন উজ্জ্বল বর্ণের একটা গোলা বা ঝুমঝুমি বাঁধিয়া রাখিলে তা'র মনে রং ও আকৃতির জ্ঞান সঞ্চার হয়। ক্রমে শিশুর ধরিতে পারিবার বয়স হইলে, উহা হাতে করিয়া সে স্পর্শ-জ্ঞান অনুভব করিতে পারে।

একটা নরম গোলা সমস্ত দিন শিশুর মাথার কাছে টাঙ্গাইয়া রাখিলে তাহার মনে একটা সম্পূর্ণ বস্তুর আকারের দাগ বসে। ক্রমে ঐ গোলাটা একটু একটু নাড়িলে ও তার সঙ্গে মা তালে তালে মিষ্ট গান গাহিলে শিশুর মনে গতি ও শব্দ জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ক্রমে শিশু ভিন্ন ভিন্ন গোলার দ্বারা পৃথক পৃথক রঙ্গে অভ্যস্ত হয়। ফ্রোবেলের মতে ঐরূপে অজ্ঞাতসারে শিশু যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা তাহার পুষ্টি সাধন কালে চিরকাল মনে বসিয়া থাকে। শিশুর বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ গোলা খেলাও নানারূপে সাধিত হয়। কার্য্যকরা নবজাত শিশুর প্রথম বৃত্তি। ঐ বৃত্তির দ্বারা ফ্রোবেল সকলের পূর্ব্বে শিক্ষা কার্য্য সাধন করিতে চেষ্টা করেন। আরম্ভকালে শিশুর সকল কাজ অবাধে চলিতে দেওয়া

উচিত ; পরে উহা সোজা দিকে চালিত ও কষিত হওয়া আবশ্যক।

ফ্রোবেল অতি গভীররূপে স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ ও উহার নিয়ম সকল আবিষ্কার করেন। বীজের মধ্যে যেমন গাছের অঙ্কুর ঢাকা থাকে, এবং তাহা হইতে সময়ে ডাল, পালা, পাতা ও শিকড়-যুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষ আবির্ভূত হয় ; ডিমের ভিতর যেমন জীবন-বীজ লুকান থাকে, এবং যাহা হইতে সময়ে পাখী ও উহার যত আশ্চর্য্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গতি বিধির যন্ত্রাদি পরিপুষ্ট হয় ; পাথর যেমন তার আরম্ভকালে যে স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়, তাহা ভিন্ন কখন আর কোন আকার গ্রহণ করিতে পারে না ; প্রত্যেক জীব যেমন অনন্ত বিধানানুসারে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয় ও যে নিয়মের বিপরীত দিকে যাইতে এক মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও সাধ্য নাই—মানবস্বভাবও সেই নিয়মের অধীন। এখন ঐ বিধান কি তাহাই আমাদের শিক্ষা করা উচিত। ফ্রোবেলের পূর্ব্বগামী অনেক বিজ্ঞ লোক উহার নানারূপ ধারণা ও অন্বেষণ করিলেও ফ্রোবেল ভিন্ন আর কেহই উহা বুঝিতে সক্ষম হন নাই। সেজন্য এখন তাঁহার পরিশ্রম ও জ্ঞানের বলে আমরা এত দিনে প্রকৃত শিশু-শিক্ষার যে মহা উপায় পাইয়াছি, তাহা যেন কোন জননী অবহেলা করিয়া শিশুর জন্ম হইতে চিরকাল তাহার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি সাধন করিতে বিমুখ না হন, এই আমাদের প্রার্থনা।

ফ্রোবেল শিশুর প্রথম কয়েক মাসের জন্য গোলা ও মাতার গানের দ্বারা যেরূপ শিক্ষা দিতে বলেন, তাহা আমাদের দেশের ঝুমঝুমি ও মা'র ঘুম পাড়ান গানের দ্বারা অনেকটা হইয়া থাকে। কিন্তু তার পরে শিশুর মন ও শরীর যত বাড়িতে থাকে জননীদিগের অল্প বয়স, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা বশতঃ ভারতীয় সন্তানেরা প্রকৃত শিক্ষায় বঞ্চিত হয়।

মনে যাহা কিছু প্রবেশ করে সে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা মনের উপর আধিপত্য করে। ঐ ধারণা অবলম্বন করিয়া ফ্রোবেল তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর মূল স্থাপন করেন। যেমন যুবকেরা বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীতও নিজেদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের ঠিক ব্যবহার করিতে পারে, শিশুগণ ও সেই রূপ অজ্ঞাত ভাবে ইন্দ্রিয় সকল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ব্যবহার শিখে, বিজ্ঞান আমাদিগকে কেবল পৃথিবীর ও সমুদয় বিশ্বের মধ্যে বৃদ্ধি, স্থিতি ও হ্রাসের স্বাভাবিক নিয়ম সকল শিক্ষা দেয়।

যদি কখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে জগতের সৃষ্টি কৌশল বুঝিতে না পারি যদ্যপি উহা চিরকালের জন্য আমাদের কাছে রহস্য স্বরূপ থাকে, তথাপি চর্চ্চা ও অনুশীলন দ্বারা আমরা স্বাভাবিক শক্তির উপর মহা ক্ষমতা পরিচালন করিবার জ্ঞান লাভ করি। সকলেই জানেন, এক সময়ে জল ও আগুন এই দুইটি ভূতকে

লোকে কত ভয় করিত, কিন্তু এখন বিজ্ঞান বলে উহারা মানুষের যে কিরূপ বশীভূত ভৃত্য স্বরূপ হইয়াছে তাহা আমরা ধোঁয়া কলের অদ্ভুত ক্ষমতা দ্বারা দেখিতে পাই। অবশ্য বীজ ব্যতিরেকে বৃক্ষ সৃজন করিতে মানুষের সাধ্য নাই, কিন্তু বৃক্ষ জীবনের জ্ঞানের দ্বারা মানুষ প্রত্যেক গাছেরই উন্নতি সাধন করিতে পারে। আর এমন কি, পশু জীবনও মানুষের বৈজ্ঞানিক যত্ন ও চর্চ্চার দ্বারা উন্নত হইয়া থাকে। বৃক্ষ রোপণ বা উৎপাদন ও জমি শুষ্ক করার জন্য বাতাস ও মেঘ অনেকটা মানুষের বশীভূত হয়! যে শক্তির দ্বারা অদ্ভুত বিদ্যুতের উৎপত্তি, এখন সেই শক্তি আমাদের দূত স্বরূপ হইয়া প্রতি দেশে ও নগরে সমগ্র জগতে সংবাদ দিতেছে। তবে শুধু কি মানুষের মন মানবজাতির অন্বেষণের কাছে দুর্গম থাকিবে? উহার নিয়ম সকল কি শারীরিক বিধানের উপর একান্ত নির্ভর করে না? আমরা নিশ্চয় বিশ্ব জগতের জ্ঞান ও অনুশীলন দ্বারা ঐ উন্নত জীবকে আরও অধিক সুন্দর ও মহৎ করিতে পারি।

কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম সকলের অজ্ঞতা ও বিকৃতি বশতঃ ঐ প্রকৃত শিক্ষার বিজ্ঞান অন্যান্য অনেক মহা উপকারী বিজ্ঞানের ন্যায় অবহেলার জন্য নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। সেজন্য আমাদের দেশের পিতা মাতাদিগকে ঐ মহৎ জ্ঞানের উপযোগিতা বুঝাইতে ও তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে ঐ জ্ঞানানুসারে পালন করাইতে আমাদিগের অনেক পরিশ্রম ও যত্নের আবশ্যক। ফ্রোবেল যখন প্রথম তাঁহার শিক্ষার ধারা জর্ম্মনীতে প্রচার করেন, তিনি তাঁহার কর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিয়া সকল ইউরোপীয় জননীদিগকে তাঁহার সহায় হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের ভারতবর্ষে ঐরূপ উন্নত ও প্রকৃত শিশুশিক্ষার ধারা প্রচলিত করিবার সময় আমরা উচ্চৈঃস্বরে ভারতীয় জননীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। হাজার শিক্ষিত লোকদিগকে ঐ মহা শিক্ষার কথা বুঝাইলে যে উপকার না হইবে, একজন জননীকে অনায়াসে উহা বুঝাইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহা হইতে অনেক অধিক সুফল দেখাইতে পারা যাইবে। শিশু মাতার প্রাণের ধন, সেই কোমল শিশুকে শিখাইতে হইলে মা ব্যতীত আর কে উহাতে অধিক মনোযোগী ও অধিক সফল হইবে?

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শিশু মাতৃপ্রেম ও মাতার স্বভাব অনুভব করে। ঐ প্রেম ধীরে ধীরে শিশুর আধ-ঘুমন্ত আত্মায় প্রবেশ করে। মা বুকে করিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান, অতি যত্নে তাহাকে দোলায় শোয়াইয়া রাখেন, আবার জাগিবামাত্র তাহাকে বুকে করিয়া দুধ দেন। এইরূপে জননীর ঐ আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ শিশুর আত্মায় প্রবেশ করিয়া পবিত্র মহৎ ও উন্নত মানব-চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে। মাতার ঐ স্নেহময় গান সকল সতত যেন শিশুর সঙ্গে ঘুরিয়া

বেড়ায়। কানে সর্ব্বদা ঐ মিষ্ট শব্দ শুনিতে শুনিতে ও চক্ষে সতত ঐ প্রেমময়ী মাতার প্রেমের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে শিশু আধ-ঘুমন্ত আত্মা স্বর্গীয় ভাবে জাগিয়া উঠে।

শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্য ও ফ্রোবেলের ধারা উপকারী। ক্রমে মাতার গান শুনিতে শুনিতে শিশু যত বড় হইতে থাকে ও চলিতে শিখে, অমনি ঐ গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে খেলিতে শিখানও আবশ্যক। কি প্রকার গান, ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিশুর পক্ষে আনন্দদায়ক ও উপকারী, তাহা আমরা (কিণ্ডারগার্টেনে) দেখাইব। এই কোমল বয়সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যখন অতি নমনীয় থাকে, সেই সময় উপযুক্ত ব্যায়াম ও শরীরের চালনাদ্বারা প্রত্যেক ভাগের পুষ্টিসাধন করা অতি আবশ্যক।

ক্রীড়াই শিশুর প্রথম ইচ্ছা ও কাজ। সুতরাং খেলা দ্বারা শিশুর শরীর পুষ্টকরা ও মন প্রশস্ত করার মত ঔষধ আর নাই। নিয়মিতরূপে নানাপ্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদির দ্বারা শিশুর শরীর ও মন উভয়ই এক ভাবে চালিত হয়, উহা শিশুকে সকল বাহিক দ্রব্যের আকার, প্রকার ও কাজের শৃঙ্খলা শিখায়, শিশুর শরীরকে দৃঢ় ও সবল করে, শিশুকে ভবিষ্যতের বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত করে।

ক্যানেডা প্রবাসীর পত্র।

O. A. C.
Guelph. Out.
Canada.
4th August, 1908.

শ্রীচরণেষু—

মা! যদিও এবার আমার আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি খাওয়া ঘটিল না, তাহার পরিবর্ত্তে কত নূতন নূতন ফল এদেশে খাইতেছি। সেইগুলির বিষয় একটু লিখি :—

১। Raspberry—দেখিতে প্রায় লিচুর মত লাল ও লিচুর চেয়ে ছোট, খোলা ছাড়াইতে হয় না, ভিতরে একটী দুটী করিয়া ক্ষুদ্র বিচি, মিষ্ট প্রায় লিচুরই মত। মেয়েরা একটা বড় কাচের পাত্রে করিয়া টেবিলের উপর দিয়া যায়। আমরা দশজনে মিলিয়া তাহা ভাগ করিয়া খাই। প্রত্যেকে এক একটি ছোট dish পূর্ণ করিয়া ঐ ফল লইয়া থাকি। তাহাতে একটু দুধ ও চিনি দিয়া চামচে করিয়া তুলিয়া খাই। অতি সুন্দর লাগে।

২। Blue berry—ফলসার মত বড়, পাকিলে উহার রং নীল হয়, মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বিচি থাকে। মেয়েরা যখন রস

নিংড়াইয়া দেয় তখন সে রসের রং একেবারে নীল। প্রত্যেককে এক এক গ্লাস পূর্ণ করিয়া পান করিবার জন্ম দিয়া যায়। আবার কখন কখন প্রত্যেককে ছোট কাচের বাটি করিয়া ঐ ফল দিয়া যায়, আমরা তাহাতে একটু দুধ ও white sugar মিশাইয়া খাই, কিন্তু কিছুতেই ঐ নীল রংটা যায় না। একেত ফলটা খুব মিষ্ট, তাহাকে আরো "গুড় গোলা" করিয়া খাওয়া হয়। এদেশের ছেলে মেয়েরা আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের ও বুড়োদের অপেক্ষা বেশী মিষ্টি খায়। সেজন্য ২৫ বৎসর বয়স হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবক ও যুবতীদের মধ্যে দেখি যে একটা দুটা করিয়া false teeth মুখের মধ্যে বাঁধান আছে। অনেক ছেলে মেয়েরা আমার দাঁত দেখিয়া হিংসা করে ও জিজ্ঞাসা করে " সিংহ! তোমার দাঁত যে এখন সব গোটা "। আমি তদুত্তরে বলিলাম—"আমি ত বাঙ্গালাদেশে তোমাদের মত বেশী মিষ্টি খেতাম না, তাছাড়া আমি প্রত্যেক আহারের পর অন্য ঘরে গিয়া মুখ ধুইয়া থাকি। তোমরা ত জলের অভাবে রুমালে মুখ মুছিয়া থাক।"

আবার আর একদিন দেখি যে পাক ঘরের মেয়েরা ঐ Blue berryর পিষ্টক করে এনে টেবিলেতে রেখেছে। এক খানি রেকাবে ময়দা গুলিয়া ও ইহাকে আর একটি ভিন্ন রেকাবে একপুরু করিয়া লেপিয়া, তাহার উপর ঐ সুপক নীল ফল বা তাহার রসে অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু করিয়া আবার তাহার উপর আর এক পুরু ময়দা গুলিয়া লেপিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে কলের উনুনে চর্ব্বি দিয়া সেঁকিয়া লওয়া হয়। এ দেশে ত ঘি পাওয়া যায় না—কাজে কাজেই চর্ব্বি দিতে হয়। ঐ পিষ্টক খাইতে অতি সুন্দর লাগে।

এদেশের মেয়েরা ঐ প্রকার পিষ্টক লেবু, কলা, আপেল, খেজুর, কিস্‌মিস, নারিকেল, আনারস প্রভৃতি ফলের করিয়া থাকে। আমি মিস্ হার্ডিকে (ইঁনি আমাদের matron) বলিব যে ঐ সমস্ত পিষ্টক কি করে এ দেশের মেয়েরা প্রস্তুত করে তাহা আমাকে শিখাইতে। দেশে ফিরিলে আপনাদিগকে তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইব।

জেনে রাখিবেন এখানে যাহা কিছু রান্না হয় তাহা সব machine এতে (অর্থাৎ কলের উনুনেতে)। এদেশের মেয়েরা সমস্ত বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে। তাহারা কি হাত দিয়া কাঠের বা কয়লার উনুনে রান্না করিতে পারে? তার উপর একটা দুটা লোক ত খাচ্ছে না—খাচ্ছে অনেক লোক, কাজে কাজেই machineএর প্রয়োজন।

৩। Cherry—কুলের মত এক প্রকার ফল; পাকিলে ইহার রং ঘোর লাল, আর অত্যন্ত মিষ্টি। মেয়েরা ইহার রস নিংড়াইয়া গ্লাসে করিয়া দিয়া যায়, আবার কখন কখন ইহারও পিষ্টক

আগেকার মত প্রস্তুত করিয়া খাওয়ায়। তাহা অতি চমৎকার খাইতে লাগে।

৪। Currant—মনেকা ও করমচার মত ঠিক নহে। ফলসার মত ছোট ফল, ভিতরে একটি ছোট বিচি। ফল পাকিলে ইহার রং হল্‌দে হয়, মিষ্ট নহে, একটু টক্ লাগে। ইহারও রস নিংড়াইয়া খাওয়া হয়। আবার কখনও ডিস্ পূর্ণ করিয়া দিয়া যায়। তাহাতে দুধ ও বেশী পরিমাণে চিনি দিয়া চাম্‌চে করে তুলিয়া খাইতে হয়। আমার কাছে এ ফলটা তত ভাল লাগে না। এদেশের ছেলে মেয়েরা কিন্তু খুব খায়।

৫। Salted cucumber—আমাদের দেশে শসায় কেহ কেহ লবণ দিয়া খায়, এদেশেও সে রকম শসা আছে। কিন্তু এই Salted cucumberএতে লবণ লাগাইতে হয় না। (ইহা অর্দ্ধপক হইলে যেন লবণ) লাগানর মত আস্বাদন পাওয়া যায়। এটা বড় অদ্ভুত ফল। এতে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং লবণ লাগিয়ে রেখেছেন। আমাদের কলেজের মাঠেতে একটা বড় পেয়ারা গাছের মত শসা গাছ আছে। তাহার botanical নাম magnolia acuminata, গাছে যেমন পেয়ারা ঝোলে এ গাছেও শসা ঠিক সে রকম ঝোলে। গত exhibitionএতে অনেক কৃষক ঐ গাছ দেখে অবাক হয়েছিল। আরও অনেক লিখিতে বাকি রহিল। ক্রমশঃ লিখিব।

প্রত্যেক মেলে চিঠি পত্র না পেলে আমার জন্য ভাবিবেন না। আমি মানুষদের সঙ্গে আছি—বাঘ, ভাল্লুক বা সাপ বা ম্যালেরিয়া বাতাস পূর্ণ দেশে নাই।

ক্রমশঃ

ভুল ভাঙ্গা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই পারিষদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবে আর কি? দিন স্থির পর্য্যন্ত ক'রে এসেছেন, তা' দেবেন বাবু! বসে ভাব্‌ছেন কি? বাড়ীর ভিতরে যান, বিভা কা'ল শ্বশুর বাড়ী যাবে, তার উদ্যোগ আয়োজন করুন গে। তবে বেয়াই ম'শায়! গাড়ী ডাক্‌তে বলুন। কা'ল কেন? এখনি যাত্রার উদ্যোগ করুন। প্রথমবার বিভা শ্বশুর বাড়ী যাবে, এ লগ্নই ভাল

দেবেন্দ্র বাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এক্ষণে কাশীনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বিভাকে এখন পাঠাতে পারি না।"

কাশীনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "কেন?"

দেবেন বাবু উপেক্ষার সহিত বলিলেন, "আমার এইরূপ ইচ্ছা।"

কাশীনাথ আবেগের সহিত বলিলেন, "সে কি বেয়াই মশায়! মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন, এখন পাঠাবেন না, এ কেমন কথা! গরিব হোক আর যাই হোক, যখন তার হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছেন, তখন আর সে বিচারে ফল কি? আমি আমি যে বাড়ীতে ব'লে এসেছি, বৌ মাকে না নিয়ে ফিরছি না। এখন আমি কোন মুখে শুধু হাতে ফিরে যাব?"

সেই পারিষদ একটু ব্যঙ্গ ও গর্ব্ব মিশ্রিত স্বরে বলিল, "সে কি বেয়াই মশায়! শুধু হাতে ফিরবেন কেন? এ রাজার সংসার, এখানে কিছুরই অভাব নেই, আপনি যা চা'বেন, তাই পা'বেন। দেবেন বাবু এমন লোক নন্।"

অমর এ পর্য্যন্ত একটীও কথা বলে নাই। তাহার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল, তবুও সে পিতার সাক্ষাতে নীরব ছিল। আর থাকিতে না পারিয়া একটু তেজের সহিত বলিল, "আমার পিতা এখানে ভিক্ষা করতে আসেন নাই, তাঁর পুত্রবধূকে নিতে এসেছেন। আপনাদের যদি পাঠাতে অমত থাকে, স্পষ্ট ক'রেই বলুন। অমন কারচোপের প্রয়োজন কি?"

এই তেজপূর্ণ অথচ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র বাবু কুপিত হইলেন। বলিলেন, "তবে স্পষ্ট কথাই শুন অমর! বিন্তাকে শ্রীনগর পাঠা'তে আমার ইচ্ছা নাই। তার থাকবার মত বাড়ী আগে প্রস্তুত কর, তখন তাকে নিতে এস। যত দিন তা না হয়, তত দিন কোন কথা ব'লো না। মাটির ঘরে সে কখনো থাকেনি, থাকবেও না।"

অমর কম্পিত স্বরে বলিল, সেটা আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

কাশীনাথ চিত্র পুত্তলিকার মত বসিয়া ছিলেন। অমর তাঁহাকে বলিল, "বাবা! আর কেন? যথেষ্ট হ'য়েছে, এখন উঠুন এই জন্যই আমি তখন নিষেধ করেছিলাম।"

কাশীনাথ বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবুর একজন পার্শ্বচর বলিল, "সে কি বেয়াই ম'শায়! কতদিন পরে এলেন, এখনি যাবেন কেন? দু'দিন থাকুন, আমোদ আহ্লাদ করুন, তার পরে যাবেন। একান্ত পক্ষে একটু জলযোগ ক'রে যান। বেয়াই বাড়ী এলে মিষ্ট মুখ করতে হয়।"

অমর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পিতার হাত ধরিয়া একেবারে বৈঠক খানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল, একজন পারিষদ বলিতেছে, "জামাই বাবু রাগ ক'রে গেলেন নাকি?"

দেবেন বাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলার মত চক্র, অমন ঢের রাগ দেখেছি, ও রাগ কত দিন?"

অমর আর শুনিতে চাহিল না। পিতা পুত্রে রাস্তায় বাহির হইয়া জন সমুদ্রে মিশিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পরে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। অমরনাথ এখন মতিহারীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। অমরনাথ এম্, এ, পাশ করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় ফিরিতে ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সুনজরে পড়িয়া একেবারে দুই শত টাকা বেতনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়া মতিহারীতে আসেন। অমরনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমারনাথ এনট্রান্‌স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্‌সি কলেজে এফ্, এ, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অমরনাথ একাকী একটী বাসায় থাকিতেন। তাঁহার কার্য্য-নির্ব্বাহ-প্রণালী নিতান্ত আড়ম্বর শূন্য ছিল। একটী মাত্র ভৃত্য তাঁহার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিত। একটী হিন্দুস্থানী আরদালী তাঁহাকে রন্ধন করিয়া দিত। এই দুইটী লোক ব্যতীত তাঁহার বাসায় আর দাস দাসী কেহই ছিল না।

আজ প্রায় দুই বৎসর গত হইল অমর নাথ শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই হইতে এক দিনের জন্যও আর সে বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই বা সেখানে কোন পত্রাদিও লেখেন নাই। আধুনিক নব বিবাহিত দম্পতির মধ্যে যেমন চিঠি পত্রাদি লিখিবার নিয়ম প্রচলিত আছে অমর নাথ এবং বিভাময়ীর মধ্যে সেরূপ দেখা যায় নাই। অমরনাথ উচ্চশিক্ষিত যুবক হইলেও সম্পূর্ণ 'সেকেলে' ধরণের ছিলেন। শ্বশুরবাটীর নিকটে থাকিয়াও অন্যান্য যুবকের ন্যায় প্রতি শনিবারে শ্বশুর-বাটী যাইতেন না। দুই তিন মাস অন্তর হয়তঃ কচিৎ একদিন যাইতেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় অতি অল্পই হইয়াছিল। বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে পত্নীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু বিভাময়ী তাহার কোন উত্তর দেন নাই। অমরনাথও আর কখনও স্ত্রীকে পত্র লেখেন নাই।

জামাতার ভাল চাকুরী হওয়ার সংবাদে তাঁহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাঁহার স্ত্রীকে নিয়া যাইবার জন্য অনেক বার পত্র দিয়াছেন, অমরনাথ সে সব পত্রের কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই, অনেক পত্র লেখার পরে বিরক্ত হইয়া একবার শ্বশুরকে লিখিয়াছিলেন, "আমি এখানে হীন অবস্থায় থাকিলেও আপনার অবস্থায় বেশ সন্তুষ্টই আছি, আর কাহাকেও এখানে আনিয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আশা করি, আপনারা আর আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না।"

অমরনাথের এই পত্র পাইয়া তাঁহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী হতাশ হইয়া কিছুদিন আর পত্রাদি লেখেন নাই।

একদিন অমরনাথ কাছারী হইতে আসিয়া সবে মাত্র বসিয়াছেন এমন সময়ে হরকরা খানকয়েক পত্র দিয়া গেল। অমরনাথ পত্রগুলি হাতে লইয়া দেখিলেন, একখানি শ্রীনগর হইতে তাঁহার পিতা লিখিয়াছেন। কয়দিন বাড়ীর সংবাদ

না পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে পিতার পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

"পরম কল্যাণবরেষু—

অত্র পত্রে শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।

কয়েক দিন তোমার কুশল সম্বাদ না পাইয়া চিন্তাযুক্ত আছি, আশা করি, ভগবদাশীর্ব্বাদে কুশলে আছ। সম্প্রতি শ্রীমতী উষাবালার শুভ বিবাহ না দিয়া আর রাখিবার উপায় নাই। তোমার নিষেধ ছিল বলিয়া আমি এতদিন চেষ্টা করি নাই। এক্ষণে আশু বিবাহ দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কয়টী সম্বন্ধ উপস্থিত আছে। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন স্থানে স্থির করিতে পারিতেছি না।

শ্রীমান্ কুমারনাথের বিবাহের জন্য তোমার গর্ভধারিণী বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমারও তাহাতে মত আছে। শেষ জীবনে সুশীল পুত্রবধূর সেবা শুশ্রূষা করিবেন; আমরা তাঁহাদের হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্ম চিন্তায় সময় কাটাইব, বড় আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান বড় সাধে বাদ সাধিয়াছেন। যাহা হউক এখন কুমারের বিবাহ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি।

মনোহরপুরের শ্যামাচরণ দত্ত অবস্থাপন্ন লোক। তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিলে টাকা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মেয়েটী তত ভাল নয়। আর তোমার রামসদয় খুড়ো, তাঁহার কন্যার সহিত কুমারের বিবাহ দিতে বিশেষ উৎসুক। মেয়েটী পরমসুন্দরী কিন্তু রামসদয়ের অবস্থা তো জান? শাঁখা, সাড়ী ছাড়া তাঁহার আর কিছু দিবার শক্তি নাই। মেয়েটী কিন্তু বড় লক্ষ্মী। তোমার অভিমত শীঘ্র জানাইবে।

বাটীর সমাচার উপস্থিত মঙ্গল। তোমার কুশল সম্বাদ সর্ব্বদা প্রার্থনীয়। কিমধিকমিতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক তোমার পিতা।"

পুঃ—বাবা! আমাদের একটা অনুরোধ, বেয়াই মহাশয় স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া পুনঃপুনঃ আমাকে পত্র লিখিতেছেন, তিনি অন্যায় করিয়াছিলেন, সেজন্য এখন বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছেন। বৌমাকে আনিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিতেছেন। আর বৌমা ত কোন দোষেই দোষী নন্। বাবা! আমার মাকে শীঘ্র ঘরে নিয়ে এস। ঘরের লক্ষ্মী কতদিন পরের বাড়ী থাকিবেন? দুই বৌমাকে এক সঙ্গে দেখিয়া নয়ন ও জীবন সফল করিব। অজিতকুমারের সংবাদ পাইয়াছ কি না জানিতে ইচ্ছা করি।"

৮

যে রাত্রে অমরনাথ পিতার সহিত শ্বশুরবাড়ী হইতে আসেন, সেই রাত্রি হইতে অজিত কুমারের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রাত্রিশেষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অজিতকুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অমর নাথ প্রত্যূষে অজিতকে

দেখিতে না পাইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। অমর নাথ প্রথমে মনে করিলেন, অজিত হঠাৎ বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে স্বয়ং যাইয়া দেখিলেন, অজিত বাড়ী যান নাই। অজিতের পিতা, অজিতের কোনই সংবাদ বলিতে পারিলেন না। হঠাৎ পুত্রের নিরুদ্দেশ-সংবাদ পাইয়া অজিতের পিতা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি চারি দিকে পুত্রের সন্ধানার্থ লোক পাঠাইলেন। একমাস ধরিয়া তাহারা সহর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল। বৃথা চেষ্টা! অজিতের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

অজিতের পিতা নিরস্ত হন নাই। সর্ব্বগুণাধার প্রাণাধিক পুত্রের এমন আকস্মিক অদর্শনে কোন্ স্নেহময় পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অজিতের পিতা দেশ দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিলেন এবং পুলিশেও সংবাদ দিলেন। ফলে কিন্তু কিছুই হইল না। এখনও পর্য্যন্ত নানাস্থানে অজিতের সন্ধান চলিতেছে।

অমরনাথ নিজে অনেক দিন পর্য্যন্ত যথাসাধ্য প্রিয়বন্ধুর সন্ধান করিয়াছেন। অজিতের এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কোন কারণ অমর জানিতে পারেন নাই। আজ পিতার পত্র পাইয়া অজিতের জন্য তাঁহার অত্যন্ত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হায়, অজিত! কল্পনায় যাহাকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়া তুমি কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে, সেই তোমার অমর আজ সত্য সত্যই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছে। আজ তুমি কোথায়? তোমার যে দুঃখ-কাহিনী আমার নিকটে বলিবে বলিয়াছিলে, তাহা আমাকে বলিবার অবসর পর্য্যন্ত সহিল না"—অমরের চক্ষুতে জল আসিল।

ভাবনা অন্য পথে ধাবিত হইল। অমর ভাবিলেন, "পিতা দেশে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ লিখিতেছেন। আমার ও মন ছুটিয়াছে। অনেক দিন জন্মভূমি, এবং পিতা মাতাকে দেখি নাই। যাইবারও বাধা নাই। এক মাসের অবসর গ্রহণ করিয়াছি, এখনি যাইতে পারি, কিন্তু দেশে গেলেই কলিকাতা যাইতে হইবে। পিতার আদেশ, আমার স্ত্রীকে আনিতে হইবে। আমার যতই অনিচ্ছা থাক, পিতার আদেশ কখনই অবহেলা করিতে পারিব না।"

পাঠক! পাঠিকা! ব্যাপারটী অন্যরূপ মনে করিবেন না।

অমরনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক হইলেও আধুনিক নব্য সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতার বাক্য, দেবতার আদেশের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। জীবন দিয়াও পিতৃবাক্য পালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

অমরনাথ আবার ভাবিলেন, শ্বশুর শাশুড়ী এখন পাঠাইতে অমত করিবেন

না বুঝিতেছি, কিন্তু তাহার মনের ভাব কি? এত দিন বিবাহ হইয়াছে, আজিও তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইলাম না। আর জানিবারই বা বাকি কোথায়? ধনবানের কন্যা, অতি যত্নে পালিতা, আশৈশব কেবল লোকের উপরে প্রভুত্ব করিতেই শিখিয়াছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ, মমতা বা প্রণয় থাকা অসম্ভব। যদি আমার প্রতি তাহার একটুও মমতা থাকিত, তবে কি সে এত কালের মধ্যে আমাকে একখানিও পত্র লিখিত না? সে ত এখন আর ক্ষুদ্র বালিকাটী নাই? সামান্য এক খানা পত্র লিখিতে কোন বাধাই থাকিতে পারে না। তাহার পিতা মাতা অবশ্য নিষেধ করেন নাই। বিবাহ হওয়া অবধি যতটুকু সময় দেখা হইয়াছে, বিভাময়ী অমরনাথের সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। অমরনাথ তখন মনে করিত, লজ্জা বশতঃই বিভা এমন ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু এখন অমরের মনে হইল, তাহার সে ভাবে গর্ব্ব ও দম্ভ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। স্বামীর নিকটে স্ত্রীর লজ্জা কত দিন থাকিতে পারে?

অমরের ভাবনার বিরাম নাই। একটীর পরে আর একটী ভাবনা আসিয়া তাঁহার সমগ্র চিত্তকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। নানা ভাবনায় অমর নাথ আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন।

৯

প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই অমর নাথ পিতাকে পত্র লিখিলেন। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। ভাবিতে বিলম্ব হইল না। তিনি লিখিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রাম সদয় খুড়োর কন্যার সহিত কুমারের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবেন। আমি শীঘ্রই বাড়ী আসিতেছি। আর আর বিষয় সাক্ষাতে শ্রীচরণে নিবেদন করিব। নিবেদন, মিতি—

প্রণত দাস, অমর।"

পত্র খানি ডাকে পাঠাইয়া অমর প্রাতঃ কৃত্য সমাধা করিলেন। রাত্রিতে নানা চিন্তায় কিছুই আহার হয় নাই। সুনিদ্রার পরে মনের অবসাদ দূর হইয়াছে। এখন ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় ভৃত্যকে এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন। অমর নাথ আধুনিক বাবুদিগের ন্যায় চা-পায়ী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা চায়ের ব্যবহার করিতেন না। মধ্যে মধ্যে শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া কখন কখন পান করিতেন।

চা পান করিয়া অমর নাথ একখানি সংবাদ পত্র দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তিনি বিশেষ প্রয়োজনে এখনই বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক। অমর ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল। দেখিলেন, তাঁহার

শ্বশুর, সেই ধন গর্ব্বিত, মহা অহঙ্কারী প্রতাপশালী দেবেন্দ্রবিজয় বাবু সামান্য বেশে তাঁহার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত।

বিস্মিত অমরকে, প্রণাম করিবার অবসর না দিয়া দেবেন বাবু উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। আবেগ পূরিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা অমরনাথ! আমাদের ভ্রম দূর হ'য়েছে। অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতেই ফল্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে। অনুতাপে হৃদয় পুড়ে যা'চ্ছে। এখন ও যদি উপায় কর্‌তে পার, তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

অমর তাঁহার কথার কোনরূপ ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তবে একটা কিছু হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি শ্বশুরের হস্ত ধারণ করিয়া ভিতরে নিয়া গেলেন। অনেক চেষ্টার পরে অমর জানিতে পারিলেন; বিভাময়ী সঙ্কটাপন্ন পীড়িতা, জীবনের আশা নাই বলিয়া চিকিৎসকেরা জবাব দিয়াছে, মৃত্যুশয্যার পড়িয়া বিভাময়ী একটীবার মাত্র অমরনাথকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। দেবেন বাবু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন;—"বাবা! আর কেউ এলে তোমাকে নিয়ে যেতে পার্‌বেনা। হয়ত তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না। মায়ের আমার জীবনের সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে, তাই আমি নিজে এসেছি। নতুবা তা'কে সে অবস্থায় রেখে কোন্ চণ্ডাল পিতা স্থানান্তরে যেতে পারে? চল বাবা! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। বিলম্ব কর্‌লে হয়ত আর দেখা হবে না।"

শ্বশুরের কথা শুনিতে শুনিতে অমরের নয়ন আপনাআপনি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ কত কাল পরে তিনি বিভাময়ীর কথা শুনিলেন। অমরনাথ মনে করিলেন, "বিভা পীড়িতা, মুমূর্ষু! সে আমাকে দেখিতে চায়, কেন? তবে কি সে আমায় ভাল বাসে। হায়! কি ভুলই করিয়াছি।"

যেখানকার দ্রব্য সেইখানে পড়িয়া রহিল। অস্নাত অনাহারী অমরনাথ শ্বশুরের সহিত কলিকাতায় রহনা হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে তারযোগে আপনার বিপদ জানাইলেন এবং বিশ্বাসী ভৃত্যকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরেই একটী রুক্ষকেশ, মলিন বেশধারী লোক অমরনাথের বাসা বাটীর দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডেপুটী বাবু বাসায় আছেন?"

ভৃত্য বলিল, "না, তাঁর স্ত্রীর ব্যারাম, তিনি এইমাত্র কলিকাতায় রওনা হইলেন।"

লোকটি আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

১০

যে দিন অমরনাথ রাগ করিয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসেন সেই দিন হইতে বিভাময়ীর ভাবান্তর উপস্থিত হয়, জনপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী পিতৃ ভবনের মধ্যে বিভাময়ী আপনাকে নিতান্তই একাকিনী বোধ করিতে থাকে। অট্টালিকায় বাস, এবং দাস

দাসী দ্বারা সেবিতা হইয়াও, বিভাময়ীর জীবন শূন্য ও শান্তিহীন মনে হইত। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল; বিভাময়ীর মনের অশান্তি ততই বাড়িতে লাগিল। এমন অবস্থায় কি মানুষ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? বিভাময়ী বালিকা মাত্র।

বিভাময়ী কেবলই ভাবে, "পিতা কেন তাঁহাকে কর্কশ কথা বলিলেন? কেন আমাকে পাঠাইলেন না? তিনি যে বড় আশা করিয়া আমাকে নিতে আসিয়াছিলেন। বাবা যখন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন, তখন তাঁহার মনে না জানি কত কষ্ট হইয়াছিল? কিন্তু তিনি বা ফিরিয়া গেলেন কেন। কেন তিনি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না? কেন আমাকে জোর করিয়া নিয়া গেলেন না? সে অধিকার ত তাঁহার ছিল?

আবার ভাবিত, পিতা মাতা আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবেন বলিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছেন। পাছে আমি ক্লেশ পাই, সেই জন্য স্বামীর সঙ্গে যাইতে দেন নাই। কিন্তু ইহাতে যে আমার মনের সুখ শান্তি একেবারেই নষ্ট হইল, তাহা কি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না? হায়, প্রভু! আমি ত কোন দোষে দোষী নই, তবে কি জন্য আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে? আর কি তুমি আমার কাছে আসিবে না?"

বালিকা আর ভাবিতে পারে না।

বিভাময়ী অনেক দিন মনে করিয়াছে, স্বামীকে পত্র লিখিবে। কতবার কাগজ কলম নিয়া লিখিতে বসিয়াছে। কিন্তু কি জানি কেন, আবার কি ভাবিয়া বিরত হইয়াছে। যখনই পত্র লিখিবার কথা মনে হইত, তখনই ভাবিত, কই! তিনি ত একখানা পত্র আমাকে লেখেন নাই? আমি কি বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব?'

হায় অভিমানিনি! আপন সমূহ বিপদ উপস্থিত জানিয়াও নারীস্বভাবসুলভ অভিমান ত্যাগ করিতে পারিল না?

বিভা স্বামীকে পত্র লিখিতে পারিল না।

ক্ষুদ্র বালিকা চিন্তার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে শয্যা আশ্রয় করিল। দিন দিন তিল তিল করিয়া তাহার জীবনী শক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল। শরীর শীর্ণ ও মুখ মণ্ডল বিশুষ্ক। বিভা আর উঠিয়া বসিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, সরস্বতীর শুভ বিবাহে

মাতার

আশীষ ভিক্ষা।

নন্দিনী মোর সুকন্যা মোর
বক্ষের নিধি প্রাণের ধন,
মনে পড়ে ওরে আজ শুভদিনে
তোর সেই যে জন্মক্ষণ।

মনে পড়ে সেই মূঢ় শিশু তুই
ক্রন্দন কল্লোলে ভরিলি দিক,
বঙ্গ মাতার অঙ্গন ভরি
কে এলরে বলি গাহিল পিক।
বিভুর আজ্ঞায় সুকোমল কায়
জন্মভূমির বাতাস জল,
বন্দনা করি নান্দনী তোরে
পাতি দিল মার শ্যামাঞ্চল।
কত যে সঙ্কট কত যে বিঘ্ন
ঝড় ঝঞ্ঝার ভীষণ দুঃখে,
রক্ষিতে তোমারে হৃদি অকাতরে
দিয়েছি কত যে মরণ মুখে।
যবে সিন্ধু এসে গর্জ্জেছিল হেসে
যুঝিল জীবন মৃত্যুর সনে,
বিভুর কৃপায় সে সঙ্কট যায়
পুনঃ ফিরে এলে নব জীবনে।
আজ শুভ দিনে কত পড়ে মনে
তোর যে বাল্য তোর কৈশোর,
আজ ভরা গঙ্গা পূর্ণ জোয়ারে
দিক উছলিত নব কল্লোল।
সেই প্রিয় ধনে ধর্ম্ম প্রেম সনে
বাঁধি দিতে আজ এসেছি নাথ,
তোমার করুণ প্রসাদ অরুণ
'করুক' এদের সুপ্রভাত।
কোথা ঋষীন্দ্র রাজনারায়ণ
"কুমারী রতন" সাধের নামে,
প্রথমে আশীষি বরে ছিলে তারে
আশীষ কর গো এ শুভ দিনে।

মনস্বী যোগেন্দ্র ব্রহ্ম যোগাসনে
কোন্ সপ্ত স্বর্গে বিভুর প্রেমে,
তব স্নেহাশীষ এসেছে কি বহি
ফুলের সৌরভে মলয় সনে ?
উষা কি তোমার বিমল হাস্য
মিলন পুলকে আননে ভাসে,
এসেছ কি উষা নব উষা বহি
এ দুটি নবীন পথিক পাশে ?
হে মঙ্গলময় তব প্রেম জয়
বিশ্বের মাঝারে ফুটায় হাসি,
শচীন্দ্র "রতনে" পথিক নবীনে
আশীষ কর গো তুমি গো আসি।
এস প্রিয়তমা।　　কুমুদিনী ওমা
পতিকুলে ধ্রুব হও গো তুমি,
জনপদ কল্যাণী,　　সৌভাগ্যশালিনী,
বিশ্বজনের হও আদরিণী।
দুঃখ অশ্রুজল,　　যত অমঙ্গল,
শত সঙ্কট থাক হেথা পড়ে,
গার্গী মৈত্রেয়ী সমা,　　অরুন্ধতী রমা,
রমণী রতন হও বিভু বরে।
কেন প্রাণ তোরে　　রাখে হেথা ধরে
সুখী হও বৎস যাক্ বিঘ্ন দূরে।
দেশ ও সমাজ,　　জগতের কাজ,
সাধি চলে যেও কর্ত্তব্য ভরে।
ওগো বিশ্বেশ্বর,　　ওঁকার অক্ষর,
তব সম প্রিয় কে আর আছে,
এ দুটি পান্থে,　　চরণ প্রান্তে,
রাখ চিরতরে সকলে যাচে।

মা।

শ্রীমান্ শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং শ্রীমতী কুমুদিনীর শুভ বিবাহে

বধূ-বরণ।

"সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাম্ ভব
সাম্রাজ্ঞী ননন্দরি ভব, সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু"

আমাদের আঁধার কুটিরে
কে আসিছ দিক্ উজলিয়া,
চির মৌন শুষ্ক ফুল বন,
তোমা দেখি উঠিছে হাসিয়া।
আমরা যে দীন অভাজন—
কোথা দিব বসিবার স্থান,
শত তাপে দগ্ধ হিয়া আজি,
তাই কি তোমারে দিব দান ?
তুমি যে গো স্বরগবাসিনী
অমর-প্রার্থিতা দেববালা,
কেন তুমি আসিলে মরতে,
জুড়াইতে তাপিতের জ্বালা ?
নাহি জানি কোন্ সুপ্রভাতে,
গিরি-শিরে—আত্ম বিসর্জ্জিয়া,
কে সাধিল মহতী সাধনা,
তব কৃপা অলক্ষ্যে মাগিয়া।
না জানি সে তরুণ তাপস
শীতাতপ সহিয়াছে কত,
সুখ দুঃখ নাহি ছিল মনে,
একাগ্রতা বাল্মীকির মত।
তারি পুণ্যে —তারি তপোবলে,
এলে তুমি স্বর্গ পরিহরি,
মানবেরে কৃতার্থ করিতে—
দীন গৃহে রাজ রাজেশ্বরী।

রত্ন তুমি সংসার-সাগরে
পুষ্প মাঝে পবিত্র কমল,
জীবনের আনন্দ প্রতিমা,
কোথা রাখি—কোথা যোগ্য স্থল ?
এলে যদি—এস দেববালা!
সুখ শান্তি সুমঙ্গল সহ,
বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ
তব শিরে থাক্ অহরহঃ।
এলে যদি—এস দেববালা।
ভক্তি-প্রীতি আনন্দ লইয়া,
তব বুকে সঞ্চিত অমৃত
গৃহে, দেশে, দাও বিলাইয়া।
এলে যদি—এস দেববালা,
লইয়া সৌভাগ্য বরাভয়,
সীমন্তের মঙ্গল সিন্দূর,
হাতে শাঁখা হউক অক্ষয়।
এস এস এস দেববালা!
লক্ষ্মী হয়ে চিরানন্দ ধামে,
তৃপ্ত হোক তৃষিত নয়ন,
দেখি তোমা শচীন্দ্রের বামে।

কলিকাতা।
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সাল—বঙ্গাব্দ।
শুভাশীর্ব্বাদিকা—
শ্রীমানকুমারী বসু।

Address of welcome to Her Highness The Dowager Maharani of Cooch Behar C. I.

আবার এসেছি আবার সকলে
নয়ন আসারে ভাসিতে ভাসিতে,
আবার এসেছি দুঃখী ভগ্নী দলে
মনের বেদনা এসেছি কহিতে।
বর্ষে বর্ষে আসি নিতে পুরস্কার,
তায় কেন ঝরে অশ্রু আমাদের,
এ হেন দিনেতে হৃদয় সবার
ব্যথিত আহত আঘাতে শোকের।
ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গে—এই কি নিয়তি!
সে দিন কেঁদেছি কতই এখানে,
অশ্রুভরা চোখে চির অশ্রু গতি
এসেছি কাঁদিতে--কাঁদি ভাঙ্গা প্রাণে।
নৃপ "নৃপেন্দ্রের" সে মূর্ত্তি এখনো
জাগিছে হৃদয়ে চিত্রার্পিতের প্রায়,
ভুলিব কি মোরা? ভুলিব কখন?
সে মূর্ত্তি তাঁহার রয়েছে হেথায়!
বজ্রাহতে পুনঃ হয় বজ্রপাত?
না ভুলিতে সেই ঋষি মূর্ত্তি হায়
উছসি আবার বঙ্গের আঘাত
আসিল সংবাদ তাড়িত বার্ত্তায়!
নূতন নৃপতি—"রাজরাজেন্দ্র" নাই,
আশার মূরতি গেছেন চলিয়া,
এস ভগ্নি—কাঁদি মিলিয়া সবাই
কাজ নাই আর পুরস্কার নিয়া!
কি দিবে মোদের—মাতঃ মহারাণি,
চাই না আমরা চাই না কিছুই,
মূল্যবান যাহা—শিরোমণি জানি
জানিতাম মোরা তাঁদের শুধুই!
হারায়েছি তাহা—কি নিব আমরা?
ভক্তকন্যা তুমি মাতঃ মহারাণি,
হৃদয় তোমার—প্রেম ভক্তি ভরা,
পিতার মতন নিয়ে ক্রুশখানি—
তুমিও চলেছ ক্রুশের প্রচারে
তুমিও এসেছ তাঁহার মতন—
"ক্রুশ" হাতে নিয়ে সুদূর "বিহারে"
নমি মোরা তোমা ধরিয়া চরণ।
সমাধিতে বস সমাহিত হ'য়ে
তপস্বিনী যথা তপস্যায় রত
প্রার্থনা তোমার ব্যাকুল হৃদয়ে
ভাঙ্গা প্রাণে শান্তি দিবে তায় কত।
তোমার সুকাজ, তোমার জীবন
তোমার চরিত্র—আমাদের পথ,
তোমার উদ্যম, উৎসাহ বচন
করিবে মোদের পূর্ণ মনোরথ।
তোমার পশ্চাতে এসেছি চলিতে,
মাতার মতন আমাদের নিয়ে
চল তুমি চল—নিয়ে "ক্রুশ" হাতে,
চলিব আমরা তোমাকে ধরিয়ে।
জানিব মানিব—তুমি আমাদের
চির মাতা তুমি দরিদ্র কন্যার
ভক্তি, শ্রদ্ধা চির দিব হৃদয়ের
দিই আজ পদে শত নমস্কার।

Address of welcome to Her Highness The Maharani of Cooch Behar.

এস এস মহারাণি, শ্রদ্ধা ভক্তি মালা আনি,
দিই আজ তোমার গলেতে।
আনন্দে বরণ করি, ফুল মালা গলে ধরি,
ফুলরাণী তুমি এসেছি দেখিতে।
'বরদা' প্রাসাদ মাঝে, ছিলে ফুল্ল ফুল সাজে,
এখানেও তুমি রাজার মহিষী।
বড় আশা আমাদের, বড় আশা "বিহারের"
দেখিতে তোমারে বড় ভাল বাসি।
এসেছ ভালই তুমি, ধন্য এ বিহার ভূমি
কত আনন্দ বঙ্গ মহিলার।
দেখ মহারাণি আজ, কি আনন্দ হৃদি মাঝ,
"বরদা" "বিহার"—এক পরিবার।
নিবেদন আমাদের, ভালবাসা হৃদয়ের,
দিও আমাদের তেমনি করিয়া।

"বরদা" বাসারে যথা, বরদা—মহিষী মাতা
দেন ভালবাসা হৃদয় ভরিয়া।
দিও আমাদের, ভালবাসা হৃদয়ের,
দিও মহারাণি তেমনি করিয়া,
বিহার ভূমিতে যথা, বিহার মহিষী মাতা,
দেন ভালবাসা পরাণ ভরিয়া।
আমাদের শিক্ষা, আমাদের দীক্ষা,
নিও তুমি ভার মাতার সঙ্গেতে।
আমাদের ভাল বেসে, আসিয়াছ এই দেশে,
এসেছ কেবল আমাদের হিতে।
আজ তাই শুভক্ষণে, আজ শুভ সম্মিলনে,
কৃতজ্ঞতা, ভক্তি লও আমাদের।
আমরা সকলে মিলে, দুঃখিনী ভগিনী দলে,
নত শিরে দিই শ্রদ্ধা হৃদয়ের।

সুনীতি কলেজের বাৎসরিক বিবরণ।

১৯১৩-১৪

শিক্ষা-প্রণালী। বিগত পাঁচ বৎসর হইতে সুনীতি কলেজে নূতন প্রণালী অনুসারে শিক্ষা-দান চলিয়া আসিতেছে। বালিকাদিগের উপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা এবং শিল্প শিক্ষা দানই এ প্রণালীর উদ্দেশ্য।

পরীক্ষার ফল। বিগত ১৯১৩ সালের পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত বালিকাগণ Anglo Vernacular Upper Primary Standard পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে :—

(পারদর্শিতানুসারে)

কুমারী পঙ্কজিনী চক্রবর্ত্তী, প্রথম বিভাগ
শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত „

উক্ত সালের Anglo Vernacular Lower Primary Standard পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বালিকাগণ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে :—

(পারদর্শিতানুসারে)

কুমারী লীলাবতী রায় প্রথম বিভাগ
„ মালতীলতা চট্টোপাধ্যায় „
„ অচল নন্দিনী চক্রবর্ত্তী „
„ প্রতিভা কুমারী রায় „

নগেন্দ্র বালা গুহ „
যোগমায়া দাস গুহ „
হেমপ্রভা বাগচি „
সৌদামিনী সরকার „
প্রতিভাবতী সেন „
ষোড়শীকুমারী ভৌমিক „
ঈশানীবালা মুখোপাধ্যায় „
নিভাননী সরকার „
আমিনা খাতুন „
স্নেহলতা রায় দ্বিতীয় বিভাগ
„ বিভাবতী লাহিড়ী „

উপরিউক্ত বালিকাগণের মধ্যে যে বালিকা Anglo Vernacular Lower Primary পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, স্কুলের প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাকে মাসিক দুই টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে হিন্দু বালিকাটি অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে সেটি আদিম কুচবিহার ও যেটি ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করিয়াছে সেটি এ দেশীয় মুসলমান বালিকা।

ছাত্রী সংখ্যা।—১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসের ছাত্রী সংখ্যা ১৯৭২ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ জন অধিক। গড় উপস্থিতি ১৭৫, অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫ জন অধিক। এই সকল ছাত্রীদের মধ্যে ৯ জন মুসলমান অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪ জন কম। ৫ জন ব্রাহ্ম অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১ জন অধিক। ১ জন খৃষ্টান অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের সমান। ২৩ জন রাজগণ ও কুচবিহারের আদিম অধিবাসী অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৪ জন কম। এই ২৩ জনের মধ্যে ৮ জন বালিকা রাজগণ পরিবার ভুক্ত। ইহা অত্যন্ত আশাজনক যে স্থানীয় রাজগণ-পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার সমাদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

মহিলা বিভাগ। নানা অসুবিধা নিবন্ধন এই শ্রেণীর কার্য্য বিগত জুলাই মাস হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাজগণ মহিলাদিগকে শিল্প শিক্ষা বিধানই এই বিভাগের উদ্দেশ্য।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোম রাজ্যের ইতিহাস।

৬ অধ্যায়।

পার্টিনাক্স, জুলিএনস্, সিভেরস্, কারেকেলা ওলিটা, মাক্রিনস্, হালিও গেবোলস্, আলেকজাণ্ডার সিভেরস, মাক্সিমস, পিউপিনস্ ও বালবিনস্, গার্ডিয়ানস, ফিলিপ, ডিসয়স, গালস ও ভালিরিয়ান।

১। পার্টিনাক্স নামে এক প্রাচীন সেনেটর কমোডসের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি জেনোয়া প্রদেশের এক

নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু নিজে অত্যন্ত সাহসী, নম্র, জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। যে সৈন্যেরা কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করে, ২ মাস ৬ দিবস রাজত্বের পর তাহারাই আবার তাঁহাকে বধ করিল।

২। এক্ষণে বহুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি রাজ্যলাভার্থে একান্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ইহাতে রক্ষক সেনাগণ (ক) এক কৌতুকাবহ পণ করিল যে, যে ব্যক্তি অধিক টাকা দিতে পারিবে তাহাকে সাম্রাজ্য বিক্রয় করা যাইবে। অনন্তর ডিডিয়স্ জুলিয়েনস নামে এক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি, অনেক টাকা দিয়া রোম রাজ্য ক্রয় করিল। কিন্তু পাঁচ মাসের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সিভেরসের আজ্ঞায় তাঁহার শিরশ্ছেদন হইল।

৩। সিভেরস যেমন যুদ্ধবিশারদ ছিলেন, সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র জয়লাভও করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাইগেল ও আলবিডসকে পরাভূত এবং সেনেটকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অনন্তর ২০৮ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে ব্রিটেন গমন করত ফোর্থ হইতে ক্লাইড নদী পর্য্যন্ত, প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অবশেষে ১৭ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করিয়া ২১১ খৃঃ ইয়র্কে প্রাণত্যাগ করেন।

(ক) আগষ্টস, প্রিটোরিয়ান্, গার্ড বলিয়া আপনার কতকগুলি দেহ রক্ষক নিযুক্ত করেন। ইহারা পরে এরূপ প্রবল হইল যে স্বেচ্ছানুসারে সম্রাটদিগকে নিযুক্ত, পদচ্যুত বা হত করিত।

৪। মাক্রিনস্ ও হালি ও গাবেলসের ন্যায় কারেকেলা ও লিটা নামে সিভেরসের দুই পাপিষ্ঠ পুত্র ছিল। তাহারাই পরে সিংহাসন অধিকার করিয়া যাবতীয় লোকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

৫। মাক্রিনস্ মুরবংশীয়,—তাহার আদিমাবস্থা অত্যন্ত অপকৃষ্ট ছিল। সে ১ বৎসর ২ মাস রোমে রাজত্ব করে। কারেকেলার পুত্র হেলিওগেবেলস ৩ বৎসর ৯ মাস রোমে রাজত্ব করে। তাহার খুল্লতাত পুত্র আলেকজাণ্ডার সিভেরস মহৎ লোক ছিলেন। অতঃপর তিনি সম্রাট হইয়া ১৩ বৎসর রাজত্বের পর বিদ্রোহী সৈন্যগণ দ্বারা মেন্টনগরে নিহত হন।

৬। অতঃপর মাক্সিমস ও তাঁহার পুত্র রোমের সম্রাট হইলেন। মাক্সিমস্ প্রথমে থ্রেস প্রদেশের এক মেষপালক ছিলেন, পরে সৈন্যাধ্যক্ষ ও ক্রমে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তিনি দয়ালু কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নৃপতি ছিলেন এবং দুই বৎসর রাজত্বের পর রক্ষক সেনা দ্বারা হত হন।

৭। মাক্সিমসের মৃত্যু হইলে সৈনিক পুরুষেরাই রোমের অধীশ্বর হইল। তাহাদিগের ক্ষমতার সীমা কি! তাহারা রোমের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল; ইচ্ছা করিলে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্রাট করিত এবং ইচ্ছা হইলে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত বা নিহত করিতে পারিত। এই জন্য পরবর্ত্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে রোমে ৫০ জনেরও অধিক সম্রাট হয়।

৮। বালবিনস মাকসিমসের উত্তরাধিকারী হইয়া পরে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিনাশিত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী গার্ডিয়ানস। ফিলিপ তাঁহাকে নিপাত করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। (ক) পরে ডিসিয়স সম্রাট হইলেন। তিনি যে দুই বৎসর শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খৃষ্টানদিগের প্রতি উপদ্রবকারী ও অত্যাচারী বলিয়া খ্যাত হন।

গালস, ভলসিনিয়স ও ইমিলেনস প্রত্যেকে অতি অল্পকাল করিয়া রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে ভালিরিয়ান সম্রাট হইয়া পারস্যের রাজা সেপর কর্ত্তৃক ইডেসরের যুদ্ধে পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন এবং অল্পদিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।

৭ অধ্যায়।

গালিনিয়স, ক্লডিয়স, কুইন্টিলিয়স, অরিলিয়স, টেসিটস ইত্যাদির রাজত্ব।

১। গালিনিয়স তাঁহার পিতা ভালিরিয়ানের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি অত্যন্ত রিপুপরায়ণ ছিলেন এবং সেনাগণ কর্ত্তৃক হত হন। তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিশ জন অত্যাচারী লোক সম্রাট হইবার জন্য এক কালে উত্থিত হয় এবং মহা গোলযোগ উপস্থিত করে।

২। এইরূপ বিবাদ কলহে সাম্রাজ্য ক্রমশঃ হীন বল হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুগণ আসিয়া রোম নগর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

৩। ক্লডিয়স (দ্বিতীয়), গালিনিয়সের উত্তরাধিকারী। তিনি তৎকালের এক জন মহৎ এবং বিদ্যালোকসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন। ২৬৯ খৃষ্টাব্দে ডানিউব নদীর তীরে তিনি গথদিগের সমুচ্ছেদ করেন। তাঁহার পুত্র কুইন্টিলিয়সের ১৫ দিন মাত্র রাজত্বের পর অরিলিয়স সম্রাট হইলেন। তিনি পালমিরার রাণী জেনোবিয়াকে পরাভূত করিয়া কারারুদ্ধ করেন।

৪। অতঃপর অরিলিয়স ৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া নিউকেপোরস কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। বৃদ্ধ টেসিটস তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া ছয় মাস রাজত্ব করিবার পর স্বীয় ভ্রাতা ফ্লোরিয়েনসের করে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া যান। সিরিয়াধিপতি প্রোবস বলপূর্ব্বক তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া ছয় বৎসর শাসন করেন। পরে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিপাত করিল।

৫। প্রোবসের পর কেরস রাজা হন। তিনি এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার দুই পুত্র নিউমিরিনস ও কেরিনস রাজ্যাধিকারী হয়। কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্যে অতি অল্প কাল রাজত্ব ভোগ হইয়াছিল।

৬। ডালমিসিয়াবাসী জাই ওক্লি-

(ক) ফিলিপ যে বৎসর সম্রাট হয়েন সেই বর্ষে রোমে সহস্র সাম্বৎসরিক বর্ষোৎসব হয়। এই উপলক্ষে যেরূপ ঘটা হয়, রোম কোন কালেই সেরূপ দর্শন করেন নাই।

সিয়ন তৎপরে সম্রাট হন। ইনি অতি নীচ বংশজাত। কিন্তু তাঁহার গুণ অতীব মহৎ ও উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি ২৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হইয়া মাক্সিমিয়ান নামক এক ব্যক্তিকে আপনার সহকারী করিয়া তাঁহার উপর রাজ্যের পশ্চিম অংশের ভার দিলেন এবং আপনি পূর্ব্বাংশ মাত্র শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আরও কনষ্টান্টিয়স্ ও গালিরিয়সকে সিজর উপাধি দিয়া, আপনাদিগের সহকারী নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে চারি ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

৭। ডাইওক্লিসিয়ন কুড়ি বৎসর ও মাক্সিমিয়ান আট বৎসর রাজত্ব করিয়া কনষ্টান্টিয়স ও গালিরিয়সের উপর রাজ্যের ভার সমর্পণ করেন। ইঁহাদিগের পর কনষ্টান্টিয়সের পুত্র কনষ্টান্টাইন দি গ্রেট সম্রাট হইলেন (৩০৬খৃঃ)। তিনি ব্রিটন দেশের ইয়র্কসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন।

৮। কনষ্টান্টাইন সর্ব্ব প্রথম খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রোম-সম্রাট ছিলেন। তিনি রোম হইতে বিজানসিয়মে রাজধানী লইয়া যান। পরে তাঁহার নামানুসারে ৩৩০ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরের নাম কনষ্টান্টিনোপল্ হয়।

৯। কনষ্টান্টাইন রোম রাজ্যকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া তাঁহার তিন পুত্র কনষ্টান্টাইন, কনষ্টান্সস ও কনষ্টান্সকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় রাজ্য বৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া ভয়ানক ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত করিলেন এবং তাহাতে সকলেই উচ্চাভিলাষের পুরস্কার স্বরূপ মৃত্যুর গ্রাসে ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। রোম রাজ্য এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ অসভ্য জাতিদিগকে আক্রমণ জন্য আহ্বান করিতে লাগিল।

৮ অধ্যায়।

জুলিয়ান দি আপেষ্টেট হইতে রোমের শেষ সম্রাট হনোরিয়স।

১। জুলিয়ান, কনষ্টাইন দি গ্রেটের পৌত্র ও কনষ্টান্সের পুত্র খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম পুনর্ব্বার স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন বলিয়া তাঁহাকে আপষ্টেট অর্থাৎ পতিত বা বিধর্ম্মী বলে। তিনি অতিশয় সাহসিক রাজা ছিলেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার বীরত্ব ও প্রজাহিতৈষিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। এই সময়ে জার্ম্মানেরা রাইন নদী পার হইয়া গলদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভয়ে তাহারা পুনরায় স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। ৩৬৩ খৃঃ পারস্য দেশের লোকদিগের সহিত যুদ্ধে জুলিয়ান হত হইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী জোভিয়ান পারসিক দিগের সহিত এক অপমানজনক সন্ধি করিলেন। ইঁনি খৃষ্ট ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করেন এবং সাত মাস বাইশ দিনের রাজত্বের পর লোক যাত্রা সম্বরণ করেন।

৩। জোভিয়ানের পর ভালিরিয়ান দি গ্রেট সম্রাট হইলেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন।

তিনি রোমের পশ্চিমাংশ আপনার জন্য রাখিয়া স্বীয় ভ্রাতা ভালেন্সকে পূর্ব্বাংশের অধিপতি করিলেন।

৪। তিনি অতি সরল স্বভাব ছিলেন, তজ্জন্য ফলাফল বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া লক্ষ লক্ষ গথকে তাহাদিগের প্রার্থনানুসারে থ্রেস প্রদেশে বাস করিতে অনুমতি দেন। তাহারা হন্‌ ও অন্যান্য জাতির সহিত যোগ স্থাপন করিয়া রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল এবং আড্রিয়া-নোপলের মহাযুদ্ধে রোমীয় সৈন্যগণকে পরাজিত ও অনেক সেনানীর সহিত ভালেন্সকে হত করিল।

৫। ইঁহার উত্তরাধিকারী গ্রেসিয়ান ও ভালেণ্টাইন স্মরণযোগ্য কোন কার্য্যই করেন নাই। পরে থিয়োডোসিয়স দি গ্রেট সম্রাট হইয়া বিপক্ষগণকে পরাভব ও রোমরাজ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্র আর্কেডিয়স ও হনোরিয়স এই দুই ভ্রাতার মধ্যে রোম রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন।

৬। আর্কেডিয়স থ্রেস, আসিয়া-মাইনর, সিরিয়া, এবং ইজিপ্ট বা মিসর দেশের উপর রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হনোরিয়স ইটালী, বার্ব্বে রাজ্য, গল ও ব্রিটনের রাজা হইলেন। ইহার অনতি-বিলম্বেই নূতন নূতন অসভ্য জাতি সকল (ক) একে একে পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া রোমের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল, যাহা সম্মুখে পাইল লুট ও ধ্বংশ করিতে লাগিল এবং তাহারা যেখানে আসিল সেই খানেই আপনাদিগের অধি-কার বিস্তার করিল। ইহার দ্বারাই সমুন্নত রোম রাজ্যের অচিরাৎ অধঃপতন হইল।

৭। যে সকল অসভ্য জাতি রোমের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তন্মধ্যে গল, হন ও লম্বার্ডিয়ান সর্ব্ব প্রধান। তাহারা বৃহৎ বৃহৎ দেশ সকল সমূলোৎখাত করিল, রোম রাজ্যের ভগ্নাবশেষোপরি নূতন রাজ্য সকল স্থাপন করিল এবং যেখানে আসিতে লাগিল সেই স্থানেই আপনাদিগের রীতি নীতি প্রচলিত করিল।

৮। অবশেষে গলাধিপতি আলারিক ৪১০ খৃষ্টাব্দে মহানগর রোম জয় করিয়া ৫ দিনের জন্য তাহা লুঠ করিতে সৈন্য গণকে আজ্ঞা দিল এবং রোম সমূলে বিনাশিত হইল। হায়! যে মহানগরী যাহা ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত সকল শত্রুর আক্রমণ তুচ্ছ করিয়াছিল এবং যাহা করস্থ করিতে অদ্বিতীয় যোদ্ধা হানিবল

(ক) ভ্যাণ্ডাল, আলান, গথ, ভিসিগথ, ফ্রাঙ্ক, আলিমানি, সাক্‌সন্‌, আঙ্গল, হন, বর্গণ্ডিয়ান, লম্বার্ড, জিপিডি, আভার, শ্লেভাই, নর্ম্মাণ, বুল্‌গেরিয়ান, সেরাসান, মুর এবং টর্ক বা তুরস্ক ইত্যাদি অসভ্য জাতি রোম রাজ্যকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই শেষোক্ত জাতি দ্বারা ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে রোম স্থাপনের ঠিক ২২০০ বৎসর পরে আর্কেডিয়স-প্রাপ্ত পূর্ব্ব রোম রাজ্য ধ্বংশ হয়।

প্রভৃতিরও সাধ্য হয় নাই, এক্ষণে কতকগুলি অসভ্য লোক দ্বারা তাহা ছিন্ন ভিন্ন ও শতধাকৃত হইয়া উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইল। যে রোমের নামে মেদিনী কম্পান্বিত হইত, যে রোম বীরদর্পে সমুদায় জাতিকে অধীনস্থ করিয়া আপনার উচ্চ পাতাকা গগনমার্গে উড্ডীয়মান করিয়াছিল এক্ষণে সেই রোমের সকল চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইল।

সমাপ্ত।

কন্যার বিয়োগে—মাতার বিলাপ।

(১)

নয়নের মণি হয়ে ছিলে মাগো এ ধরায়
সহসা চলিয়া গেলে স্নেহের নন্দিনী হায়!
বড় ব্যথা লাগিয়াছে, বলি আর কার কাছে
তুমি মাগো আর ধরা দিবে না ত এ ধরায়
পরোলোকে দেখা হবে পুনঃ আশা করি তায়।

(২)

তোমার কণ্ঠের বাণী আহা কিবা সুমধুর
এখন বাজিছে কানে মোহন মধুর সুর।
সঙ্গীতের কিবা তান, মন্ত্র মুগ্ধ করে প্রাণ
কি দেখালে অপরূপ মাধুরিমা ভরপুর
দেবতার গুণ গানে দুঃখ তাপ করি দূর।

(৩)

কি যে মন্ত্র শিখেছিলে অনন্তে পুরিয়া প্রাণ
স্বর্গের অমিয় সুধা আকণ্ঠ করিতে পান।
অনন্তের উপাসনা, সে জীবনে ফুরাত না
নিশি দিন ছিল মা গো সেই তোর ধ্যান জ্ঞান,
কত ভাবে কত রসে অভিষিক্ত করি প্রাণ।

(৪)

স্নেহ প্রীতি ভালবাসা দিয়ে প্রাণ প্রিয় জনে
দেখালে স্বর্গের শোভা সংসারের এ কাননে
তোমার ব্যাকুল প্রাণ, হো'ত সদা আগুয়ান,
মুছাতে গো অশ্রুধারা দুঃখিত তাপিত জনে,
ভুলিব কি কভু তাহা দেখায়েছ যা নয়নে।

(৫)

সুন্দর ফুলের মত ফুটে ছিল সে হৃদয়
যাহার সুবাস পেয়ে নর নারী সমুদায়
হইতে পাগল পারা, প্রেমে যেন মাতোয়ারা,
সাধু সাধ্বী কত জন দিল তার পরিচয়
তোমার জীবন শুধু ছিল সেবাব্রত ময়।

(৬)

দেবতার হাতে গড়া মধুর জীবন অতি
যৌবনের নব রাগে হয়েছিল মূর্ত্তিমতী,
নয়নে প্রতিভা তব, কিবা ছিল অভিনব,
মা আমার শান্তশীলা ছিলে তুমি গুণবতী
কুমারী রতন হয়ে কি দেখালে স্নিগ্ধ জ্যোতি।

(৭)

হেসে খেলে চলে গেলে চির-শান্তি-
নিকেতনে
তোমা হেন ভাগ্যবতী দেখি নাই এ
জীবনে।
তোমার আত্মীয় যারা, দেখ সমাসীন তারা,
পরলোকে আছে তোর কত শত প্রিয়
জনে,
ভকত প্রেমিক সাধু উমেশ চন্দ্রের সনে।

(৮)

দুঃখ তাপ দূরে যাক্ মুছে ফেলি অশ্রুধার
মাগো তুমি সুখে থাক শান্তি ধামে অনি-
বার।
যাঁরে ভাল বেসে ছিলে তাঁরে প্রাণ ঢেলে
দিলে
মা মা বলে বাহু তুলে ছুটে গেলে কোলে
যাঁর,
সত্য সে আনন্দ ধামে পেলে তুমি পুর-
স্কার।

সুর নর সমস্বরে করে সবে জয় গান,
জয় হে জগত পতি! জয় সত্য ভগবান্।

তুমি এক পিতা মাতা সকলের পরিত্রাতা
জয় শিব সিদ্ধি দাতা পুরাও সবার প্রাণ,
অনন্ত করুণা সিন্ধু চির সুখ শান্তি ধাম

১০

যে জন কাতর প্রাণে ডাকে সত্য সনাতন!
তুমি তার প্রাণে এসে দাও শুভ দরশন!
ইহ পরলোক তুমি, আত্মার আশ্রয় ভূমি
প্রাণের হে প্রিয়তম! তুমি সার নিত্যধন,
অনন্ত জীবন পথে তুমি সত্য নারায়ণ!

১১

তোমার শ্রীশ্রীচরণে সঁপি এই দেহ প্রাণ,
সুখে দুঃখে চিরদিন থাক তুমি বর্ত্তমান।
বিশ্বাস নয়নে হরি, তব কৃপা স্পর্শ করি
বিপদ দুর্দ্দিনে নাথ! কর তুমি শান্তি দান,
দুঃখী তাপী পাপী জনে এত দয়া ভগবান

১২

প্রাণের পরম নিধি কেড়ে নিলে দয়াময়,
এত দিনে পূর্ণ হ'ল তোমার ইচ্ছার জয়।
তুমি তারে দিয়া ছিলে, তুমি তারে তুলে
নিলে,
সংসারে ফুটিয়া থাকে স্বর্গের কুসুমচয়,
পুনঃ তারে নিয়ে গিয়া কর স্বর্গ শোভাময়।*

* এই কন্যা তাহার স্বাস্থ্যোন্নতের জন্য দীর্ঘকাল পিতা মাতার নিকট হইতে বহু দূরদেশে গিয়াছিল। ভগবানের অশেষ কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পরমানন্দে পিতামাতার নিকট আসিতে ছিল; পথিমধ্যে ভীষণ ব্যাধি বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া পিতামাতাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পথি-মধ্যেই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

প্রথম বিভাগ।

বানার্জ্জি গ্রেস শান্তাবালা ডাওসেশন স্কুল।
বসু অমিয়া লরেটো হাউস।
„ ভক্তিমতী ভিক্টোরিয়া স্কুল।
„ প্রতিভা ডাওসেশন স্কুল।
„ সত্যপ্রিয়া ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়।
ভট্টাচার্য্য চারুপ্রভা ডাওসেশন স্কুল।
চন্দ্র সুনীতি বালা ঢাকা এডেন স্কুল।
চট্টোপাধ্যায় এলা রমলা ডাওসেশন স্কুল।
চৌধুরী পুষ্পলতা প্রাইভেট।
দাস সুজাতা বেথুন স্কুল।
দাস গুপ্তা তরুলতা „
দুয়ারা সুধালতা „
„ সুখলতা „
গুপ্তা সুনীতি বালা ঢাকা এডেন স্কুল।
খাস্তগীর আশালতা ময়মনসিং হাই স্কুল।
„ ইন্দুলেখা বেথুন স্কুল।
মুখার্জ্জি রেণুকা „
মোজেলস্ সাঠিল লরেটো হাউস
নাগ শান্তিময়ী ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।
নিয়োগী সুরবালা ময়মনসিং বিদ্যাময়ী স্কুল
রায় লীলা ঢাকা এডেন স্কুল।
„ প্রতিভা বেথুন স্কুল।
রায়চৌধুরী মণিকা ডাওসেশন স্কুল।
রায় লীলা „
„ মণিকা „
মণিকা „
সান্ন্যাল চপলা প্রাইভেট।
সরকার বীণাপাণি, মহারাণী স্কুল দার্জ্জিলং
সেন গুপ্তা সুমতী ডাওসেশন স্কুল।

দ্বিতীয় বিভাগ।

বন্দ্যোপাধ্যায় বিভা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়।
„ সেফালিকা „
বসু ফ্লোরেন্স সরসী বালা এল, এম, এস, গার্লস স্কুল।
„ আইভি ইন্দুবালা „
„ পূর্ণিমা প্রাইভেট।
ভাদুড়ী সুনীতি „
বিশ্বাস মৃণালিনী ইউ, এফ, সি, হাই স্কুল।
„ স্নেহলতা গার্ডেন মেমোরিয়াল।
চক্রবর্ত্তী প্রফুল্ল কুমারী „
„ সুধাময়ী প্রাইভেট।
দত্ত শান্তিলতা ঢাকা এডেন।
দেবী কমলকামিনী প্রাইভেট।
গুহ লাবণ্যপ্রভা গার্ডেন মেমোরিয়াল।
গুপ্তা অরুণা লরেটো হাউস।
মৈত্রেয় কুন্দলতা প্রাইভেট।
মহান্তি ইচ্ছাবতী গার্ডেন মেমোরিয়াল।
মণ্ডল মণিপ্রভা ডাওসেশন স্কুল।
„ লবঙ্গলতা গার্ডেন মেমোরিয়াল।
নাগ প্রীতিময়ী ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।
রায় প্রতিভা ছোটনাগপুর হাই গার্লস স্কুল।
সরকার সরোজিনী ইউ, এফ, সি হাইস্কুল

সরবান্ মেরী	ডাওসেশন স্কুল।
সেন মালতী	ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়।

তৃতীয় বিভাগ।

বিশ্বাস নির্ম্মল নলিনী	ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।
মিত্র বিজলী	বেথুন।
" প্রতিভা	"
সরকার পুলিনবালা,	গার্ডেন মেমোরিয়াল।

আই, এ, পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

গুপ্তা তটিনী	বেথুন কলেজ।
হাজরা পরিমল	ডাওসেশন কলেজ।
মজুমদার সুনীতি	"
বসু সুজাতা	বেথুন কলেজ।
দাস চারুলতা	ডাওসেশন কলেজ।
বিশ্বাস নীশাময়ী	
গুপ্তা সুধা	
চট্টোপাধ্যায় সীতা	বেথুন কলেজ।
নন্দি সরলা	ডাওসেশন কলেজ।
ডলি স্পানিয়ান	লরেটো হাউস।
ঘোষ জ্ঞানপ্রিয়া	প্রাইভেট।
ফ্লোরা এ, লটেরী	লরেটো হাউস
রায় বেলা	ডাওসেশন কলেজ।
লিলিয়ান মাসুক	লরেটো হাউস।
খিস্‌নানি সুশীলা	বেথুন কলেজ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

দত্ত ইন্দুমতী	প্রাইভেট।

বি, এ, পরীক্ষার ফল।

ইংরাজি অনার।

ব্রাউন কন্সটান্স	ডাওসেশন কলেজ।
আনোকি ইগোলিন	"

সম্মানের সহিত।

চাটার্জ্জি শান্তা	বেথুন কলেজ।
" কিরণ বালা	ডাওসেশন কলেজ।

পাশ কোর্স।

কর নর্ম্মদা	বেথুন কলেজ।
মিত্র বিভাবতী	"
বিশ্বাস ইন্দুপ্রভা	"
" সুরমা	ডাওসেশন কলেজ।
সরকার নীহার	বেথুন কলেজ।
" বিভুবালা	নন্ কলেজিয়েট।
দেভেরিয়া লিলিয়ান	প্রাইভেট।

নূতন সংবাদ।

১। বর্ত্তমান বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ পরীক্ষায় কুমারী তটিনা গুপ্ত প্রথম এবং বি, এ, পরীক্ষায় ব্রাউন কনষ্টান্স ইংরাজি অনারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

২। বর্মিংহাম নগরবাসী মিঃ এসন্ নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার রেলগাড়ী আবিষ্কার করিয়াছেন, এই গাড়ী কেবল মাত্র একখানি লাইনের উপর দিয়া চলে। যখন গাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয়, তখন ইহা লাইন হইতে উপরে উঠে এবং শূন্যে চলিতে থাকে। এই সময় ইহার গতি ঘণ্টায় ৫০০ শত মাইল হয়।

৩। পরহিতব্রত সাধু নিত্যানন্দ দাস

মহাশয় পতিতা ও কলঙ্কিতা হতভাগিনী দিগের গর্ভস্থ সন্তান রক্ষার জন্য নবদ্বীপে "নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির" নামে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মন্দিরের কার্য্য যাহাতে সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে একটী কর্ত্তব্যাবধারণ-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সুতার কাপড়ে চিতা পড়িলে পরিষ্কার করিবার উপায়—দেড় আউন্স ক্লোরাইড অফ্ লাইম প্রায় তিন পোয়া গরম জলে মিশ্রিত করিয়া ঐ চিতা ধরা স্থান গুলি তাহাতে ডুবাইয়া রাখিয়া একটু পরে শীতল জলে কাচিয়া লইলেই উহা উঠিয়া যায়।

বামারচনা।

বর্ষবরণ।

উষার আলোক যবে,
পূরব দুয়ার খুলি,
মুছে দিল যত দুঃখ বাধা পুরাতন,
নবীন কিরণ রাশি,
আকাশের গায়ে মাখি,
উজ্জ্বল করিল মোর হৃদয় কানন।
চম্পক-কেতকী-দলে,
শীতল সুরভি বায়,
মধুগন্ধে করি পূর্ণ আবার গগন।
আবার প্রদীপ জ্বালি,
কুসুমে সাজায়ে ডালি,
এস নববর্ষ ঘরে করিগো বরণ॥
তোমার পরশে পুনঃ,
পাইয়া চেতনা ফিরি,
ঘরে ঘরে জেগে উঠে নবীন পরাণ।
কত উৎস প্রাণে ঝরে,
আশার তরঙ্গ ভরে,
সদা অনুকূল পথে করিতে প্রয়াণ।
তোমার অভয় বাণী
প্রতি প্রাণে দাও আনি,
বহাও সকল হৃদে উৎসাহ তুফান।
শিক্ষা দাও, দীক্ষা দাও,
কর্ম্মেতে মতি জাগাও
হাতে ধরি তুলি দাও উন্নতি সোপান॥
বিশ্বাস ভকতি বল,
প্রীতি প্রেম নিরমল,
গেঁথে দাও হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে।
ধুয়ে দাও আবিলতা,
মুছে যাক্ অমিলতা,
ভুলে যাই পুরাতন ভয় ভাবনারে॥
তব পায় নব বর্ষ,
ভক্তি ভরে ঢালি অর্ঘ্য,
যতনে বরিয়ে লব প্রতি ঘরে ঘরে।
কর কর আশীর্ব্বাদ,
মুছে যাক্ অবসাদ,
বাজুক নবীন বীণা সবার অন্তরে॥

সুনীতি ভাদুড়ী, কেশব ধাম
বেনারস।

ক্যাজাবায়াঙ্কা।

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

১

জ্বলন্ত অর্ণবযানে বালক দণ্ডায়মান
করিয়াছে সেথা হ'তে অন্য সবে অন্তর্দ্ধান
রণপোত-ভগ্ন-অংশ ধ্বংস করি হুতাশন
শব রাশি দহি করে শিশু পাশে আগমন
তথাপি নির্ভীক শিশু দাঁড়ায়ে সুন্দর ভাবে,
ঝটিকা দমিতে যেন জনম তাহার ভবে,
বীরের শোণিত তার সর্ব্বদেহে প্রবাহিত
মূর্ত্তিমান গর্ব্ব যেন শিশুরূপে বিরাজিত

২

দ্রুত বেগে অগ্নি-রাশি নিকটে আসিছে তবু
পিতার আদেশ বিনা সে নাহি সরিবে কভু,
কিন্তু জনকের স্বর শ্রবণে না পশে আর,
ভূপতিত অবসন্ন মৃত কলেবর তাঁর।
কহে শিশু জনকেরে উচ্চে ক'রে সম্বোধন,
"বল পিতঃ! কার্য্য মোর হইল কি সম্পাদন?
না জানিল পিতা তার মৃত্যুমুখে নিপতিত,
তনয়ের তরে তিনি আর নন উচাটিত।

৩

সম্বোধি জনকে শিশু পুনঃ কহে উচ্চৈঃস্বরে
"পারি কি যাইতে আমি, বল পিতঃ! বল মোরে!"
আগ্নেয় অস্ত্রের ধ্বনি তাহারে উত্তর দিল,
দ্রুতবেগে অগ্নি রাশি গড়ায়ে কাছে আসিল
জ্বলন্ত অগ্নির শ্বাস স্পর্শিল ললাট দেশ;
স্পর্শিল তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত সুচারু কেশ;
তথাপি সাহসী শিশু বিচলিত হয় যেন।
রহিল হতাশ ভাবে সেই স্থলে দাঁড়াইয়ে।

৪

একবার মাত্র আর সম্বোধি পিতায় বলে,
"বল পিতঃ! এখনও কি রব আমি এই স্থলে?
বাদাম * ও রসারসি অতিক্রমি তার পাশে
ঘূর্ণমান অগ্নিরাশি দ্রুত বেগে ধেয়ে আসে
বেষ্টিল তরণী দীপ্ত উচ্ছ্বসিত বৈশ্বানর
আক্রমে পতাকা উঠি ঊর্দ্ধ হৈতে ঊর্দ্ধতর
উজ্জ্বল অনল স্রোত শিশুদেহ আবরিল
পতাকা সদৃশ শিখা নভস্থল আচ্ছাদিল।

৫

বিদীর্ণ হইল তরী বজ্রনিনাদের প্রায়
সেই বীর বালকের কি দশা হইল হায়!
কি দশা হইল তার জান তুমি প্রভঞ্জন
করিলে সেকালে তুমি সিন্ধু জল আলোড়ন
মাস্তুল পতাকা আদি যা'ছিল অর্ণবযানে
নিক্ষেপিয়া সে সকল বারিনিধি সন্নিধানে,
যত বস্তু হৈল নষ্ট, সকলের শ্রেষ্ঠতম
শিশুর সে ক্ষুদ্র হিয়া ছিল অতি নিরুপম।

---

* বাদাম—নৌকার পাল।

সুনীতির আশীর্ব্বাদ।

আঁধারে আলোক মম অশান্ত হৃদয়ে প্রীতি
আয় আয় কাছে আয়,
শুভ বেলা বহে যায়,
বুকে ধরে চুমি তোরে লয়ে পূর্ব্ব স্মৃতি।

সাঙ্গ হ'ল বাল্য খেলা উষার আলোক।
জীবনের নব পাতে,
আরক্তিম সুপ্রভাতে,
দেখা দিল প্রেম রশ্মি ফুটিয়া পুলকে।

কনক-দুয়ার খুলি আনন্দে জননী।
নন্দন কানন হ'তে,
পারিজাত মালা গেঁথে,
দেবী তব আসিছেন উজলি অবনী।

স্নেহের বল্লরী মোর ওগো কৃশাঙ্গিনী।
পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা,
ভক্তি নম্র বিভূষিতা,
অনবস্থা প্রফুল্লিতা ওগো সুলাজিনী।

পাতিয়া অঞ্চল খানি আজি সে চরণে।
মাথা পাতি লহ দান,
জীবনের সুসম্মান,
সুখ শান্তি অনাবিল প্রেমের মিলনে।

দূর্ব্বা ধান সুলক্ষণ চিহ্ন কল্যাণের।
তাই দিয়ে হৃষ্ট মনে,
দিবে তোরে বরাননে,
মহাপুত আশীর্ব্বাদ সারা জীবনের।

যাবৎ সংসারে রবে হবে সুখময়ী।
সুপথ দেখাবে তোরে,
ইহ পর কাল তরে,
এই আশীর্ব্বাদ বাছা প্রতি পদে জয়ী।

সর্ব্ব মঙ্গল পূর্ণা এই দূর্ব্বা ধান।
কায় বাক্য দিয়ে,
রেখো রাণী আরাধিয়ে,
ইহাতেই শ্রী ঐশ্বর্য্য ইহাতেই মান।

সংসারের দুর্লভ যাহা বাঞ্ছিত নারীর।
এ আশীষ বরে নিত্য,
বলীয়ান হবে চিত্ত,
জ্ঞান ধর্ম্মে বিদ্যা ধনে আশ্রয় লক্ষ্মীর।

সারা জীবনের বল এই আশীর্ব্বাদ।
ধ্রুব তারা সম হ'য়ে,
লয়ে যাবে লক্ষ্য ধেয়ে,
পুরাবে আকাঙ্ক্ষা তব মিটাইবে সাধ।

মাতা পিতা যে প্রবাসে, এ আনন্দ মাঝ
বড় মেজ ছোট মামা,
ভক্তি স্নেহ অনুপমা,
দাদা দিদি ভাই বোন ফুলের সমাজ।

এই সুখ সম্মিলনে তারা কেন দূরে।
আর কত পড়ে মনে,
ভাসে অশ্রু নেত্র কোণে,
তোর এই পুরস্কারে রহে কেন সরে।

আছে আছে সব আছে স্ব, স্ব, আসনে।
আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি,
পায়না দেখিতে সৃষ্টি,
বিধাতা রচিত কুঞ্জ কমল কাননে।

যে যেথায় আছ বসে কর বর দান।
সুনীতি কল্যানী মেয়ে,
রাখগো আশীষ দিয়ে
বুকের ভিতরে যার আছে যত টান।

ঢেলে দাও ঢেলে দাও আজিকে সবাই।
কাঞ্চন হীরক রাশ,
অতুল্য ইহার পাশ,
গোপন-সঞ্চিত ধন আছে যত ভাই।

আয় মা সুনীতি রাণী আয় বুকে লই।
জুড়াব মরম জ্বালা,
হেরে আনন্দের মেলা,
শুভ আশীর্ব্বাদে তোর সবে ধন্য হই।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

দুটী ফুল।

১

কোন নন্দনের, পুণ্য ভূমি মাঝে,
ফু'টে ছিল দু'টী ফুল।
সৌরভে গৌরবে, অতুলন মরি,
কি দিব তা'দের তুল॥

২

কি জানি কি পাপে, আসিল মর্ত্ত
পুণ্য স্বর্গ চ্যুত হ'য়ে।
মম হৃদি বৃন্তে, ফুটিয়া হাসিল,
সেই পুণ্য ছবি লয়ে॥

৩

সংসার উদ্যানে, এক বৃন্তে মরি,
ফুটে ছিল দুটী ফুল,
সোহাগ বাতাসে, যুগল কুসুম,
করিত গো দুল দুল॥

৪

স্বভাবজ রূপে, স্বভাবজ গুণে,
উজলি সংসার বাস।
সময়ে ফুটিল, গলে পরাইল,
নব মায়া নাগ পাশ॥

৫

নাহি ছিল কোন, পাপ মলিনতা,
দুঃখ ব্যথা জ্বালা হীন,
ভেবেছিনু মনে, শান্তির আলোকে,
পড়ি রব চির দিন॥

৬

কিন্তু কে বুঝিবে, বিধাতার বিধি,
এ মর জগতে হায়!
ইচ্ছা যাহা তাঁর, অবশ্য পুরিবে,
কে পারে খণ্ডিতে তায়!

৭

প্রলয় ঝটিকা, এল আচম্বিতে,
ধারিয়া ভীষণ সাজ।
সাধের উদ্যান, ছিন্ন ভিন্ন করি,
হৃদয়ে হানিল বাজ॥

৮

শুভ্র নিরমল, সৌরভে অতুল,
দু'টী ফুল অমরার।
কঠোর পীড়নে, নিপীড়িত করি,
একটী ছিঁড়িল তার॥

৯

না ছুটিতে বাস, না ফুটিতে হাস,
কুসুম কোরক মরি,
কালের প্রলয়, নিশ্বাস পবনে,
ভূতলে পড়িল ঝরি,

১০

ছিল দুটী ফুল, এক বৃন্তে মরি,
আমার হৃদয় পরে।
একটী তাহার, পড়িল খসিয়া
কালের নিশ্বাস ভরে।

১১

অন্য ফুল এবে, বিশুষ্ক মলিন,
নাহি সে লাবণ্য হায়!
বড় ব্যথা তার, বাজিয়াছে প্রাণে,
কেমনে বুঝিব তায়?

১২

কাল স্রোতে যাহা, ভেসে গেছে মম,
আর না আসিবে ফিরে।
সেই স্রোতে যেন, এ শূন্য জীবন,
ভেসে যায় পিছে ধীরে॥

১৩

দগ্ধ হৃদি হায়! আর কি জুড়াবে?
তাই বাঞ্ছা দয়াময়।
তাহারি ভাবনা, ভাবিতে ভাবিতে,
হোক্ এ জীবন লয়॥

হেমাঙ্গিনী।

চিত্র পরিচয়।

সুবিখ্যাত কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

কবি মানকুমারী বসুর নাম বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। ইনি ৺ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইহাঁর প্রণীত "শুভ সাধনা" নামক পুস্তক ছাত্রীদিগের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়েরই পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত পুস্তক প্রণেত্রীদিগের মধ্যে আর কোন রমণীরই এরূপ সম্মান লাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী শিক্ষার যেরূপ সুবিধা হইয়াছে ইনি যে সময় শিক্ষালাভ করেন, সে সময় এরূপ সুবিধা ছিল না। ইনি নিজের চেষ্টায় এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। একজন হিন্দু বিধবা রমণীর পক্ষে এরূপ উন্নতি ও সম্মান লাভ অতি গৌরবের বিষয় ও সকলের অনুকরনীয়।

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯।১নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 611. July, 1914

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১১ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩২১। জুলাই, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

হারকিউলিস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পেটিকাবদ্ধ বস্ত্রখানি লাইকাসের হস্তে দিয়া দেয়ানীরা বলিলেন, "আমার স্বহস্ত-রচিত এই বসন খানি সযত্নে লইয়া গিয়া হারকিউলিসের হস্তে অর্পণ করিও। যুদ্ধ-জয়ের জন্য যখন তিনি দেবপূজা করিবেন তখন ইহা যেন অঙ্গে ধারণ করেন। সাবধান, বস্ত্র খানি কখনও আবরণমুক্ত করিও না। পরিধানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন রৌদ্রতেজ ও অগ্নি-তাপ হইতে ইহা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে। আর এই অঙ্গুরীয়টী লইয়া যাও—তাহা হইলে ইহা কাহার উপহার তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইবে না।" আদেশ-পালনের অঙ্গীকার করিয়া লাইকাস চলিয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পরে দেয়ানীরা সঙ্গিনীগণের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বিবর্ণ মুখমণ্ডল, রক্তহীন ওষ্ঠাধর ও ভয়াকুল চক্ষু দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। শুষ্ক, স্খলিত কণ্ঠে রাণী বলিতে লাগিলেন—"আমি কি করিয়াছি! Nessusএর শোণিতরঞ্জিত বসনখানি হইতে স্খলিত কয়েকটি সূত্র রৌদ্রে পড়িয়াছিল। এখনই দেখিলাম সূত্র কয়টি জ্বলিয়া উঠিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, আর সেই স্থানের ভূমি হইতে ফেনা উঠিতেছে। কি ভয়ানক! আমার স্বামীর দেহে ইহার ফল না জানি কি হইবে! এখন আমার মনে হইতেছে যে, ঔষধটিকে আলোক ও উত্তাপের মুখ হইতে দূরে রাখিতে Nessus আমাকে বারংবার বলিয়া দিয়াছিল। হায়, কি হইবে—আমি কি করিব? কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও যে ইহাতে হার-

হিরকিউলিসের যদি কোন অনিষ্ট হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দীর্ঘকাল আমিও এখানে থাকিব না।”

দেয়ানীরার অন্তরের আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলচিত্তে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সমুদ্রের দিক হইতে ত্বরিত অশ্বপদের ধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল। স্পন্দিত বক্ষে নীচে নামিয়া আসিয়াই তিনি পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন। জ্বালাপূর্ণ দৃষ্টি মাতার মুখে রাখিয়া যুবক তিক্তকণ্ঠে কহিলেন—'মা! তুমি যদি আমার মা না হইতে'—শ্বাসরুদ্ধ স্বরে জননী বলিলেন—'হায়, বৎস! আমি কি করিয়াছি?”

“কিছুই না—শুধু আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছ।” স্পন্দহীনা দেয়ানীরা পুত্রবর্ণিত ঘটনা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন:—পূজাবেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হারকিউলিসের নিকটে কেমন করিয়া লাইকাস দেয়ানীরাপ্রদত্ত মারাত্মক উপহার লইয়া উপস্থিত হইল। হারকিউলিস কেমন আনন্দে পত্নীর নিপুণ সূচিরচিত বস্ত্রখানি অঙ্গে পরিয়া পূজায় রত হইলেন। তাহার পর কিরূপে হোমশিখার তাপে হাইড্রার বিষ জ্বলিয়া উঠিল। কি ভীষণ জ্বালা—অপরিসীম যন্ত্রণা! কিরূপে ক্ষিপ্তপ্রায় বীর লাইকাসকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং ক্রোধে অন্ধ হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে অভাগাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

পুত্র Hyllus বলিলেন—'জীবিত বা মৃত অবস্থায় হউক, শীঘ্রই তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি শুধু পতিঘাতিনী নও তুমি পৃথিবীর মহত্তম বীরের হত্যাকারিণী!'

বাক্যহারা দেয়ানীরার এক সহচারিণী বলিলেন—'হায়, মহারাণি, আপনি কেন চুপ করিয়া রহিয়াছেন? এইরূপ নীরব থাকা যে, জগৎসমক্ষে আপনার কল্পিত অপরাধকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে।'

কিন্তু জগৎ কি বলিবে না বলিবে তাহাতে এখন তাঁহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? তাঁহার অন্তরে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার নিকটে স্তুতি-নিন্দা তুচ্ছ! বিদ্যুৎবেগে রাণী সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

ক্ষণকাল পরে কি ভাবিয়া তিনি নির্জ্জনে কার্য্যব্যস্ত পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্র মুখ তুলিল না—সে মুখে কোমলতার লেশমাত্র ছিল না! রাণী ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া ধীরে ধীরে হারকিউলিসের শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে শয্যার উপরে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন—'বিদায়—বিদায়—আমার বিবাহিত জীবনের আনন্দ-নিকেতন—আমার স্বর্গসুখের পুণ্যভূমি—অভাগিনী চিরবিদায় লইতেছে!' শাণিত ছুরিকা দেয়ানীরার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইল।...

এতক্ষণে পরিচারিকার নিকটে সকল কথা শুনিয়া Hyllus ছুটিয়া মাতার

নিকটে আসিলেন। কিন্তু হায়, তিনি বড় বিলম্বে আসিয়াছেন। বুকে পড়িয়া মাতার রক্তহীন বিবর্ণ মুখ খানি চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া পুত্র বলিতে লাগিলেন—'মা গো, মা আমার! আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছি! আমারই নিষ্ঠুর বাক্য শাণিত ছুরিকা হইয়া তোমার বক্ষের রক্তপান করিয়াছে। এখন আমি পিতৃহীন ও মাতৃহীন—কিন্তু আমার নিজেরই দোষে আমি তোমাকে হারাইলাম!'...

আট জন বীর পুরুষ বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসের দেহ সসম্ভ্রমে বহিয়া আনিয়া সন্তর্পণে শয্যায় স্থাপন করিলেন। উদ্বিগ্ন হৃদয়ের প্রাণপণ যত্ন সত্ত্বেও সামান্য আন্দোলনের জলন্ত যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। যে বীরের বাহুবলের সমক্ষে সহস্র শত্রুর দর্প নিমেষে চূর্ণ হইয়া যাইত, তিনিই আজ শিশুর ন্যায় শয্যায় লুটাইয়া অসহায়ের মত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন! আর্ত্তস্বরে হারকিউলিস বলিলেন—'গ্রীকগণ, তোমাদের জন্য কঠোর শ্রমে আমি জীবনাতিপাত করিয়াছি। এখন আমার জন্য তোমরা একটি কার্য্য কর। বেদনার স্তূপ অপদার্থ এই মাংসপিণ্ডকে অগ্নি বা তরবারির সাহায্যে শেষ করিয়া দাও—সকল যাতনার অবসান হইবে!'

শয্যাতলে নতজানু হইয়া বসিয়া Hyllus পিতার ললাটের যাতনার স্বেদবিন্দু মুছিয়া দিতেছিলেন। একটু শান্ত হইয়া হারকিউলিস তাঁহাকে বলিলেন—

—"দেখ, বৎস, স্বর্গরাজ্ঞীর বিদ্বেষ বা Eurysthes এর রোষ যাহাকে নত করিতে পারে নাই, আজ এক দুর্ব্বলা রমণীর দুরভিসন্ধির ফলে সে কেমন ধূলিলুণ্ঠিত। তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান কিনা এবার তাহার পরীক্ষা হইবে। সেই অভিশপ্তা রমণীকে আনিয়া একবার আমার হস্তে প্রদান কর। আমার দেহমনকে সে এমনি করিয়া অপদার্থ করিয়া দিয়াছে যে, আমি বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছি!' গাত্রের আবরণ উত্তোলন করিয়া বীরবর বলিতে লাগিলেন—'দেখ তাহার হস্তের কীর্ত্তি! আমার সর্ব্বদেহ দগ্ধ, সকল গর্ব্ব, সকল শক্তি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে এই কাজ করিয়াছে সে বুঝিবে যে, এই মুমূর্ষুর বাহুদ্বয়ও কত শক্তি ধরে।'

ধীরে Hyllus বলিলেন—'হায়, আপনার প্রতি অত্যধিক ভালবাসা= ইহাই তাঁহার একমাত্র অপরাধ।' হারকিউলিসের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত দেখিয়া Hyllus বলিতে লাগিলেন—'না—আমার কথা আগে শুনুন—তিনি এখন আপনার ক্রোধের অতীত স্থানে পৌঁছিয়াছেন।'

'তুমি কি বলিতেছ?'

Hy.—"এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার মুখে সর্ব্বনাশের বার্ত্তা শুনিয়া তিনি স্বহস্তে আপনার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। আপনার সে উপহার তিনি নির্ম্মলচিত্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা আপনাকে

চিরপ্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন। ইহা Nessusএর দুরভিসন্ধির—" এই নাম শুনিয়াই হারকিউলিস আর্ত্তকণ্ঠে বিলাপ করিয়া উঠিলেন—

"বহুদিন পূর্ব্বে দৈববাণী হইয়াছিল যে, মৃতের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে—তাহা পূর্ণ হইল। আমি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! ভাবিতেছিলাম যে, অতি দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের অবসানে শান্তির দিন আসিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সমাধিতল ভিন্ন আমার সংগ্রামের অবসান নাই।"

দীর্ঘকাল গম্ভীর দৃষ্টি পুত্রের মুখে স্থাপন করিয়া হারকিউলিস বলিলেন—'বৎস, আমার হাতে তোমার হাত রাখ।" Hyllus পিতার হস্ত গ্রহণ করিলেন।—"এখন শপথ কর আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে।"

ক্ষণেক দ্বিধা করিয়া Hyllus বলিলেন—"শপথ করিলাম।"

"Oeta পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশ তোমার পরিচিত?"

Hy.—"বহুবার সে স্থানে পূজার নৈবেদ্য অর্পণ করিতে গিয়াছি।"

হার—"সেই স্থানে এই দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তৎপরে সজ্জিত-চিতামধ্যে আমার দেহ স্থাপন করিয়া তোমাকে স্বহস্তে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হইবে। এ ভীষণ ঘৃণিত ক্ষত হইতে উদ্ধারলাভের আর উপায় নাই।"

এই গুরুতর আদেশে Hyllus স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিরূপে ইহা পালন করিবেন? ইহা যে পিতৃ হত্যার ন্যায়! অবশেষে পিতার একান্ত অনুরোধে তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু আপন হস্তে চিতায় অগ্নি-প্রদান-রূপ কঠোর কার্য্য হইতে মুক্তি চাহিয়া লইলেন।

হারকিউলিস বলিলেন—"আর একটি কর্ত্তব্যভার তোমার উপরে অর্পণ করিতেছি। রাজকুমারী Iole কে তুমি জান?"

Hyllus চমকিত হইলেন।

—"তবে শোন,—আমার পুত্রবধূ করিবার জন্য তাঁহাকে আমি আনিতেছিলাম। তাহাতেই সকল অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু সেই জন্য তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইও না। মনে রাখিও যে, তোমার মুমূর্ষু পিতার অন্তরের একান্ত কামনা যে, তোমরা দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। আমার কথা কি শুনিতেছ?"

Hyllus বলিলেন—"পিতা, যে আমার পিতা ও মাতার মৃত্যুর কারণ তাহাকে আমি পত্নীত্বে বরণ করিব কিরূপে?"

"আমার আদেশকে তুমি সম্মান করিবে না?"

মুমূর্ষুকে আর উত্তেজিত করিতে ভীত হইয়া Hyllus অনিচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন।

বীরবর ফাইলকৃটিটাস্ হারকিউলিসের চিতায় অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

কিণ্ডারগার্টেন কি?

কিণ্ডারগার্টেন একটী জর্ম্মণভাষার কথা। উহা। বিস্তারিত অর্থ—ক্রীড়া ও সামান্য বস্তু দ্বারা শিশুকে কাজ ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। জর্ম্মণীদেশে ঐ শিক্ষার প্রথা পণ্ডিত ফ্রোবেল্ প্রথম প্রচার করেন, সেজন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই ঐ প্রকার শিক্ষার স্কুলগুলি ঐ নামে প্রচলিত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এতদিন পর্য্যন্ত একটীও কিণ্ডারগার্টেন ছিল না, তাহার কারণ এই যে ভারতীয় পিতা-মাতাগণ এখনও ঐ মহৎ শিক্ষার উপকার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন। সেজন্য তাঁহা-দিগকে ঐ শিক্ষার ধারা ও উহার কতক সুফল যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মায়ের সরল ও সুমিষ্ট গান ও গার্হস্থ্য খেলার মধ্যে শিশুর তিন বৎসর কাটিয়া যায়। পরে চারি বৎসরে পা দিবার সময় হইতে তাহাকে কিণ্ডারগার্টেনে পাঠান কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত ভাবে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা দেওয়া হয়।

১

শিক্ষয়িত্রী হাতে দুইটী জিনিষ ধরিয়া আছেন, ঐ দুইটী দেখিতে এক প্রকার হইলেও পরস্পর হইতে বিভিন্ন।

একটী গোলা রবারের ও নরম, আর একটী কাঠের ও শক্ত। শিশুগণ পূর্ব্বে উহার সম্বন্ধে কিছু শিখিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহারা আর এক নূতন ভাবে উহা দেখে, উহা দ্বারা গোলাকার বস্তু ও সহজে তাহার গড়ান গতি তাহাদের মনে বসিয়া যায়। উহাদের বিভিন্নতাও তাহারা শিখে,—একটা নরম ও হাল্‌কা বিনাশব্দে মেজের উপর গড়ায়, অন্যটা কঠিন ও ভারী, লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। শিক্ষয়িত্রী একে একে সকল শিশুকে কাছে ডাকিয়া গোলা দেখান, পরে তাহাদিগকে চোক বুজাইতে বলেন ও প্রত্যেকের হাতে ক্রমে ক্রমে দুইটী গোলা দিয়া উহার কোনটী কিরূপ জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা চোকে না দেখিয়া স্পর্শের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গোলা নির্ণয় করে। পরে একটির পর অন্যটী তিনি মাটিতে ফেলিয়া দেন, শব্দের দ্বারা শিশুরা উহার কোন্‌টা কিরূপ স্থির করে। এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের চালনার জন্য আরও অনেক প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। আর শিশুগণ সকলে অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উহাতে যোগ দেয়।

ঐরূপে আকার শিক্ষার পর তাহাদের নিজে কাজ করিবার সময় আসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলি তাহাদের বাড়ী বা পোল ইত্যাদি নির্ম্মাণের বাক্স দ্বারা ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা কাঠের দ্বারা ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে তাহাদিগকে অতি সরল প্রথা মতে শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশালাইয়ের মত কাঠের ছোট ছোট

টুক্‌রা দ্বারা তাহারা নানা রকমের ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করে। উহাদ্বারা শিশুগণ সোজা ও বাঁকা রেখা প্রভৃতি জ্যামিতির রেখা সকল টানিতে শিখে। তাহারা নিজেরা যাহা প্রস্তুত করে, নিজ নিজ কল্পনানুসারে তাহার নাম দেয়, সেই কারণে উহতে তাহাদের কোন ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা আত্ম-সাহায্যে যাহা কল্পনা ও নির্ম্মাণ করে, তাহা কখন ভুলিয়া যায় না। এই সকল কাষ্ঠাদিদ্বারা বাড়ী ঘর নির্ম্মাণের শিক্ষা-প্রথাকে "অঙ্কশাস্ত্রধারা" বলে। তাহা ব্যতীত জীবনধারা ও সৌন্দর্য্যধারা নামে আর দুইটী ধারা আছে, তাহা শিশু অঙ্ক-ধারার পূর্ব্বে শিক্ষা পায়। প্রথমটীর দ্বারা শিশু যত শিল্প ও স্বাভাবিক দ্রব্য হইতে নির্ম্মাণ করিতে শিখে, আর শেষেরটীর দ্বারা শিশু সকল দ্রব্য অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইতে ও গড়িতে শিখে।

২

সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছেলেরা অতি সরল নির্ম্মাণ-দ্রব্য লইয়া আরম্ভ করে। একটী বাক্সতে একটা বড় কিউব আটখানা ছোট ছোট কিউবে বিভক্ত। শিশু তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শিক্ষয়িত্রীর আদেশ মত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পৃথক করিয়া রাখে ও সাজায়। উহাদ্বারা তাহাদের সংখ্যা-জ্ঞান হয় ও ছোট বড় দ্রব্যের তুলনা দ্বারা পরিমাণ শক্তি জন্মে।

অত্যল্পবয়স্ক শিশুগণ বালির ঘর প্রস্তুত, মাটি, খোঁড়া প্রভৃতি তাহাদের আনন্দ-দায়ক সরল কাজে ও ক্রীড়ায় শিক্ষিত হয়।

কাচের মালা-গাঁথা, কাগজের বাক্স প্রস্তুত করা, তুলা বাচা, পুতুল গঠন করা, পুতুলের বিছানা প্রস্তুত করা প্রভৃতি নানাপ্রকার ছোট ছোট কাজে তাহারা খেলার সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। সংক্ষেপে, ইহা দ্বারা তাহাদের স্বাভাবিক ও স্বাধীন কল্পনা এবং বৃত্তি সমুদায়ের পুষ্টির জন্য প্রচুর সুবিধা দেওয়া হয়। উহা দ্বারা শিক্ষয়িত্রী বালক বালিকাদিগের মনের ভাব বিশেষরূপে বুঝিয়া তাহাদিগকে তাহাদের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করেন।

তার পর একটী ছোট নাটকের অভিনয় দ্বারা খেলা করা হয়। কয়েক জন শিশু উহা অভিনয় (act) করে, আর অবশিষ্টেরা গান গায়। দুইজন চতুর বালক রাজা ও ঘোড়া সাজে, দুই জন বালিকা সরাই কর্ত্রী ও তাহার পরি-চারিকা হইয়া একটা কোণে যেন সরাইয়ে বসিয়া থাকে। দুইজন কামার ও তাহার সঙ্গী হয়ে আর এক কোণে বসে। দ্বারবান গোলাকার বেড়ার মধ্যে থাকে, দুইজন লম্বা ছেলে দরজা হয়ে দাঁড়ায়, আর দুইজন আস্তাবলে কাজ করে। রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া আস্তে আস্তে বেড়াইতে যায়। আর সকল ছেলে ঐ বিষয়ে একটি সরল গান গাহিয়া উঠে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে রাজা ও ঘোড়া উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে, রাজা সরাইয়ের দিকে

ঘোড়া ফিরায়, এবং সরাইকর্ত্রী ও তাহার পরিচারিকা দুইজনে রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে জল ও খাবার দেয়। ছেলেরা আবার গান গাহিয়া উঠে।

"হো হো রাজা-মশায় তোমার ঘোড়া বড় ধীর,
অতি আস্তে চলিলে পর হয়ে যাবে ক্লান্ত।
এখন তুমি সরাইয়ে নেমে খাও দুধ ক্ষীর,
দাও তোমার ঘোড়াকেও ঘাস খড়, পান্থ।
তার পর রাজা মশায়, আবার তুমি যেও।

যাইতে যাইতে ঘোড়া থামিলে পর ছেলেরা আবার গাহিয়া উঠে।

"হো হো রাজা তোমার ঘোড়া যেতে চায়না,
ওর ক্ষুরের নাল ভেঙ্গেছে, কামারের দোকান কাছে,
তিনটে পেরেকে ঠিক হবে—আগে আর পাছে।
কামার এসে তাড়াতাড়ি নাল বাঁধিয়ে দেয়;
হো হো রাজা তুমি আবার যেতে পার।

রাজা আবার ঘোড়ায় উঠিয়া কিছুক্ষণ পরে বাড়ীতে পৌছাইলে ছেলেরা আবার গায়—

"হো হো রাজা মশায় ঘোড়া থেকে নাম,
সইস তোমার ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে যাক্।
এখন তোমার বিকাল বেলার বেড়ান হল শেষ,
ছেলেদের জন্যে তুমি কি কিছু এনেছ?
হাঁ। হাঁ। ভাল ভাল কত জিনিষ আছে।
ছেলেরা তোমার পাশে আনন্দেতে নাচে।

এরূপ গানের মধ্যে রাজা ঘোড়া থেকে নামেন ও সইসকে ঘোড়া দিয়ে শিশুদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদিগকে সকল জিনিষ ভাগ করিয়া দেন। এই ও খেলার শেষ, কিন্তু অন্যান্য সকল শিশুরা যাহাতে ঐ খেলায় যোগ দিতে পারে, সেজন্য ঐ ক্রীড়া তিন চারিবার খেলা হয়।

তার পর কতকগুলি শিশু গোলাকার হইয়া একটী বন প্রস্তুত করে। আর কতকগুলি শিশু পাখী হইয়া এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়ায়। ছেলেরা ছুটিতে ছুটিতে হাত নাড়িয়া পাখীর ডানার অনুকরণ করে। তাহারা যখন উড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সকলে হাত ধরাধরি করিয়া হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া পাখীর বাসার নকল করে। আর পরস্পরের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইবার নকল করে। ঐ সময়ে অন্যান্য ছেলেরা আস্তে আস্তে ঘুমানর গান গায়। ক্রমে যেন রাত পোহাইল পাখীরা ঘুম থেকে উঠিয়া আনন্দে আবার চারি দিকে উড়িতে থাকে। সকল খেলাই শিশুদের ব্যায়ামের জন্য বার বার খেলা হয়।

তাহা ব্যতীত, ঐ সকল আনন্দদায়ক ক্রীড়াতে শিশুরা অপরিসীম উল্লাস আনন্দ এবং স্বাধীনতা ভোগ করিলেও তারা স্কুলের নিয়মের মতে চলিতে বাধ্য হয়। খেলা-ভঙ্গ বা বিশ্রাম যখন তখন করিবার সাধ্য নাই। গোল হইয়া দাঁড়ান প্রভৃতি কাজে বালক-বালিকারা শরীরকে অতি সোজা ও স্থির রাখিতে বাধ্য হয়।

সামান্য ব্যায়াম বা গানও স্কুলের নিয়মের মতে সাধিত হইয়া থাকে। কেহ নিজের ইচ্ছামত খেলায় যোগ বা ভঙ্গ দিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়ার অংশ নির্দ্দিষ্ট শিশুদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, আর অন্যেরা, যতক্ষণ না তাহাদের পালা আসে, ততক্ষণ ধীর ভাবে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা কার্য্যক্ষমতার সঙ্গে নিয়ম, নিয়ম, নম্রতা, বশ্যতা ও বিনয় প্রভৃতি গুণে অভ্যস্ত হয়। আর উহা দ্বারাই অন্যান্য গুণের পুষ্টি সাধন ও দোষের নিরাকরণও হইয়া থাকে। সকলের অপেক্ষা বড় ছেলেরা অতি ছোট শিশুদিগকে কাজের সাহায্য করে এবং শিক্ষয়িত্রীকেও সকল দ্রব্য বাক্সে গুছাইয়া রাখিতে সহায়তা করে। ক্ষমতার দ্বারা স্বার্থ লাভ করিবার ইচ্ছা কখনও প্রশ্রয় পায় না, কেননা, কিণ্ডারগার্টেনে ছোট বড় সব সমান। কোন ছেলে দুর্ব্বল বা ভীত হইলে তার অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ সঙ্গীরা তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপে মন ও আত্মায় অনেক মহৎ বাসনার উদয় হয়। এই আনন্দময় স্কুলে ছেলেদিগকে কখনও শাস্তি দিবার রীতি নাই। কিন্তু কেহ কোন বিষয়ে দুষ্ট বা একগুঁয়ে হইলে তাহাকে ক্রীড়া হইতে বঞ্চিত রাখাই তাহার একমাত্র শাস্তি।

কিণ্ডারগার্টেনের ভিন্ন ভিন্ন খেলা ও উহার উদ্দেশ্য আমি পাঠিকাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু নিজ চক্ষে না দেখিলে উহার মহৎ শিক্ষার ফল বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। খেলার ন্যায় গল্প সকলও ভিন্ন ভিন্ন। উহাদ্বারা সাধারণতঃ স্বাভাবিক বিষয়ের, ভিন্ন ভিন্ন কালের, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ও নীতি জ্ঞান সম্বন্ধীয় ছোট ছোট কাজ ও জ্ঞানের কথা শিশুকে বলা ও শিখান হয়। তাহা ব্যতীত পশু পাখীর গল্প, ঈশ্বরের কথা; ধর্ম্ম শাস্ত্রের গল্প সকলও তাহাদের উপযোগী করিয়া অতি সরল ভাষায় বলা হয়। প্রকৃতি ও জীবন হইতে ঐ সকল গল্প লওয়া হয় বলিয়া উহার কখন শেষ নাই।

ক্যানেডা প্রবাসীর পত্র।

O. A. C.
Gulph Out.
Canada.
1st March, 1909.

শ্রীচরণেষু মা!

গত শনিবার Union Literary Societyতে আমাদের যে debate হয়েছিল, তাহার ছাপান প্রগ্রেম্ এই চিঠির

সহিত পাঠাইলাম। তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে আমাকে সে রাত্রে বাংলা গান করিতে হইয়াছিল। আমার কতকগুলি বন্ধু আমাকে গান গাহিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করাতে আমার নাম প্রগ্রামে ছাপান হয়। আমি কিন্তু ইতি মধ্যে যে দুটি গান সে রাত্রে গাহিব তাহার সুর মিস্ কুপারকে দিয়া পিয়ানোর সাহায্যে এক রকম ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে সভাতে আমি প্রথমে বাংলা গান দুটি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া বুঝাইব। তারপর তিনি আমার গানের সহিত পিয়ানো বাজাইবেন। এই রকম করিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া শনিবার রাত্রে ৮টার কিছু পূর্ব্বে Massey Hall এ যাওয়া হইল। আমার পৌছিবার পূর্ব্বে সে হল্ ছাত্র, ছাত্রী ও অধ্যাপকে পূর্ণ হইয়াছিল। আমি এরূপ জনতা দেখিয়া প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। আমি যখন আমার পরিচিত বন্ধুদিগের পাস কাটিয়া সিট্ লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলাম, আমার কোন কোন বন্ধু বলিতেছিলেন—"Cheer up Sinha!" তাহার পর আমি ও মিস কুপার দুজনে এক স্থানে বসিলাম। ইহার পূর্ব্বেও অনেক বার debate হইয়াছিল, প্রগ্রাম্‌ও ছাপান হইয়াছিল, কিন্তু সে রাত্রের মত জনতা আর কখন হয় নাই।

অত জনতা হওয়ার কারণ এই যে ঐ প্রগ্রাম্ সমস্ত কলেজে বিতরণ করা হইয়াছিল। আর ইহারা কখনও বাংলা সঙ্গীত শুনে নাই, এইজন্য ঔৎসুক্যবশতঃ বেশী লোক আসিয়াছিলেন। প্রথমে মিস্ হার্টলির vocal solo হইল, সে অতি চমৎকার, চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহার গান শেষ হইলে তিনি যখন platform হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন, একটী গ্রাজুয়েট লেডী তাঁহার হস্তে ফুলের তোড়া দিলেন। এই প্রকারে প্রত্যেক গায়িকাকে ফুলের তোড়া দেওয়া হইল। তাহার খানিক পরে আমার পালা এল। সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন:—"Hindu National Anthem by mr. Sinha" অমনি চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। আমি ও মিস্ কুপার দু'জনে বরাবর সোজা platformর উপরে গিয়া দাঁড়াইলাম, মিস্ কুপার পিয়ানোর নিকটস্থ চেয়ারে বসিলেন।

আমি প্রথমে দাঁড়াইয়া গানটীকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিলাম, তাহার পর মিস্ কুপারকে পিয়ানোতে সুর দিতে ইসারা করিলাম। আমি "বন্দে মাতরম্" গানটী করি কিন্তু এটা আমি "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের" সুরে গাই নাই। এ গানটা গাহিয়া আমরা দু'জনে বসিবার জন্য ফিরিয়া আসিতেছি, আবার সেই গ্রাজুয়েট লেডীটী মিস কুপারের হাতে ফুলের তোড়া দিলেন। আমার গান শেষ হইবার পর হইতে ক্রমাগত আনন্দধ্বনি ও 'এঙ্কোর'

শব্দ চারিদিক হইতে হইতেছিল। তথন আমি বুঝিলাম যে আমাকে আবার আর একটি গান গাহিতে হইবে। আমি কিন্তু পুনরায় উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। তথন পার্শ্বস্থ বন্ধুগণ আমাকে বলিলেন "মিঃ সিংহ, শীঘ্র শীঘ্র যাও।" আবার আমরা দু'জনে platformএর উপরে যাইলাম এবং আমি বলিলাম :— "The next one has quicker movement." তার পর মিস্ কুপারকে পিয়ানোতে সুর দিতে ইঙ্গিত করিলাম। আমি এবার "তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে" এই গানটা গাহিলাম। সভাপতি ও তাঁহার পত্নী, সকলে আমার দিকে তাকাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন। গান শেষ হইলে আবার ঘন ঘন করতালি হইতে লাগিল। আবার সেই গ্রাজুয়েট্ লেডীটি মিস্ কুপারকে ফুলের তোড়া দিলেন। আমরা নিজেদের আসনে গিয়া বসিলাম। Debateএর পর শেষে সকলে দাঁড়াইয়া "God save the king গাইয়া সভার কার্য্য শেষ করা হইল।

উপরের ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কিরূপ প্রথা। আপনারা ত জানেন আমি ভাল গাহিতে পারি না, তার উপর আজ দুই বৎসর দেশ ছাড়িয়া বাংলা গানের একেবারেই চর্চ্চা নাই, এদেশে আসিয়া ইহাদের সঙ্গে ইংরাজি গান করিয়া থাকি। তবে ইহাদের কথা রাখিবার জন্য সেদিন বাংলা গান করিয়াছিলাম। ইহাও একটা শিক্ষা। আমাদের দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সঙ্গীত-বিদ্যা শিখান বা তাহাতে উপাধি দেওয়া হয় না। এদেশের মেয়েরা উহা খুব যত্নের সহিত শিখিয়া থাকে। Toronto নগর Conservatory of musicএর জন্য বিখ্যাত। এদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক Literary society আছে। ইহাতে বালক বালিকা প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ বা debate করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েদের ঐরূপ শিক্ষা অল্প বয়স হইতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহারা বক্তা, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কাজ সুন্দররূপে করিতে পারে। অধিক বয়সে অর্থাৎ কলেজ-ক্লাসে উঠিয়া ঐ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে nervousness ও bashfulnessকে পরাজয় করা তাহাদের পক্ষে একটু কঠিন হয়। এদেশের কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়—Co-educational অর্থাৎ ছেলে মেয়েরা একত্র পড়ে ও সমস্ত কাজে ও পাঠে তাহাদের সমান অধিকার।

আমাদের দেশে ত অনেক সভা-সমিতি হয় কিন্তু অনেক সভা সমিতিতে মেয়েদের বাদ দেওয়া হয়। কলিকাতা University Instituteএ অনেক debate হয়: সেখানে debateএর প্রগ্রাম্ কি ঐরূপ ছাপান হয়? সেখানে কি মেয়েদের গান গাহিতে দেওয়া হয়?

এদেশের মেয়েরা দেখুন Congressএ

বসিয়া কত বিষয়ের আলোচনা করিতেছে। পার্লেমেণ্টের সভ্য হইবার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিতেছে। In this country they have the right to express their sentiments in public. Widows and unmarried girls, rated on the assessment roll, can vote in Ontario, in Manitoba and British Columbia. In this country the woman of Political aspiration does not limit her ambition to a vote. She sits in Parliament and takes part in a Parliamentary debate. আরও কত এদেশের মেয়েদের প্রশংসার কথা লিখিব ?

তাই সত্য সত্যই স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণ আমেরিকাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিয়া ভারতের রমণীদের জন্য কাঁদিয়াছিল। আমার বোধ হয়, যদি তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে আমাদের দেশে—"Give freedom to those invisible ladies"—ইহা সম্ভব করিতে পারিতেন। অ মরা চিন আমাদের মেয়েদের অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া উন্মুক্ত বায়ু সেবনে বঞ্চিত করিয়াছি, তাই কোন কোন হিন্দু রমণী দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন :—"আর আমরা কেবলমাত্র দিবারাত্র সংসার লইয়া ব্যস্ত, কেবল আহার করি ও নিদ্রা যাই, বাহিক জগতের কোন ঘটনাতে লিপ্ত থাকি না। আমাদের মৃত্যুই ভাল।"

এবার এই পর্য্যন্ত। ইতি—

রাণী ভবানী

আমাদিগের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অনেক পুণ্যবতী রমণীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় নাম ইতিহাসের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, সুবর্ণ অক্ষরে জ্বলিতেছে। সেই সকল পুণ্যশ্লোক-রমণীর পবিত্র নাম আজও ভারতের গৃহে গৃহে উচ্চারিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহারা স্ব স্ব সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়া দেশের হিত-সাধন-পূর্ব্বক স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহস, সহিষ্ণুতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা, দানশীলতা এবং ত্যাগস্বীকার তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহাদিগের সেই কার্য্যকলাপ স্মরণ করিলে হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়। তাঁহারা ধন্য ও বরেণ্য।

মীরা বাই, অহল্যা বাই, ধর্ম্মদেবী,

তারা বাই, দুর্গাবতী ও কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ রমণীগণ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। রাণী ভবানীও অন্যতম ভারতকন্যা ইনি স্বীয় গুণাবলিতে ভূষিত হইয়া মাতৃভূমির সুখ্যাতি ও গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় অনেক রমণী ছিলেন ও আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উচ্চাঙ্গের রমণী কয়জন? তাঁহার সাহস, বিক্রম, তেজস্বিতা, দয়া প্রভৃতি মহৎ গুণ সকল নারীকুলের ভূষণ ও গৌরব। সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র ভারত তাঁহার গুণে গৌরবান্বিত।

আমাদিগের এই প্রবন্ধের নায়িকা রাণী ভবানী এক অসামান্য-গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্বর্ত্তী ছাতিন নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী, মাতার নাম জয়দুর্গা। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত আদর ও যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অসাধারণ সৌন্দর্য্য বিকাশ ও সুখকর পরিমল বিতরণপূর্ব্বক মানবের মনপ্রাণ হরণ করে, তাহার মুকুলও সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে, বাল্যজীবনে মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া পতিত হয়। বহুগুণসমন্বিতা রাণী ভবানীর গুণরাশির অনেক লক্ষণ তাঁহার বাল্যজীবনের স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃভবনে কীর্ত্তিবাস নামে একজন পুরাতন কর্ম্মচারী ছিলেন। কোন উপরিতন কর্ম্মচারীর দ্বারা তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তিবাসের অনেক গুলি পোষ্য ছিল। কর্ম্মটী যাওয়ায় তিনি অকূল পাথারে ভাসিলেন, চিন্তার কূল কিনারা পাইলেন না। কি করিয়া পোষ্যবর্গে মুখে অন্ন দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিবেন এই ভাবনায় তাঁহার আহার নিদ্রার প্রবৃত্তি দূর হইল। কীর্ত্তিবাস জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি সংসার প্রতিপালনের উপায়ন্তর না দেখিয়া জগদীশ্বরের ধ্যানপূর্ব্বক অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। কোমল হৃদয়া বালিকা ভবানী তাহার ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া যাহার পর নাই ব্যথিতা হইলেন। রাণী ভবানী তখন অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা মাত্র। কীর্ত্তিবাসের অশ্রু তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট দৌড়িয়া গেলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্ গদ্ বচনে কহিলেন, 'পিতঃ! একি অবিচার! যে ব্যক্তি আপনার সংসারে জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনার কল্যাণ সাধন করিয়াছে, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে, তাহাকে কি জন্য তাড়াইলেন? তাহার উপায় কি হইবে? তাহার সন্তান সন্ততি কোথায় যাইবে? তাহারা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে?' পিতা বালিকা কন্যার এবম্প্রকার জ্ঞানগর্ভ ও স্নেহপূর্ণ অনুরোধে মুগ্ধ হইলেন এবং বৃদ্ধ কীর্ত্তিবাসের জন্য একটী বৃত্তি স্থাপনের

ব্যবস্থা করিয়া সুখী হইলেন। কীর্ত্তি-বাস ও আমরণ সেই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন।

নাটরাধিপ রাম জীবন রায়ের পুত্র রাম কান্ত রায়ের সহিত ভবানী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্বশুর ভবনে আগমন করিলে, আত্মীয়, কুটুম্ব এবং পাড়া প্রতিবেশী সকলে তাঁহার গুণে বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, সমবয়স্কদিগের প্রতি সহৃদয়তা এবং অধীন দাসদাসীদিগের প্রতি স্নেহ-মমতা সকলের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। দিন দিন তাঁহার গুণের সুখ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সকলে তাঁহাকে রাজকুলের কুললক্ষ্মী বলিয়া আদর, যত্ন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা, গাম্ভীর্য্য ও কার্য্যদক্ষতা পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল।

মহারাজ রামজীবন রায়ের মৃত্যুর পর, রামকান্ত রায় কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব যুবকের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশই উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ঘোরতর বিলাসী হইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী দয়ারাম ব্যতিরেকে তিনি আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। তদীয় পরলোকগত পিতা ৺রাম জীবন রায়ের প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান দয়ারাম রায় ও তাঁহার বিষ নয়নে পতিত হইলেন। সঙ্গিদিগের কুপরামর্শে তিনি রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী দয়ারামকে পদচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করিলেন। তাঁহার পথের কণ্টক অপসারিত হইল। রাণী ভবানী এই সংবাদে অতিশয় দুঃখিত, স্তম্ভিত ও ভাবিত হইলেন। তিনি স্বামীকে কুপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত এবং দয়ারামকে তদীয় পূর্ব্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না! বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। কিছুদিন পরে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অনাদায় রাজস্বের জন্য রামকান্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় পিতৃব্য-পুত্র দেবীপ্রসাদ রায়কে তাহাতে অধিষ্ঠিত করিলে রামকান্ত বিশেষ বিপন্ন হইলেন। রামকান্ত সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাণী ভবানীর সহিত জগৎ শেঠের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি নিঃসহায় হইয়া চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ রামকান্তের পক্ষাবলম্বন করিয়া নবাব সরকার হইতে রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না! ইহাতে রামকান্ত আরও নৈরাশ্যের ঘোরতর অন্ধকারে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার মন আরও সংশয়, ভয়, ও হতাশের দোলায় দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তিনি কর্ণধার-

বিহীন তরণীর ন্যায় সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার খাইয়া সুখ ছিল না, বসিয়া সুখ ছিল না, কিসে স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, এই চিন্তায় অহরহঃ মগ্ন থাকিতেন। কিন্তু ভগবান যাঁহার সহায় হন, তাঁহার কিসের ভাবনা? তাঁহার জন্য সমুদ্রের তরঙ্গ থামিয়া যায়, মরুর মধ্যে স্বচ্ছ সলিল প্রবাহিত হয় এবং অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্দ্দিনে অন্ধকারের মধ্যে বিজলী চমকিল, তাঁহার গৃহদেবতা রাণী ভবানীর বুদ্ধি খেলিল, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় হইল। তিনি পুরাতন কর্ম্মচারী দয়ারামকে ভুলিয়া যান নাই। দয়ারামের ক্ষমতা ও গুণ তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত ছিল না, তিনি স্বামীকে সম্মত করাইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নবাব-সদনে গমন করিবার প্রস্তাব করিলেন। নবাব সরকারে উৎকোচ প্রদান করিবার জন্য দয়ারাম রামকান্তের নিকট লক্ষ মুদ্রা চাহিলেন। রামকান্ত উক্ত টাকার জন্য ভাবিত হইলেন। রাণী ভবানী সেই সময়ে অবাধে, অকাতরে, এবং রাণীর উপযুক্ত সাহসে, নিঃসংশয়চিত্তে স্বীয় গাত্র হইতে সমুদয় অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক উদারতা, মহত্ব এবং পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন! দয়ারামও নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে রামকান্তের জন্য নাটোর রাজ্যোদ্ধার পুনরুদ্ধার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রাণী ভবানীর বুদ্ধি কৌশলে এবং দয়ারামের দক্ষতায় রামকান্ত পুনরায় পৈত্রিক গদিতে উপবিষ্ট হইলেন

রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি-সময়ে অভিষেক উপলক্ষে রাণী ভবানী মনের সাধে, অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান, ধনদান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য দ্বারা আপনাকে কৃতার্থম্মন্যা করিয়া জনসাধারণের পূজনীয়া হইয়াছিলেন।

রাণী ভবানীর দুইটা পুত্র ও একটী কন্যাসন্তান হইয়াছিল। পুত্র দুইটীর শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হইয়াছিল। কিছুদিন পরে রামকান্ত পরলোক গমন করেন। অবশিষ্ট কন্যাটীকে লইয়া তিনি এই সংসার-মরুর মধ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পতিবিয়োগ-কালে রাণী ভবানীর বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ ছিল। ঐ কন্যাটীর নাম তারাসুন্দরী। তারা, রূপে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় পরমাসুন্দরী ছিলেন কিন্তু তিনি বালবিধবা। কথিত আছে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য নাটোরে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। এবম্প্রকার অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য বিলক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দূত কেবল মাত্র পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। দূত লাঞ্ছিত, অপমানিত ও দূরীকৃত হইলে নবাবের সৈন্য নাটোররাজ্য আক্রমণ করিল। রাণী ভবানী তখন বীরাঙ্গনাবেশে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং

নবাবের প্রেরিত সৈন্য-সমূহ ছত্রভঙ্গ করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন।

রাণী ভবানী অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী ছিলেন। তাঁহার সমগ্র রাজ্যের আয় বার্ষিক প্রায় দেড় কোটী মুদ্রা ছিল। বাঙ্গালার নবাবকে প্রায় ৫২ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক রাজকর দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত সৈন্যরক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য ব্যয়ও ছিল। রাণী ভবানীর অধীনে প্রায় ৫০ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য থাকিত। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ঢাকার রাজা রাজবল্লভ, পাটনার রাজা রায় দুর্লভ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন। তাঁহার ধনজনের কিছুই অসদ্ভাব বা অভাব ছিল না। তিনি মনে করিলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন, লোকজনের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে পারিতেন এবং বৃথা আড়ম্বরে জগতকে চমকিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা কখনও করেন নাই বা তাঁহার করিবার প্রবৃত্তিও হয় নাই। তিনি জানিতেন, সত্য সত্যই তাঁহার ধনাগার অর্থে পরিপূর্ণ তাঁহার গৃহলক্ষ্মী অচঞ্চলা, তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি লোকদেখান মিথ্যা ভান অবলম্বন করিয়া লোকের নিকট মিথ্যা সুখ্যাতি ও মিথ্যা প্রশংসার আশা করিতেন না। আরোপিত সৌন্দর্য্য এবং জাঁকজমকে তিনি ঘৃণা করিতেন, বা কখন তাহা ইচ্ছা করিতেন না। তিনি তাঁহার সেই বিপুল ধন সাধারণের হিতসাধনের জন্য ভাবিতেন এবং আপনাকে তাহার রক্ষয়িত্রীমাত্র মনে করিতেন। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে কত ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে কত বাসোপযোগী গৃহ দান করিয়া ও অন্নছত্র দিয়া লোকসাধারণের হিত সাধন করিয়াছেন। তিনি পথে পথে ছায়াতরু রোপণ ও তৎপার্শ্বে কূপ খনন করাইয়া পথিকদিগের ক্লেশ নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি গরীবের জননী ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে মা ভবানী বলিয়া ডাকিত। তিনি একজন আদর্শরমণী ছিলেন। তাঁহার গুণের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাইতে পারে না। ক্ষুধার্ত্তের অন্নদান, পিপাসার্ত্তের বা পিপাসুর জলদান এবং আতুরের ঔষধদান তাঁহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল।

১১৭৬ সালে (১৭৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা দেশে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর কহে। সেই ছিয়াত্তুরেম মন্বন্তরের ভীষণ আলেখ্য লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তাহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত এবং হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। সেই দুর্ভিক্ষে লোক আহারাভাবে গাছের পাতা, মরা জন্তুর মাংস এবং এবং মৃত্তিকা পর্য্যন্ত যাহা সম্মুখে কিছু পাইয়াছে তাহাই ভক্ষণ করিয়াছে। মাতা স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিয়া শিশু সন্তানের মাংস

ভক্ষণ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর রাক্ষসীমূর্ত্তির আবির্ভাব আর কোথায় দেখা যাইতে পারে? স্বামী স্ত্রীর হস্ত হইতে, মাতা পুত্রকন্যার হস্ত হইতে কাড়িয়া খাইয়াছে। ইহা অপেক্ষা জঠরানল, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আর কোথায় জ্বলিয়া থাকে? হায়! ভগবানের লীলা কি বিচিত্র! এই দুর্ভিক্ষের সময় মহামারি সুদীর্ঘ পদ সঞ্চারে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া বঙ্গদেশকে শ্মশানভূমে পরিণত করিয়াছিল। কত সহস্র সহস্র লোক ঔষধ ও পথ্যাভাবে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিল! চারিদিকে হাহাকার! কে কার দেখে তাহার ঠিক নাই! সহস্র সহস্র লোক মরিয়া যাইতে লাগিল। কেবল শৃগাল, কুক্কুর ও গৃধিনীর পার্ব্বণ তাহাদের আনন্দের সীমা ছিল না! এই দুর্দ্দিনে, বঙ্গের এই শোকতাপপূর্ণ অন্ধকারময় রজনীতে সেই প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী স্বীয় ধনাগারদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া কত অনাহারীর, কত পীড়িতের দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন! তাঁহার সেই সৎকার্য্য সকল আজও সেই ভীষণ অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং যতদিন এই বঙ্গদেশ থাকিবে, বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন সেই পুণ্যবতী স্বর্গীয়া দেবীর পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া লোকে সুখী ও ধন্য হইবে।

১২১০ সালের (১৮০৩ খৃঃ) মাঘী পূর্ণিমার দিন উন-আশি বৎসর বয়ঃক্রম কালে পূজনীয়া মহারাণী ভবানী এই কর্ম্মক্ষেত্র সংসার-ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গধামে চলিয়া যান। তাঁহার বিমল যশোরাশি ভারত ব্যাপিয়া আজও তাঁহার সুকীর্ত্তি সকল ঘোষণা করিতেছে। তিনি মরিয়াও আমাদিগের মধ্যে বাঁচিয়া আছেন।

শ্রীভুবন মোহন ঘোষ।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

তাঁহার লিখিত ডায়েরী।

১

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিবাধই গমন—১৮৬৩ কি ৬৪ সালে একদিন অপরাহ্নে বৃষ্টিতে অর্দ্ধ ভিজিতে ভিজিতে মহর্ষি পাকড়াসী মহাশয়ের সহিত নিবাধই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথাকার সমাজের প্রধান অধ্যক্ষ বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় তাঁহার আদেশে তখনি রাত্রিকালীন উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। উপাসনার পূর্ব্বে কালীকৃষ্ণ বাবু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইনি আমাদের সমাজের আচার্য্য, ইনি কি বেদীতে বসিবেন?' পাকড়াসী মহাশয় ও তিনি বসিতে যাইতে ছিলেন, এই কথা শুনিবা

মহর্ষি আমার হাত ধরিয়া বেদীর এক পার্শ্বে বসাইলেন ও তিনি মধ্যে বসিলেন। পাকড়াশী মহাশয় উপাসনা করিলেন, মহর্ষি উপদেশ দিলেন ও তৎপরে আমি একটী লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলাম। উপাসনান্তে মহর্ষি মহা আনন্দে আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া আমাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন 'তোমাদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও জয়যুক্ত হউক।'

এই সময় কলিকাতায় মহর্ষির বিরুদ্ধে ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার দলস্থ ব্রাহ্মদিগের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। মহর্ষি বেদীতে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহাকেও আচার্য্যের কার্য্য করিতে দিতেন না। এই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ। ইহা যে মিথ্যা তাহা বেশ বুঝিলাম।

২

৩। ৯। ৭১

প্রবৃত্তির জালে আপনাকে জড়াইতে না দিলেই আপনাকে জয় করা যায়। ঈশ্বরের জালে তাহাকে জড়াইতে দিলে আপনা হইতেই স্বর্গে গিয়া পড়া যায়।

এখন যেমন আমরা সংসারে বাস করি এবং সংসারের সম্পর্কে সকলের সহিত আমাদের সম্পর্ক, পরলোকে আমরা ঈশ্বরে বাস করিব ও তাঁহার সম্পর্কে সকলের সহিত আমাদের সম্পর্ক দেখিব।

ইহলোকে ৫ জনের গোলমালে পাপ ভুলিয়া থাকা যায়, আত্মগ্লানির অশ্রু বাহিরে গড়াইয়া যায়, পরলোকে একাকী অন্তরের মধ্যে অশ্রুপাত করিতে হইবে।

২

যে কার্য্য পর ঘণ্টার জন্য রাখিয়া দিবে তাহা পর বৎসরেও শেষ হয় কিনা সন্দেহ, অতএব যখনকার কার্য্য তখনই সম্পন্ন করিবে।

তোমার হৃদয়মিত্র যদি তোমার হৃদয়-বিদারক শত্রু হয় তাহা হইলে কি করিবে? ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর।

যেখানে যে কার্য্য ভাল করিতে পার সে কার্য্যের জন্য সেই থানে যাও। ব্রাহ্মেরা সাম্প্রদায়িক নহেন।

৩

২৭। ১। ৭২

অহংভাব ত্যাগ না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন আরম্ভ হয় না। জগতের রাজা হৃদয়ের দেবতা, তুমি সকলই। জগতের সূর্য্য চন্দ্রের অহংভাব নাই, তাহারা কেমন তোমার চরণের অনুগত দাস। আমি কি জগতের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না, কেবল তোমার সেবায় শরীর মন সকলই সমর্পণ করিতে পারি না? স্বার্থই অনর্থ,—সকল অপবিত্রতা ও দুঃখের মূল। তোমার সেবক কেমন নিশ্চিন্ত। সুখ কোথায়? তোমার কাছেই নিশ্চিত সুখ, তুমি যে সকল ভার বহিতে অঙ্গীকার করিলে কেন সুখের লোভে অহঙ্কারী হইয়া আপনার দুর্ব্বল মস্তকে সংসারের বোঝা ধরিয়া রাখি? তোমার এই শরীর এই মন, এই ধন, এই পরিজন, লও নাথ,

সকলই তোমারে দিলাম। তোমার রূপ মাধুরী, নয়ন ভরিয়া হেরিব।

৪

২৭। ১২। ৭২

মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার উপদেশ।—ধর্ম্ম রাজ্যের ৩ ভাগ, আম দরবার, খাস দরবার ও আরাম ঘর, অথবা শরীর মন ও আত্মা দ্বারা উপাসনা। সাধারণ বা আম দরবারে নানা সম্প্রদায়, নানা উপাসনা প্রণালী ও নানা প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানেই ধর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা মাত্র। তাহা হইতে ঈশ্বরের কৃপায় খাস দরবারে যাওয়া যায়, সেখানে মন তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি বিষয়ের অনুসরণ করিয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল হয় ও প্রার্থনা করে। কিন্তু আরাম ঘররূপ শান্তি নিকেতনে আত্মার সঙ্গে তাঁহার যোগ —স্তব্ধ হইয়া সৌন্দর্য্য দেখা, শান্তি ভোগ করা—তাহা লোকের নিকট কিছুতেই বর্ণনা করা যায় না। তাহা বলিবার জন্য বাক্য নাই এবং তাহা শুনিবারও ক্ষমতা অতি অল্প লোকের আছে। যে নিজে দেখে সেই বুঝে। নীচের লোকে যখন সূর্য্যের অস্ত গমন দেখে তখন উচ্চ ভূমির কোন ব্যক্তি সূর্য্যকে প্রকাশিত দেখিয়া যাই তাহা বর্ণনা করে অন্যে তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে।

একটী প্রাচীরের উপর উঠিয়া যে ব্যক্তি পরপার দেখে সে হাসিয়া পড়িয়া যায়, কেন যায় তাহার বৃত্তান্ত বলিতে থামিতে পারে না। জীবনের পরীক্ষা দ্বারা সত্য গুলি কেবল ইঙ্গিত ভিন্ন বুঝা যায় না। ঈশ্বর সারবান, আত্মাকে তাঁহা দ্বারা সারবান্ করিতে হইবে।

ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না, কিন্তু যেমন ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে বুদ্ধি খুলিয়া যায়, সেইরূপ চেষ্টা ও সাধন করিতে করিতে বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া যায়। প্রেম ও অনুরাগ হইলে আর মার নাই। যিনি যেমন উপযুক্ত, তিনি সেইরূপ তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছেন। যদি এক মাত্রা অধিক হয় অসহ্য হইয়া পড়ে, শিশুর যত বয়োবৃদ্ধি হয়, মাতার স্তনদুগ্ধ ততই ঘন হয়। অগ্রে ঘন দুগ্ধে পীড়া হয়। গর্ভস্থ শিশুকে যত্নে রক্ষা করিতে হয়।

মাতার নাড়ীর সঙ্গে শিশুর নাড়ীর বন্ধন থাকাতে তাহার পোষণ হয়। শিশু সক্ষম হইলেই নাড়ীচ্ছেদন হইবে। সংসারের বন্ধন সকল ও আত্মার পক্ষে সেইরূপ।

বৃন্দা।

বৃন্দা—ইনি মহা পুণ্যবতী, মহা জ্ঞানশীলা ও মহা দানশীলা ছিলেন এবং স্বীয় তপস্যা বলে স্বয়ং ভগবানকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

কেদার রাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে কমলাংশজাতা এক কন্যা উৎপন্ন হন। উদ্ভব কালে উঁহার পরিধান বহ্নি বিশুদ্ধ বসনও সর্ব্বাঙ্গ রত্ন ভূষণে ভূষিত ছিল। এই কামিনীশ্রেষ্ঠা কমললোচনা কন্যা উদ্ভূতা হইয়া কেদার রাজকে কহিলেন "মহারাজ আমি আপনার কন্যা, তপস্যা করিবার জন্য আমাকে একটী অতি পবিত্র স্থান দিতে হইবে।" রাজা কন্যার বাক্য শ্রবণে কন্যাকে পূজা করিয়া পত্নীর হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, এবং স্বীয় নগর সমীপবর্ত্তী এক আশ্রম তাহার তপস্যার্থ প্রস্তুত করিয়াদিলেন। তিনি কন্যাকে বৃন্দা নামে অভিহিতা করিলেন। বৃন্দা ঐ বনে তপস্যার্থ গমন করিতেন। তাঁহার নামানুসারেই উক্ত বন বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হয়। বৃন্দা বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপোনিরত হইয়া বরেণ্য ব্রহ্মার নিকট বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন। পরে ব্রহ্মা বলিলেন বৃন্দে! তুমি কিছুকাল পরে কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর একদা সেই পরম সতী বৃন্দা বসন্ত সময়ে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া যমুনা নদীর তীরে হাস্যবদনে পুষ্প শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেই সাধ্বীকে পরীক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মকে মনোহর বেশে তথায় প্রেরণ করিলেন। তখন সেই কন্যা বিজন স্থানে এক ভুবনমোহন যুবা পুরুষকে দর্শন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনাম্বুলিপ্ত ও রত্নাভরণে ভূষিত ছিল। সেই কণকপ্রভা সমন্বিত যুবকের কমনীয় মূর্ত্তি কামিনীগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাঁহাকে দেখিলে ষোড়শ বর্ষীয় কুমার বলিয়া বিবেচনা হয়। কোটি কন্দর্পের ন্যায় তাঁহার লাবণ্য, পরিধান পীত পট্ট বসন এবং মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় এবং লোচনদ্বয় ফুটন্ত শরৎ পঙ্কজের ন্যায় মনোহর। বৃন্দা তাহাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করাইয়া পূজা ও আনন্দে ফল মূল মধুপর্ক (১) ও সুবাসিত জল দান করতঃ ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তখন সেই ব্রহ্মতেজ প্রজ্জলিত বিপ্ররূপী ভগবান্ ধর্ম্ম পূজা গ্রহণ করতঃ হৃষ্ট হইয়া সাদরে তাঁহাকে কামুকীদিগের মনোরম কিন্তু সতীগণের অসহনীয় বাক্য বলিতে লাগিলেন। তিনি কহি-

(১) মধুপর্ক—দধি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ এবং চিনি (অর্দ্ধসের সমস্তে) মিশ্রিত খাদ্য। এখন ইহার পরিবর্ত্তে 'চা' দেওয়া হয়। হায়! হায়! কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ভাবুন দেখি।

লেন "অয়ি মনোহরে! তুমি কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? তুমি এই নির্জ্জন স্থানেই বা কি করিতেছ? আমার নিকট এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বল। সুন্দরি! তুমি কোন্ বস্তুই বা বাঞ্ছা করিতেছ? তোমার মঙ্গল হউক, যে বর তোমার বাঞ্ছিত তাহাই আমার নিকট প্রার্থনা কর।" বৃন্দা কহিলেন "আমি কেদার রাজের কন্যা, আমি এই বিজন বনে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেছি, আমার প্রার্থনা "হরি আমার পতি হন্। আপনি যদি সমর্থ হন তবে এই বাঞ্ছিত বর আমাকে প্রদান করুন্। আর যদি অসমর্থ হন্ তবে প্রশ্নের প্রয়োজন কি? স্বস্থানে চলিয়া যান্।"

ধর্ম্ম কহিলেন "সুন্দরি! যিনি নিশ্চেষ্ট, অতর্কণীয়, নির্গুণ, নিরাকার, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থই যিনি শরীর ধারণ করেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ভিন্ন কোন্ রমণী সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হইতে পারে। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠশায়ী হরির ঐ দুই ভার্য্যাই তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন। স্বয়ং পরমেশ্বরী সরস্বতীও তাঁহার স্তবে অশক্তা এবং কমলাও ভক্তি ভরে দিবানিশি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন। কল্যাণি! তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তিনি গোলকধামে রাধিকা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রেমের বশ নহেন। মহাভাগে! আমি নৃপগণের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, বরাননে! দেবতা ও দৈত্য সমাজে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, আমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অতএব আমাকেই পতিরূপে ভজনা কর। অয়ি কল্যাণি! ত্রিলোক মধ্যে যাহা কিছু সুখ আছে,আমার প্রসাদে তৎসমস্তই তুমি ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই। অয়ি মধুর হাসিনি! সপ্ত সাগর পারে দেবগণের ক্রীড়ার্থ পূর্ব্বে বিধাতা এক কাঞ্চনময় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তুমি আমার সহিত তথায় গমন করিয়া বিহার সুখ লাভ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। অথবা পুষ্পোদ্যান সমন্বিত মহেন্দ্রের অমরাবতীতে গমন পূর্ব্বক চল উভয়ে সুখে কাল যাপন করি, না হয় নানারত্নে বিভূষিত স্বর্ণময়ী লঙ্কায় কিংবা সুমেরু গহ্বরে অথবা মনোহর ক্ষীরোদ সমুদ্রে, না হয় নির্জ্জন রমণীয় সত্যলোকে গমন পূর্ব্বক,চল উভয়ে সুখে বিহারে প্রবৃত্ত হই। মলয়াচলে উৎকৃষ্ট রত্নসার নির্ম্মিত রমণীয় স্থান বিদ্যমান আছে, পবিত্র চন্দন গন্ধ বায়ুতে উহা সতত সুগন্ধময়, মালতী, যূথিকা, কেতকী ও চারুচম্পক পুষ্পের সুগন্ধে উহার চতুর্দ্দিক আমোদিত, তথায় চির বসন্ত বিরাজিত, পিকগণ ও ভ্রমরগণ নিরন্তর মধুর ধ্বনি করিতেছে, চল তথায় গিয়া উভয়ে সুখে বিহার করি। দেবি! ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম, ধনেশ্বর, বহ্নি ধর্ম্ম ও চন্দ্র ইহাঁদের মধ্যে যাঁহার সুরম্য লোকে তোমার ইচ্ছা হয় চল তথায় গিয়া বিহার করি। অথবা রত্নদ্বীপ, মণিদ্বীপ কিংবা রমণীয় চন্দ্রসরোবর যেস্থানে তোমার

অভিরুচি হয় সেই স্থানে গিয়া আমার সহিত বিহার কর, তোমার মঙ্গল হইবে।” ধর্ম্মদেব এই কথা বলিয়া সম্ভোগার্থ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন (উহা বাস্তবিক সত্য নহে, সতীত্ব পরীক্ষার ছলনা মাত্র) তদ্দর্শনে সেই কেদার রাজ কন্যা বৃন্দার মুখকমল ও লোচনদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি বেদানুগত ধর্ম্মার্থযুক্ত যশস্কর সত্য ও হিতজনক বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। “হে মহাভাগ! ধৈর্য্য ধারণ করুন্, আপনি সর্ব্ব জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগণের তপোঽনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, সত্যনিষ্ঠা ব্রতাচরণ ও ধৈর্য্যধারণ এবং সৎপথে থাকাই প্রকৃত ধর্ম্ম। বিপ্রবর! নীচস্বভাব অধর্ম্মচারিরাই পরস্ত্রী সম্ভোগ করিয়া থাকে, ঐরূপ অধর্ম্মাচরণ আপনার কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলে সর্ব্ব প্রকার শত্রুই পরাজিত হয়, দুষ্ট ব্যক্তি অশুভের আকর, অধিক কি সে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ! বলপূর্ব্বক পতিব্রতা গমন করিলে নিশ্চয়ই মাতৃগামী হইতে হয় এবং সদ্য ব্রহ্মহত্যার পাতক লাভ হইয়া থাকে। পরে সেই মহাপাতকিকে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তপ্ত তৈলে নিরতিশয় দগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ নাই বলিয়া মরণ হয় না এবং যমদূতগণ লৌহদণ্ড দ্বারা নিরন্তর তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে। অতএব যে পরস্ত্রী সঙ্গম ক্ষণমাত্র সুখকর, কিন্তু চির দুঃখের হেতু, অধিক কি সর্ব্বনাশের কারণ, ধার্ম্মিক ব্যক্তি কখনও সেই অগম্যাগমন জনিত মহাপাতকের অভিলাষ করেন না। ওহে জ্ঞানদুর্ব্বল দ্বিজ! তুমি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বস্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। যেমন দীপ শিখা দর্শনে কীট তাহাতে আত্ম সমর্পণ করে, যেমন বড়িশ বিদ্ধ মিষ্ট দ্রব্য দর্শনে লুব্ধ মীন মৃত হয়, যেমন দুষ্ট ব্যক্তি পয়োমুখ বিষকুম্ভ দর্শনে তাহা গ্রহণ ধাবিত হয় সেইরূপ লম্পট পুরুষ আত্ম বিনাশের বীজ স্বরূপ আপাতঃ মনোহর পরস্ত্রীর মুখপদ্ম দর্শনে মোহাভিভূত হয়। রমণীগণের সর্ব্বাবয়ব কামের আধার, বিনাশের কারণ এবং অধর্ম্মের আবাসভূমি, অজ্ঞান পুরুষ পর যোষিদ্‌গণের সঙ্গম করিয়া যুগ যুগান্তরের নিমিত্ত আত্মাকে রৌরব নামক নরকে পাতিত করে। তুমি নির্জ্জন স্থান ও আমার অনাহারাদি দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু আমাকে তত দুর্ব্বল মনে করিও না। সকল স্থানেই দেবতাগণ বর্ত্তমান থাকেন, এ স্থানেও সমুদয় দেবগণ ও লোকপালগণ বিদ্যমান আছেন ও সকল কর্ম্মের সাক্ষী, সকলের নিয়ন্তা, অধিক কি যিনি যমেরও দণ্ডদাতা সেই জাজ্বল্যমান ধর্ম্মকে স্বয়ং ভগবান্ হরি সর্ব্বত্র স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। হে দ্বিজ! স্বয়ং কৃষ্ণ সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা রূপে এবং অন্যান্য দেবগণ ইন্দ্রিয়াদিরূপে সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং গুপ্ত, নির্জ্জন বা রক্ষক বিহীন স্থান কোথাও নাই। অতএব হে জ্ঞানদুর্ব্বল ব্রাহ্মণ! আমাকে

ক্ষমা কর। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তোমার স্বস্থানে গমন কর। ব্রাহ্মণগণ সকলেরই অবধ্য, নতুবা আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করিতাম, সে যাহা হউক, বৎস! এক্ষণে তুমি সচ্ছন্দে গমন কর। তপোনুষ্ঠানে আমার অষ্টোত্তর শত যুগ অতীত হইয়াছে, আমার পিতা মাতা বা পিতৃগোত্র কেহই নাই। হে দ্বিজ কেবলমাত্র সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিতেছেন, ধর্ম্ম, আদিত্য, চন্দ্র, পবন, হুতাশন, ব্রহ্মা, শম্ভু ও ভগবতী দুর্গা আমাকে রক্ষা করিতেছেন, অতএব তুমি অবলা জ্ঞানে, আমায় অবমাননা করিও না, নিশ্চয় জানিও সর্ব্বত্রই সমস্ত দেবগণ বিরাজমান আছেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃস্বরূপা, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

বৃন্দা দেবী এইরূপ বলিয়া ধরার ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্ররূপী ধর্ম্ম তাঁহার প্রবোধ বাক্যে গমন না করিয়া বরং সম্ভোগার্থ তৎসন্নিধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন বৃন্দা দেবী ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "অব্রাহ্মণ! তুমি ক্ষয় প্রাপ্ত হও।" তিনি এই কথা বলিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপদানে উদ্যত হইলে স্বয়ং সূর্য্যদেব তাঁহাকে সযত্নে নিবারণ করিলেন। এমন সময় জগৎপ্রভু স্বয়ং ভগবান মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই ত্রিদশেশ্বরগণ ধর্ম্মকে অমাতীত চন্দ্রের ন্যায় কলামাত্র অবস্থিত, সতী কোপানলদগ্ধ মলিন ও নিশ্চেষ্ট দর্শনে ক্রোড়ে লইয়া নিরতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন "অয়ি জন্ম মৃত্যু জরা বর্জ্জিতে মদ্ভক্তে বৃন্দে! ধর্ম্মের অপরাধ ক্ষমা কর, অয়ি পতিব্রতে! মদ্ভক্ত ধর্ম্মকে জীবন দান কর।" ব্রহ্মা কহিলেন "সতি বৃন্দে! দেখ ধর্ম্ম বিনা সমস্ত জগৎ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অনন্ত ও বসুন্ধরা কম্পিত হইতেছে।" মহাদেব বলিলেন "সুন্দরি! ধর্ম্মাভাবে সমুদয় জগৎ প্রণষ্ট হয়, অতএব বরাননে! ধর্ম্মকে জীবন দান কর তোমার মঙ্গল হউক।" সূর্য্য বলিলেন "পতিব্রতে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর, ধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিয়া সৃষ্টি রক্ষা কর।" অনন্ত বলিলেন "তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেছ তবে কিরূপে ধর্ম্ম হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব ধর্ম্মকে জীবিত কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। তোমার মঙ্গল হউক।" চন্দ্র বলিলেন "বৃন্দে! তোমার পরীক্ষার্থ ধর্ম্ম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দ্বিজরূপে আগমন করিয়াছিলেন, তুমি নির্দ্দোষীর হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ।" মহেন্দ্র বলিলেন "বৃন্দে! শাস্ত্র তোমার অবিদিত নাই, মানবগণ তপোঽনুষ্ঠানে ধর্ম্মকেই উপার্জ্জন করে, ধর্ম্ম বলেই তপস্যার ফল লাভ হয়, তাহা তুমি জান, এক্ষণে যদি ধর্ম্মই

ক্ষয় প্রাপ্ত হন্ তবে কিরূপে তুমি তপঃফল লাভ করিবে?" বরুণ বলিলেন "ধর্ম্মিষ্ঠে! জীবন দান করিয়া সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধার্ম্মিকে! ধর্ম্ম বিনা কর্ম্মিগণের সমুদয় কর্ম্মই বিফল হয়।" পবন বলিলেন "শুভে! এক্ষণে ধর্ম্মের জীবন দান করিয়া জগৎপবিত্র কর, দেখ, ধর্ম্ম-লোপ হইলে তোমার তপঃফলও বিলুপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।"

বহ্নি বলিলেন "সুন্দরি! তুমি স্বধর্ম্ম উপার্জ্জনার্থ ভারতে সমাগত হইয়াছ, এবং না জানিয়াই ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়াছ,অতএব এক্ষণে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত কর।" যম বলিলেন "বরাননে! আমি কর্ম্মিগণের সমুদয় কর্ম্ম বিদিত আছি এবং ধর্ম্মানু-সারেই তাহার ফল দান করি, অতএব ধর্ম্মকে জীবিত কর, আর বিলম্ব করিও না।"

পতিব্রতা তপস্বিনী বৃন্দা দেবগণের বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থ পূর্ব্বক সেই সুরেশ্বর-গণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "দেবগণ, ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণরূপে আমার পরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না, আমায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, আমি কোপ ভরে উহাঁকে ক্ষয় করিয়াছি। সে যাহা হউক আপনাদিগের প্রসাদে আমি ধর্ম্মকে নিশ্চয় পুনর্জ্জীবিত করিব।" বৃন্দা এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন "যদি আমার তপস্যা ও বিষ্ণুপূজা সত্য হয় তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে দ্বিজবর এই মুহূর্ত্তে বিজ্বর হউন্। যদি আমি যথার্থই অকপটে উপবাস ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি এবং আমার ব্রতানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও পবিত্রতা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই বলে এই বিপ্র এখনই বিজ্বর হউন্। যদি ব্রহ্মা, দেবগণ, পরমা প্রকৃতি, যজ্ঞ, তপস্যা সত্য হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বিজ্বর হউন্। যদি সর্ব্বাত্মা, নিত্য, বিগ্রহ নারায়ণ ও জ্ঞানাত্মক শিব সত্য হন তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বিজ্বর হউন।" সতী বৃন্দা এইরূপ বলিয়া ধর্ম্মকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহার সেই কলাবশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে সকরুণ রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্য-বসরে ধর্ম্মের পত্নী "মূর্ত্তিদেবী" শোকা-কুল চিত্তে তথায় আগমন পূর্ব্বক বিনত মস্তকে বিষ্ণু চরণে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে নাথ করুণাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি দয়া করুন্, হে কৃপাময়! জগন্নাথ! শীঘ্র আমার কান্তের জীবন দান করুন্। এই সংসারে যে রমণী পতিহীনা হয় সে যথার্থ পাপিয়সী নেত্রহীন মুখমণ্ডল ও প্রাণশূন্য দেহের ন্যায় তাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যের বা সুরম্য বসন ভূষণের প্রয়োজন হয় না। কি পিতা কি ভ্রাতা, কি পুত্র, কি বন্ধুবর্গ, কি মাতা সকলেই পরিমিত দান করেন, কিন্তু এক-মাত্র স্বামী অভিলাষানুরূপ সমুদয় দান করিয়া থাকেন।" 'মূর্ত্তিদেবী' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বৃন্দাকে কহিলেন "তুমি যে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় আয়ু লাভ করিয়াছ, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মকে অর্পণ

করিয়া গোলকধামে গমন কর। পশ্চাৎ তুমি এই তপস্যার এবং আয়ুঃ দানের ফলে আমাকে লাভ করিবে। বরাহ কল্পে গোলোক হইতে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক রাস মণ্ডলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" সতী বৃন্দা বিষ্ণু বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মকে আয়ুঃদান করিলেন। তখন ধর্ম্মদেব তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় পূর্ণ কলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অধিকতর রূপলাবণ্য প্রকাশ পাইল, তৎকালে তিনি জগৎপ্রভু হরিহর ব্রহ্মা ও পরাৎপরা দেবী প্রকৃতিকে প্রণাম করিলেন। পরে বৃন্দা দেবগণকে বলিলেন "দেবগণ আমি যে ধর্ম্মের প্রতি দুর্লঙ্ঘনীয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্। আমার সেই বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে জানিবেন, আমি ভীতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া 'ক্ষয়প্রাপ্ত হও' এই বাক্য বারত্রয় বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে উপক্রম করিলে ভাস্করদেব আমাকে নিবারণ করিয়াছেন, এজন্য এই ধর্ম্মদেব পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন এবং এক্ষণে ও যেরূপ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছেন, সত্য যুগে এইরূপ পূর্ণভাবে থাকিয়া ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলির প্রথমে একপাদ এবং শেষে ষোড়শাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন। পরে পুনরায় সত্যযুগে পরিপূর্ণ হইবেন। আমার মুখ হইতে যখন ক্রমে তিন বার 'ক্ষয়হও' শব্দ নির্গত হইয়াছে, তখন সেই ক্রমে উহাঁর পাদ পাদ রূপে তিন বার করিয়া ক্ষয় হইবে এবং চতুর্থ বার বলিবার উপক্রম করিলে যখন ভাস্করদেব নিবারণ করিয়াছেন, সেই হেতু কলি শেষে কলা মাত্র অবস্থিত থাকিবেন।" বৃন্দা এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় দেবগণ দেখিতে পাইলেন গোলক হইতে এক অতি সুন্দর দিব্যরথ বেগে আগত হইতেছে, উহা অমূল্য রত্নে নির্ম্মিত ও হীরাহার পরিষ্কৃত নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাণিক্য, বস্ত্র, শ্বেত চামর, রত্ন, দর্পণ এবং মনোহর ভূষণ সকল উহার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। অনন্তর বৃন্দা হরি, হর, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গোলক ধামে গমন করিলেন এবং দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে বৃন্দা দেবী গোকুলে হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়ার তিরোধান—ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী লেডী হার্ডিঞ্জ আর ইহ জগতে নাই। সহসা এই সংবাদ শুনিয়া আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় সহৃদয়া দৃঢ়চেতা রমণী অতি বিরল।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের প্রাণ সংশয় হয়। এই বিপদকালে তিনি যে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণে চির অঙ্কিত থাকিবে।

লেডি হার্ডিঞ্জ লর্ড এলিংটনের প্রথমা কন্যা। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং ১৯১০ সালে স্বামীর সহিত ভারতে আগমন করেন।

কে জানিত যে এই সাধ্বী সতী এত অল্প দিনের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন? দুই পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া সাধ্বী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন! ভগবান পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বামী ও সন্তানদিগের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ২৭শে জুন অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়ানা নগরে একটী সভায় উদ্ভিদের স্নায়বিক উত্তেজনা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করেন। এই সভাস্থলে ভিয়ানা নগরের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও মনীষিগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বসু মহাশয়ের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। ভিয়ানার যে সকল মনস্বী এক্ষণে উদ্ভিদের শরীরবিজ্ঞানের অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া অধ্যাপক বসুর লেবরেটারিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার বিষয়ে এই নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে চাহিয়াছেন।

সেণ্ট্রাল পুলিশ কোর্ট—স্থির হইয়া গিয়াছে যে আগষ্ট মাসে কলিকাতার সেণ্ট্রাল পুলিশ আদালত লালবাজার হইতে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে উঠিয়া যাইবে।

তুরস্কে নারীজাতির উন্নতি—৬ বৎসর হইল তুরস্কে যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা যখন যথেচ্ছাচারী ছিলেন, তখন স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ ও উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন, নরনারী উভয় লইয়া জাতি, এই উভয়ের উন্নতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতি কখনও হইতে পারে না। পূর্ব্বে ধনীরা আপনাদের ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপীয় নারীদিগকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা সূচ কর্ম্ম, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তুর্কির অভিজাতবর্গ নারীর পক্ষে ইহাই চূড়ান্ত শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। যে সকল নারীর অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় লিখন, পঠন, ধারাপাত, সূচিকার্য্য ও কোরাণ পড়ান হইত। স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন কেহই অনুভব করিত না। ধনী রমণীদিগকে খোস-পোষাকী ও গরীব স্ত্রীলোকদিগকে ধোবার খাতা ও বাজার খরচের হিসাব রাখার উপযুক্ত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীলোকদের যে আবার পুত্র-কন্যার শারীরিক ও মানসিক উন্নতির চিন্তা করিতে হইবে, জাতিকে মহৎ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা কাহারও মনে উদয় হইত না। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় দুর্গতি দেখিয়া চিন্তাশীল লোকেরা নারীর উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারিয়া তুরস্কের নানা স্থানে উন্নত প্রণালীর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে নারীদের জন্য ৩টি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারীগণ যাহাতে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারেন, অসহায় অবস্থায় পতিত হইলেও যাহাতে পরের গলগ্রহ না হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, এই সকল বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সহিত তজ্জন্য নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যনির্ম্মাণ প্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ কার্য্য এই যে, নারীদের জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। তথায় ২০০ নারী অধ্যয়ন করিতেছেন। এখানে ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি নানাবিদ্যা অধীত হইয়া থাকে।

রেডিয়ামের আশ্চর্য্য শক্তি—রেডিয়াম ধাতুর কিরণ সম্পাতে কুষ্ঠ ও ক্যান্সার প্রভৃতি রোগচিকিৎসার আশ্চর্য্য প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। রেডিয়াম ধাতু অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; সম্প্রতি মার্কিণের এক প্রসিদ্ধ ধনী কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের মিশন হাঁসপাতালে রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য ইহার এক কণা দান করিয়াছেন। উহার মূল্য বহু সহস্র টাকা।

সংসারধর্ম্ম।

(নীতিজ্ঞান।)

কর্ম্মজীবনকেই সংসার বলে। তাহার বহু সংখ্যক পথ থাকিলেও স্থূলতঃ পাপ ও পুণ্য নামে দুইটি প্রধান পথ আছে। মানুষ যখন সংসারধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুণ্য পথে বিচরণ করে, তখন সে তাহারই সম্পুর্ণ উপযুক্ত হয়, আর যখন পাপের আশ্রয় লয় তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। সে তখন মোহের বশে যে দিকে আশু সুখ দেখিতে পায় সেই দিকেই ধাবিত হইতে থাকে এবং সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনের আর তাহার ক্ষমতা থাকে না। কথাটা আরও সরল ভাবে বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ পুণ্য কি? পবিত্রতাই পুণ্য, যাহাতে নির্ম্মল সুখের অধিকারী হওয়া যায় তাহাই পুণ্য, যাহার ফলে মানবচিত্ত দিন দিন উন্নত হয় তাহাই পুণ্য, যে ভাবে চলিলে অপরকে নির্ম্মল সুখ প্রদান করিতে পারা যায় তাহাই পুণ্য; যাহা জ্ঞানের ফল তাহাই পুণ্য। আর একটা কথা—মানব যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন একমাত্র সংসারের উপর নির্ভর করিয়াই সে জীবিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সংসার-ধর্ম্মের শৈথিল্যে জাতকের জীবন সঙ্কটময় হয়, তাহার অভাবে জাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সংসারে যাহা উৎকৃষ্ট পন্থা, যাহাতে জীবন রক্ষা, যাহাতে সুখ শান্তি, যাহাতে দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি, তাহাই সংসারধর্ম্ম। কাজেই সংসারধর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম একই পদার্থ। যেমন নদী হইতে সমুদ্ভূত খাল, বিল প্রভৃতির জল ও নদীর জলে কোনও পার্থক্য নাই, সেই প্রকার সমস্ত সংসার-ধর্ম্মের অংশভূত পুণ্যক্রিয়া ও সংসারধর্ম্মেও কোন পার্থক্য নাই।

সংসারধর্ম্ম কোনও একটী কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয় না, সুদীর্ঘ মানব জীবনের প্রত্যেক বিশুদ্ধ ক্রিয়াতেই তাহা প্রতি-ফলিত হইয়া থাকে, তাহা অনন্ত অর্থাৎ জ্ঞেয় সংখ্যার অতীত, তাহা স্থূল হইতেও স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম।

সংসারধর্ম্মের কতকগুলি অন্তরায় আছে,—১ম জ্ঞানাভাব, ২য় মোহ, ৩য় লোভ, ৪র্থ ঈর্ষা, ৫ম আলস্য, ৬ষ্ঠ ক্রোধ, ৭ম অভিমান, ৮ম উদাসীনতা,—৯ম রোগ, ১০ দরিদ্রতা। ইহাদের একএকটী সংসারধর্ম্মকে বিচলিত অথবা আবৃত করে। দরিদ্র যদি অন্যান্য অন্তরায়ের বশবর্ত্তী না হয় তবে সে সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে। মহাভারতে আছে, ধার্ম্মিক প্রবর বিদুর ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, একদা শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যপ্রসঙ্গে তাঁহার অতিথি হইলে, বিদুর ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলকণা দ্বারা অতিথিসৎকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবেরা যখন নিতান্ত দরিদ্রবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন তখন তাঁহারা জ্ঞান-বলে সমস্ত সংসারধর্ম্মই রক্ষা করিতেন—শত শত ব্রাহ্মণের পরিতোষ করিতেন। জ্ঞানই মানবকে সুকর্ম্ম-পথে পরিচালিত করে, আবার সেই সুকর্ম্ম জ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া দেয়। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়াই সংসারধর্ম্ম জীবিত থাকে। মানব মাত্রেরই উচিত কর্ম্মপথে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান উপার্জ্জন করা। জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা প্রথম জানা আবশ্যক। শাস্ত্রে বলে "জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানম্" অর্থাৎ যদ্দ্বারা ভালমন্দ জানিতে পারা যায় তাহাই জ্ঞান। সেই জন্যই বঙ্গকবি বলিয়াছেন—

"দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে
সেই ধর্ম্ম, সেই পুণ্য, চল সেই পথে।"

সংসারধর্ম্মীর পক্ষে নীতিজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, একমাত্র নীতিজ্ঞানই কর্ম্মপথের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেয়, নীতি-জ্ঞানের বলেই সাংসারিক কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হয়। এক্ষণে দেখিতে হইবে সেই নীতিজ্ঞান টা কি?

পণ্ডিতেরা বলেন "যে জ্ঞানের দ্বারা কার্য্য-সকল নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাই নীতি-জ্ঞান।" কথাটা ক্ষুদ্র হইলেও সরল নহে। এই স্থলে দৃষ্টান্ত প্রয়োগই উপদেশপক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়।

আশ্রিত প্রতিপালনের তুল্য যশস্কর ও সুখদায়ক ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। গীতায় যে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে কর্ম্মযোগ এবং মুক্তপক্ষে জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা আছে, কর্ত্তব্য-সম্পাদন-জনিত আত্মপ্রসাদই তাহার মূলউদ্দেশ্য। আত্ম-প্রসাদই নির্ম্মল সুখ আনয়ন করে। নির্ম্মল সুখের উপর আর কিছু জীবের আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু আছে কি? আশ্রিত-প্রতিপালন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগ। ইহাতে যশঃ দিগ্ দিগন্তর ব্যাপৃত হয় এবং আত্মপ্রসাদ জনিত নির্ম্মল সুখের অধিকারী হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে মহাভারতে বহু দৃষ্টান্ত আছে।

তাহার পর বিজ্ঞবন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ প্রত্যেক মানবের পক্ষেই মঙ্গলজনক। যিনি তাহা গ্রহণ না করেন তাঁহাকে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। এই সম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্রে একটী শ্লোক আছে,—

দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্ বাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥

অর্থাৎ মৃত্যুগামী ব্যক্তি দীপনির্ব্বাণের গন্ধ-আঘ্রাণে, সুহৃদ্ জনের বাক্য শ্রবণে এবং অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শনে সক্ষম হয় না, তাহারা শীঘ্রই মৃত্যুপথ অবলম্বন করে। তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহা প্রত্যেক মানবেরই গ্রহণীয় বিষয়। এতৎসম্বন্ধীয় নীতি জ্ঞানেরউপর নির্ভর করিয়া সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা দুর্য্যোধন অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন, লোক, জন, ধন, মান কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ লোকসমূহ তাঁহার ব্যবহারের ফলে সন্তুষ্ট ছিল না।

তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত বটে, কিন্তু সন্তোষের সহিত নহে। আর দেখ যুধিষ্ঠির বনবাসী হইয়াও সকলের চিত্তের উপর রাজত্ব করিতেন, তাঁহার চরিত্র-বলে, তাঁহার ব্যবহারের উৎকৃষ্টতায় সকলেই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত,—ভক্তির সহিত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত, এমন কি শত্রুও তাঁহার ধর্ম্ম ও চরিত্রের নিকট মস্তক অবনত করিত। যুধিষ্ঠির চরিত্র-বলে ধর্ম্মরাজ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌম রাজত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন পদে পদে অপমানিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন এবং পরে মৃত্যুকে অলিঙ্গন করেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—সংসারধর্ম্ম একটী বিষয়েই পর্য্যবসিত হয় না। বিভিন্ন মানবের কার্য্যভেদের সঙ্গে সঙ্গে সংসারধর্ম্মেরও বিভিন্নতা আছে। রাজার রাজধর্ম্ম হইতে কুটীরবাসী দরিদ্রের সাধারণ ধর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যেই সংসারধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। নীতিজ্ঞানই তাহার পরিচালক। যে কার্য্য নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত তাহা সুখ শান্তির মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন। রাজার পক্ষে রাজনীতিই নীতিজ্ঞান, আর দরিদ্রের পক্ষে সংসারপ্রীতিই নীতিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নীতিজ্ঞান দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেই যথার্থ সংসার পালন করা হয়।

নূতন সংবাদ।

১। নিম্নলিখিত বালিকাগুলি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

(পূর্ব্ব বঙ্গ)

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ২০৲ টাকা।

সুনীতি বালা গুপ্ত—ঢাকা ইডেন স্কুল।
সুরবালা নিয়োগী—ময়মনসিং বিদ্যাময়ী স্কুল।
লীলা রায়—ঢাকা ইডেন স্কুল।
সুনীতি বালা চন্দ　　„
শান্তিলতা দত্ত　　„

(পশ্চিম বঙ্গ)

প্রথম শ্রেণী ২০৲ টাকা বৃত্তি।

সুধালতা দুয়ারা—বেথুন স্কুল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি ১৫৲ টাকা।

তরুলতা দাস গুপ্ত—বেথুন স্কুল।

তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি ১০৲ টাকা।

সুখলতা দুয়ারা—বেথুন স্কুল।

২। নাইনিতালের জঙ্গলে সম্প্রতি এক অদ্ভুত বালিকা পাওয়া গিয়াছে। বালিকার বয়স আট নয় বৎসর, দেখিতে বানরীর মত কিন্তু বালিকা বানরী নহে। প্রথম প্রথম বালিকা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, ঘাস আর কাঁচা আলু ব্যতীত আর কিছুই খাইত না। সম্প্রতি তাহার ভয় অনেকটা ভাঙ্গিয়াছে, এখন সে রুটী ও দুধ খায়। কথা বলিতে পারে না, চীৎকার

করে। এইরূপ প্রকাশ যে ইহা এক পশু পালিতা মানব-কুমারী।

৩। সিগাৎসি সহরে "মৈত্রেয়ী" বা "প্রীতি" বুদ্ধের এক মূর্ত্তি দালাই লামা প্রস্তুত করাইতেছেন। এই মূর্ত্তি ওজনে দুই শত মণ হইবে। মূর্ত্তি তামার নির্ম্মিত হইয়া সোণার পাতে মোড়া থাকিবে। এই মূর্ত্তি উচ্চে ৮০ ফুট হইবে ও ইহার রক্ষার জন্য ৯০ ফুট উচ্চ এক মন্দির নির্ম্মিত হইবে। মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ করিতে তিন বৎসর লাগিবে এইরূপ শুনা যাইতেছে।

সমালোচনা।

আহোম সতী—সচিত্র ঐতিহাসিক উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ইহা আসামের অন্তর্গত "আহোম" রাজ্যের এক আদর্শ তেজস্বিনী সতীর উপাখ্যান।

গিরি কাহিনী—শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, শিলং হইতে প্রকাশিত। এখানিও সচিত্র, আসামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীতে পূর্ণ। কাহিনীগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং ভাষা অতি সরল। ইহা পাঠে আসামের প্রথার বিষয় অনেক জানা যায়। অল্পের মধ্যে অতি শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের সহিত পুস্তক দুই খানি লিখিত হইয়াছে।

বামারচনা।

কার তরে?

হে বারিধি কার তরে
বিশাল বালুকা তটে,
ব্যাকুল আবেগে থাকি
পড়িতেছ লুটে লুটে।
অবিরাম অবিশ্রান্ত
কার তরে হাহাকার?

উত্তাল তরঙ্গ তুলি
ফিরিছ সন্ধানে কার?
আছড়ি পড়িয়া তটে
প্লাবিয়া সৈকত ভূমি,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা
আদিকাল হতে তুমি,

রত্নের আকর সিন্ধু
কিসের অভাব তবে ?
দিশা হারা হয়ে কেন
গর্জ্জিতেছ ভীম রবে ?
পার্থিব রতনে বুঝি
ও হৃদয় তৃপ্ত নয়,
'পরম রতন' তরে
তাই এত হায় হায় !!
বুঝেছি তোমার ভাষা
বুঝেছি তোমার ব্যথা,
আমিও এসেছি তাই
জানাইতে দুটো কথা।
আমিও তোমারি মত
ব্যথা ভরা হৃদি লয়ে
প্রতীক্ষায় আছি শুধু
দীর্ঘ বিরহ সহে
ক্ষুদ্র হৃদি ক্ষুদ্র প্রাণ
জানাতে পারিনা তাই
নীরবে চাপিয়া ব্যথা
নীরবেই শুধু সই।
বড়ই নিঠুর সে যে
নিঠুর হৃদয় তার,
পশেনা শ্রবণে তাই
আমাদের হাহাকার।
আমিও তোমারি মত
আমরণ ডেকে দেখি,
হৃদি প্রাণ ঢেলে দিয়ে—
দেখি দেখা পাই নাকি ?

চারুমতি দেবী।

স্নেহলতা।

কুমারীদের জহর ব্রত দেখে লাগে ভয়
কন্যা জননী আকুল প্রাণী "কখন কি হয়
স্নেহের খনি মায়ের প্রাণ সন্তানের তরে,
ত্রাসিত সদা চিন্তা কাতরা চখে জল ঝরে।

বিনিদ্র রাত্রি যাতনা দাত্রী কাটে শয্যোপরি,
(ভেবে) কোথায় পাত্র কোথাবা অর্থ আহা দুঃখে মরি।

সমাজ জ্বালা করে উতালা নিন্দিছে বিধাতা,
ভাবিছে মনে হায়রে! কেন হয়েছিনু মাতা।*

"আয় মা যত অনূঢ়া মেয়ে পাতিয়াছি বুক,
প্রাণ সঁপিব তোদের তরে ঘুচাইব দুঃখ।

* আমার একমাত্র কন্যা লইয়া পণ প্রথার দারুণ নিষ্পেষণে যখন নিষ্পেষিত হইতে ছিলাম তখন করুণাময় শ্রীহরি কন্যাভার পীড়িত নিরুপায় দরিদ্র বিধবার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমার একমাত্র সন্তানকে দুঃখময় সংসার হইতে লইয়া তাঁহার নিরাপদ স্নেহ ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া আমায় বিপদ মুক্ত করেন।

সহিব যত তোদের তরে সমাজ লাঞ্ছনা,
বুকের ধন রাখব বুকে ক'রে যত্ন নানা।
হয়েছি মাতা ধরেছি গর্ব্বে কর্ত্তব্য যে াদের
তোমরা কেন মরবে হেন জ্বালায় দেশের
এনেছি ডেকে তোদের মোরা এই মন বাগে,
সাজাতে জ্ঞানে ধর্ম্ম ভূষণে সুচরিত বাশে।
শিখাব যত্নে হৃদয় রত্নে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
মনের হর্ষে অতিত গর্ব্বে রাখব সংযত।
কালের ধর্ম্মে হয়ত শেষে হবে সময়র,
পণের প্রথা ঘুচিয়ে যাবে বিবাহাড়ম্বর।"

মুক্ত-গীতি।

১

জীবন আমার অধীন হলেও
হৃদি তো অধীন নয়,
হৃদয়ের গতি সমীরণ সম
গতি শীল চির রয়।

১

যে রাগিণী সুর লভিয়াছি প্রাণে
বিভুর স্নেহের দান,
আমারি মনের মতন আমি যে
গাহিব নিয়ত গান।

৩

মোহিনী উষার হেরিয়া মাধুরী
বিহগ কাকলী সনে,
তুষিতে উষারে সমাদর ভরে
গাহিব কুসুম বনে।

৪

সমুন্নত কভু হিম-গিরি শিরে
কভু বা সাগর কূলে,
সজনে বিজনে যাহা সাধ গাব
নানাতানে প্রাণ খুলে।

৫

চাঁদনী নিশায় জোছনায় মিশে
গাহিব তারকা সনে,
হরিষে বিষাদে বিরহে মিলনে
গাহিব আপন মনে।

৬

স্বাধীন হৃদয় গাহিবে পুলকে
ভুলিয়া ভবের ব্যথা,
ধরণীর তুচ্ছ কোলাহল রাশি
দিবে না আসিতে হেথা।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 612. August, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১২ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩২১। আগষ্ট, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

ধর্ম্মের গোপনভাব।

দুরাচার কংস জানিতেন গোকুলে প্রতিপালিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তিনি হত হইবেন। সুতরাং কৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি গূঢ় মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন, ছলক্রমে কৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়া তাহার বিনাশসাধন-পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে আনিবে কে? এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, মন্ত্রী বলিলেন,'বৈষ্ণব ব্যতীত কৃষ্ণকে আর কেহই আনিতে পারিবে না।'

কংস হতাশ হইয়া কাতরভাবে বলিলেন, রাজ্যে যত বৈষ্ণব ছিল, সকলই সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে, কৃষ্ণকে আনা হইল না, সুতরাং আমার আসন্নকাল উপস্থিত। মন্ত্রী উত্তর করিলেন, মহারাজ আপনার সভাসদ্ অক্রূর পরম বৈষ্ণব। তিনি আত্মগোপন করিয়া, চিরকাল আপনার মঙ্গল-কামনায় সভামধ্যে উপস্থিত রহিয়াছেন। সভাভঙ্গের ক্ষণকাল পূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছেন, তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে সভাস্থ করিলেই সত্যাসত্য প্রকাশিত হইবে।

রাজাজ্ঞায় দূতগণ অক্রূরগৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তিনি স্নানান্তে নির্জ্জনবাস করিতেছেন, পরিজনবর্গেরও সেখানে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য জানিয়া তাহারা সেই নির্জ্জন গৃহ দেখাইয়া দিল। দূতগণ দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম ধারণ পূর্ব্বক অক্রূর ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, আর অবিরল প্রেমধারা তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে। কিন্তু রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। তিনি আস্তে আস্তে নামাঙ্ক মুছিয়া ফেলিলেন, এবং পরিষদের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রাজসমীপে উপনীত হইলেন।

তখন মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, সুচতুর অক্রূর সকলই গোপন করিয়াছেন, কেবল ললাটপ্রান্তে হরিনামের ঐ ঈষৎ রেখা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়াছে।

দেখুন প্রেমিকের কি মধুর ভাব! যাঁহার প্রেমে তিনি চিত্তহারা সভাসদের কথা দূরে থাকুক, পরিজনবর্গও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল না।

এই অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনিলেন, এবং পাপমতি কংস বিনষ্ট হইল।

ভগবদ্‌ভক্তের এই বাস্তবিক লক্ষণ। তাঁহাতে প্রদর্শন করিবার ভাবের লেশও থাকে না। তিনি বিলাস-সুখোন্মত্ত মানবের স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে, সেই প্রেমসাগরে চির-নিমগ্ন থাকিয়া, তাঁহাদের হিতকামনা করেন এবং তাঁহার অকপট-সাধন-গুণে কালে ভগবানের করুণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং আসুরিক ভাব ও ভোগলালসা সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

বহুজনসমক্ষে বাহ্যিক ও ক্ষণিক প্রেমের প্রদর্শন হইতে এ কত স্বতন্ত্র পদার্থ। ঈশ্বর করুন, অক্রূরের ভাবে বহুজন মধ্যেও নির্জন হইয়া আমরা অন্তরে অন্তরে তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া যাই।

যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

নারদ ভক্তিবলে বৈকুণ্ঠে নিয়ত নারায়ণ-সহবাসে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। ছায়াস্বরূপ ইষ্টদেবের অনুগমন করিতে করিতে তাঁহার এই সংস্কার জন্মিল, ভক্তগণ মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক দিন তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার প্রতি আপনার প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক?" এ প্রশ্নের উত্তরদানে নারায়ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নারদের আগ্রহাতিশয়ে অবশেষে তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা বলিলেন, কস্মিন্‌ কালে কেহ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই। যাহা হউক, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, নিজ সংস্কারকে দৃঢ়তরকরণ-মানসে, নারদ অনেক অনুসন্ধানের পর সেই ব্যক্তির গৃহে উপনীত হইলেন। সে কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ, তখন কর্ষণজন্য ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। নারদের অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইল। তিনি মনে করিলেন, এ ব্যক্তির নামোল্লেখ প্রভুর উপহাস মাত্র। তিনিই যে তাঁর প্রিয়তম, প্রকারান্তরে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। 'যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়া অব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে ব্যস্ত, সে ব্রাহ্মণপদবাচ্যের অযোগ্য বর্ব্বর। ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য ঋষি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ও হলস্কন্ধে

বলদসহ ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইল এবং স্নানপূর্ব্বক জলযোগ করিতে করিতে নারদের সম্বর্দ্ধনা করিল।

নারদ কহিলেন, উপবীতধারী হইয়া, হলচালনাদ্বারা তিনি আপনাকে নরকগামী করিয়াছেন এমন কি, স্নানান্তে একটী হরিনাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ না করিয়াই, ইতর প্রাণীর মত উদরপূরণে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণের পক্ষে এ সকল অধঃপতনের লক্ষণ। এই প্রকারে নারদ উপদেশচ্ছলে ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ভগবান তাঁহার স্কন্ধে যে সকল জীবপোষণের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহাই, সম্পন্ন করা তাঁহার সাধন। যত দিন সন্তানগুলি সক্ষম না হয়, তত দিন ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম। এবং "হরি" এই শব্দ মুখে না লইয়া বলিলেন, যে নাম উচ্চারণের কথা বলিতেছেন, তাহা গ্রহণ মাত্রেই তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং ভগবদ্দত্ত কর্ত্তব্য পালিত হইবে না। তবে যদি ঋষি কৃপা করিয়া এ ভার গ্রহণ করেন, তিনিও নাম লইতে প্রস্তুত। নারদ সম্মত হইলেন। তখন কৃষক কঠোর কর্ত্তব্যভার নারদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে করযোড়ে, হৃদয়ের সমুদয় বিশ্বাসের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করিল।

অমনি ব্রাহ্মণ জীবন্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল দেখিয়া নারদ অবাক্। তাঁহার সমুদয় অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। যে নামগানে আজীবন উন্মত্ত থাকিয়া তিনি ভগবানের প্রিয়তম- হইতে পারিলেন না, আপাততঃ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হীনকর্ম্মা ব্রাহ্মণ একটীবারমাত্র সেই নাম উচ্চারণপূর্ব্বক, কেবল অটল বিশ্বাসবলে ভক্তের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল।

অন্তর্যামী ভগবানের লীলা বিচিত্র। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কে কোন্ অবস্থায় আত্মগোপন করিয়া তাঁহার জন্য লালায়িত, কেবল তিনিই তাহা জানিতেছেন। বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের অহঙ্কারে উন্মত্ত আমরা নিজের অগণ্য মহাপাপের প্রতি অন্ধ হইয়া আপনাদের কল্পিত শ্রেষ্ঠতার অভিমানে স্ফীত হইতেছি। তিনি কৃপা করুন, আমাদের বিশ্বাসচক্ষু প্রস্ফুটিত হউক। অন্তঃপ্রচ্ছন্ন নিজ পাপমূর্ত্তিদর্শনে বিনীত হইয়া জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, নীরবে কেবল তাঁহারই সহিত যেন আত্মার যোগ সুদৃঢ় করিতে পারি।

ক্যানেডার পত্র।

O. A. C. Guelph, Ont, | Canada. Sept. 12. 09.

শ্রীচরণেষু—

মা!

ক্যানেডার জাতীয় exhibition এবার Toronto নগরে হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আসিয়া পত্র লিখিতে বসিয়াছি। ইহা ক্যানেডার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাৎসরিক মেলা। আমি কলিকাতার গতপূর্ব exhibition দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার সহিত তুলনায় দেখিতেছি যে, ক্যানেডার exhibition অতি উত্তম। যেমন কলিকাতা বঙ্গের মধ্যে প্রধান নগর, সেইরূপ Toronto Ontarioর মধ্যে বড় নগর।

চাষারা এক ভাড়ায় তথায় যাতায়াতের টিকিট পাইয়াছিল। আমি কৃষি সংক্রান্ত exhibit গুলিকে ভালরূপ দেখিবার জন্য Torontoতে গিয়াছিলাম। আমাদের কলেজ হইতে যে সকল exhibit পাঠান হইয়াছিল তাহার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এদেশের কৃষিমেলা দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম, বড় বড় Farmতে কিরূপ অদ্ভুত ও বড় কল চলে তাহার সব ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান হইয়াছে। গম, যব, যই প্রভৃতির গুচ্ছি দিয়া সমস্ত দেওয়ালটাকে সাজান হইয়াছে। প্রত্যেক varietyর কি নাম ও একার (Acre) প্রতি কত bushel ফসল পাওয়া যায় ইত্যাদি লেখা আছে। তার পর "ফলের রাজ্যে" গেলাম। সে হল্‌টার জানলা, দরজা, ছাদের নিম্নপৃষ্ঠ নানাবিধ লাল, সবুজ, হল্‌দে রংবিশিষ্ট ফলেতে সজ্জিত। সে হলের চারিদিক ছেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে সমস্ত ফল বেশ টাট্‌কা ও পাকা। কোন জাতীয় আপেল ত্রিকোণাকারে, কোন স্থানে আড়কোণাকারে, কোন স্থানে গোলাকারে সাজান আছে।

সেখান হইতে ফুলের ঘরে গেলাম। কে যেন সেখানে পারিজাত কুসুম ছড়াইয়া দিয়াছে। যে সমুদয় মেয়েরা ফুলের "বোকে" প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছে তাহারা তাহাদের নাম, ধাম ও উপাধি লিখিয়া দিয়াছে। কোন মিস্ ফার্ষ্ট প্রাইজ, কোন মিস্ সেকেণ্ড প্রাইজ, কোন মিস্ থার্ড প্রাইজ পাইয়াছেন—এইরকম সব লেখাও আছে। সে ঘরে ছোট ছেলেমেয়েদের কি স্ফূর্ত্তি! তাহারা কখন "Mamma! I would have this bouquet.'' "Isn't that a beauty'' ইত্যাদি কেমন আধ আধ স্বরে বলিতেছে।

তারপর Tropical হলেতে যাইলাম। সেখানে যত গ্রীষ্মপ্রদেশের ফল প্রভৃতি, Cuba হইতে নারিকেল, নারিকেলের দড়ী, বেতের ঝুড়ি, আক, আকের শিকড়, বড় বড় পেঁয়াজ—এক একটা পেঁয়াজ যেন এক একটা বড় আম, সে গুলিকে দড়ী দিয়া বাঁধিয়া কলার কাঁদীর মত ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক varietyর নাম ও কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও সংক্ষেপে বর্ণনা করা আছে। তারপর কত রকমের নারিকেল তৈল দেখিলাম, তখন যেন বাংলা

দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়িল। এদেশের মেয়েরা তো নারিকেল তৈল ব্যবহার করে না—তাহারা মাথায় সাবান মাখে। তারপর Hawai ও Javaর কলস দেখিলাম। তখন যেন বাংলা দেশের হাঁড়ি ও কুম্ভকারের কথা মনে পড়িল। এ সমস্ত জিনিষ এদেশের ছেলে মেয়েরা অনেকে কখন দেখে নাই, তাই তাহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। আমি বিদেশীয় ছাত্র বলিয়া আমাকে ঐ সমস্ত জিনিষের নিকট যাইতে বাধা দিল না। আমি রেলিং টপ্কাইয়া ভিতরে আসিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি যেখানে যেটার আবশ্যক বুঝিতেছিলাম তখনিই তাহার নোটস্ পকেট বুকেতে লিখিতেছিলাম।

যতরাজ্যের রেড়ীর তৈলের বীচি দেখিলাম। সেই সমস্ত seed exhibitorদের ঠিকানা লিখিয়া রাখিলাম। বোতল হইতে বীচি লইয়া hand-lensএর সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তখন কে যেন সেই জনতার মধ্যে বলিল —"আমার বোধ হয় ঐ ভদ্রলোকটী (অর্থাৎ আমি) রেড়ীর তৈল খাইতে পছন্দ করেন।" তখন চারি দিক হইতে খুব হাসির ধুম পড়িল। মেয়েরা রুমাল মুখে দিয়া হাসিতে লাগিল।

আপনি জানেন মা "সিংহের" তখন কি হল? "সিংহ" একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল। কারণ তারা সিংহকে ঠাট্টা করিল। আমি তখন বলিলাম :—Say girls, don't you like castor oil?" তাহার উত্তর হইল—"Oh, no, we always take epsom salt."*

তার পর বড় বড় আদা সব দেখিলাম। সে গুলি Trinidad হইতে আসিয়াছে। আদা দেখে তখুনি আদা খাইতে ইচ্ছা করিল।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দেশীয় টুপীর exhibit দেখিলাম। সেই সমস্ত টুপী দেখিয়া মেয়েরা খুব হাসিতেছিল। হাঁ, দেশে ফিরিবার সময় এদেশের farmতে কাজ করিবার সময় যে প্রকার টুপী মাথায় দিয়াছিলাম তাহার দু' তিনটা নমুনা লইয়া যাইব।

তার পর নানাবিধ Arrowroot ও শুষ্ক লঙ্কার exhibits দেখিলাম। আঃ তখন লঙ্কা খাইতে ইচ্ছা গেল। আঃ তখন ইচ্ছা হইল যেন এক লাফে বাংলা দেশে চলিয়া যাই। তারপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তুলা দেখিলাম, সেখানে একটা নিগ্রো ছেলে ও মেয়েকে পাহারায় রাখা হইয়াছে।

তারপর Chartএর ঘরে যাইলাম। সেখানে কোন নক্সায় ক্যানেডার farmর সংখ্যা, কোন নক্সায় গম, যব প্রভৃতির বপন, কোন নক্সায় ক্যানেডার জন সংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িতেছে কি না, কোন নক্সায় ক্যানেডার তুষারপাত, কোন নক্সায় ক্যানেডার শূয়র, ঘোড়া,

* এদেশের ডাক্তারগণ Purgativeর জন্য epsom salt অধিক ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

গাভী প্রভৃতির সংখ্যা, কোন ম্যাপে ক্যানেডার মাখন ও পনীরের কারখানা প্রভৃতির বুঝান আছে। এ সমস্ত আমি পকেট বইতে নোট্ করিয়া রাখিতেছিলাম; কারণ যদি দেশে ফিরিয়া ঐ প্রকার কৃষি-মেলা বসাই তখন বাংলা দেশের কত farm, একার প্রতি কত ধান, কত স্থানে কত পরিমাণ বৃষ্টি ইত্যাদি দেশের চাষাকে বুঝান যাইবে। আচ্ছা, সত্য সত্যই কি আমি একদিন নিজের Planএর মত দেশে ফিরিয়া কৃষিকাজ করিতে পারিব? কে আমাকে এত টাকা দিবে? হায়, আমার শেখাই সার হবে, পেটে কেবল বিদ্যাই থাকিয়া যাইবে, অর্থাভাবে কাজে হাত দিতে পারিব না। কৃষিবিদ্যা শিখে না হয় শেষে বোটানী পড়ান যাইবে।

তারপর Senate ও House of Commonএর সভ্যদের ঘরে যাইলাম। তথায় "Feeding Stuff Act" সম্বন্ধে একজন চাষা বক্তৃতা করিতেছিলেন, ইনি পারলিয়ামেণ্টের সভ্য। আমার ন্যায় আরও অনেক ছাত্র ও কৃষক গ্যালারির চারিদিকে বসিল। গ্যালারি পূর্ণ হইয়া গেল। কেহ চেয়ার অভাবে ম্যাটিংএর উপর বসিল। আমার নিকট একটী মহিলা ম্যাটিংএর উপর বসিয়া পড়িল, সেও নোট্স লিখিতেছিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য সিট ছাড়িয়া দিলাম। সিট দিবামাত্র সে আমাকে "Thank you" বলিল। এ বক্তৃতা অতি আবশ্যক সেজন্য সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া কখন দাঁড়াইয়া কখন বা বসিয়া শুনিতে ছিলাম। বলিব কি কৃষি সম্বন্ধে কেহ কখন বক্তৃতা করিতে আসিলে, এদেশের চাষাদের মেয়েগুলি তাহাদের ছেলে মেয়ে রাখিয়া ছুটিয়া আসে।

তারপর Apiary হলেতে গেলাম। ওঃ সেখানে এত মৌমাছি, কি প্রকার কাচের বাক্সর মধ্যে সাজান রয়েছে, কেমন তাহা মধু নিংড়ান হচ্ছে—দেখিয়া অবাক হইলাম। এচ্ বোসের "কুন্তলীন" আফিসে প্রবেশ করিলে যেমন দেখা যায় যে, শিশিতে করিয়া তৈল ও নানাবিধ পুষ্পসার রাখা হইয়াছে, সেইরূপ এই ঘরে প্রত্যেক টেলেতে ছোট ও বড় বোতলে করিয়া নানা প্রকার মধু সাজান আছে। তারপর Butter-making Competition দেখিতে গেলাম। চারিজন মেয়ে ভাল মাখন কলে প্রস্তুত করিবে বলিয়া প্রকাণ্ড এক হলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। আমরা গ্যালারিতে বসিয়া তাহাদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। আমার পার্শ্বস্থ মেয়েরা বলিতেছিল "Look at that girl, she is not steady, she is going too fast" কেহ বলিতেছে "I bet Miss Kelly will stand first."

এইরূপে আরো কত যে কয়েক দিন ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম তাহা বোধ করি এই প্রকার করিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। এখন নিম্নে মেয়েদের কতকগুলি কাজ সংক্ষেপে বলিয়া যাই—

Women's Building—এখানে মেয়েরা কলেতে কাচের বাসন প্রস্তুত করিতেছে, মেয়েরা কলেতে grain bag, bureau cover প্রস্তুত করিতেছে, মেয়েরা Automatic grey cotton loom চালাইতেছে, তাহারা heel breasting machine চালাইতেছে। কোন মেয়ের apron এর উপর এক খণ্ড কাগজে লেখা রয়েছে—"I am single", কাহারও লেখা রয়েছে "I am married"—ইত্যাদি। আমি এ সমস্ত তামাসা দেখিতেছিলাম আর হাসিতেছিলাম। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে ঐ সমস্ত ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মেয়েরা হাজার হাজার দর্শকবৃন্দের সম্মুখে লজ্জা না করিয়া কাজ করিতেছে, কেহবা ঘণ্টায় ৩৲ টাকা কেহবা ঘণ্টায় ৯৲ টাকা করিয়া পায়। তাহাদের পোষাক ও গলার bead দেখেন তো অবাক হইবেন।

তারপর আর একদিন Toronto বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Y. M. C. A তে গিয়াছিলাম তাহাতে অনেক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। এখানে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন সর্ব্বপ্রথম ভারতের প্রতিনিধি-স্বরূপ আসিয়া "ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অনেকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তারপর আর একদিন প্রাতে আমার পূর্ব্বপরিচিত মিস্ বায়রন্ নামে একটি Unitarian Christian মহিলার নিকট দেখা করিতে যাই, আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ring করিবামাত্র চাকরাণী নিম্নে আসিয়া visiting card উপরে লইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

রাচি ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৎপরে আমরা দিনকতকের নিমিত্ত ডুরেণ্ডায় গমন করিয়াছিলাম। এই ডুরেণ্ডা রাঁচি হইতে তিন মাইল। মধ্যে একটী সেতু আছে, সেইটী অতিক্রম করিলেই ডুরেণ্ডার সীমানা আরম্ভ হয়। বিস্তীর্ণ-ক্ষেত্ররাজির উপরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারিগণের নিমিত্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ডুরেণ্ডা রাঁচি হইতে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও আরও অধিক স্বাস্থ্যকর। এক এক লাইনে ১৬ খানি করিয়া বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রত্যেক বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে তাহার স্বজাতির সহিত বাস করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। Christian quaters এ Christianগণ থাকেন, Behari quarters এ Behari থাকেন, Brahmo quarters এ ব্রাহ্মগণ থাকেন। এইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে

থাকিলেও সকলের মধ্যে বেশ একটী সৌহার্দ্দভাব দেখা যায়।

ইহার কিয়দ্দূরে ৬৪ মহল অর্থাৎ ৬৪ খানি বাটী এক শ্রেণীতে নির্ম্মিত। ডুরেণ্ডার এক মাইল দূরে হিনু বলিয়া স্থান অবস্থিত। এই স্থানেও অনেক কর্ম্মচারী পরিবার সহ অবস্থান করেন। এই ডুরেণ্ডায় যে বাটীতে আমরা অবস্থান করিতেছিলাম, উহার পশ্চাদ্‌ভাগেই গুর্খা সৈন্যদের হাঁসপাতাল, আহত সৈন্যগণ এই স্থানে সেবার নিমিত্ত আগমন করে। উহার সম্মুখেই প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ মাঠে সকলে ভ্রমণ করেন। মাঠের মধ্যে Golf field আছে। প্রায়ই বৈকালে দেখিতাম সাহেবেরা Golf খেলিতেছেন। এই মাঠের মধ্যস্থানে একটী কৃত্রিম মৃত্তিকার পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ঢিপি আছে। গুর্খা সৈন্যগণ এই মাঠে ড্রিল করে ও বন্দুকাদি ছুড়িতে অভ্যাস করে। এই ঢিপির উপরে যিনি সৈনিকদলের নেতা তিনি দণ্ডায়মান থাকিয়া কে কেমন ছুঁড়িতেছে অবলোকন করেন। বন্দুক ছুঁড়িলে এই মৃত্তিকাময় ঢিপির গায়ে গুলি লাগে। ইহা একটী আবরণ স্বরূপ; যাহাতে গুলি অপর কাহারও গাত্রে না লাগে তন্নিমিত্ত এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহার পশ্চাতেই সুবর্ণ রেখা ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। তখন উহা শুষ্ক থাকায় বালুকারাশি দ্বারা পূর্ণ ছিল। এই মাঠ হইতে ষ্টেশন অতি নিকটে, নদীটী অতিক্রম করিলেই ষ্টেশন দেখা যায়।

ডুরেণ্ডার অতি নিকটেই Secretariat Office, এই স্থানেই সকল কর্ম্মচারী কাজ করেন। এই office অতি বৃহৎ চতুর্দ্দিকে উদ্যান বেষ্টিত, ইহার সম্মুখে একটী ফটক, পশ্চাতে আর একটী ফটক আছে।

এই ডুরেণ্ডায় অবস্থান কালে আমরা একদিন জগন্নাথপুরের পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম। Ranchiতে খুব সুন্দর ল্যাণ্ডো ভাড়া পাওয়া যায়। তাহাতে আরোহণ করিলে মনে হয় না যে, ভাড়া করা ল্যাণ্ডোয় আরোহণ করিয়াছি। ঘোড়া দুইটী সতেজ ও বলবান্ ও দ্রুতগতিতে চলে। ল্যাণ্ডোর মধ্যে বসিবার স্থানও অতি সুন্দর, ঠিক মনে হয় কাহার বাড়ীর ল্যাণ্ডো। আমাদের কলিকাতার ভাড়া করা ফিটন অপেক্ষা ইহা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট।

আমরা ঠিক করিলাম, পাহাড় দেখিতে যাব, কিন্তু বৈকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল ও বড় ঝড় উঠিল। সকলে বলিলেন যাওয়া হইবে না। আমরা কিন্তু নিরস্ত হইলাম না। গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা সেই বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিয়া Waterproof ছাতি ইত্যাদি লইয়া চলিলাম। কিয়ৎদূর গমনের পর, পবনদেব যখন বুঝিলেন, যে তাঁহার বিক্রমকে আমরা অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম, তখন তিনি ক্ষান্ত হইলেন, ঝড় ও বৃষ্টি কামিয়া গেল। দুই ধারে ধান্য ক্ষেত্র, মধ্যস্থান দিয়া রাস্তা। আমা-

দের ল্যাণ্ডোর উপরটা ঢাকা ছিল, বৃষ্টি কমিতেই সেই ঢাকা খুলিয়া দেওয়া হইল, দূর হইতে এই জগন্নাথপুর পাহাড় দেখিতে পাইলাম, মনে হইল শুধু বুঝি একটী মৃত্তিকার টিপি। যত নিকটে যাইতে লাগিলাম, তত স্পষ্টরূপে ইহা দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার পর আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর পদব্রজে গমনপূর্ব্বক পাহাড়ে আরোহণ করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যেও সিড়ির ধাপ আছে। সুতরাং আরোহণ করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। উপরে উঠিলাম, উঠিয়া দেখি সম্মুখেই প্রবেশপথ, আর চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, ঠিক যেন মনে হয় একটী দুর্গ। যাহা হকউ ঐ প্রবেশপথদ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই একটী মন্দির, তাহার ভিতর বিগ্রহ রহিয়াছে, এই বিগ্রহের প্রত্যহ পূজা হয়। মন্দিরগুলির গাঁথুনি এখনও খুব দৃঢ়, অথচ ইহা কোন কালে নির্ম্মিত হইয়াছে, কি শক্ত গাঁথুনি। পশ্চাতে আরও দুইটী মন্দির দেখিলাম। একটীর চূড়া এত উচ্চ যেন মনে হইতেছে, আকাশকে স্পর্শ করিতেছে। পুরাকালের এই মন্দিরসমূহের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রবেশপথের সম্মুখেই যে মন্দির, তাহার মধ্যে জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ভিতরে একটু অন্ধকার, দেখিলাম পূজারী বসিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, পশ্চাতে কয়েকটী ক্ষুদ্র গুহা অবলোকন করিলাম, সে সমূহ এত অন্ধকারময় যে ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, বাহিরে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিলাম। চারি ধারে বন্যবৃক্ষ-সমূহ দণ্ডায়মান, সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে ধরণীকে তামসজালে আবৃত করিতেছিলেন, বিহঙ্গকুল যে যার নীড়ে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু হৃদয়ে কেমন একটা ম্লানভাব আনয়ন করিল। বৃক্ষে ঝিঁঝিঁ রব ধ্বনিত হইল, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই ঝিল্লিরবই শুদ্ধ শ্রবণ করা যাইতেছিল। দূরে বংশীধ্বনি হইতেছিল, হয়ত নিকটবর্ত্তী গ্রামের কৃষকপুত্রগণ সেই অপূর্ব্ব মুরলী ধ্বনিত করিতেছিল। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা এবং সেই স্থানের নিস্তব্ধতা উভয়ে মিলিত হইয়া গাঢ়তররূপে নীরব ভাব ধারণ করিল। সন্ধ্যা-সমীরণ ধীরে ধীর প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার স্পর্শে কেমন একটা কোমলতার ভাব প্রাণে জাগরিত হইল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে অবতরণপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় গন্তব্যস্থানে গমন করিলাম।

কিয়ৎদূরে গমন করিয়া আর একটী টিপি দেখিতে পাইলাম, পরম্পরায় অবগত হইলাম যে উহা "জগন্নাথের মাসীর" বাটী। মাসীর বাটীর কি বাহার। এ বাটী দর্শনে হাসি আর থামাইতে পারিলাম না। তৎপরে আমরা গৃহে ফিরিলাম। বাটীর সকলে ভাবিয়াছিলেন আমরা বৃষ্টিতে ভিজিয়াছি। কিন্তু যখন শুনিলেন আমরা কিছুমাত্র ভিজি

নাই, তখন তাঁহারা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

এইবার আর কয়েকটী কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব, বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই।

পরদিন ঠিক করিলাম সুবর্ণরেখা নদী দেখিতে যাইব। তখন যদিও নদীতে জল ছিলনা তবু একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। সে দিনও পূর্ব্বদিনের ন্যায় পুনরায় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম। গমনকালে ল্যাণ্ডোর ঢাকা আর খোলা হয় নাই, কারণ অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু যখন নদীর নিকটে উপস্থিত হইলাম তখন বৃষ্টি থামিয়া গেল। এই নদীর উপর দুইটী প্রকাণ্ড সেতু। একটী সেতু জনসাধারণ ও গাড়ী প্রভৃতি যাইবার জন্য নির্ম্মিত। ইহার উপর বেশ সুন্দর প্রসস্ত রাস্তা। উহার আর একটু পাশে আর একটী সেতু, ইহার উপর দিয়া রেলের লাইন চলিয়া গিয়াছে। এই সেতুতে কাহারও উঠিবার অধিকার নাই। একটী কাষ্ঠফলকে লেখা আছে "এই সেতুর উপর উঠা নিষেধ।" উহার উপর দিয়া রেলের লাইন গমন করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় রেল-কোম্পানী এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া পাশ দিয়া সেতুর নিম্নে গমন করিলাম। তখন নদীর জল নাই বলিলেই হয়। বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড ছিল, তাহার উপর উপবেশন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিবার পর দেখিলাম কোথা হইতে নির্ম্মল জলরাশি ঐ স্থানে আসিতেছে। আমরা ও কয়েকজন সঙ্গী, কোথা হইতে ঐ জল আসিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলাম। দেখিলাম আমরা যেখানে বসিয়া রহিয়াছি তাহার সম্মুখে অদূরে কোথা হইতে কুল কুল স্বরে জল আসিতেছে, কিন্তু উহার পথ কোথায় তাহা জানি না। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আমরা একবার জলের মধ্যে আর একবার পাথরের উপর পদক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলাম। অন্যান্য সকলে প্রথমে আমাদের যাইতে বারণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে স্থান হইতে জল আসিতেছে সে স্থানে যাইতে হইলে অতি সাবধানে যাইতে হয়। আমরা আস্তে আস্তে কিয়ৎদূর গিয়া দেখিলাম দুধারেই তীর, মধ্যে ঠিক আমাদের পয়ঃপ্রণালীর ন্যায় সরু একস্থান হইতে উক্ত নির্ম্মল জলরাশি নির্গত হইতেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণের পর দেখিলাম দুইখানি প্রস্তরখণ্ড বক্রভাবে অবস্থিত, তাহার নিম্নে সুড়ঙ্গের ন্যায় এক স্থান হইতে জল আসিতেছে, এইটী আবিষ্কার করিয়া আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তৎপরে দেখি, আমাদের অন্যান্য সমভিব্যাহারিগণ যখন দেখিলেন আমরা একটা কিছু আবিষ্কার করিয়াছি, তাঁহারাও সেই স্থানে আসিলেন। ঐ স্থানে অনেক প্রস্তরঢিপি ছিল, আমরা সকলে উহাতে উপবেশন করিয়া ঐ জলরাশির নির্গমপ্রণালী-

দেখিতে লাগিলাম। ঐ স্থানে উপবেশন-কালে অদূরে নদীর অপর তীরে একটী নূতন বাটী নির্ম্মিত হইতেছে দেখিলাম। এই নির্জ্জন স্থানে কাহার বাটী নির্ম্মাণ হইতেছে জানিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইলাম যে Veterinary College নির্ম্মিত হইতেছে। Buildingটী দূর হইতে আমাদের Prinsep's Ghat এর মত দেখাইতেছিল। এই স্থানে উপবেশন করিয়া যে কি সুন্দর সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলাম তাহা বর্ণনাতীত। পশ্চিমগগনে ভানুদেব অস্তগমন করিতেছেন, সমস্ত গগন সোণালী রং দ্বারা রঞ্জিত হইল, ক্রমশঃ ঈষৎ লোহিত তৎপরে গাঢ় লোহিত, ক্রমে সিন্দুর বর্ণ ধারণ করিল। সেই আলোক জলের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া কি এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিল। রাঁচি পাহাড়ে একদিন সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তদপেক্ষা সুবর্ণরেখার তীরে যে কি মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। ক্রমে ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব কেমন সুন্দরভাবে অস্ত গমন করিলেন। সহরে অবস্থান-কালে এরূপ সৌন্দর্য্য-দর্শন হইতে আমরা বঞ্চিত ছিলাম।

এই সকল উন্মুক্ত স্থানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে বড়ই মনোহর। সূর্য্যের অস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে "দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন" এই গানটীর কথা মনে হইল। বাস্তবিক, ঐ গানটীর সহিত স্বভাবের কি সম্বন্ধ তাহা সেদিনই প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিলাম। "আয়ুঃসূর্য্য" প্রকৃতই অস্ত যায়, ঐ সময়ের পক্ষে এই গানটী এত উপযোগী ও এত হৃদয়স্পর্শী, যে সকলেরই উহা ভাল লাগিল।

আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই। Woodro Falls দেখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, দেখিতেও যাইতাম, কিন্তু সময়ের অসঙ্কুলান বশতঃ যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। পুনর্ব্বার যদি কখনও গমন করি তবে দেখিয়া সাধ মিটাইব। এই Falls ২১ মাইল দূরে অবস্থিত এবং এরূপ মনোরম ও রমণীয় যে তাহা অবর্ণনীয়।

রাঁচিতে আর বিশেষ কিছুই দেখিবার নাই। Roman Catholicদের Roman Mission Church, ইহা স্বতন্ত্র; Englishদের English Mission Church, এই Churchটীতেই অধিকাংশ Christian গমন করেন। এতদ্ভিন্ন একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহাতে সহরের সকল ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণই যোগদান করেন।

এই স্থানে আমার প্রবন্ধ শেষ করিলাম। অনেক ত্রুটী আছে, সহৃদয় পাঠিকাগণ সেই সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কুমারী মণিকা রায় চৌধুরী।

ভারতের ফল, এবং তাহা সংরক্ষণ করিবার উপায়।

Wealth of India নামক মাসিক পত্রে মিঃ, পি, এম্, ভেনকাটারাম আয়ার মহাশয় ফল-সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "কাজের লোক" নামক পত্রে ফলসংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন। অদ্য ভেনকাটারাম আয়ার মহোদয়ের প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। "কাজের লোকে" প্রদত্ত প্রণালী এবং ইহার প্রণালীতে বিশেষ পার্থক্য নাই, পাঠকগণ পাঠ করিয়া তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ফলকথা, ভারতের বিবিধ প্রকারের ফল অন্যদেশে দুর্লভ, যদি ফল সংরক্ষণ করিয়া ভারত হইতে বিদেশে সেই সকল সংরক্ষিত ফল চালান কারবারের উন্নতি বিধান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের অর্থস্বাচ্ছল্য হইতে পারে। সেই জন্য কথাটার পুনরায় অবতারণা করিতে চাহি। ইহা যে বিশেষ লাভজনক শিল্প এবং ব্যবসায়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আম, আনারস, লিচু, কলা এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার ফলের সংরক্ষণ করিতে পারিলে বিলাতে পাঠাইয়া প্রচুর ধনাগমের পন্থা করা যাইতে পারে। এদেশে আমের চাট্নী প্রভৃতি বিলাতে সাদরে বিক্রয় হইয়া থাকে, স্বর্ণপ্রসূ ভারতে সমস্তই আছে, নাই কেবল উদ্যোগী উদ্ভাবন-শক্তিবিশিষ্ট মস্তিষ্ক। এই জন্যই আমরা পরমুখাপেক্ষী। শিল্পের আলোচনার দিকে আদৌ দেশটার প্রবৃত্তি নাই, শিল্পের সাহিত্য সাহিত্যমধ্যে এদেশে গণ্য হয় না, সেইজন্য নাটক নভেলের সাহিত্য অপেক্ষা শিল্প সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনে একদিন আমরা উপস্থিত ছিলাম, সেখানে শিল্পবিষয়ক সাহিত্যের কোন গবেষণাই হয় নাই। কোন ভদ্রলোক তাঁহার একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয় পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, অনেক জনসমাগম, বড় বড় প্রবন্ধ পাঠের আড়ম্বরে বালক কিছুই বুঝিতে পারে নাই বোধ হয়। তাহার দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "দাদু, সাহিত্যিক" কাহাকে বলে, দাদা মহাশয় বিপদে পড়িলেন, আমরাও পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম—বালকের এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি উত্তর দিলে বালক বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। ইত্যবসরে বৃদ্ধ দাদামহাশয় বলিলেন, কি জান সতুবাবু! যাঁহারা ভাষার গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারাই সাহিত্যিক, আর সরল ভাষাকে যাঁহারা বড় বড় দুর্ব্বোধ্য কথায় বেশ জটীল করিয়া দিতে পারেন, তাঁহারাই হইলেন বড় সাহিত্যিক। দুর্ভাগ্যের, বিষয় সতুবাবু

বৃদ্ধের কথাটা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, সে বলিল, দাদু আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দাদা মহাশয় বলিলেন—আমিও ভাল বুঝিতে পারি নাই, তা তোমাকে বুঝাইব কি? চল বাড়ী যাই। দেশের সাহিত্যচর্চ্চা নিশ্চই দেখিতে শুনিতে, দেখাইতে শুনাইতে ভাল কথা সন্দেহ নাই, সাহিত্যের উন্নতি কে না চায়, কিন্তু শিল্পবিষয়ক সাহিত্যের আলোচনা কি একেবারেই অস্পর্শীয় বিষয়? পাশ্চাত্য দেশের শিল্পবিষয়ক সাহিত্য হইতে এদেশের সাহিত্যভাণ্ডার পরিপুষ্ট হওয়া উচিত। ক্রমাগত অসার উপন্যাস এবং নাটকে দেশটা পরিপূর্ণ করিবার প্রশ্রয় দেওয়ায় দেশে এক শ্রেণীর অলস অকর্ম্মণ্য লোক গঠিত হয় মাত্র। এটা কথা প্রসঙ্গে তুলিলাম মাত্র, আমরা সাহিত্যিকও নহি, সাহিত্যের সমালোচনা করিবার ক্ষমতাও রাখি না। যাক্ কথায় কথায় অন্য বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তজ্জন্য পাঠক এবং সাহিত্যিকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

ফল সংরক্ষণের জন্য অধিক মূলধন এবং পেটেণ্ট যন্ত্রাদির সাহায্য না লইলেও কতকগুলি মোটামুটী প্রণালী জানিলে সাধারণ লোকেও ছোট রকমের কারখানা করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই কার্য্য চালাইতে হইলে একটা সস্‌প্যান বা কড়াই, একটা কেট্‌লী অথবা সেইরূপ কোন একটা জল গরম করিবার পাত্র আবশ্যক।

বোতলের কথা।

বিদেশে দেশের সংরক্ষিত ফল চালাইতে হইলে বোতলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপাদান। দীর্ঘকাল ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে বোতলগুলি সম্পূর্ণভাবে এয়ার টাইট্ বা বায়ুঅবরোধক হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভিতরে বাতাস ঢুকিলে সংরক্ষিত ফল নষ্ট হইয়া যাইবে। এই এই কাজের জন্য মুখে রবার দেওয়া কাচের ছিপি দেওয়া বোতল বাজারেও খরিদ করিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বোতল ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বারম্বারও ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

সিরাপ বা সরবতের কথা।

অনেকের ধারণা আছে যে, ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে সিরাপ একটা অপরিহার্য্য সামগ্রী।

সাধারণ বিশুদ্ধ জলও সিরপের ন্যায় উপযোগী। স্বচ্ছ সিরপেরও আর একটী দোষ ইহা যথেষ্ট তরল এবং স্বচ্ছ হইলেও ফলের স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট করিয়া দেয়। সেই জন্য সিরপ বা চিনি একেবারেই না ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। যদিই ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এক কোয়ার্ট অর্থাৎ ৩ পোয়া আন্দাজ জলে মাত্র ১ পাউণ্ড অর্থাৎ অর্দ্ধ সের মাত্র চিনি দেওয়াই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। আরও একটা কথা, যদি চিনি ব্যবহারই করিতে হয় তাহা হইলে কখন Raw Sugar বা আস্তচিনি ব্যবহার করা উচিত নয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা যে সরবৎ বা সিরপ হইবে,

তাহা অপরিষ্কার হইবে। যাহাকে বাজারে পরিষ্কৃত চিনি বা White Lump Sugar বলে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। ইহা দ্বারা প্রস্তুত সিরাপ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া থাকে।

ফলের কথা।

ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে কি প্রকার পরিপক্ক ফল ব্যবহৃত হওয়া উচিত, তাহাও আলোচ্য বিষয়, কারণ ফলের পকাবস্থার উপর সংরক্ষিত ফলের আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে। যে সকল ফল বোতলে সংরক্ষিত হইবে তাহা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়া উচিত নয়, একটু ডাঁটো থাকা ভাল, তাহা হইলে যখন চিনিতে পাক হইয়া, দানাদার হইবে, তখন সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে না। আবার ফল একেবারে কাঁচা হইলেও সুবিধা হয় না এবং খুব সুপক্ক হইলেও চলে না।

যে জলে ফলগুলিকে সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা অবশ্যই কোনক্রমে ফারেণহিট তাপমানের ২০০° ডিগ্রীর অধিক উত্তাপ-বিশিষ্ট হওয়া উচিত নহে। ১৯০ উত্তাপ হইলেই ভাল হয়। সেইজন্য জলের এই উত্তাপ স্থির করিবার জন্য একটা থারমোমিটার অতি অবশ্যই রাখিতে হয়।

ফলের অবস্থা।

যে সমুদয় ফলকে সংরক্ষণ করিতে হইবে সে সকল ফল বেশ পুষ্কল ও নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক, পচা কাঁচা অপরিপক্ক ফল সংরক্ষণের অযোগ্য। ফলগুলিকে সংরক্ষণ করিবার পূর্ব্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়া মুছিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, তাহার বোঁটা বাদ দিতে হইবে, তাহার পর সমস্ত ফলগুলিকে বাছাই করিয়া সমান আকৃতির ফলগুলিকে পৃথক করিতে হইবে। কারণ একই বোতলে ছোট বড় ফল সংরক্ষণের অনেক অসুবিধা হইয়া পড়ে। দেখিতেও ভাল হয় না এবং যখন চিনির রস দ্বারা sterlize বা দানাদার করা হয়, তখন সমান আকৃতির ফল না হইলে কোন স্থানে রস বা সীরপ অধিক জমা হইয়া পড়ে; কোন স্থানে রস সমান পায় না। এই একটী বিশেষ দোষ হইয়া পড়ে সুতরাং সমান আকৃতির ফল বাছাই করিয়া লইলে অনেক সুবিধা।

বোতল বা টীন পূর্ণ করিবার প্রণালী।

এইটিই এই কার্য্যের বিশেষ আবশ্যক বিষয়। কারণ এই কার্য্যের সুচারু বন্দোবস্তের অভাবেই সংরক্ষিত ফল অল্প দিনেই নষ্ট হইয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, ফলধারী বোতল পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে যে বায়ু প্রবেশ রোধ করা যাইতে পারে, এরূপ গ্লাস-ষ্টপার দেওয়া বোতলের আবশ্যক, বোতলের মুখেই কাচের স্ক্রু দেওয়া ছিপি বিশিষ্ট এবং রবার দেওয়া বোতল বীজ ও ফল সংরক্ষণের জন্য বাজারেও ক্রয় করিতে পারা যায়। কলিকাতার চীনাবাজারে শিশি বোতলের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

এই বোতলের ভিতর সমান আকৃতির ফলগুলি বিশেষ সুবন্দোবস্তের সহিত সাজাইয়া লইতে হইবে, একটা কাষ্ঠখণ্ডের শলাকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়া তাহা দ্বারা স্তরে স্তরে সাজাইয়া লইতে হয়, কারণ বোতলের ভিতর হাত প্রবেশ করান সম্ভব নহে।

বোতলের গলা পর্যান্ত ফলগুলিকে সাজাইতে হইবে এবং তাহার পর শীতল জল দ্বারা অথবা সীরপ দ্বারা বোতল পূর্ণ করিতে হইবে। সীরপ না দিবার বাসনা হইলেই শীতল জল দিয়া উপরের স্ক্রু ওয়ালা ছিপি আঁটিয়া দেওয়া উচিত, যাঁহারা সীরপ দিয়া ফল সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত উপায়ে সীরপ বা রস প্রস্তুত করিয়া ঐ সুসজ্জিত ফলের উপর ঢালিয়া দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিতে পারেন।

লোফ সুগার বা
দানাদার সাদা চিনি—১ পাউণ্ড অর্দ্ধ সের
জল (পরিষ্কার)—১ কোয়ার্ট বা আন্দাজ
৩ পোয়া

অগ্নিতে একটা এনামেলের কটাহে বা মৃত্তিকা পাত্রে দিয়া গলাইয়া ইহার গাদ কাটিয়া রস বা সীরপ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে ;

তাহার পর দানাদার করিবার কথা।

একটা সস্প্যান বা কটাহ সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা এরূপ পরিমাণ গভীর হওয়া উচিত, যেন বোতলের গলা পর্য্যন্ত এই কটাহের জলে নিমগ্ন থাকিতে পারে। তাহার পর একখানা অর্দ্ধইঞ্চি পরিমিত মোটা কাষ্ঠের তক্তাকে উপ-রোক্ত প্রকারের কটাহের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, যদি তক্তা না দিয়া কটা-হের উপরই বোতল স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলে বোতল উত্তাপে ফাটিয়া যাইতে পারিত, সেই জন্য যাহাতে উত্তপ্ত কটাহের সম্পূর্ণ তাপ বোতলে না লাগিতে পারে, একখণ্ড তক্তা দেওয়ার ব্যবস্থা। উক্ত তক্তার উপর যখন বোতলগুলি স্থাপিত হইবে, তখন যেন কোনরূপে বোতলগুলি গায়ে গায়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া না যায়, তজ্জন্য বোতলগুলির মধ্যস্থলে খড় দিতে হইবে। এখন স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লৌহ কটাহের জল এবং বোত-লের মধ্যে সীরপের বা জলের উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। যদি কেটলীর জল ৫০ ডিগ্রি ফারনহিট্ হয়, তাহা হইলে বোতলের ভিতরের ৪০ ডিগ্রি হইবে। সেইজন্য উত্তাপ মৃদুভাবে বৃদ্ধি হওয়া উচিত। এখন উপরোক্ত উপায়ে বোতলে সীরপ দিয়া কটাহের মধ্যস্থ কাষ্ঠের তক্তার উপর বোতলগুলি কর্ক বা ছিপি যথাযোগ্য আঁটিয়া স্থাপন করিয়া তাহার পর কটাহে এরূপ পরিমাণ জল দিতে হইবে, যেন সেই জল বোতলের গলদেশ বা ছিপির ঠিক নিম্ন পর্যান্ত দিতে পারে। তাহার পর কটাহের নিম্নে অগ্নির উত্তাপ দিয়া ১৬৫° ডিগ্রি হইতে ১৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ ক্রমে

ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া তুলিতে হইবে। ফলের পক্কতা অনুযায়ী কখন কখন উত্তাপের তারতম্য করিয়া লইবার আবশ্যক হয় তবে ১৬০° ডিগ্রি হইতে ১৯০ উত্তাপ সর্ব্বাবস্থাতেই যথেষ্ট। উত্তাপ ১৯০ পর্য্যন্ত উঠিবামাত্রেই কটাহকে অগ্নি হইতে নামাইয়া যদি স্ক্রু বিশিষ্ট বোতল হয়, তাহার স্ক্রু গুলি টাইট করিয়া আটিয়া দিতে হইবে, তাহার পর ১৫।২০ মিনিট —১৬৫ ছোট ফলের জন্য এবং ১৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত বড় ফলের জন্য উত্তাপ ঠিক রক্ষা করা উচিত।

এরূপে ভিতরের বায়ু-প্রবেশ বন্ধ হইবে। বায়ু-প্রবেশ রোধ না করিতে পারিলে ফল সংরক্ষণ সুসম্পন্ন হইল না, বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, চিনি বা জল উভয় দ্বারাই ফল উপরোক্ত উপায়ে সংরক্ষণ করিতে পারা যায়।

"কাজের লোক" হইতে উদ্ধৃত।

শিশু জীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

কিণ্ডার গার্টেনের দ্রব্য

ফ্রোবেলের ধারা মতে শিশুশিক্ষা স্বাভাবিক গতির সঙ্গে সমতালে হওয়া উচিত। শিশুকে কোন বিষয় শুধু কেবল কথা দ্বারা বাহিরে বাহিরে শিখানর আবশ্যক নাই। সে সকল বিষয় নিজ চক্ষে দেখিবে, বুঝিবে, কল্পনা করিবে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে এই তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাই সকল দ্রব্য কেবল কথাদ্বারা না শিখাইয়া শিশুকে কাজের দ্বারা উহার অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিণ্ডার গার্টেনে চিন্তা, কর্ম্ম, জ্ঞান ও মনোবৃত্তির চালনা সমস্তই এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা শিশুজীবনের প্রথম কাজ। খেলা করা, গড়া, পেটা, ভাঙ্গা শিশুজীবনের প্রথম নিয়োগ। সেই কারণে ঐ কালেই তাহার ভবিষ্যৎ পরিশ্রম ও দক্ষতার ভিত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

শিশুর পুষ্টিসাধন সর্ব্বদা গতিশীল হইবার জন্য প্রথমে অতি সরল দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিতে হয়, ক্রমে শিশুর বয়সের সঙ্গে ঐ খেলার সামগ্রী সকলও ক্রমে স্বাভাবিক দ্রব্যের বিকাশের ন্যায় জটিল হইয়া আসে। ঐরূপে একটী দ্রব্যের জ্ঞান শিশুকে পরেরটীর জন্য প্রস্তুত করে। পরে বালক বালিকারা যখন বড় হইয়া কাঠের দ্বারা বাড়ী নির্ম্মাণ ইত্যাদি কাজ নিজেরাই করিতে শিখে, তখন তাহারা ইচ্ছামত নানারকমের বড় ছোট নূতন প্রকার বাড়ী পোল বা কল কাঠের দ্বারা তৈয়ার করিতে শিখে। ঐরূপ কর্ম্মের দ্বারা তাহাদের বোধ শক্তি, কল্পনাশক্তি

আবিষ্কার ও চিন্তাশক্তির পুষ্টিসাধন হয় এবং হস্ত ও চক্ষু এককালে কার্য্যতঃ কর্ম্মে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হয়। ক্রমে শিশু একরূপ জড় অবস্থা হইতে মনের কর্ম্মক্ষম অবস্থায় উপস্থিত হয়। সে নিজে যে সকল আকৃতির কল্পনা করে তাহাই নির্ম্মাণ করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে। এইরূপ স্বেচ্ছাপুর্ব্বক চেষ্টা দ্বারা শিশুজীবন স্বতন্ত্র কাজের দিকে অগ্রসর হয়।

কিণ্ডর গার্টেনের অন্যান্য ক্রীড়া ও কার্য্যের ন্যায় নির্ম্মাণ কার্য্যেও উপযুক্ত নিয়ম ও ধারা মতে চলা উচিত। মনোবৃত্তি সকলের নিয়মিতরূপে পুষ্টির সঙ্গে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা ও সঠিক জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করা ঐ শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য। আরও অপরের স্বত্বরক্ষা, শান্তি, বন্ধুতা ও সহায়তা করা প্রভৃতি সামাজিক গুণের ও ইহা দ্বারা অনুশীলন হয়। প্রত্যেক বালক বা বালিকা কেবল নিজ নিজ নির্ম্মাণ দ্রব্য লইয়াই খেলিতে শিখিবে, ঐ সকল দ্রব্য ভাঙ্গা বা নষ্ট করা, অপরের দ্রব্যে হাত দেওয়া বা অন্যের ঘর ভাঙ্গিয়া দেওয়া কিম্বা নিজের কাজ ও দ্রব্যগুলি এলোমেলো করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখা প্রভৃতি অনিয়মে কখন প্রশ্রয় পায় না।

আকার, পরিমাণ, সংখ্যা ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে উত্তমরূপে জ্ঞান জন্মাইলে চিত্রবিদ্যায় শিশুর মনকে আকৃষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে শ্লেটের উপর সরল পাতার আকার হইতে গাছ পালা, কুকুর, বিড়াল, প্রভৃতি জীবন্ত দ্রব্য আঁকিতে শিখে। যে সকল রেখা কোণা আদি সে কিউবে শিখিয়া ছিল, সেই সব রেখা ও কোণা সে শ্লেটে আঁকে, কাজেই ঐ সকল জ্ঞান তাহার মনে দৃঢ়রূপে বসিয়া যায়।

২

কিণ্ডরগার্টেনের শিক্ষার মতে শিশুর যে সকল স্বাভাবিক গুণ জাগিয়া উঠে, তাহা সচরাচর তাহাদের সমস্ত জীবনের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হয়। আর কোনও কোনও শিশু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী না হইলেও অতি শিশুকাল হইতে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় জন্য তাহাদের কাজের অভ্যাস এরূপ অন্তরের মধ্যে বসিয়া যায় যে প্রাপ্ত বয়সে অলস বা অকর্ম্মণ্য হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সেই কারণে যে সকল শিশু মস্তিষ্ক চালনাদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইবে, তাহারা হস্তচালনার দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারিবে।

কিণ্ডরগার্টেনের ধারামতে শিশুশিক্ষা এত উপকারী যে আমাদের দেশে যাহাতে উহার প্রচলন হয় সে বিষয়ে প্রত্যেক পিতামাতার একান্ত যত্ন করা আবশ্যক। আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্নেহময় ও সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী হিন্দু পিতামাতারা একবার উহার মর্ম্ম ও সুফল বুঝিতে পারিলে শিশুদিগকে ঐ শিক্ষালয়ে

পাঠাইতে কখনও অবহেলা করিবেন না।

তিন চার বৎসর হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার সময়, পরে তাহাদের মন যত বিকশিত হয় তত তাহাদের গভীর শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং তখন কিণ্ডারগার্টেন ছাড়িয়া বালকবালিকার স্কুলে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু ঐ শিক্ষালয় ছাড়িলেও পিতামাতারা মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষা শেষ হইয়াছে। বরং শিশুর পরিপক্ক অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কিণ্ডাগার্টেন তাহার মন ও শরীরকে প্রস্তুত করিয়াছে মাত্র। এখন শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কাজ পিতা মাতার বা শিক্ষকের নিকট সহজ হইয়া আসিবে। ঐ ধারামতের শিক্ষা দ্বারা শিশুর যে সকল জ্ঞান ও কর্ম্ম-শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে, বাড়ীতে পিতা মাতার শিক্ষাদ্বারা তাহা অধিকতর সম্পূর্ণ করা আবশ্যক।

অনেকে বলিবেন, ধনী ও মধ্যবর্ত্তী লোকেরা অনায়াসে তাঁহাদের সন্তানদিগকে কিণ্ডারগার্টেন-স্কুলে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহাদের সন্তানদিগকে ওরূপ শিক্ষা কি প্রকারে দিবে? শিশুদিগকে কিণ্ডারগার্টেনের ধারা মতে শিক্ষা দিতে হইলে যে, কোন কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পাঠাইতে হইবেই, এরূপ নয়। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যখন উহা এ পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই, আর প্রতি গ্রামে ও নগরে বা পাড়ায় উহার স্থাপন করিয়া ধনী দরিদ্র সকল বালকবালিকা-দিগকে সমানভাবে শিক্ষা দিবার এখনও যে কত বিলম্ব আছে তাহার ঠিক নাই। সে জন্য প্রত্যেক পিতামাতার কাছে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে তাঁহারা নিজ নিজ বাটীতে এক একটী ঘর শিশুদের খেলার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন ও তাহাদের মন বুঝিয়া তাহাদের ইচ্ছামত খেলা ও নির্ম্মাণদ্রব্য কিনিয়া খেলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কাজ ও জ্ঞান শিক্ষা দিন; তাহা হইলে কিণ্ডারগার্টেনের ফল অনেকটা আমাদের ভারতবর্ষীয় পরিবারেও দেখা যাইবে। ধনী লোকেরা সন্তানদের খেলানা ও পুতুল ইত্যাদিতে কত অর্থ নষ্ট করেন, সে স্থলে গোটাকতক রবরের ও কাঠের গোলা ও কতকগুলি গঠনোপযোগী কাঠ কিনিয়া শিশুদিগকে কাজে নিযুক্ত রাখিলে তাঁহারা অবিলম্বে উহার মহাফল দেখিতে পাইবেন। আর গৃহস্থ ও দরিদ্র পিতামাতার প্রতি আমার এই বক্তব্য যে, বোধ হয় আমাদের দেশে এমন পিতামাতা কেহই নাই, যাঁহারা সন্তানদিগকে খানকতক ছেঁড়া কাগজ ও কাঠের টুক্‌রা যোগাড় করিয়া দিতে অপারক। ঐ সামান্য দ্রব্য লইয়া সন্তান যতই দুষ্ট ও কলহপ্রিয় হউক না, সে আনন্দে কাজ আরম্ভ করিবে। শিশু দুষ্টামি ছাড়িয়া

একটী কোণে মাদুরে বা মাটীতে বসিয়া কাগজ দিয়া কত রকম জিনিষ গড়িবে, আর কাঠের পর কাঠ সাজাইয়া বাড়ী তৈয়ার করিবে।

ধনী ও শিক্ষিত লোকদিগের সন্তানেরা যেমন তাহাদের চারিদিকের মার্জ্জিত আচার ব্যবহার দ্বারা কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, সেইরূপ গরীব লোকদিগের সন্তানেরা সরলতার আধিক্য ও বিলাসের অভাব বশতঃ ঐ জ্ঞানশিক্ষার জন্য অধিকতর প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, শৈশবকালে ধনী ও দরিদ্র, বা শ্রেণী ও জাতিজ্ঞান বালকবালিকাদিগের মনে জন্মায় না। সে জন্য তাহাদের অন্তরে কোন প্রভেদ হইবার কারণ নাই। বিশেষ অনেক সময় অতিরিক্ত বিলাস বা আদরে থাকিয়া ধনী সন্তানদের মানসিক-বৃত্তি সকল শিথিল হইয়া পড়ে, কিন্তু দরিদ্রের সন্তানদিগের সে ভয় নাই। আর যে সকল ধর্ম্ম, গুণ ও জ্ঞানে ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার, সেই সকল আত্ম, পারিবারিক ও সামাজিক গুণের চর্চ্চা করা কিণ্ডারগার্টেনের উদ্দেশ্য। তাহা ব্যতীত, সকল প্রকার লোকের সন্তানেরা শৈশবকাল হইতে একত্র খেলা ও মিশামিশি করাতে পরস্পরের দেখাদেখি তাহাদের স্বভাব মার্জ্জিত হইবে, এবং ভয়ঙ্কর অপকারী জাতিভেদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাইবে। তাহারা বাল্য কাল হইতে শিখিবে যে, এ জগতে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নৈতিক গুণ ব্যতিরেকে আর কিছুই মানুষকে প্রকৃতরূপে শ্রেষ্ঠ বা মহৎ করিতে পারে না। ঐ শিশু শিক্ষার প্রভাবেই আমরা সময়ে যে, জাতিভেদ অসীম সমুদ্রের ন্যায় মাঝখানে থাকিয়া কত ধর্ম্মশীল ও জ্ঞানী লোকদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, কত সৎ ও পরিশ্রমী ব্যক্তিকে সকলের নীচে ফেলিয়া রাখিয়াছে, সেই দুঃখজনক জাতিভেদ-সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধিবার আশা করিতে পারি।

ফ্রোবেলের ধারা মতে কিণ্ডার গার্টেন-শিক্ষায় শিল্প বা প্রাকৃতিক জ্ঞানেরও কোন অবহেলা করা হয় না। সেই কারণে শিশুশিক্ষার জন্য ঐ স্কুলের সঙ্গে সাধ্য-মত একটী ছোট রকমের বাগানের আবশ্যক। বালকবালিকাদিগের ইট কাঠ ও ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টা স্বভাবের সঙ্গে খেলা করা উচিত। উহা দ্বারা তাহা-দের মন প্রশস্ত, চিন্তাশক্তি দৃঢ় ও কল্পনা-শক্তি প্রবল হয়। তাহা ব্যতীত, সর্ব্বদা গাছপালা, জীবজন্তুর সঙ্গে আলাপে মগ্ন থাকিলে অতি অল্প বয়স হইতেই শিশুরা সাংসারিক ধূর্ত্ততায় চতুর হইবে না, শীঘ্রই স্বাভাবিক নিয়ম ও কাণ্ড সমূহের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে। উদ্যানের গাছ-পালার মধ্যে শিশুরা ছুটাছুটি ও দৌড়া-দৌড়ি করিবে, ও খেলিয়া বেড়াইবে। মাটী খুঁড়িয়া গাছ রোপন করিতে শিখিবে, শিশু নিজে বীজ বুনিবে ও আনন্দের সঙ্গে তরুর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ দেখিবে।

ঐ স্বাভাবিক ক্রীড়ার সঙ্গে তাহাদের মন ও ফুটিয়া উঠিবে। আর শিশু বাল্য কাল হইতে জীব, জন্তু, গাছ, তৃণ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলের প্রতি যত্ন করিতে ও উহা দ্বারা তাহার হৃদয় প্রশস্ত হওয়াতে সে সমস্ত জগৎকে ভাল বাসিতে শিখিবে। এইরূপে অজানিত ভাবে শিশুর মন সবল পবিত্র ও নৈতিক জ্ঞানে পুরিয়া উঠিবে ও এককালে তাহার মন, শরীর ও হৃদয় পুষ্ট হইয়া, তাহার পর জীবনে পরস্পরের সাহায্য করিবে। তাহা হইলে আর আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় কালের ন্যায় ভারতের কোন প্রদেশে, ক্ষীণশরীর-প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক, বা কোথাও সরল দেহ শূন্য মস্তিষ্ক, আর কোন স্থলে বা হৃদয় শূন্য প্রকাণ্ড দেহ বা সবশূন্য মস্তকসার বালক ও যুবকদিগকে লইয়া মহা বিভ্রাটে ও বিপদে পড়িতে হইবে না।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস।

কুমারী সুনীতি মজুমদারের জন্ম দিন উপলক্ষে প্রীতি উপহার।*

শুভ জন্মদিনে তব, কি আনন্দ অভিনব,
উথলি উঠিছে প্রাণে কি বলিব তার,
পিতা মাতা গুরুজন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
স্নেহনেত্রে মুখপানে চাহে অনিবার।
প্রাণের পুতলিপ্রায়, একমাত্র কন্যা তায়,
আর কেবা আছে হেন তোমার মতন,
মাগো বড় ভাগ্যবতী, হ'লে তুমি বিদ্যাবতী,
যে গৃহে জন্মেছ তুমি অতি সুশোভন।

২

শৈশবে মাতার কোলে, আধ-আধ মা মা বোলে,
যে বাণী শিখিয়াছিলে করিয়া যতন,
জননী করুণাময়ী, আজ তোরে করে জয়ী,
দেখ করেছেন দেবী অঙ্গের ভূষণ।
বিদ্যার সাগর পিতা, মাতা সর্ব্বগুণান্বিতা,
তুমি মাগো তাঁর সুতা জন্মেছ যখন,
হবে কত গুণবতী, রূপে গুণে সরস্বতী,
বিভুপদে এই ভিক্ষা যাচি অনুক্ষণ।

করি তোরে এ মিনতি, বিভুপদে রেখ মতি,
সুখে দুঃখে জেনো গতি হরি নিরঞ্জন,
তাঁহারি কৃপায় হয়, এ জীবন মধুময়,
জ্ঞানের বিজলি ছুটে হৃদে অনুক্ষণ।

* ইনি সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা এবং উড়িষ্যার আদর্শ পুরুষ স্বর্গীয় রায় মধুসূদন রাও বাহাদুরের দৌহিত্রী; এবার আই এ পরীক্ষায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে "ডফ স্কলারসিপ" নামক বৃত্তি পাইয়াছেন।

দর্শন বিজ্ঞান তাঁর, করে তত্ত্ব আবিষ্কার,
অফুরন্ত যে ভাণ্ডার বর্ণিবে কে তার,
ডুবিলে সে জ্ঞানার্ণবে, অমর জীবন লভে,
সাধু ভক্ত যোগী ঋষি জ্ঞানী, অনিবার।

৪

নয়নে দেখেছ তুমি, জননীর জন্মভূমি,
সাধু সেই মাতামহ শ্রীমধুসূদন,
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম যোগ, কিবা তাঁর স্বর্গভোগ
সশরীরে হয়েছিল সুন্দর কেমন !
সদা বিগলিত প্রাণ, প্রেমে কিবা মূর্ত্তিমান,
স্মরণে রেখগো মাতঃ দাদার জীবন,
জীবনে আসিবে বল, সুখ শান্তি পরিমল,
করিবে জীবন—সেই আদর্শে গঠন।

৫

বিনয়ে ভূষিতা হও, সদা মিষ্ট কথা কও,
দাস দাসী পরিজন সবে তুষ্ট হোক;
উঠিয়া সে জ্ঞানরথে, অনন্ত জীবন পথে,
দয়াময় দয়াকরে ধরুন্ আলোক।
কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, নির্ভয়ে করিবে তাহা,
হৃদয়ের প্রসন্নতা রেখ সর্ব্বক্ষণ,
লয়ে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা, রেখ প্রাণে পবিত্রতা,
এই মাত্র জেনো মাগো নারীর ভূষণ।

৬

আমরা তোরে ভালবাসি, তাই এই অভিলাষী,
হও মাগো আয়ুষ্মতী লভিতে জীবন,
এ শুধুতো কথা নয়, জীবনে সফল হয়,
দেব-আশীর্ব্বাদে জেনো কুমারীরতন !
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, এই জীবনের আশা,
হৃদয়ের মাঝে আছে প্রেম পারাবার,
যিনি হৃদয়ের স্বামী, তিনিত অন্তরযামী,
একমাত্র জীবনের সত্য সারাৎসার।

৭

কর তাঁরে সদা ভক্তি, জীবনে পাইবে শক্তি,
নিভৃতে হৃদয় মাঝে খুলিয়া দুয়ার,
ডাক সেই প্রাণারাম, যিনি সর্ব্বশক্তিমান,
ভূতলে গড়েন তিনি সোণার সংসার।
শুভ জন্মদিনে তব, কি আনন্দ অভিনব,
উথলি উঠিছে প্রাণে কি বলিব তার,
পিতা মাতা গুরুজন, আর প্রাণপ্রিয়জন,
দিতেছেন এই লও প্রীতি উপহার।

অহল্যার শাপ মোচন।

বিশ্বামিত্র মুনি রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া যখন তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি পথ, গ্রাম, নগরাদির পরিচয় দিয়া ও সকল দর্শনীয় স্থান তাঁহাদিগকে দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। পথি মধ্যে মিথিলা ধামে একটী উপবনে নির্জ্জন তপস্যার স্থান দেখিয়া বিশ্বামিত্র মুনিকে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষি দেব ! এই স্থানটীকে আশ্রমের ন্যায় মনে হইতেছে কিন্তু এখানে কোন মুনিকে দেখিতে পাইতেছি না, এ স্থানে কাহার আশ্রম ছিল জানিতে ইচ্ছা করি। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিলেন যে মহাত্মার

কোপ প্রযুক্ত এ আশ্রমের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে আমি তাঁহার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই স্থানে মহাত্মা গৌতম মুনির আশ্রম ছিল, তখন ইহার সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি এইস্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পত্নী অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। অহল্যা দেখিতে পরম সুন্দরী ছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করেন এবং মুনি শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় গৌতমের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। এই রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া একদিন সুযোগ পাইয়া সুররাজ ইন্দ্র গৌতমমুণির বেশ ধাধণ পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া অহল্যার সহিত বাস করেন। দুর্ব্বুদ্ধি ইন্দ্র নিজ মনস্কাম পূর্ণ করিয়া যখন প্রস্থান করিতেছে সেই সময়ে গৌতম মুনি আশ্রমে প্রবেশ করিতেছিলেন। পবিত্রাত্মা গৌতম অসদাচারী ইন্দ্রকে নিজ বেশ ধারণ করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইতেছে দেখিয়া সক্রোধে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন ও তৎপরে অহল্যাকে কহিলেন তোর এই পাপের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। বহুকাল এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্য ভাবে অনাহারে অবস্থিতি করিতে হইবে। তৎপরে যখন দশরথ পুত্র রামচন্দ্র এস্থানে আসিবেন তাঁহার পাদ-স্পর্শে তুই পাপ মুক্ত হইবি। সেই অবধি অহল্যা এ স্থানে অবস্থান করিতে-ছেন। বিশ্বামিত্রের নিকট রামচন্দ্র সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন তথায় প্রচ্ছন্নভাবে তপস্যা-রতা অহল্যা অপূর্ব্ব তেজঃসম্পন্না হইয়াও প্রস্তরবৎ অবস্থান করিতেছেন। রামচন্দ্রের স্পর্শে অহল্যা পাপ মুক্ত হইয়া পুনরায় মহামুণি গৌতমের সহিত মিলিত হইলেন।

জীর্ণাবাস।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥
গীতা—২য়, অঃ।

বাসা জীর্ণ হইয়াছে আর টিকে না, সে বাসায় পক্ষীর থাকা নিতান্তই ক্লেশকর, তাই তা'কে সে বাসাটী ছাড়িয়া আবার একটি নূতন বাসার অনুসন্ধানে চলিতে হইবে। অবশ্য এ বাসাটী ত্যাগ করা ভিন্ন অন্য বাসা দেখা চলে না, কাজেই এ বিরহবেদনা শুধু পাখীর নহে পাখীর সঙ্গীদেরও আছে। পাখীরত—বাসা এত দিনের সাধের বাসা—ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে সেজন্য ত দুঃখ অন্তঃকরণে উদয় হইবেই, এতদ্ব্যতীত তাহার সাথীরা

যা'র তা'রই সঙ্গে এতদিন সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল, সম্পদে বিপদে যে তা'দের সহায় ছিল, তাহার বিরহে এ পাখীর দলের শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করা কি নিতান্ত অবিধেয়? না। এ যে স্বভাবজাত অশ্রু, সুতরাং এ কি করিয়া অবিধেয় বলি? যাহার হৃদয়ে আর পাষাণে কবির সুনিপুণ তুলিকা রঞ্জিত করে এ সময় তাহার সে পাষাণ ভেদ করিয়া কতই না বর্ষার বারিধারা বর্ষণ করে, তবে দোষ কি? কোমল, কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ের ইহাই লক্ষণ। যাহার এমন দিনে কারুণ্যরসের উদ্ভব না হয় সে হৃদয় পাষাণ! তবে সে স্রোতেও অঙ্গ সমর্পণ করা বিধেয় নহে। তাই ভক্তের ভগবান দয়ার সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে উপরি উক্ত বাক্যটী বলিয়াছেন—

মনুষ্য যেরূপ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আমাদের দেহস্থ আত্মা (যিনি অবিনাশী) এই ভাঙ্গা খাঁচা ত্যাগ করিয়া নূতন খাঁচা (দেহ) ধারণ করেন।

সুতরাং তাহার জন্য "নানুশোচমি" শোক করিও না। কেন,—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥১৬

অনিত্য বস্তু যাহা তা'র অস্তিত্ব নাই। যাহা নিত্য তাহার বিনাশ নাই। যাঁ'রা এই উভয়ের পরিণাম দেখিয়াছেন, তাঁহারই

কিন্তু কে অবিনাশী আর কে বিনাশী তাহা কেমন করিয়া জানিব? তাই বলিতেছেন—"অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্" যিনি এই সমস্ত (দেহাদি) ব্যাপিয়া আছেন তিনিই অবিনাশী, "কশ্চিৎ অব্যয়স্য তাস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি" সেই অব্যয়ের (উৎপত্তিনাশহীন আত্মার) বিনাশ করিতে পারে না।

তবে বিনাশ হয় কাহার? না—"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যাস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য" নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছন্ন আত্মার এই দেহগুলি নশ্বর।

সুতরাং এ গুলির নাশত অবধার্য্য। তবে এ গুলির জন্য বালসুলভ ক্রন্দন কখনই বিধেয় নহে। কেন না যেটী সার সেত চিরদিনই আছে তাহার ধ্বংস কোথায়—

ন ত্বেবাহং জাতু নাশং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥

আমি ও যে কখনও ছিলাম না এমন নয়, তদ্রূপ তুমি ছিলে না তাও নয়, এই রাজন্যবর্গ ও ছিলেন না তাও নয়, ইহার পরে যে আমরা থাকিব না তাও নয়। যদি তা' থাকি তবে মৃত্যুটা কি? লোকে বলে "মরিলেই সব ফুরায়" এ কথার তাৎপর্য্য কি?

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

দেহধারী দিগের এদেহে যেমন কৌমার,

যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি বা মৃত্যুও তদ্রূপ, সেজন্য জ্ঞানী তাহাতে মোহিত হন না।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ যে ইহাকে (আত্মাকে) হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়ই জানে না কারণ ইনি হত্যাও করেন না, হতও হয় না।

তাই আবার বলিতেছেন—

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়ং মুচ্যতে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতু মর্হসি॥

এই আত্মা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় (অজ্ঞাত জিনিষ) মনেরও অগোচর এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর বলিয়া কথিত, অতএব ইহাঁকে এরূপ জ্ঞাত হইয়া শোক করিও না।

অন্য দিকে ধরিতে গেলে যদি এ নিত্য জাত ও নিত্য মৃত হয় তাহা হইলেও শোক অবিধেয়, কেন—

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ॥
তস্মাদপরিহর্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতু মর্হসি॥

যেহেতু জন্মিলেই মরণ এ ধ্রুব, মরিলেও জন্ম হইবেই, তখন অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিও না।

কখন এই ক্ষুদ্র বায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হইবে কে জানে, তাই জানাইতে ভগবান মৃত্যুর একটি ক্ষুদ্র অভিনয় আমাদের জীবনে অহরহ করিতেছেন—সেটী শ্বাস-ক্রিয়া। এই শ্বাস বহির্গত হওয়াই মৃত্যু আর উহার প্রবেশেই জন্ম হইতেছে। এক দণ্ড শ্বাসের গতি বন্ধ হইলেই কি কষ্ট না অনুভব করি, কিন্তু বুঝি কি, হায় সে দিন কেমন! না সে দিনের জন্য প্রস্তুত হই? পরের এই জীবনাভিনয়ের দৃশ্য দেখি, অশ্রু বিসর্জ্জন করি কিন্তু ভাবি না, দেখিয়াও ভাবি না যে এ দিন আমার নিকটেই আছে ঘটিলেই হইল।

মায়ার যে কি এক অভাবনীয় শক্তি যে, এত দৃশ্য এত ঘটনাতেও জীব আপন কর্ত্তব্য পথে উপনীত হয় না। এখন দেখা যাউক এর উৎপত্তি কোথায়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভি জায়তে॥

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের আসক্তি আসে, তাহা হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-" বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ক্রোধ হইতে মোহ (হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা), মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম (আত্ম বিস্মৃতি), স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে মৃতবৎ হয়। Then life becomes unrespected and desolate.

তাহা হইলে এখানে দেখিলাম যে ঐরূপ ছুটাছুটী করিতে করিতে হোচট্ খাইয়া শান্তি কোথায়?

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

রাগদ্বেষশূন্য, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিলেও আত্ম-বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন।

কিন্তু রাগদ্বেষশূন্য কিরূপে হইবে ?

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ যোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত জীবের আত্মাই যাঁহার আত্মা (অর্থাৎ সর্ব্বজীবে সমদর্শী) এমন ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না।

এই সর্ব্বভূতে সমদর্শিতার ফলে "এটা আমার ওটা আমার" এ জ্ঞান যায়, তখন বিষয় হইতে আর আসক্তি আসে না, আসক্তি না আসিলে আর জীবের ভাবনা থাকে না, তখন সে—প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া ফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক যিনি কর্ম্ম করেন তিনি পুণ্য বা পাপ উভয় কর্ম্ম দ্বারাই লিপ্ত হন না, যেমন জলে থাকিয়াও পদ্ম-পত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না—তাসেই। এ সংসারক্ষেত্রে থাকিয়াও সেই পুরুষ স্বাধীন। সংসার অরণ্য সবই তাঁহার পক্ষে সমান। এইরূপে মোহের নাশ হইলে জীব আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হয় এবং এই আত্মতত্ত্ব-বলে ক্রমে পরম গতি লাভ করে, জীব তন্ময়ত্ব লাভ করে অর্থাৎ সে সেই ব্রহ্ম হইয়া যায়।

এক্ষণে "ব্রহ্ম" কি তাহাই দেখা আবশ্যক। "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" যিনি পরম অক্ষয় (যাঁহার ক্ষয় নাই) যিনি জগতের মূল তিনিই "ব্রহ্ম।" "অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ অন্তকালে যিনি আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন, ইহা নিঃসন্দেহ। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক হইতেও সকল লোক আবার ফিরিয়া আসে অর্থাৎ পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় তাহার আর জন্ম হয় না।

তাঁকে প্রাপ্ত হইবার এক সহজ উপায় বলিতেছি—পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা-লভ্যস্ত্বনন্যয়া। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥

হে পার্থ, যাঁহাতে ভূতগণ রহিয়াছে এবং যিনি এ সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অব-স্থিতি করিতেছেন সেই পরম পুরুষ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য।

এই খানেই "ভক্তের ভগবান" এই মহাবাক্য রক্ষিত হইল। তাই বলেছেন—

ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে
নিয়ে বেড়াই ভাঙা তরী।
যে নদীর কূল কিনারা নাই,
সেই নদীতে আমি পাড়ি মারি!

ওহো প্রভুর কি ভক্তের প্রতি কৃপা, তা না হ'লে ভক্তের জন্য প্রভু স্বয়ং বোঝা মাথায় লন। প্রভু, আমরা বুঝি না,

তাই কাঁদিয়া মরি, ভাবি না তাই ভাবনার খেয়ালে গোলে হরিবোল দিই, উঁকি ঝুঁকি মারিতেছি আর আমি তোমার দেখিবার জন্য ছুটীয়া মরিতেছি একি কম পরিতাপের বিষয়! ভাই, বন্ধু, এস সকলে মিলে আমাদের হৃদয়ের দেবতা শান্তি-দাতার স্মরণ লই। যাঁর নাম স্মরণে পাপী তাপী শান্তি পায়, আজ তাঁ'কে ডাকিলে আমরা কেন না তাঁহার কৃপা লাভে সক্ষম হইব। তিনি দয়ার সাগর। এ জগৎ তাঁ'র, তাঁ'র জিনিষ তাঁ'র কাছে যা'বে আস্‌বে তাতে আমাদের সুখ দুঃখ কি? আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করিব, সময় নাই, অগাধ জলধি সম্মুখে তরী নাই। সেই অন্তিম স্মরণ, বিপদ তারণ, মুক্তিদাতা ভগবানের কৃপাকণা লাভের জন্য আজি হইতে যত্নবান্ হই। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ হরি ওঁ।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

মুষ্টিযোগ।

১। পোড়া ঘায়ের উপর চালের গুড়া ছড়াইয়া দিলে পোড়ার জ্বালা ও যন্ত্রণা অনেক নিবারণ হয়। ইহা ফোড়ায় পুলটিস রূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

২। চিরেতা জ্বরের পর শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা ও ক্ষুধামান্দ্য দূরকরি-বার জন্য ব্যবহৃত হয়। পালাজ্বরের পক্ষেও ইহা কম উপকারী নহে।

৩। গোল মরিচ—অর্শ রোগীর পক্ষে ৩।৪টী গোল মরীচ একটু মধুর সহিত মাড়িয়া অর্শের বলির মুখে লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা ক্রমে দূর হয়।

৪। অজীর্ণ—৭।৮টী গোল মরীচ একটু লবণের সহিত সেবনে অজীর্ণতা দোষ দূরীভূত হয়।

৫। খয়ের—স্তন্য ক্ষতে খয়েরের জল দিয়া সর্ব্বদা স্তনের বোটা ধৌত করিলে উপকার হয়। পাঁকুইয়ের ঘায়ে খয়ের দিলে উপকার দর্শে।

দাঁত কন্‌কন্ করিলে খয়েরে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

পালাজ্বর—(Malaria Fever)—

১। কুকসিমার পাতা হস্তে ডলিয়া সেই রসের আঘ্রাণ লইলে আরোগ্য হয়।

২। টেপারির শিকড় শনি মঙ্গলবারে দক্ষিণ হস্তে বাধিয়া তিন দিবস রাখিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

৩। সূর্য্যমুখী গাছ, অধিক পরিমাণে বাটীতে রোপণ করিলে পালাজ্বর হয় না।

বৃশ্চিক দংশন—

১। ছাগল নাদি জলে ঘর্ষণ করিয়া দষ্ট স্থানে দিলে জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

২। মুক্তাঝুরির পাতা বাটিয়া গরম

করিয়া পুলটিস দিলে তৎক্ষণাৎ বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি, বিছা ইত্যাদির জ্বালা নিবারণ হয়।

৩। রশুনের রস দষ্ট স্থানে দিলে জ্বালা শীঘ্র নিবারণ হয়।

৪। চিনির জল লাগাইলে শীঘ্র বোলতা, ভীমরুল কামড়ানর জ্বালা দূর হয়।

৫। গাওয়া ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিলাইয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে বিছাকামড়ান জ্বালা তৎক্ষণাৎ দূর হয়।

উকুন—

১। চাঁপা ফুলের পাতার রস মস্তকে মাখিলে উকুন মরিয়া যায়।

চুলকনা—

১। চাল মুগুরার তৈলে কর্পূর মিশাইয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়।

দদ্রু—

১। মাজুফল চূর্ণ ৮ ভাগ ও তেঁতুল ভস্ম ১ ভাগ, নারিকেল তৈল সহযোগে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

২। ধূপ, গন্ধক, সোহাগা ও ফটকিরি সম ভাগে জলে বাটিয়া লাগাইলে ও দাদ আরোগ্য হয়।

৩। গর্জ্জন তৈল ও গন্ধক চূর্ণ এবং ঘেঁচি কড়ি ভস্ম একত্র মিশাইয়া লাগাইলে যে প্রকার দাদ হউক না কেন নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা আমার পরীক্ষিত এবং শত সহস্র রোগী এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

নাড়ীজ্ঞানে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সন্তান পরীক্ষা।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ৫ম মাসে যখন কোন পীড়া না থাকে সেই সময়ে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে কন্যা জন্মে। আর পিত্তের প্রবলতা থাকিলে পুত্র জন্মে (পরীক্ষিত)।

নাড়ী পরীক্ষার স্থান নির্ণয়—স্ত্রীলোকের বাম হস্তের আর পুরুষ হইলে তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নে বা মনিবন্ধ প্রদেশে অর্থাৎ কব্জিতে (Brachial artery), তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে টিপিলে ধমনীস্থ শোণিত-গতি বিশেষরূপে অনুভূত হয়, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ মতে নাড়ী পরীক্ষা কহে।

তর্জ্জনী অঙ্গুলির আঘাত প্রাপ্তে বায়ু, মধ্যমার আঘাত প্রাপ্তে পিত্ত ও অনামিকায় আঘাত প্রাপ্তে কফ, জ্ঞান করিবে।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

পরিপাক কর্ত্তব্যতা—"সেনিটরী রিপোর্টে" এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, মাধ্যাহ্নিক ভোজনের পরে শরীর ও মনের বিশ্রাম আবশ্যক, তৎপরে হাস্য ও

কৌতুক করিবার সময়, তৎপর রাজনীতি বিষয়ে চিন্তা ও তর্ক এবং তাহার পর গীত ও বাদ্য শ্রবণ ও দর্শন করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সকল ব্যক্তি সামান্য সময় বাদ্য কৌতুকে নষ্ট হইলে ক্ষুণ্ণ হন, তাঁহারা জানেন না প্রতিদিন কিরূপে সময় অতিবাহিত হইলে পরিপাক কার্য্য সম্পাদিত হয়।

গৃহ মধ্যে গুল্ম রক্ষা করা—এইটী লোকের নিতান্ত ভ্রম যে, শয়ন বা বসিবার গৃহে গুল্ম লতাদি রক্ষা করিলে শরীরের স্বাস্থ্য হীন হয়।

"রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"

এই চিরপ্রসিদ্ধ মতটী এখন ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যদি তীব্র গন্ধযুক্ত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত গৃহের বায়ু সেই গন্ধে মিশ্রিত হয়। গুল্ম রক্ষা করিলে তাহার দ্বারা বায়ুর অম্লঅঙ্গারক বাষ্প শোষিত হইয়া সমস্ত গৃহের বায়ু বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। এক্ষণকার মতে সতেজ লতা ও গুল্মই প্রধান দুর্গন্ধনিবারক।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

নারীর কর্ত্তব্য।

নারীর কর্ত্তব্য যে কি, তাহা পূর্ব্বপুরুষগণ চিন্তা করিয়া অনেক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অনেক নারী তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করেন না, বা যাহা পাঠ করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন করেন না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে আপনা হইতেই দৃষ্টি পড়িবে। অপরের বলিয়া দিয়া করান, সকল বিষয়ে সম্ভবপর নহে. আপন হৃদয়স্থ বিবেক দ্বারা প্রণোদিত হইলে অনেক বিষয় আপনিই সুমীমাংসিত করিয়া লইতে পারেন।

নারী গৃহের রাজ্ঞীস্বরূপা। রাজা যেরূপ রাজ্য শাসন করেন, গৃহিণী তদ্রূপ গৃহে নিজ অধিকার পরিব্যাপ্ত করেন। গৃহে কেহ ক্লেশ পাইলে (যাহা মোচন করা সাধ্যায়ত্ত) বা কেহ বিপথগামী হইলে বিশেষতঃ বালকবালিকারা সচ্চরিত্র না হইলে গৃহিণী কতকাংশে ভগবানের নিকট দায়ী, এবং সমস্ত পরিবারের সহিত স্বয়ং ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। গৃহে ধর্ম্মভাব প্রবল থাকিলে, জগদীশ্বরের মহিমামণ্ডিত-স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, কেহ সহজে অসৎ কার্য্য করিতে পারেন না। সর্ব্বাগ্রে সমস্ত পরিবারে ধর্ম্মভাব জাগরূক রাখা উচিত। তাহার পরে জীবে দয়া, পশুপক্ষী, দুঃখী, তাপী, আত্মপর, দাসদাসী, সকলের প্রতি সমান দয়া শিক্ষা দিতে হইবে। দয়া যে হৃদয়ে বাস করে, সে হৃদয় কোমল না হইয়া যায় না। অসাম্প্রদায়িক,সাধুভক্তি শিক্ষা দিবে, নতুবা হৃদয় বিদ্বেষ ও নীচতার আগার

হইবে। রাজা রামমোহন, খৃষ্ট, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, মুশা, চৈতন্য, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ, সকলে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে ভগবানকে ডাকিয়াছেন। যিনি যে নামেই ডাকুন না কেন, সকলেই যে ভগবানকে ভাল বাসিতেন ও সেই জন্য ভক্তির পাত্র, ইহা বালকবালিকাদের বলিয়া দেওয়া উচিত।

অনেক স্থলেই পত্নীর অবিবেচনায় পতির স্বভাবের বিকার হয়। স্বামীর অমতাবলম্বী, স্বার্থপরায়ণা, নারী আপনার ও গৃহের এবং স্বামীর ক্লেশের কারণ হয়েন। কেবল অসৎ কার্য্যে নারী স্বামীর পথে যাইবেন না, বরং তাঁহাকে সৎপথে আনিতে যত্ন করিবেন, নতুবা সকল কার্য্যে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবেন, তিনি যাহা ভালবাসেন, তাহাই স্ত্রীর করা উচিত। তাঁহার সহিত বাকবিতণ্ডা করা, তাঁহার উপর প্রভুত্ব করা বা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করা অশোভন। দেহ ও বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার ও যথাসাধ্য সুশৃঙ্খলায় রাখিবে। সংসারে শান্তি ও হাস্যমুখ থাকিলে সে সংসার জীবন-সংগ্রামে ক্লিষ্ট পুরুষের পক্ষে আরামের স্থল। যে গৃহে সুখ আছে, সে গৃহে স্বামী অসৎ পথের পথিক হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সমস্ত জগতের লাঞ্ছনা ও ক্লেশ, সংসার-পথের অগণ্য দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা সহিয়া মানব গৃহে যদি জুড়াইতে পায়, কোন ক্লেশ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আর একটী কথা, নারীকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, কারণ স্বার্থ চিন্তা সকলরূপ উত্তম বিষয়ের মূলে বাধা দেয়। স্বার্থত্যাগ না করিতে পারিলে কোন বিষয়েই সুবিধা হয় না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নারীর সৌন্দর্য্য!

অনেক নারী সংসারে স্বামী পুত্র ব্যতীত অপর কাহাকেও রাখিতে ইচ্ছা করেন না। স্বামীর পিসিমা, কাকীমা, ভগিনীগণ এখন গলগ্রহ পদবাচ্য। বৃদ্ধা শ্বশ্রূকে না রাখিলে লোকনিন্দা, সেজন্য তিনি দাসীরূপে সং-সারে অবস্থান করেন। তিনি বৌমার মুখাপেক্ষী, বৌমা একটী পয়সা দিলে তবে খরচ করিবেন। তিনি পৌত্র, পৌত্রীকে ভয় করিয়া চলেন, যদি বৌমার মুখটা একটু ভার দেখেন, অমনি ভয়ে শশব্যাস্ত! নারীর এ বিষয় চিন্তা করা উচিত যে, অবস্থা চক্রবৎ ঘুর্ণায়মান হইতেছে, আমার অবস্থা যদি পরে ঐ প্রকার হয় তখন এই ব্যবহার পাইলে আমার অন্তরের অবস্থা কি প্রকার হয়?

নারীকে লোকে গৃহলক্ষ্মী বলে। লক্ষ্মী অর্থে—শ্রী, নারী শ্রীরূপিণী, তাঁহার অঙ্গের বাতাসে, শোভাহীন গৃহ শ্রী-সম্পন্ন হইবে, সংসারে তিনি শান্তি, সৌন্দর্য্য, ধন, জন প্রদান করিবেন। তিনি যেখানে থাকিবেন সন্তোষ তথায় আজ্ঞা-কারী হইয়া থাকিবে, শৃঙ্খলা, ধর্ম্মভাব, আরাম তাঁহার অনুবর্ত্তী। এই নারীর মূর্ত্তি!

অবান্তরবাক্যপ্রিয়তা, অনর্থক-হাস্য-পরিহাসকারিতা, মিথ্যাবাদিতা, বিশৃঙ্খলা,

ধর্ম্মভাববিহীনতা, অধিকবেশভূষাপ্রিয়তা নারীর মূর্ত্তি নহে। যাঁহার মস্তকে কর্ত্তব্যের গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি ঘুমঘোরে অচেতন, একবারও আপন দায়িত্বের বিষয় চিন্তা করেন না, শিশুর ন্যায় অজ্ঞানভাবে, অলসভাবে, আপন মহৎ জীবন কাটাইতেছেন, নষ্ট করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে?

কতক শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যেও একটু দোষ আছে। অনেকে একটু লেখা পড়া শিখিয়া আর গৃহকর্ম্ম করিতে পারেন না। তাঁহারা কি সত্যই পারেন না, না করেন না? নারী গৃহকর্ম্ম করে, ও পুরুষ অর্থোপার্জ্জন করে, ইহা বোধ হয় ভগবানেরই বিধান, সকল দেশে এই নিয়ম। অসভ্যজাতিদের মধ্যে পুরুষ পশুপক্ষী শিকার করিয়া আনে, নারী রন্ধন করে। বালকবালিকারা খেলা করে, কোন কোন স্থলে বালিকারা রন্ধন করে, বালকেরা বাহিরের কার্য্যে যায়, বাজার করে। যদি শিক্ষিতাপত্নী বিবাহ করিয়া পুরুষের সংসার অধিক বিশৃঙ্খল হয় তবে শিক্ষায় লাভ কি? শিক্ষিতা পত্নী সুচারুরূপে সংসার চালাইবেন গৃহে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন, তিনি অজ্ঞান নহেন, সংসার তাঁহার নিকট যে অনেক আশা করে।

অনেকে বলেন স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলে প্রায়ই চাকরী করিতে যায়। অনেকে স্ত্রীলোকের চাকরী করাকে উপহাস করেন, কিন্তু হয়তো ভাই ৪০ টাকা মাহিনা পান, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ৪।৫টী, মা, ঠাকুরমা, কাকীমা আছেন, ২।১টী পুত্রসহ ভগ্নী বিধবা হইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন, সংসারে দরিদ্রতা পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করিল, সেস্থলে ভগিনী কোন স্কুলে পড়াইয়া কিছু টাকা আনিলে মন্দ, এ কথা কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিবেন না।

নচেৎ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত নারীর বিদ্যাশিক্ষা নহে, চরিত্র গঠনের সংসার রক্ষার জন্য নারীর বিদ্যাশিক্ষা।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

নূতন সংবাদ।

১। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বালিকাগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—ভাষার জন্য ডাফ্‌স্কলার্সিপ্‌ কুমারী সুনীতি মজুমদার। লজিকের জন্য—সারদাপ্রসাদ প্রাইজ কুমারী তটিনী গুপ্ত। সিন্ধুবালা পদক ও উমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি রৌপ্যপদক কুমারী তটিনী গুপ্ত।

২। বি, এ, পরীক্ষায় নিম্নলিখিত দুইটী বালিকা পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। কনষ্ট্যান্স ব্রাউন গঙ্গামণি দেবী স্বর্ণ পদক

ও শান্তা চট্টোপাধ্যায় পদ্মাবতী পদক ও প্রসন্নময়ী দেবী প্রাইজ।

৩। আরজেণ্টাইন প্রদেশের মিষ্টার গ্রিগেঁরী নামক এক ব্যক্তি একরূপ তড়িৎ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্বারা শস্যের ও খাদ্যের অনিষ্টকারক কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি জীব সমূহ অনায়াসে ধ্বংস হইতে পারিবে।

৪। সন্তোষের রাণী শ্রীমতী দীনমণি চৌধুরাণী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, গোলোক নাথ দাতব্য ঔষধাগারও গঙ্গাবাড়ী অতিথিশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩ লক্ষ, ৬৩ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন।

৫। সমস্ত ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে আহত দিগের সেবার জন্য ইংলণ্ডের "রেডক্রস" সোসাইটীর মহিলাগণ প্রস্তুত হইতেছেন। এখনও পর্য্যন্ত জর্ম্মণির পরাজয় হইয়া আসিতেছে আমরা সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডের জয় কামনা করি।

বামারচনা।

যশোদা-জীবন-ধন।

যাবি না কি সঙ্গে মোর যশোদা-জীবন-ধন,
কি ব'লে দাঁড়াব গিয়া আধার সে বৃন্দাবন
কি কহিব অভাগীরে,
কি ক'রে সে বাচিবেরে,
সে ফিরে বাঁধিবে বুক না দেখিলে চন্দ্রানন
পরাণ যাবেনা সাথে কেমনে যাইব ধন ?
অভাগিনী-রত্ন সার,
নীলমণি কণ্ঠহার,
কেমনে কাহার করে করিব রে সমর্পণ,
প্রাণ ধরি কারে দোব দেব-আরাধিত ধন।
মোদের জীবন-ব্রত,
কেনরে নিদয় এত ?
ননী হাতে পণ চাহি যশোদা আকুল ধন,
"যাবনা" কেমন কথা, এ তোর কেমন পণ ?
আমিরে যাইয়া একা
কি ক'রে করিব দেখা,
সুধাবে কোথায় নন্দ অভাগী-বুকের ধন,
জীবন সম্বল কই আমাদের প্রাণ মন,
মোর নীলকান্ত মণি,
আর কি চাবেনা ননী,
কেমনে আসিলে ফিরে পাষাণে কি গড়া মন,
কলিমা-রতনে মোর কোথা দিলে বিসর্জ্জন,
ক্ষণেক চোখের আড়ে,
জাননা কি করিত রে,
অভাগিনী যা হইত জানে তা ব্রজ জন,
আমাদের প্রাণাধার কেমন কঠিন মন,

ননী নিয়ে কি করিবে,
কার মুখে তুলে দেবে,
দগধ হৃদয় জ্বালা কে করিবে নিবারণ,
কার মুখ চেয়ে রবে শূন্যময় সে ভবন।
তুই রে গৃহের বাতি,
তুই নয়নের ভাতি,
ভবনে বাহিরে যেরে সব তোর নিদর্শন,
আঁধার নন্দের পুরী বিজন বিজন বন!
তোমার খেলার সাথী,
অধীর আকুল অতি,
বলে দেরে কি করিবে তোর প্রিয় সখাগণ,
বেণু মুখে ধেনু রাখা সব কি ভুলিলি-ধন?
তুমি মথুরায় রাজা,
এতে যে মোদের সাজা,
জানিলে কে আসিত রে সঙ্গে নিয়ে এ রতন,
কে শুনিত কে দেখিত এ দৃশ্য যে কি ভীষণ।
তো-বিনা মাখন চোরা,
অকূল আঁধার ধরা,
দিবসে রজনী মত হইবে রে বৃন্দাবন,
কি দিয়ে বাঁধিবে বুক কি নিয়ে বুঝাবে মন,
হৃদয় জীবনারাম,
গোপের আনন্দধাম—
শ্মশান করিলি বাপ, কিরূপ পাষাণ মন,
কি ক'রে ত্যজিলি যশোদা-অঞ্চল-ধন,
আয়রে জীবনাধার,
'যাবনা' বলোনা আর,
সহেনা বুকেতে যেরে বজ্রাঘাত এ বচন,
বুঝিবি না জ্বালা তার বুঝিবি না কি বেদন,
গোপাল নিকটে তোর,
তবু যে আঁধার ঘোর,
না জানি কি হবে তো-বিনা রে কালধন,
রবি, শশি, তারা, বাতি সব হীন বৃন্দাবন,
নয়নের মণি রাখি,
অন্ধকার পথ দেখি—
কেমনে চলিব আজি আঁধার অবনী মন,
আঁধার আঁধার প্রাণ সব আলো নির্ব্বাপণ!

শ্রীমতী হরিমতি দেবী।

---

৩৭ নং মথুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 613. ——— September, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৩ সংখ্যা।	ভাদ্র, ১৩২১। সেপ্টেম্বর, ১৯১৪।	১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

নিবেদন।

এ জীবন কি শুধু একটী মহাসাগরের জলবুদ্‌বুদ্‌ মাত্র? মহাসাগরে যেমন কত শত সহস্র জলবুদ্‌বুদ্‌ উত্থিত হইয়া আবার তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার যেমন কোন উদ্দেশ্য বুঝা যায় না এ জীবন কি সেইরূপ উদ্দেশ্য-বিহীন জলবুদ্‌বুদ্‌ মাত্র? একবার উত্থিত হইয়া অলক্ষ্যে মিলাইয়া যাইবে? না, জগতের সমুদয় সৃষ্টবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, এ জগতে বিধাতাপুরুষ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কণামাত্র বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় নাই। প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টরূপে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়। মানবের শুভ সঙ্কল্প দ্বারা যাহা রচিত তাহা কল্যাণকর, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। এ জগতের সমুদয় বস্তুই আমাদের অজ্ঞাতসারে যাহা রাখিয়া যাইতেছে পরে তাহাই আমাদের জীবন গঠনের সহায় হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই এ জগৎবাসীর শিক্ষার বিষয়। আমরা সকলেই এক একজন শিক্ষকরূপে পরিগণিত। যে জীবন শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে কিরূপে উদ্দেশ্যবিহীন জল-বুদ্‌বুদের সঙ্গে তুলনা করিব? তাহাত হইতে পারে না। ইহা যখন উদ্দেশ্য বিহীন জল-বুদ্‌বুদ্‌ নহে তখন ইহার কর্ত্তব্য কত কঠিন! যে জীবনের উদ্দেশ্য আছে তাহার লক্ষ্যও আছে। সেই লক্ষ্যকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া সকল প্রকার পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করাই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। হে বিশ্ববিধাতা এ জীবন যখন উদ্দেশ্যবিহীন খেলার

সামগ্রী নহে তখন যাহাতে ইহা ইহার লক্ষ্য সাধনের উপযোগী হয় সেই সকল গুণ দ্বারা ইহার উন্নতির সহায়তা কর। পূর্ব্বজীবনে যাহা করিয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে যে সকল ত্রুটী ও অপরাধ আছে তাহার সংশোধন কর। "জীবন ক্রম-উন্নতশীল" শুনেছি, এ জীবনের পক্ষে সেই বাক্য যাহাতে সফল হয় সেই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার করুণা ব্যতীত জীব বাঁচিতে পারে না, এতদিন তোমার সেই অপার করুণা লাভ করিয়া আসিয়াছি। হে দেবাদিদেব মহাদেব আজিও তোমার সেই করুণার প্রার্থী হইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ কর।

"সবাই ছেড়েচে নাহি যার কেহ
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন নাহি যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।"

হে প্রভু "সবাই যাকে ছেড়েছে তার তুমি আছ,যে নিরাশ্রয় তার জন্য তোমার গৃহ আছে" এই আশায় আশান্বিত হইয়া চলিতেছি, তুমি আমার সহায় হও।

তুমি আমার পিতা, রক্ষক পালয়িতা,
পদাশ্রয়ে করহ অভয়।
তুমি মম জননী,— স্নেহ প্রেমের খনি,
কোলে রাখ এ তনয়ায়।
তুমি আমার সখা, প্রাণ মাঝে দেও দেখা,
উদ্ধার বিপদ সময়।
তুমি আমার গুরু, মনোবাঞ্ছা কল্পতরু,
তব কৃপায় সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা নারী।

জন্মকালে সকল দেশের, সকল সময়ের ও সকল শ্রেণীর কন্যারা একই অবস্থায় থাকে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর পিতা-মাতার অবস্থানুসারে ও দেশকাল ভেদে ক্রমশঃ তাহাদের জীবনের তারতম্য হইয়া থাকে। জঙ্গলে পতিত সাঁওতালের শিশু. উঠানে শায়িত দরিদ্রকন্যা, তেতলার উপরে দুগ্ধফেননিভশয্যাস্থিত ধনীর বালিকা, কিম্বা সুন্দর মখমলের শয্যায় বহুমূল্য পোষাকে আবৃত ইউরোপীয় ধনীর সদ্যঃ প্রসূত সন্তান—এ সব গুলিই মঙ্গলময় জগদীশ্বরের একই নিয়মে সৃষ্ট এবং একইরূপ আভ্যন্তরিক অবস্থায় স্থিত, উহাদের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। সকলেই ক্ষুধা পাইলে একভাবে কাঁদে এবং দুগ্ধপানে এক প্রকারেই পরিতৃপ্ত হয়। জননী যাহাই আহার করুন্ তাহা একই প্রণালীতে জীর্ণ হইয়া একই নিয়মানুসারে তাহাদের শরীর পুষ্ট করে। অবশ্য, উহাদের বাহ্যিক পরিচ্ছদ ও সজ্জার যে প্রভেদ তাহা দ্বারা উহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থায় হটাৎ কোন বিভিন্নতা ঘটাইতে পারে না।

শীতকালে তাহাদের ফ্লানেল বা বনাতের পোষাকে গা ঢাকা দাও, বা ভালুকের চামড়ায় আচ্ছাদন করিয়া রাখ, তাহারা উভয় হইতেই একইরূপ উপকার পায়। গ্রীষ্মকালে উহাদের খাটের উপর শীতল পাটীতে ফেলিয়া রাখ, বা মাঠের উপর নরম ঘাসে শোয়াইয়া দাও—তাহারা একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া খেলা করে। কিন্তু ঐ সকল বালিকা যত বড় হইতে থাকিবে তত তাহাদের জীবন ও শরীরের প্রভেদ লক্ষিত হইবে। ইহা সত্য যে, ধনী বা দরিদ্র, মূর্খ বা শিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকের সন্তানেরই অনিয়মের ফলে অসুখ হইয়া থাকে, আবার এক ঔষধ ও জননীর শুশ্রূষায় সকল শিশুই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্রসন্তান উপযুক্ত ঔষধও পায় না আর মারও সেরূপ যত্নও পায় না। পিতামাতা দরিদ্র, ঔষধ কিনিবার অর্থ নাই, অথবা তাহারা এত অসভ্য যে ভিন্ন ভিন্ন রোগের যে স্বতন্ত্র ঔষধ ব্যবস্থা আছে সে জ্ঞানও তাহাদের নাই। অথচ দরিদ্র বা অসভ্য মায়েদের মনে যে মাতৃস্নেহ কম তাহা নহে, কেবল শিক্ষার অভাবে তাহারা উপযুক্তরূপে সন্তানপালনে অক্ষম। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া ধনীর কন্যাটী এক দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া মার যত্নে ও দাস দাসীর কোলে কোমলভাবে পালিত হয়, অপরদিকে অসভ্য বা দরিদ্রের মেয়েটী মাটীতে কাদা-ধূলা মাখিয়া বাড়িতে থাকে।

এখন আমরা লক্ষ করিলে দেখিতে পাইব, দুটি কোমল ফুল একত্র একভাবে ফুটিয়া যত্ন ও কর্ষণ প্রভাবে একটী বাগানের গোলাপ হয়, আর অবহেলা ও অশ্রদ্ধা বশতঃ অন্যটী বনের ভাঁট-বাকসের মত গড়াগড়ি যায়। এখন হইতেই আমরা তাহাদের বাহ্যিক প্রভেদের সঙ্গে মানসিক বিভিন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাই। বড় মানুষের বা সভ্যলোকের মেয়েরা কাদায় হাত দিতে সংকুচিত হয়, দরিদ্র বা অসভ্য শিশুরা কাদা ধূলা মাখিয়া সুখী হয়। একটী বালিকা কাপড় না পরিয়া কখন ঘরের বাহিরে যাইবে না, আর একটী খোলা দেহে রাস্তায় ছুটিয়া বেড়ায়। ক্রমশঃ একজন নানারূপ বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া জ্ঞানবতী হয়, অপরটী নিজের অবস্থা পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে না বুঝিয়া পশুর মত জীবন কাটায়। অতএব দেখ, ঐ দুটী জীবনে কত প্রভেদ। বাহ্যিক বিভিন্নতা হইতেই উহাদের এই আভ্যন্তরিক অনৈক্য। অথচ জন্মাইবার পর হইতেই যদি আমরা ঐ দুটী মেয়েকে একভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া লালন পালন করিতাম, একভাবে শিক্ষা দিতাম, তাহা হইলে ঐ দুইটীই যে এক প্রকার পবিত্র, শিক্ষিতা ও চতুর হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহাতেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই-তেছি, মানব জীবনে, বিশেষতঃ নারীর পক্ষে শিক্ষার কত আবশ্যক। আমাদের দেশে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া

যায় সেই জন্য বালিকাগণ অধিক দিন স্কুলে যাইতে বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিবার অবসর পায় না, সেই কারণে অন্তঃপুর-শিক্ষা ভিন্ন কন্যা ও বধূদিগের স্থায়ী উন্নতির আশা করিতে পারা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

ক্যানাডা প্রবাসির পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অল্পক্ষণ পরে মিস্ বায়রণ্ আলু থালু চুলে নামিয়া আসিয়া বলিলেন কেমন আছেন মিঃ সিংহ! আপনি ভিতরে আসুন" এই কথা বলিয়া আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসালেন এবং বলিলেন "চুল না বাঁধিয়া আসাতে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।" আমি তদুত্তরে বলিলাম "সে জন্য কিছু মনে করিবেন না, বোধ হয় আমি একটু অগ্রে আসিয়াছি।" তাহার পর দুই জনে চা পান করিলাম। তাঁহার নিকট হইতে Rev. Hutcheon, Toronto Unitarian Church এর Pastor এর বাড়ীর ঠিকানা পাইলাম। তখনি আমি তাঁহাকে 'Phone করিলাম। তিনি তদুত্তরে আমাকে সে দিন বেলা তিনটার সময় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে বলিলেন। আমি মিস্ বায়রণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া Central Y.M.C.A.তে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Rev. Hutcheon এর নিকট গেলাম। তিনি অতিশয় মহাশয় লোক, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণ সকলে একে একে আমার নিকট পরিচিত হইলেন। তাঁহারা সকলে আমাকে ঘিরিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁহার বাটীতে অতিবাহিত করিলাম। শেষে Rev. Hutcheon আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন যে পুনরায় যখন Torontoতে আসিবেন তাঁহার বাটীতে উঠিবেন এবং আমার গির্জ্জাতে "ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে" বক্তৃতা দিবেন। আমি আগামী শীতকালে সেইজন্য Torontoতে যাইব এবং বোধ হয় সেই সময় মিস্ ওয়াট্ * ও কলিকাতা হইতে Guelph এ আসিয়া পৌঁছিবেন।

Torontoতে জীবন সুন্দর কাটিয়া গেল। Exhibition Ontario হ্রদের অতি নিকটেই হইয়াছিল। হ্রদের জল পরিষ্কার, বালক বালিকারা সব সাঁতার দিতেছে। রাত্রিতে হ্রদের উপর নানা প্রকার fireworks (বাজি পোড়ান দেখান) হইত। ওঃ সে সব অতিশয় বিস্ময়কর।

* * * *

---

*Guelph নিবাসী মিস্ ওয়াটের সহিত লেখকের মাতার পরিচয় ইতি মধ্যে হইয়াছিল।

আজ ১৪ই সেপ্টেম্বর। আজ Spencerকে Michigan হইতে এখানে আনাইয়াছি। Spencerএর মা ভারতবর্ষ হইতে কারি, পাউডার, চাট্নি প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়াছেন। Spencer একজন ইংরাজ ছাত্র, ইহার পিতা Coimbatoreএর পাদরি। আমি মিস্ ওয়াটসনকে বলিয়া Macdonald Instituteএর Kitchen classএতে পড়িবার অনুমতি পাইলাম। তিন জন শিক্ষয়িত্রীকে আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আর আমি (of Calcutta), Spencer (of Nilgherry) Slater (of Poona) এই কয়েক জনে মিলিয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিতে দ্বিতলার ঘরে কারি ও ভাত রন্ধন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। আমার অন্যতম বন্ধু মিস্ ফার্গুসন্, মিস্ ওয়াটসন্ ও মিস্ রড়িক্ এই তিন জন মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন আমরা ঠিক রন্ধন করিতে পারিতেছি কি না। Spencer আলু ও পেঁয়াজ ভাজিল, Singha আতপ চালের ভাত রন্ধন করিল; Slater ফাউলের কারি রাঁধিল। মিস্ ফার্গুসন্ ও অন্যান্য মহিলারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আমরা আস্বাদন করিয়া দেখিতেছিলাম যে ঝাল, মসলা ও লবণ ঠিক দেওয়া হইয়াছে কি না।

ওঃ সে দিন আমাদের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি; নিম্নতলে যত শিক্ষয়িত্রী ও বালিকা, তাহারা আমাদের লম্ফ ঝম্ফ শুনিয়া, শুধু কি তাই, পেঁয়াজ ভাজার গন্ধ পাইয়া উপরে আমাদের রান্নাঘরে দৌড়িয়া এলেন। "বসুন শিক্ষয়িত্রীগণ!" বলিয়া আমরা চেয়ার দিলাম। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন "সিংহ! তুমি কি আজ ক্যানেডা ছাড়িবে নাকি?" "না আমি শুক্রবারে Guelph ছাড়িব।" Spencer বলিল—"সিংহ! তুমি কি ভাব যে এই সমস্ত মহিলা আমাদের Indian dishকে পছন্দ করিবেন?" আমার নিকট কতকগুলি দারুচিনি ছিল, আমি এক একটী করিয়া বালিকাদিগের হাতে দিলাম। কেহ বলিল "এটা কি" "এরূপ আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।" তাহার পর এ কথা সে কথার পর আমি বলিলাম:— "Spencer! আমার যেন মনে হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষেই আছি।" হা হা করিয়া সকলে হাসিল। তখন বালিকাদের দিকে তাকাইয়া বলিলাম; "ভারতবর্ষে গেলে তোমাদের এই প্রকার অতিরিক্ত ঝাল দেওয়া 'খানা' খাইতে হইবে।" তাহার পর কাঁটা, চামচ, ছুরি, ডিশ, ন্যাপ্কিন সব টেবিলের উপর সাজান হইল। ফাউলের কারীটা অতি চমৎকার হইয়াছিল সমস্ত বালিকাদের তাহার একটু একটু আস্বাদন করান গেল। কেবল আমরা তিন জন পুরুষে আর তিন জন মহিলাতে ৬খানা চেয়ার লইয়া টেবিল-টাকে ঘিরিয়া বসিলাম। প্রথমে "A toast to Emperor of India"— তার পর ঠং ঠং শব্দ করিয়া খাইতে বসা

গেল। Spencer খাইতে খাইতে বলিল—"ক্যানেডাতে আসার পর আমার ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে আমি একলাই এই সমস্ত ভাত খাইতে পারিতাম।" মহিলারা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে পিয়ানো বাজান গেল। "Three cheers for India! হিপ্ হিপ্ হুরে প্রভৃতি আনন্দধ্বনি করা হল। তার পর আমরা তিন জনে ঠিক করিলাম যে ভারতে ফিরিলে আমরা একত্র মিলিত হইব, এবং এই Macdonald Institute তে Indian dish রাঁধার কথা স্মরণ করিব।

Slaterএর কথা পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছি। সে ইংরাজ ছাত্র, গত বৎসর B. Sc. উপাধি পাইয়াছে। আর এক বৎসর পরে ভারতে ফিরিবে। Spencer এই কলেজে এক বৎসর পড়িয়া Michiganএতে পড়িতেছে, আর "সিংহ"তো এখানে দু'বৎসর পড়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিল। আমরা তিনজনে ভারতবর্ষ হইতে আসি, আবার এখন তিন জনে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছি। যদি তিন জনে জীবিত থাকি তো পুনরায় ভারতে মিলিত হইব।

১৬ই সেপ্টেম্বর। আমি আজ কাল Queen's Hotelএ আছি। এখন রাত্রি ১১টা। এই কতকক্ষণ হইল মিসেস্ ওয়াটদের বাড়ীর সকলকে "গুড্ বাই" বলিয়া আসিলাম। Mrs. Watt বলিলেন:—"তুমি তোমার মাকে লিখ যে তুমি ভাল আছ শুধু তাহা নহে, তুমি সমস্ত বিষয়ে এখন ভাল হয়েছ, ইংরাজী কথা বলিতেও বেশ শিখিয়াছ, তোমার চেহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়েছে, এবং তুমি যখন Guelphতে আসিবে, আর কোথাও নহে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া, আমাদের সহিত থাকিবে। লুই* তোমাকে পেলে খুব খুসী হবে।" আচ্ছা, বলুন ত দেশের কোন লোক একজন বিদেশীকে কি এত খাতির, এত সমাদর করিতে চায়? আমি হিন্দু, Mrs. Watt খ্রীষ্টান, এই দু'বৎসরে আমাদের মধ্যে এতদূর বন্ধুত্ব। (ধন্য ক্যানেডার নরনারীগণ!) Mrs. Watt শেষকালে আমার মধ্যম অঙ্গুলি টিপিয়া শেষ "গুড্ বাই" বলিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন "God bless you, Good luck to you." আমি ইংরাজী ভাষায় তাঁহাকে ঠিক রকম প্রত্যুত্তর করিতে পারিলাম না। বিদায় লইতেছি এই কথাটি মুখ দিয়া স্পষ্ট বাহির হইল না।

পর দিন প্রাতে কলেজের তিনজন অধ্যাপককে special dinnerএ Wellington Hotelএ নিমন্ত্রণ করি। Director Zavitz বলিলেন:—"তুমি আর কিছু দিন থাকিয়া যাও, আমিও তোমাকে ডিনারেতে নিমন্ত্রণ করি।" এই

* ইনি Mrs. Wattএর কন্যা, সেই সময় তাহার কলিকাতা হইতে আসিবার কথা ছিল।

প্রকারে সকলের নিকট বিদায় লওয়া হইল।

আজ ১৭ই সেপ্টেম্বর। আজ বেলা ৫।৪৫ মিনিটের ট্রেনে Guelph ছাড়িয়া মার্কিণ রাজ্যে যাইবে। আমার পর পত্র সেখান হইতে পাইবেন।

প্রণত শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

শিখ গ্রন্থ-সুখমণী সাহিব।

৪৪৫ বৎসর গত হইল, নানক এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি এরূপ উদার ধর্ম্মজীবন দেখাইয়াছিলেন যে হিন্দুমুসলমান উভয়েই তাঁহাকে আপনার বলিয়া মনে করিত। তাঁহার ধর্ম্মমত হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত একেশ্বরবাদ ছিল।

গুরু নানকের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মকথা তাঁহার শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদাস সে সমস্ত এবং তৎপরবর্ত্তী গুরুদিগের এবং কবির প্রভৃতি সাধুদিগের কথা সমূহ একত্র করিয়া "গ্রন্থ সাহিব" নাম দিয়া শিখধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অর্জ্জুনদাস গুরু নানকের তিরোভাবের ৪৩ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুরু অর্জ্জুনদাস একজন অতি ভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সুখমনী নামক গ্রন্থ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় প্রদান করে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে হৃদয় বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়।

সুখমণী—যাহা পাঠ করিলে সুষম্না নাড়ীতে অর্থাৎ সত্ত্বগুণে মন অবস্থান করে। সম্মানার্থ সাহিব কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিখেরা আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের পূজা করেন। সেই কারণে সুখমণী সাহিব, গ্রন্থ সাহিব প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সুখমণী গ্রন্থসাহিবের অন্তর্গত একটী অধ্যায়। ইহাকে একটী পৃথক গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুখমণী-গ্রন্থের পদাবলী সুরলয়-যোগে গান করা যায়। গৌরী রাগিনীতে শিখেরা ইহা গান করেন। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদাসের রচিত বলিয়া "মহলা ৫" এই সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে।

সুখমণী গুরুমুখী ভাষায় রচিত। গুরুমুখী ভাষা প্রথমে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিছু দিন পাঠ করিতে করিতে অতি সহজ হইয়া যায়। গুরুমুখী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা অতি শ্রুতিমধুর। পাঠকগণ অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় ইহাও সুর করিয়া পাঠ করিতে পারেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এবং ধর্ম্মানুরাগী সুধীবর্গ উভয়েরই এই গ্রন্থ পাঠ করিতে কৌতূহল হইবে, এই ভাবিয়া গুরুমুখী গ্রন্থ বাঙ্গালা অক্ষরে এবং প্রতি ছত্রের

বাঙ্গালা অনুবাদ পৃথক পৃথক সম্বদ্ধ করিলাম। আশা করি ইহাতে গ্রন্থখানি পাঠ করিবার অনেকটা সুবিধা হইবে। দুরূহ শব্দের অর্থ অনুবাদের মধ্যে প্রকাশ পাইবে।

পাঠকগণের সুখমণী পাঠে রুচি বোধ হইলে সমগ্র গ্রন্থসাহিব ও তাহার অনুবাদ তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিব।

সুখমণী সাহিব।

গৌরী, মহলা ৫।

ওঁ সতি গুরু প্রসাদি।

ওঁ সদ্গুরুর কৃপা।

শ্লোক

আদি গুরয়ে নমহ।
যুগাদি গুরয়ে নমহ।
সতি গুরয়ে নমহ।
শ্রীগুর দেবয়ে নমহ ॥ ১

আদি গুরুকে নমস্কার
যুগাদি গুরুকে নমস্কার
সদ্গুরুকে নমস্কার
শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ১

অষ্টপদী।

সিমরউ সিমর সিমর সুখ পাবউ।
কল কলেশ তনমাহি মিটাবউ।
সিমরউ যাস বিসুংভর একৈ।
নাম জপত অগনত অনেকৈ।
বেদ পুরাণ সিমৃত সুধাকর।
কিনে রাম নাম ইক আখর।
কিনকা এক জিস জীয় বসাবৈ।
তাকি মহিমা গণি ন আবৈ।
কাংখী একৈ দরশ তুহারো।
নানক উন সংগি মোহি উধারো ॥ ১

ভগবানকে স্মরণ কর, স্মরণ করিতে করিতে সুখ পাইবে।
কলির ক্লেশ এই শরীর থাকিতেই নষ্ট কর।
সেই এক বিশ্বম্ভর পুরুষকে স্মরণ কর।

অনেক অসংখ্য বার তাঁহার নাম জপ কর। বেদ পুরাণ ও স্মৃতি, সুধার আকর এক অক্ষর রাম নামেই কেনা যায়। যার হৃদয়ে কণিকামাত্র বাস করেন, তাহার মহিমা গণনা করা যায় না। একবার মাত্র তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি। নানক বলিতেছেন, ঐ (ভক্ত) সঙ্গে আমাকে উদ্ধার কর ॥ ১

সুখমণী সুখ অমৃত প্রভু নাম।
ভগত জনাকৈ মন বিশ্রাম ॥

সুখ মানতেই সুখ, প্রভুর নামেই অমৃত।
ভক্তজনের মনেতেই শান্তি বিরাজ করে।

রহাউ।

ছেদ।

প্রভকৈ সিমরন গরভি ন বসৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুখ যম নশৈ।
প্রভকৈ সিমরন কাল পর হরৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুসমন টরৈ।
প্রভকৈ সিমরত কছু বিঘন ন লাগৈ।

প্রভুর স্মরণ করিলে গর্ভে বাস করিতে হয় না।

প্রভুর স্মরণে যম যন্ত্রণা নাশ হয়।
প্রভুর স্মরণে মৃত্যু পরিহার করে।
প্রভুর স্মরণে শত্রু পলাইয়া যায়।

প্রভুর স্মরণ করিলে কোন বিঘ্ন আসে না।

প্রভকৈ সিমরন অনদিন জাগৈ।
প্রভকৈ সিমরন ভউ ন বিয়াপৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুখ ন সংতাপৈ।
প্রভকৈ সিমরন সাধকৈ সংগি।
সরব নিধান নানক হরি রংগি॥ ২

প্রভুর স্মরণে অহর্দিবা জাগ্রত রাখে।
প্রভুর স্মরণ করিলে ভয় আসিতে পারে না।
প্রভুর স্মরণে দুঃখ সন্তাপিত করিতে পারে না।
সাধুসঙ্গ লাভে প্রভুকে স্মরণ করিতে মন যায়।
নানক বলিতেছেন, হরিতে অনুরক্ত হইলে সকল বস্তুই মিলে॥ ২

প্রভকৈ সিমরন রিধি সিধি নউ নিধি।
প্রভকৈ সিমরন জ্ঞান ধ্যান তত বুধি।
প্রভকৈ সিমরন জপ তপ পূজা।
প্রভকৈ সিমরন বিনসৈ দুজা।
প্রভকৈ সিমরন তীরথ ইসনানি।
প্রভকৈ সিমরন দরগতি মানী।
প্রভকৈ সিমরন হোয় সুভলা।
প্রভকৈ সিমরন সুফল ফলা।
সে সিমরহি যে আপ সিমরায়।
নানক তাকৈ লাগউ পায়॥ ৩

প্রভুর স্মরণে ঋদ্ধি অর্থাৎ সৌভাগ্য এবং সিদ্ধি এবং নবনিধি লাভ হয়।
প্রভুরই স্মরণে জ্ঞান, ধ্যান এবং বিস্তৃত বুদ্ধি লাভ হয়।
প্রভুর স্মরণই জপ তপ এবং পূজা।
প্রভুর স্মরণেই দ্বিত্বভাব নষ্ট হয়।
প্রভুর স্মরণে তীর্থস্নানের ফললাভ হয়।
প্রভুর স্মরণে ভগবানের দ্বারে সম্মান পায়।
প্রভুর স্মরণ শুভজনক হয়।
প্রভুর স্মরণে সুফল ফলে।
সেই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে যাহাকে নিজে স্মরণ করাইয়া দেন।
নানক বলিতেছেন, এমন (ভক্ত) জনের চরণে আমি পতিত হই॥ ৩

প্রভকা সিমরন সভতে উচা।
প্রভকৈ সিমরন উধরে মূচা।
প্রভকৈ সিমরন ত্রিসনা বুঝৈ।
প্রভকৈ সিমরন সভ কিছু সুঝৈ।
প্রভকৈ সিমরন নাহি যমত্রাসা।
প্রভকৈ সিমরন পূরণ আশা।
প্রভকৈ সিমরন মনকি মল যায়।
অমৃত নাম রিদ মাহি সমায়।
প্রভজী বসহি সাধকি রসনা।
নানক জনকা দাসন দসনা॥ ৪

প্রভুকে স্মরণ রাখা সকলের শ্রেষ্ঠ কার্য্য।
প্রভুর স্মরণে অনেক লোক উদ্ধার পায়।
প্রভুর স্মরণে তৃষ্ণা মিটে।
প্রভুর স্মরণে সকল সুখ হয়।
প্রভুর স্মরণে যমের ত্রাস থাকে না।
প্রভুর স্মরণে আশা পূর্ণ হয়।
প্রভুর স্মরণে মনের ময়লা দূর হয়।
নামরূপ অমৃত হৃদয়ে প্রবেশ করে।
সাধকের রসনাতে প্রভু বাস করেন।
নানক এইরূপ সাধুব্যক্তির দাসের দাস॥ ৪

নবনিধি—কুবেরের সম্পত্তি—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব্ব এই নয় প্রকার।

প্রভকউ সিমরহি সে ধনবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে পতিবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে জন পরবান।
প্রভকউ সিমরহি সে পুরুষ প্রধান।
প্রভকউ সিমরহি সি বেমুহ তাজে।
প্রভকউ সিমরহি সি সরবকে রাজে।
প্রভকউ সিমরহি সে সুখ বাসী।
প্রভকউ সিমরহি সদা অবিনাশী।
সিমরন তে লাগে জিন আপ দয়ালা।
নানক জন কী মংগৈ রবালা॥ ৫

প্রভুকে যে মনে রাখে সেই ধনবান।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পতিবতী।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই জনই শ্রেষ্ঠ।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পুরুষ-প্রধান।
প্রভুর স্মরণে তাহার কিছুই অভাব থাকে না।
প্রভুর স্মরণে সে সকলের রাজা।
প্রভুর স্মরণে সে সুখে বাস করে।
প্রভুর স্মরণে সে সদা অবিনাশী।
স্মরণ করিতে তাঁহারাই পারেন যাঁহাদের প্রতি প্রভুর দয়া হয়।
নানক এই সকল (ভক্ত) জনের পদরেণু প্রার্থনা করে॥ ৫

প্রভকউ সিমরহি সে পর উপকারী।
প্রভকউ সিমরহি তিন সদ বলিহারী।
প্রভকউ সিমরহি সে মুখ সুহাবৈ।
প্রভকউ সিমরহি তিন সুখ বিহাবৈ।
প্রভকউ সিমরহি তিন আতম জীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন নিরমল রীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন অনদ ঘনেরে।
প্রভকউ সিমরহি বসহি হরি নেরে।
সংত কিরপা তে অনদিন জাগ।
নানক সিমরন পূরে ভাগ॥ ৬

প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা পর উপকারী হয়েন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদিগকে বলিহারী যাই।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা সুখে কাল যাপন করেন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা আত্মজিত।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের নির্ম্মল রীতি।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা আনন্দ ঘন লাভ করেন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা হরির নিকট বাস করেন।
সাধুদের কৃপাতে তাঁহারা অনুদিন জাগ্রত।
নানক বলিতেছেন, সম্পূর্ণ সৌভাগ্য হইলেই মানুষ হরিস্মরণ করিতে পারে॥৬

প্রভকৈ সিমরন কারয পূরে।
প্রভকৈ সিমরন কবহুন ঝুরে।
প্রভকৈ সিমরন হরিগুণ বাণী।
প্রভকৈ সিমরন সহজি সমানী।
প্রভকৈ সিমরন নিহচল আসন।
প্রভকৈ সিমরন কমল বিগাসন।
প্রভকৈ সিমরন অনহদ ঝুনকার।
সুখ প্রভ সিমরন কা অন্ত ন পার।
সিমরহি সে জন যিন কউ প্রভ মায়া।
নানক তিন জন স্মরণী পয়া॥ ৭

প্রভুর স্মরণে কার্য্য সফল হয়।

প্রভুর স্মরণ করিলে কখন কাঁদিতে হয় না।

প্রভুর স্মরণ করিতে করিতে হরিগুণ-গানে ইচ্ছা হয়।

প্রভুর স্মরণে সহজেই মন শান্ত হয়।

প্রভুর স্মরণে আসন স্থির হয়।

প্রভুর স্মরণে হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।

প্রভুর স্মরণে অনাহতধ্বান শ্রবণপথে আসে।

প্রভুর স্মরণে যে সুখ তাহার অন্ত নাই।

সেই জনই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে যাহাকে তিনি কৃপা করিয়াছেন।

নানক এই মহাজনের স্মরণ লইয়াছেন ॥৭

হরি সিমরন করি ভগত প্রগটায়।

হরি সিমরন লগ বেদ উপায়।

হরি সিমরন ভয়ে সিধ যতি দাতে।

হরি সিমরন নীচ চহু কুঁট জাতে।

হরি সিমরন ধারী সভ ধরনা।

সিমর সিমর হরি কারণ কর না।

হরি সিমরন কিয়ো সগল অকারা।

হরি সিমরন মহি আপ নিরংকারা।

কর কিরপা যিস আপ বুঝায়া।

নানক গুরুমুখ হরি সিমরন তিন পায়া ॥৮

হরিকে স্মরণ করিয়া ভক্ত প্রগট হয়েন।

হরি স্মরণ করায় বেদের সৃষ্টি।

হরি স্মরণ করিয়া সিদ্ধ, যতী এবং দানী হয়েন।

হরি স্মরণ করিয়া নীচ ব্যক্তিও চারি-দিকে জানিত হন।

হরির স্মরণে সমস্ত পৃথিবী রক্ষিত হয়!

স্মরণ কর স্মরণ কর সেই কারণের কারণ হরিকে।

হরির স্মরণে সকল বস্তুর সৃষ্টি।

হরির স্মরণে আপনি নিরঙ্কার বিরাজিত।

হার কৃপা করিয়া যাহাকে আপনি বুঝাইয়া দেন,

নানক বলিতেছেন, হে শিষ্য হরিকে স্মরণ করিতে সেই পারিয়াছে ॥ ৮

শিখ গ্রন্থ —সুখমনী সাহিব।

২। শ্লোক।

দীন দরদ দুঃখ ভংজনা ঘট ঘট নাথ অনাথ।

সরম তুমারী আয়ো নানক কে প্রভ সাথ ॥ ১

হে দীনদরিদ্র-দুঃখ-ভঞ্জন, সকল অনাথ-জীবের নাথ!

হে নানকের প্রভু, তোমার নিকট আসিলাম, তোমার স্মরণ লইলাম ॥১

অষ্টপদী

যহ মাত পিতা সুত মিত ন ভাই।

মন উহা নাম তেরৈ সঙ্গ সহাই।

যহ মহা ভয়ান দূত যম দলৈ।

তহ কেবল নাম সংগ তেরৈ চলৈ।

যহ মুসকল হোবৈ অতি ভারি।

হরিকো নাম খিন মাহি উধারি।

অনিক পুনহ চরণ করত নহি তরৈ।

হরিকো নাম কোট পাপ পরহরৈ।

গুরু মুখ নাম জপহু মন মেরে।

নানক পাবহু সুখ ঘনেরে ॥ ১

যেখানে মাতা পিতা পুত্র মিত্র ভাই সঙ্গে নাই,

হে মন, সেখানে হরিনাম তোমার সঙ্গ ও সহায়।
যেখানে মহা ভয়ানক যমদূত দলন করে,
সেখানে তোমার সঙ্গে কেবল হরি নামই যায়
যে সময় অত্যন্ত বিপদ হয়,
হরিনাম এক মুহূর্ত্তে উদ্ধার করে।
অনেক পুণ্য করিয়াও মানুষ তরিতে পারে না,
কিন্তু হরিনামে কোটী পাপ হরণ করে।
হে মন, গুরুদত্ত নাম জপ কর—
নানক বলিতেছে, তাহাতে সুখ ঘন প্রাপ্ত হইবে ॥ ১
সগল স্রষ্টি কো রাজা দুঃখীয়া।
হরিকা নাম জপত হোয় সুখীয়া।
লাখ করোরী বংধন পরৈ।
হরিকা নাম জপত নিসতরৈ।
অনিক মায়া রংগ তিষন বুঝাবৈ।
হরিকা নাম জপত আঘাবৈ।
যহ মারগ ইন্দু যাত ইকেলা।
তব হরিকা নাম সংগ হোত সুহেলা।
ঐসা নাম মন সদা ধিয়াইঐ।
নানক গুরু মুখ পরম গতি পাইঐ ॥ ২
যদি কেহ সকল সৃষ্ট বস্তুর রাজা হয়, তাহা হইলেও সে দুঃখী।
কেবল মাত্র হরিনাম জপ করিয়াই মানুষ সুখী হইতে পারে
লক্ষ এবং ক্রোর বন্ধন থাকিলেও, হরিনাম জপ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে।
অনেক মায়ার রঙ্গেও প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না।
এক হরিনাম জপাতেই তৃষ্ণা মিটে।
যে মার্গে মানুষ একা যায়।
সেখানে সুখকর হরিনাম সঙ্গে থাকে।
হে মন, এমন নাম সর্ব্বদা ধ্যান কর।
নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে শিষ্য পরমগতি লাভ করে ॥ ২
ছুটত নহী কোট লখ বাহী।
নাম জপত তহ পার পরাহী
অনিক বিঘন যহ আয় সংঘারৈ।
হরি কা নাম তৎকাল উধারৈ।
অনিক যোন জনমৈ মরি যাম।
নাম জপত পাবৈ বিসরাম।
হা মৈলা মল কবহু ন ধোবৈ।
হরি কা নাম কোটী পাপ খোবৈ।
ঐসা নাম জপহু মন রঙ্গ,
নানক পাই ঐ সাধ কৈ সঙ্গ ॥ ৩
কোটী লক্ষ সেনা যখন উদ্ধার করিতে পারে না,
নাম জপ করিলে তাহা হইতে উদ্ধার হয়
অনেক বিঘ্ন যখন সংহার করিতে আসে,
হরি নামই তখন বিপদ হইতে উদ্ধার করে।
অনেক যোনিতে যে জন্মিতেছে ও মরিতেছে,
নাম জপ করিয়া সে জন্ম মরণ হইতে বিশ্রাম পায়।
অহঙ্কারের ময়লা যাহার কখন ধোয়া হয় নাই,
হরিনামে তাহার কোটী পাপ হরণ করে।
হে আমার মন, আনন্দের সহিত এই নাম জপ কর।

নানক বলিতেছেন, সাধু সঙ্গ যখন পাইয়াছ ॥ ৩

যিহ মারগ কে গনে যাহি ন কোশা।
হরিকা নাম উহা সঙ্গ তোসা।
যিহ পৈড়ে মহা অন্ধ গুবারা।
হরিকা নাম সঙ্গ উজীয়ারা।
যহ পংথ তেরা কোন সিয়ানু।
হরিকা নাম তহ নাল পহানু।
যহ মহা ভয়ান তপত বহু ঘাম।
তহ হরি কে নাম কী তুম উপর হাম।
যহা তৃষা মন তুঝ আকর বৈ,
তহ নানক হরি হরি অমৃত বরষৈ ॥ ৪

যে রাস্তার দূরত্ব (ক্রোশ) গণনা করা যায় না।
হরিনাম সেই পথে তোমার সুখকর সঙ্গী।
যে পথে মহা ঘোর অন্ধকার,
হরিনাম সেখানে তোমার আলোক।
যে পথে তোমার কোন পরিচিত নাই,
হরিনাম সেখানে তোমার বন্ধু।
যেখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম ও ঘর্ম্ম,
সেখানে হরিনাম তোমার উপর ছায়া।
হে মন, যেখানে হরিতৃষ্ণায় মন আকর্ষণ করে,
নানক বলিতেছেন, হরি হরি! সেখানে অমৃত বর্ষণ হয় ॥ ৪

ভকত জনাকী বরতন নাম।
সংত জনা কৈ মন বিশ্রাম।
হরিকা নাম দাস কী ওঠ।
হরিকৈ নাম উধরৈ জন কোট।
হরি যশ করত সংত দিন রাত।
হরি হরি ঔষধ সাধ কমাত
হরি জনকৈ হরি নাম নিধান।
পর ব্রহ্ম জন কীনো দান।
মন তন রঙ্গ রতে রঙ্গ একৈ।
নানক জন কৈ বিরত বিবেকৈ ॥ ৫

ভক্ত জনের উপজীবিকা হরিনাম,
ভক্ত জনের মনে শান্তি বিরাজ করে।
হরিনাম তাঁহার দাসের আশ্রয়.
হরিনামে কোটী কোটী ব্যক্তি উদ্ধার পায়।
সাধুগণ দিবারাত্রি হরিনাম গান করেন,
সাধুগন হরিনাম ঔষধ কামনা করে,
হরিজনের হরি নামই সম্পদ,
পরব্রহ্ম হরিজনকে এই নাম প্রদান করিয়াছেন।
মন এবং শরীর সেই একেরই আনন্দে মগ্ন,
নানক বলিতেছেন, হরি জনের ইহাই বিবেক এবং বৈরাগ্য ॥ ৫

হরিকা নাম জন কউ মুকত যুগত।
হরি কৈ নাম জন কউ তৃপ্ত ভুগত।
হরিকা নাম জনকা রূপ রঙ্গ।
হরি নাম জপত কব পরৈ ন ভঙ্গ।
হরিকা নাম জনকী বড়িয়াই।
হরিকৈ নাম জন শোভা পাই।
হরিকা নাম জন কউ ভোগ যোগ।
হরি নাম জপত কছু নাহি বিয়োগ।
জন রাতা হরি নামকী সেবা।
নানক পূজৈ হরি হরি দেবা ॥ ৬

হরিজনের হরিনামই মুক্তি এবং যুক্তি,
হরিজনের হরিনামই তৃপ্তি ও ভো

হরিজনের হরিনামই রূপ ও রঙ্গ,
হরিনাম জপ করিয়া কখনও কষ্ট পান না;
হরিজনের হরিনামই শ্রেষ্ঠত্ব,
হরিজনের হরিনামই শোভা;
হরিজনের হরিনামই যোগ এবং ভোগ,
হরিনাম জপ করিলে কিছুরই অভাব থাকে না,
হরিজন হরিনাম সেবাতেই রত থাকেন।
নানক বলিতেছেন, হরি দেবতার পূজা কর॥ ৬

হরি হরি জন কৈ মাল খজীনা,
হরি ধন জন কউ আপ প্রভ দীনা;
হরি হরি জন কৈ ওঠ সতানী,
হরি প্রতাপ জন অবরন জানী;
ওত পোত জন হরি রস রাতে,
শুংন সমাধ নাম রস মাতে;
আঠ পহর জন হরি হরি জপৈ,
হরিকা ভগত প্রগট নহি ছপৈ;
হরিকী ভগত মুকত বহু করে,
নানক জন সংগ কেতে তরে॥ ৭

হরিজনের ধন সম্পদ হরিনাম,
হরিজনকে আপনি দয়া করিয়া প্রভু ইহা দিয়াছেন,
হরিজনের হরিই শক্তি, মান ও আশ্রয়,
হরিজন হরির প্রতাপ ব্যতীত আর জানে না,
হরিজন হরিরসে ওত প্রোত,
বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধিতে বসিয়া নাম রসেমগ্ন,
হরিজন অষ্ট প্রহর হরিনাম জপ করেন,
হরিভক্ত প্রকাশ হইয়া পড়েন, ছাপা থাকেন না,
হরিভক্ত বহু লোককে মুক্ত করেন।
নানক বলিতেছেন, হরিজনের সঙ্গে কত লোক তরিয়া যায়॥ ৭

পারজাত ইহু হরিকা নাম।
কামধেন হরি হরিগুণ গান।
সভতে উত্তম হরিকী কথা।
নাম শুনত দরদ দুখলথা।
নামকী মহিমা সংত হৃদ বসৈ।
সংত প্রতাপ দুরত সভ নসৈ।
সংতকা সঙ্গ বড় ভাগী পাই ঐ,।
সংতকা সেবা নাম ধিয়াই ঐ।
নাম তুল কছু অবরন হোয়।
নানক গুর মুখ নাম পাবৈ জন কোয়॥৮

হরিনামই স্বর্গের পারিজাত পুষ্প,
হরিগুণগা ই কামধেনু,
হরিকথা সকলের উত্তম,
নাম শুনিলে দুঃখ কষ্ট দূর হয়,
নামের মহিমা সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থান করে,
সাধুগণের প্রতাপে পাপ নাশ হয়;
সাধুসঙ্গ বড় ভাগ্যে হয়,
সাধুসঙ্গে হরিনাম স্মরণ করায়,
নামের তুল্য আর কিছুই নাই,
নানক বলিতেছেন, কোন কোন শিষ্য গুরু মুখ নাম লাভ করেন॥ ৮

৩

শ্লোক।

বহু শাসত্র বহু সিমৃতি পেখে সরব ডং ঢোল,

পুজসি নহী হরি হরে নাশক নাম
অমোল ॥ ১

অনেক শাস্ত্র এবং স্মৃতি খুঁজিয়া দেখিলাম, সে সকল হরিনামের তুলনায় আসে না. নানক বলিতেছেন, হরিনাম অমূল্য ॥১

জপ তপ জ্ঞান সভ ধ্যান,
ষট শাস্ত্র সিমৃত বখান ;
যোগ অভয়াস কর্ম্ম ধর্ম্ম কিরিয়া,
সগল তিয়াগি বন মধে ফিরিয়া ;
অনিক প্রকার কীয়ে বহু যতনা,
পুংন দান হোম বহু রতনা :
শরীর কটায় হোমৈ কর রাতী,
বরড নেম করৈ ভাতী ;
নহী তুল রাম নাম বীচার,
নানক গুর মুখ নাম জপীয়ৈ ইকবার ॥১

সকল প্রকার জপ, তপ, জ্ঞান এবং ধ্যান,
ষড় দর্শন এবং স্মৃতির ব্যাখ্যান,
যোগ অভ্যাস এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ক্রিয়া,
সকল ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করা ;
অনেক প্রকারের অনেক যত্ন করা,
পুণ্য এবং হোম ও বহু রত্ন দান ;
শরীরকে টুক্‌রা টুক্‌রা কাটিয়া তাহা দ্বারা হোম করা,
বহু প্রকারের ব্রত নিয়ম করা,
এ সকল কিছুই রাম নামের তুল্য বিচারে আসে না,
নানক বলিতেছেন, একবার সেই গুরুদত্ত নাম জপ কর ॥ ১

(ক্রমশঃ)

ভুল ভাঙ্গা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আজ বিভাময়ীর অসুখ বড় বাড়িয়াছে। যন্ত্রণায় সে এপাশ ওপাশ করিতেছে। সময় সময় নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, এক একবার চকিতের ন্যায় চারিদিকে উৎসুক ভাবে চাহিতেছে। পার্শ্বে জননী অনিমিষনেত্রে রুগ্নকন্যার বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার নয়ন দিয়া জলধারা পড়িয়া বক্ষ প্লাবিত করিতেছে।

ধীরে ধীরে বিষণ্নমূর্ত্তি অমর নাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হায়! কত কাল পরে!

বিভার মাতা অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল। অমর নাথ দেখিলেন, সেই সোনার প্রতিমা, মলিন হইয়া যেন শয্যায় মিশিয়া রহিয়াছে। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া অমরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অমর অবসন্ন ভাবে বিভার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। উদ্বেলিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিভা!—বিভা আমার!"—

চমকিত হইয়া বিভা নয়নোন্মীলন করিল। এমন আদরের আহ্বান তো

বিভা বহুকাল শুনে নাই? কয় দিনই বা শুনিয়াছিল? বিভার হৃদয়তন্ত্রী যেন কি এক সুরে বাজিয়া উঠিল। অমরনাথের মূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাবে বিভার মনে জাগিতেছিল সেত ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই! কিন্তু সেই অস্পষ্ট হইতে স্বামীর দেবমূর্ত্তি সুস্পষ্ট ভাবে কল্পনা করিয়া বালিকা মনে মনে প্রণয়-কুসুম দিয়া পূজা করিতেছিল। অন্তরে অন্তরে স্বামীকে দেখিতে পাইত, তাই অভাগিনী স্বামীর দীর্ঘ অদর্শন যাতনা সহ্য করিয়াও জীবিতা ছিল। আজ কত কাল পরে, জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে বিভা স্বামীকে দেখিল, তাঁহার মুখে প্রণয় সম্ভাষণ শুনিল। অসহ্য আনন্দে বিভার নয়নযুগল হইতে জলধারা গড়াইয়া শীর্ণ গণ্ড বহিয়া চলিল। অনুতপ্ত অমর নাথ সেই শুষ্ক মুখ খানি সাদরে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সযত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন। এতক্ষণে বিভার কথা ফুটিল, অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিল, "এতদিন পরে মনে পড়েছে!"

অমরনাথ সস্নেহে বলিলেন, "তোমার এমন অসুখ হ'য়েছে, আমায় জানাও নি কেন বিভা! তুমি যদি আমায় আসতে লিখ্‌তে, তবে আমিত অনেক আগে আসতে পার্‌তাম।"

বিভা সেইরূপ স্বরে বলিল "অনেক বার তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে আপনাআপনি ক্ষান্ত হ'য়েছি, পাপ লজ্জা আমায় লিখ্‌তে দেয় নি। আর আমার মনে হ'তো, আমি চিঠি দিলে তুমি কি ভাব্‌বে, হয়ত ঘৃণা ক'রে ফেলে দেবে, এই ভয় আমার বড় হয়েছিল। আমাকে যখন ঘৃনায় ত্যাগ—"

অমর বাধা দিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "আর বলো না বিভা! আমার বুক ফেটে যাবে, আমি তো তোমাকে ত্যাগ করি নাই? আমার হৃদয় পাষাণ সত্য, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। বিভা! আমার বিভা! তোমার অপরাধী স্বামীকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না কর্‌লে আমার কিছুতেই শান্তি নাই।"

বিভা পূর্ব্বমত মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার অপরাধ কি? আমার অদৃষ্ট! যা'হোক আর আমার কোন দুঃখ নাই। তুমি এসেছ, আমাকে আদর ক'রেছ, এখন আমি সুখে মর্‌তে পার্‌ব।"

অমর বিভার ক্ষীণ শুষ্ক ওষ্ঠ খানি সাদরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, অমন কথা বলো না বিভা! আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচাব। সেবা শুশ্রূষায় তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে নেব।"

বিভা, ক্ষীণ বাহু যুগল দ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁহার বুকের ভিতরে মুখ খানি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে তোমার দেশে নিয়ে চল। এখানে থাক্‌লে আমি বাঁচব না।"

অমর আবেগের সহিত বলিলেন, তাই চল বিভা! তোমাকে পল্লীগ্রামে আমার

সেই মাটির ঘরে নিয়ে যাই। সেখানে এত ঐশ্বর্য্যের মিথ্যা আড়ম্বর নাই। কিন্তু সেখানে যা' আছে, তোমার পিতার এই বৃহৎ অট্টালিকায় তা' নাই। চল বিভা আমাদের পল্লীজননীর শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই। বিভা! অভিমানিনী আমার! আবার বলি, আমায় ক্ষমা কর। আমার ধারণা ছিল, ধনবান হইলেই অহঙ্কারী হয়, তা'দের হৃদয়ে স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি কখনই থাক্‌তে পারে না। তোমার পিতার ব্যবহার, আমার সেই সন্দেহ-অনলে ইন্ধন স্বরূপ হ'য়েছিল। কিন্তু তখন আমি জান্‌তে পারি নাই যে, মরুভূমির মধ্যেও বিমলসলিলা স্রোতস্বতী থাকে! কালভুজঙ্গের শিরে নয়ন-মুগ্ধকর উজ্জ্বল মণি বিরাজ করে, এবং পঙ্কিল জলেই নয়নাভিরাম-কমলিনী শোভা পায়। বিভা! আদরিণী আমার! এত দিন পরে আমার ভুল ভেঙ্গেছে।"

অনেকক্ষণ কথা বলিয়া বিভা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে অবসন্ন-ভাবে নয়ন মুদিত করিল। আর কিছু বলিতে পারিল না। অমরনাথ ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন, এবং পার্শ্বে বসিয়া সযত্নে, মৃদুভাবে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

১২

অমরনাথকে দেখিয়া বিভার অশান্ত হৃদয় স্থির হইল। বহুদিনের বাঞ্ছিতকে পাইয়াই হউক, আর অমরের ঐকান্তিক শুশ্রূষার গুণেই হো'ক্ বিভাময়ী ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল।

বিভা অপেক্ষাকৃত সবল হইলে অমরনাথ তাহাকে দেশে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। এবার অমরের শ্বশুর শ্বাশুড়ী আর কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না, বরং সানন্দে সম্মতি দান করিলেন। বিশেষ সেবার বৈশাখ মাসেই কলিকাতা সহরে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল। চিকিৎসকেরা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "এ সময় পল্লীগ্রাম স্বাস্থ্যকর। সেখানে বিভাময়ীর স্বাস্থ্যের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা।" অমরনাথ শুভদিন দেখিয়া সস্ত্রীক দেশে যাত্রা করিলেন।

চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়া অবধি অমর দেশে আসিতে পারেন নাই, স্নেহময় পিতা মাতা বহুদিনের পরে প্রিয়তম পুত্রকে বধূসহিত দেখিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীনগরনিবাসী স্ত্রী পুরুষ দলে দলে বধূকে দেখিবার জন্য কাশীনাথের ভবনে আসিতে লাগিল। অমরের জননীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি পরম আহ্লাদে সকলকে বধূর মুখ দেখাইতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে বধূর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিভাময়ী জীবনে এই প্রথম স্বামীগৃহে আসিয়াছে। সে যাহা কিছু দেখিতেছে, সবই তাহার চোখে নূতন। সহরের নিরবচ্ছিন্ন গণ্ডগোলের ভিতর হইতে আসিয়া পল্লীগ্রামের অনাবিল নীরবতা, বিভার নিকটে বড় মনোরম ও তৃপ্তিপদ বোধ হইতে লাগিল। পল্লীজননী, তাঁহার রুগ্ন ক্লিষ্ট সন্তানটীকে সযত্নে স্বীয় শান্তিময়

ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া, তাহার দুর্ব্বল দেহে পদ্মহস্ত বুলাইয়া সন্তর্পণে সেবা করিতে লাগিলেন। বিভা, পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও যাহা পায় নাই, স্বামীর তৃণাচ্ছাদিত ভবনে আসিয়া তাহা পাইল। সে বড় সুখী হইল। বড় শান্তি পাইল। বিনা ঔষধে পনর দিনের মধ্যে তাহার পীড়ার অর্দ্ধেক উপশম হইল।

কাশীনাথের প্রতিবেশী এবং বন্ধু রাম সদয় ঘোষের কন্যার সহিত কুমারনাথের শুভ বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরতর হইল। ভ্রাতার সম্বন্ধ স্থির করিয়া অমর ভগিনীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কারণ তাঁহার ছুটীর আর বেশী দিন ছিল না।

সন্ধ্যার পরে কাশীনাথ মিত্র বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আছেন, অমরনাথ এবং গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক সেখানে উপবিষ্ট আছেন। উষাবালার বিবাহ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইতেছিল। কাশীনাথ কয়েকটী সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু অমরনাথের কোনটী মনোনীত হইল না। উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন একটী ছেলের কথা বলিলেন। ছেলেটী তাঁহার কোন আত্মীয়ের পুত্র। সবিশেষ অবগত হইয়া অমর এই কার্য্যটী মনোনীত করিলেন। ছেলেটীর বাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন্নগর গ্রামে। অমরনাথ তৎপর দিবসেই স্বয়ং কোন্নগর যাইয়া সম্বন্ধ স্থিরতর করিয়া আসিবেন, সাব্যস্ত হইল। সেই ভদ্র লোকটীও সঙ্গে যাইবেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী মলিনবেশধারী শীর্ণদেহ যুবক ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া সকলে চমকিত হইলেন, কারণ যুবকের পরিধেয় বসনাদি সামান্য এবং মলিন হইলেও তাহার আকার-প্রকার তাহার মহৎ বংশের পরিচয় দিতেছিল। যুবকের মুখমণ্ডল শীর্ণ ও শুষ্ক হইলেও তাহাতে একটী সুকুমার লাবণ্যের আভা ক্রীড়া করিতেছিল। সকলে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবক একটীও উত্তর দিল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। অমরনাথ এক দৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ দ্রুতপদে আসিয়া একেবারে আগন্তুক যুবকের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "অজিত! ভাই!—"অমর আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অজিতকুমারের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। উভয় বন্ধু পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন, কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কাশীনাথ অকস্মাৎ অজিতকে দেখিয়া বিস্মিত, চকিত ও পরম আহ্লাদিত হইলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকগণ বিস্মিতভাবে উভয় বন্ধুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শেষ।

পাঠক! পাঠিকা! আসুন, পাতা প্রস্তুত। জলযোগের বিরাট আয়োজন। দুইটী বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছে। সমারোহের সীমা নাই। এই বিবাহের পাত্র পাত্রী কাহারা? তাহা কি বলিতে হইবে?

যথাসময়ে মহাসমারোহে শ্রীমান কুমার নাথের সহিত রামসদয়ের কন্যা শ্রীমতী কিরণ বালার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। আর আমাদের অজিত কুমার তাঁহার চির-বাঞ্ছিতা উষাবালাকে জীবনের সহচরী রূপে গ্রহণ করিলেন। অবশ্য অজিতের পিতামাতার সম্মতিক্রমে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এতদিন পরে অমরনাথ অজিতের হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার ভাবান্তরের কারণও অমরের নিকট আর অজ্ঞাত রহিল না। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, রূপে গুণে অজিত কুমারের ন্যায় সুপাত্র আর কোথায় পাইবেন? শ্রীনগরনিবাসী সকলে উষাবালার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

একটী কক্ষে অমর, অজিত, বিভাময়ী ও উষাবালা কথা-বার্ত্তা, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন। সে ঘরে অন্য কেহ ছিল না।

বিভা, উষাবালাকে ধরিয়া অজিতের পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। উষা, তাহার বৌদিদির বুকের ভিতরে মুখ লুকাইল। স্নেহময়ী বৌদিদি সস্নেহে সেই মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই মুখ খানির এমন গুণ, যে একবার দেখে সে পাগল হ'য়ে যায়। কেউ বা বিবাগী হ'য়ে যায়। অজিত বাবু? সাবধানে রাখ্‌বেন। যেন কারো দৃষ্টিপথে না পড়ে।"

অজিতও হাসিয়া বলিলেন, "সকলেই কি পাগল হয়? না, সকলেই বিবাগী হয়? ভগবান যার জন্য যা'কে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, তার জন্যই সে পাগল হয়। উষা এতদিন কুমারী ছিল কার জন্য? কই? আর তো কেউ পাগল হয় নি?"

অমর বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! দুই বৎসর এক সঙ্গে থেকেও অজিতের মনের ভাব জান্‌তে পারি নাই।"

বিভা সময় পাইয়া বলিল, "মানুষে যদি মানুষের মনের ভাব জান্‌তে পার্‌ত, তা'হলে আর ভাবনা কি ছিল? বিশেষ পুরুষ মানুষ —

অমর অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর বিভা! আর সে কথায় কাজ নাই। সত্যই আমি বড় নির্ব্বোধ।"

অজিত কুমার সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অমর! যে দিন তোমার মুখে শুন্‌লাম, ধনবানের উপরে তোমার দারুণ বিদ্বেষ; ধনীর পুত্রের সহিত কিছুতেই উষার বিবাহ দিবে না, সেই দিন সংসার এবং জীবন আমার কাছে শূন্য বোধ হ'লো। আমি উষাকে বিস্মৃত হ'বার জন্য বহুদূর গিয়াছিলাম। অনেক স্থানে ভ্রমণ ক'রেছি, কিন্তু দেখ্‌লাম,

স্মৃতি যাবার নয়। তাই আবার ফিরে এলাম।"

অমর দৃঢ়ভাবে অজিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আর কেন ভাই! আমায় লজ্জা দাও? সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে, তার সাক্ষী এই দেখ,"—এই বলিয়া অমর, এক হস্তে অজিতের এবং অন্য হস্তে বিভার হস্ত ধারণ করিলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ

বিশ্বাসীর জীবন

মহর্ষি ঈশার জীবনচরিত যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে ৩০ বৎসর বয়সের সময় তিনি দীক্ষা লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হন। তখন তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনের একটী মহান্ উদ্দেশ্য (mission) আছে এবং তাহা পিতার ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ করা। তৎপরে তিনি কিঞ্চিদধিক তিন বর্ষকাল জীবিত ছিলেন, এবং আমৃত্যু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই অবিশ্রান্ত খাটিয়াছেন।

যীশু বিদ্বান্, ধনী বা পদস্থ লোক ছিলেন না। তিনি গরিব সূত্রধর-সন্তান। আজ কি খাইবেন এরূপ সংস্থানও তাঁহার ছিল না। কিন্তু কি খাইব কি পরিব, কোথায় মাথা রাখিব? তিনি সে চিন্তা আদৌ করিলেন না। পিতা আছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সকল অভাব দেখিতেছেন ও সকল অভাব পূর্ণ করিবেন, এই বিশ্বাসে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য কেবল প্রাণপণে পিতার আদেশ পালন করা। পিতার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন।

ঈশা তাঁহার পিতার ইচ্ছা কি বুঝিয়াছিলেন? "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা।" এই স্বর্গরাজ্য কি? তাহা তিনি অনেক রূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সার এই মাত্র বুঝা যায় যে সংসারে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান করা আর ঐশীশক্তি-দ্বারা দুঃখি-দুর্ব্বল এবং পাতকীদিগকে সুখী, সবল ও পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করা। ঈশা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন—অন্ধকে চক্ষু, খঞ্জকে গতিশক্তি এবং মৃতব্যক্তিকে জীবন দিয়াছেন। ইহা বাহ্যিকভাবে আমরা স্বীকার করি আর না করি, আধ্যাত্মিকভাবে অবশ্যই করিব। তাঁহার কার্য্যে এবং চরিত্রে এই যে অদ্ভুত কার্য্যসকল সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে

তিনি নিজের গৌরব কিছুই দেখেন নাই—পিতারই মহিমা দেখিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস শর্ষপকণার ন্যায় হইলেও তাহা দ্বারা প্রকাণ্ড পর্ব্বত টল্‌টলায়মান হয়। তিনি প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরকে সত্যভাবে ও অধ্যাত্মভাবে পূজা করিতেন এবং সরল অন্তরে সমুদয় হৃদয়-মন-প্রাণের সহিত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। ইহাতেই তিনি ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেন ও অসম্ভব যাহা, তাহা সম্ভব করিতে পারিতেন পিতার ইচ্ছা মস্তকে লইয়া তিনি কয়েকটী জেলে মালাকে সহচররূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাহারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগকে সতেজ করিয়া তাহাদের দ্বারা পিতার কার্য্য সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। বৎসরের পর বৎসর যত চলিতে লাগিল, ততই তিনি ব্যস্ত হইলেন "I must finish my Father's work" (পিতার কার্য্য আমি অবশ্য সমাধা করিব) এই বলিয়া নানা স্থানে প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মৃত্যুর আয়োজন সকলই প্রস্তুত, তাঁহার কার্য্য করিবার সুযোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন পিতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছার ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইল। তিনি চান আরও বাঁচিয়া পিতার কার্য্য করিতে, কিন্তু পিতার এ কি ইচ্ছা—কার্য্য সমাধা হইতে না হইতেই তাঁহার জীবন যাত্রার সমাধা হইবে। তখন ঈশা আশ্চর্য্যরূপে সে বিরোধ ভঞ্জন করিলেন,—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া তিনি আপনার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটে বলিদান দিলেন। তাঁহার জীবন শেষ হইল, কিন্তু পিতার কার্য্য কি অসম্পন্ন রহিল? পিতার কার্য্য পিতাই সম্পন্ন করিয়া লন। ঈশার তিন বৎসরের জীবনের প্রভাব দুই সহস্র বৎসর চলিয়া আসিতেছে এবং তাঁহার কার্য্যের ফল অনন্ত কাল ফলিতে থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। পিতার অনন্ত ঐশ্বর্য্য গৌরবের তিনি যে অধিকারী হইয়াছেন, তাহারও সন্দেহ নাই। পিতার ইচ্ছায় জীবনে ও মরণে আত্মবলিদান করিলে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় ও পিতার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, ঈশা এই মহা শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসী ঈশ্বর-তনয় ঈশার ন্যায় আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান এবং পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া পিতার কার্য্য সম্পন্ন করাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশা যে দীক্ষা লাভ করিয়া পিতার ইচ্ছায় আপনার জীবনের উদ্দেশ্য (mission) বুঝিয়াছিলেন, আমরা অনেকে তাহা বুঝিতে পারি না বলিয়া জীবনের কার্য্য প্রকৃত ভাবে সম্পন্ন করিতে পারি না। পিতার উপর আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর নাই, সুতরাং কি খাইব কি পরিব, কোথায় বাস করিব এবং স্ত্রীপুত্র-বংশপরম্পরার দশা কি হইবে, সেই জন্য

আমাদিগের অশেষ ভাবনা আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করি, তাহা সম্পাদনের পথে কত ভয় বাধা ও প্রতিবন্ধক দেখিয়া ভঙ্গ দিয়া থাকি। প্রবল বিশ্বাসের অভাবে আমাদের অন্তরের রিপুসকল বিষম প্রতিবন্ধক হয় এবং বাহিরের প্রতিকূল অবস্থাসকল আরও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কার্য্যের পরিমাণ স্থির করি এবং আপনার জ্ঞান বুদ্ধিতে কার্য্য করিতে গিয়া অক্ষমতা উপলব্ধি করি। এই জন্য আমাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা এবং আমাদিগের জীবনে মরণে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পায় না।

সকল ধর্ম্মসমাজে বিশ্বাসীরাই ঈশ্বরের কার্য্য দিব্যচক্ষে দেখিতে পান এবং যথাজ্ঞান, যথাশক্তি সেই কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির সহায়তা লাভ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। বিশ্বাসের কার্য্য কখনও নিষ্ফল হয় না তাহাতে মৃত্যু হইলেও মৃত্যু হইতে নব জীবন উত্থিত হয় এবং ঈশ্বরের কার্য্য নব নব ভাবে সম্পন্ন হইয়া তাঁহার মহিমা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে।

অনেকেই ভুট্টা গাছ দেখিয়াছেন। ইহার বোটানিক্যাল্ নাম Zea-Mays। এই ভুট্টা অনেক জাতীয় আছে। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ ষ্টুটিভ্যান্ট্ বলেন যে মার্কিণ রাজ্যে ৫০৭ রকমের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভুট্টা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে উহার চতুর্থ অংশও নাই। ইহা তৃণ জাতীয় বলিয়া ইহাকে Gramineœ (তৃণজাতি) অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহার বৃন্ত (stem) কিন্তু অন্যান্য তৃণের মতন ফাঁপা নহে।

ইহার পুং-অংশ (tassel) ১ নং ছবিতে "T" চিহ্নিত অংশ ও স্ত্রী-অংশ (ear) "E" চিহ্নিত অংশ একই গাছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকায় ইহার ফুল monœcious (এক লিঙ্গ)।

ইহার (tassel) পুষ্প-মঞ্জরী (spikelet) র গুচ্ছের আকারে সাজান। প্রত্যেক পুষ্প-মঞ্জরীর মধ্যে দু'টী করিয়া ফুল, প্রত্যেক ফুলের তিনটী করিয়া পরাগ-কেশর (stamens) ও কেশর দণ্ড (filamentes) আছে। ২ নং ছবিতে তাহা বেশ দেখা যাচ্ছে। যখন anther সম্পূর্ণাকারে পরিণত হয়, পরাগ কেশরগুলি সুদীর্ঘ কেশর-দণ্ড হইতে ঝুলিতে থাকে। Anther গুলি দ্বিকোষ-যুক্ত, তাহারা পরিণত হইলে উভয় দিক হইতে ফাটিয়া যায়, ৩ নং ছবিতে দেখুন। হার্স-

১নং ছবি
একটি ভুট্টা গাছ, "T" tassel,
"E" ear বা ভুট্টা।

২নং ছবি—ভুট্টার একটি পুংপুষ্প।

৩নং ছবি। Anther ফাটিয়া পুষ্পরেণুর পতন।

৪নং ছবি—৫টী স্ত্রী অংশ বা Silk.
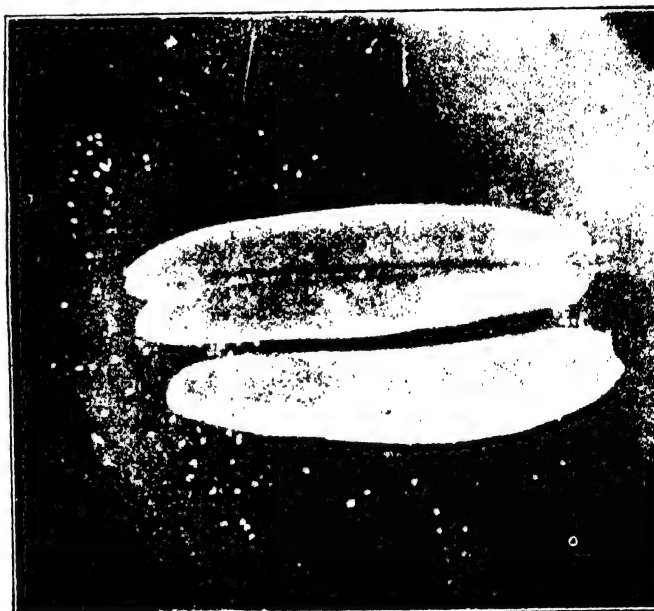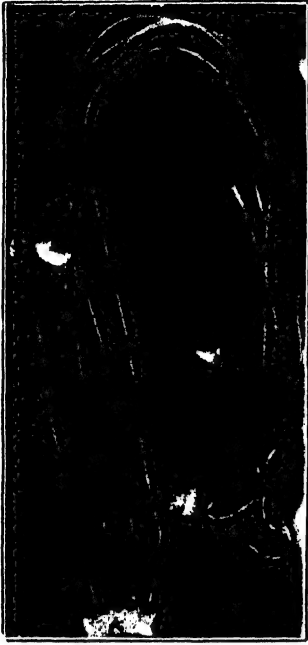
৫নং ছবি—এক একটি Silkর উপর অনেকগুলি করিয়া পুষ্পরেণু পড়িয়াছে।

লেখক ১নং ছবির জন্য Sargent, ২নং ছবির জন্য De Vries, ৪নং ছবির জন্য Bull, ৩ ও ৫নং ছবির জন্য Hopkinsর নিকট কৃতজ্ঞ।

বার্গার্ বলেন যে এক একটী antherর মধ্যে ২৫০০ পুষ্পরেণু থাকে, এবং ১৮০০০০০০ পুষ্পরেণু একটী ভুট্টা গাছের tasselতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পুষ্পরেণু অতি ক্ষুদ্র, অতি সহজেই বাতাসে উড়িয়া যেখানে সেখানে পড়ে। প্রত্যেকেরই একটী করিয়া nucleus মধ্যস্থানে আছে। ঐ পুষ্পরেণু ৮ দিবস ধরিয়া পড়িতে থাকে, কখন কখন উহা অপেক্ষা কম দিন ধরিয়াও পড়ে। পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে tasselর পুষ্পরেণু অগ্রে মধ্যস্থল, তাহার পর পার্শ্ব দিক, সর্ব্বশেষে নিচের দিক হইতে মুকুলিত হয়।

ইহার silk (অর্থাৎ female part) কে ফেঁকড়ি (shoot বা ear) এতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আবার খোসা (husk) এর দ্বারা আবৃত। যখন ঐ খোসা চতুর্দ্দিকে স্ফীত হয়, silk তখন সূক্ষ্মাগ্রদেশ হইতে উদগত হয়। এক একটী "সিল্ক" লম্বায় ৬ হইতে ১৬ ইঞ্চি, ৪ নং ছবিতে দেখুন। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখি যে ঐ "সিল্কের" অস্ত কেশযুক্ত (hairy)। প্রত্যেক "সিল্ক" হইতে এক প্রকার আটাল পদার্থ বহির্নিঃসৃত হয়, এই আটাল পদার্থ অতি সহজে পুষ্পরেণুকে পড়িবা মাত্রা ধরিয়া রাখে।

কখন কখন "সিল্ক" বাহির হইবার পূর্ব্বে anther পূর্ণাঙ্গ হয়, কখন কখন পুষ্পরেণু পড়িবার পূর্ব্বে "সিল্ক" গ্রহণক্ষম অবস্থায় উপস্থিত হয়। আবার কখন কখন anther ও "সিল্ক" সমকালীন পরিণত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে একটী একটী পুষ্পরেণুতে একটী করিয়া পুং-জীবাণু (nucleus বা male germ) আছে। ঐ পুষ্পরেণু যখন বাতাস বশতঃ অথবা আপনা আপনি যে "সিল্কের" মধ্যে স্ত্রী-জীবাণু (nucleus) আছে তাহাতে পড়ে, তখন ঐ পুং ও স্ত্রী-জীবাণু একত্র মিলিত হয়, এবং এইরূপ মিলনে ভুট্টায় একটী বীজ (Kernel) এর সৃষ্টি হয়। বীজের সৃষ্টি হইবা মাত্র "সিল্ক" শুষ্ক হইতে থাকে।

এক একটী "সিল্কের" উপর অনেকগুলি পুষ্পরেণু পড়িতে পারে, ৫ নং ছবিতে দেখুন। কিন্তু যতই পড়ুক না কেন কেবল একটী মাত্র পুষ্পরেণু বীজমূল (ovule) কে গর্ভবতী করে।

প্রকৃতি এই গাছ সম্বন্ধে এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে যে একই সময় সমস্ত পুষ্পরেণু পড়িবে না ও সমস্ত "সিল্ক" ও বাহির হইবে না। প্রথমে ভুট্টার প্রান্ত দিক হইতে "সিল্ক" বাহির হয়, এই গুলি গর্ভ সঞ্চার করিলে, তাহার পর মধ্য স্থল হইতে "সিল্ক" বাহির হয়, সে গুলিরও গর্ভাবস্থা হইলে, পরিশেষে অগ্রভাগের "সিল্ক" বাহির হয়, তখন অবশিষ্ট পুষ্পরেণু সেগুলিরও গর্ভোৎপাদন করে। এই রূপে একটী সমস্ত ভুট্টার সৃষ্টি হয়

এখন যদি যত্নের সহিত ভুট্টার (খোসা husk) ছাড়ান যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক বীজের এক

একটী করিয়া "সিন্ধ" আছে। আমরা আরও দেখি যে কোন না কোন ভুট্টাতে এক একটী বীজের ঘর ফাঁকা—তাঁহার কারণ যে সেই ভাবী বীজের "সিল্কেতে" পুষ্পরেণু আদৌ পড়ে নাই।

(ক্রমশঃ)

হারানিধি।

আমি যখন সবে দুই বৎসরের তখন আমার জননীর মৃত্যু হয়। শৈশবে মাতৃহীন বলিয়া আমি বাবার ও বড় দাদার অত্যধিক স্নেহভাজন ছিলাম। তা' ছাড়া মাতামহী আমাকে এত আদর করিতেন, যে তাঁহার কোল আমার বত্রিশ সিংহাসন অপেক্ষাও বুঝি ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। দিদিমার নিকট আব্দার করিয়া পাই নাই, এমন জিনিষ বোধ হয় আমার চক্ষে কখন পড়ে নাই। এই অনন্ত স্নেহের মধ্যে আমার বাল্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

এল, এ একজামিন দেওয়ার পর কয় মাস বাড়ী বসিয়া থাকায় আমাকে জ্বরে ধরিল। গেজেটে পাসের সংবাদ পাওয়ার পর আর বাড়ীর সকম্প জ্বরের স্বাদ ভাল লাগিল না। এই বড় দাদা বহরমপুরে বদলী হইলেন। আমিও জ্বর-অজীর্ণ-ভরা দেহ লইয়া তাঁহার কাছে চলিয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া এক মাসের মধ্যেই আমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন আমি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। পড়া শুনা বেশ চলিতে লাগিল। এই ভাবে এক বৎসর যাওয়ার পর বড় দাদা বহরমপুর হইতে বদলী হইলেন আর এক বৎসর পরেই আমার বি, এ পরীক্ষা, সুতরাং বড় দাদা বাসা, চাকর ও রাঁধুনী বামুনের যোগাড় করিয়া দিয়া আমাকে বহরম পুরেই রাখিয়া গেলেন। উকিল যোগেন্দ্র বাবুর সহিত দাদার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহার উপর আমার তত্ত্বাবধানের ভার বিশেষ করিয়া দিয়া গেলেন।

২

এই স্থানে যোগেন বাবুর সংসারের একটু পরিচয় দিই। জীবনে সকলেই বিবাহ করিয়া থাকে বটে কিন্তু যোগ্যং যোগেন যোজয়েৎ কথাটা খুব অল্পই দেখা যায়, এমন কি কাহারও ভাগ্যে তাহা একবারেই দেখা ঘটে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যোগেন বাবুর পারিবারিক জীবন এই কথার আশ্চর্য্য সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। যোগেন বাবুর শ্বশুর বহরম পুরেই থাকিতেন, তাঁহার সন্তানের মধ্যে সবে দুটী কন্যা, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে নিজ গৃহেই রাখিয়া ছিলেন এবং শেষে চতুর্থ বর্ষীয়া দ্বিতীয় বালিকাটিকে তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা পতিপত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যোগেন বাবু নিজে নিঃ-

সন্তান, বালিকা লীলাই তাঁহাদের এক মাত্র স্নেহের ধন। এই দম্পতীর সংসার খানি সর্ব্বদা আনন্দ উচ্ছাসে উচ্ছসিত থাকত, তাঁহাদের দেখিলেই মনে হইত দুইটি আনন্দ প্রবাহ পূর্ণ উচ্ছাসে মিলিত হইয়াছে। যোগেন বাবুর শ্বশুর তাঁহার প্রথমা কন্যার নাম "শিব জায়া" রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ আনন্দে সদাই রহস্য পূর্ণতা দেখিয়া তাঁহার আনন্দময় স্বামী আদর করিয়া তাঁহাকে "তরঙ্গ" নাম দিয়াছিলেন, বন্ধু মহলে তিনি "তরঙ্গ" নামেই পরিচিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য যোগেন বাবুর স্ত্রীর সহিত বৌ দিদির নিতান্ত হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, তাঁহার সম্পর্কানুসারে তরঙ্গ দিদি আমাকে সর্ব্বদাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। যখন হাসির উচ্ছাস লইয়া তিনি আমায় আক্রমণ করিতেন আমি তখন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলাইবার পথ খুঁজিতাম। সেজন্য আমি যোগেন বাবুর ও তরঙ্গ দিদির একটী অপূর্ব্ব শীকার হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং তরঙ্গ দিদির পার্লামেণ্ট হইতে একটী নূতন টাইটেল লাভ করিয়াছিলাম—"গো বেচারা"।

একদিন যোগেন বাবুর লাইব্রেরী ঘরে গিয়া দেখি তাঁহার আলমারীর উপর তিনি তরঙ্গ দিদির নাম লেখা কাগজ আঁটিয়া দিয়াছেন। আমি অবাক হইয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, যোগেন বাবু উত্তর দিলেন অরে ষ্টুপিড্, রোজ বই গুলি পড়ে তোরা ছড়িয়ে ফেলে যাবি তাই আজ আমি ঐগুলি স্ত্রীধন করে রেখেছি, এইবার আলমারীতে হাত দাও দেখি। এই কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

৩

দাদা বদলী হইবার পর আমার আহারাদিটা প্রায়ই যোগেন বাবুর বাসায় চলিত, আর আমি গেলেই লীলা "শরৎ দাদা" "শরৎ দাদা" বলিয়া ছুটিয়া আসিত। জগতে লোকের যতই সুখ সম্পত্তি থাকুক না তথাপি মাতৃহীন হইলেই বুঝি সে অনাথ হয়। লীলার কোন কষ্ট নাই, পিতৃদত্ত অজস্র অর্থ লীলার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে, তরঙ্গ দিদির ও যোগেন বাবুর সরল অন্তরের অকৃত্রিম স্নেহ লীলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অবিরত বর্ষিত হইতেছে। সুস্থ দেহে, বিমল লাবণ্যে, লীলা স্থলকমল সদৃশ চারিদিক আলো করিত, তথাপি লীলার সেই প্রফুল্ল বদনে, সেই উজ্জ্বল গণ্ডে, সেই নীল চক্ষু দুটীতে, যেন মাতৃহীনতার মর্ম্মভেদী দুঃখ অঙ্কিত থাকিত। সেই সুকুমার তরল লাবণ্যের ভিতর দিয়া একটী মলিন ছায়া ফুটিয়া উঠিত। কিম্বা বোধ হয় এই মাতৃহীন অভাগাকে দেখিলে ইহার অন্তরনিহিত গুপ্ত বেদনা অধিকতর ফুটিয়া উঠিত। ব্যথিত হৃদয় ব্যথার ব্যথী খুঁজে, তাই লীলাকে দেখিলে আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হইত, তাহার মুখের আগড়ম্ বাগড়ম গল্প আমার বড়ই মিষ্ট লাগিত। লীলাও বুঝি মনে মনে বুঝিত শরৎ দাদাও জগতে আমারি মত অভাগা, আমি যেমন জগতে "মা"

বলিয়া ডাকিতে পাই না, শরৎ দাদাও তেমনি সেই সুধাস্বাদে বঞ্চিত। তাই লীলাও আমার সঙ্গে তাহার পুতুলের, তাহার ইস্কুলের, সমপাঠির, পুস্তকের, গাছের, ফুলের গল্প করিতে এত ভাল বাসিত। আমি যোগেন বাবুর বাড়ী যতক্ষণ থাকিতাম লীলা যেন আমার ছায়ার মত বেড়াইত। এই সরলা বালিকা আমায় এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে কোন কাজ না থাকিলেও সুধু লীলাকে দেখিবার জন্য আমি যোগেন বাবুর বাসায় যাইতাম।

জন্ম দিনে।

নমো পিতঃ স্বর্গবাসি!
ভক্তি-অশ্রু নীরে ভাসি
তব এ মানসী বালা করিছে প্রণতি,
দেহ শুভ আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক মনোসাদ,
দেহ আজি জন্মদিনে অলক্ষ্য শকতি।
সদা এ স্নেহের মেয়ে,
ও চরণে আছে চেয়ে,
শত শত দুঃখ দৈন্য অবহেলি চিতে,
তোমারি সে মন্ত্রপূতা,
এই দীনা হীনা সুতা,
ক্ষুদ্র ভোগসুখ কিবা চা'ব পৃথিবীতে?
তুচ্ছ এ জীবন মম,
জলে জলবিম্ব সম,
এখনি মিলায়ে যা'ক বিশ্বের বাতাসে—
কিম্বা যুগ যুগ ধরি
কর্ত্তব্য পালন করি—
বিধি যা' চাহেন তাই হোক্ অনায়াসে।
আমি শুধু এই চাই,
যে ক'দিন বেঁচে যাই,
তোমারি আদেশ লয়ে জগতের পথে,
যেন গো চলিতে পারি—
তব লক্ষ্য অনুসরি
সমস্ত জীবন সঁপি বামা-হিত-ব্রতে।
আট বর্ষ যায় এই—
তুমি চলে গেছ সেই,
ভূতলে রাখিয়া তব সাধের সন্তান,
শুনিনা মধুর কথা,
পাইনা ক' সে মমতা,
দেখি না সে দেব কান্তি পবিত্র মহান!
তবু আমি জানি মনে,
স্বর্গপুরে দেবাসনে,
অজর অমর তুমি রয়েছ বসিয়া,
এ ভক্ত কুমারী প্রাণ
এই টুকু ব্যবধান—
সহিয়া রয়েছি পিতঃ! ও পদ স্মরিয়া।

প্রণতা—
বামাবোধিনী।

সমালোচনা।

"মহাত্মা প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন চরিত।—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত, মূল্য ৫০ আনা।

এই পুস্তক খানির লেখিকা প্রথমে তাঁহার স্বামীর (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের) অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন, পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত অপ্রকাশিত পদ্য ও প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা করিবার শক্তি অতি সুন্দর ছিল, তাঁর মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বড় মধুর শুনাইত, তাঁহার লেখার মধ্যেও সেই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এই জীবন চরিতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না।

ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান—শ্রীঅনঙ্গচন্দ্র দত্ত প্রণীত, মূল্য দুই আনা মাত্র।

ইহাতে ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহা মাতৃ উদ্দেশে উৎসর্গিত।

নূতন সংবাদ।

১। ইউরোপের সাতটী যোদ্ধৃজাতি বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বসমেত ১ কোটী ২০ লক্ষসৈন্য লইয়া সমবেত হইয়াছেন। স্থলে, জলে, ব্যোমে যুদ্ধ চলিতেছে,—স্থলে ফিল্ড গান, মেশিনগান, বড় বড় সীজ-গান ও উইজার,—জলে অতি ভীষণ অতিকায় ড্রেডনট ও সব্‌মেরিণ,—শূন্যে জেপেলিন ও এরোপ্লেনে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতেছে—প্রত্যহ এই যুদ্ধে ১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে।

২। কুচবিহারের মহারাণী—বরোদারাজ গাইকোয়াড়ের কন্যা,—ইন্দিরা—সম্প্রতি একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কন্যা আয়ুষ্মতী হউক।

৩। বিক্রমাদিত্যের প্রতিমূর্ত্তি। "কালীদাস" সমিতির সভ্যগণ নবদ্বীপের নিকট প্রাপ্ত এক প্রস্তর মূর্ত্তির পাদদেশে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিটীকে রাজচক্রবর্ত্তী যশোবর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহারই সভায় কবি কালিদাস প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। প্রতিমূর্ত্তি শীঘ্রই কবির সাধনপীঠে রক্ষিত হইবে।

৪। দানশীল স্যার তারক নাথ পালিতের লোকান্তর—বঙ্গের অন্যতম সুসন্তান দানশীল স্যার তারকনাথ পালিত মহোদয় আর ইহ জগতে নাই। ৩রা অক্টোবর শনিবার প্রাতে সাড়ে নয়টার সময় তিনি তাঁহার বালিগঞ্জস্থ বাসভবন হইতে পরলোকগমন করিয়াছেন। পালিত মহাশয় ১৮৪১ অব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কাল-

কাতায় শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ১৮৬৭ সালে আইন অধ্যায়নের জন্য বিলাতে গমন করেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৭২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত বহু অর্থ স্বদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান করিয়াছেন। এতদ্দেশে শিক্ষার বিস্তৃতি হইলেও উচ্চ গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষাগারের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া তিনি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্য ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হস্তে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থে আজ কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হইতেছে। দানশীল তারকনাথের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইল, শীঘ্র তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মীর বাইয়ের অলৌকিক ধর্ম্মবল সম্বন্ধে কুচবিহারের রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী গত সোমবার ২১শে ভাদ্র অতি সুন্দর কথকতা করিয়াছিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলে যারপর নাই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে এক সঙ্ঘ ভগ্নী দল সংগঠিত করিয়া তাহা দ্বারা তিনি ধর্ম্মপিপাসু তৃষিত আত্মার পিপাসার বারি দান করিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেই অবগত আছেন মহারাণী সুনীতি দেবী স্বর্গীয়া মহাত্মা আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি গত দুই বৎসরের মধ্যে পতিপুত্রহীন হইয়া এই মহা শোকাগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানের কি এক মহা দান প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই অপূর্ব্ব স্বর্গসুধার আস্বাদন পাইয়া, আজ জগতের নিরাশ্রয় দুর্ব্বল ভগ্নীদিগকে সেই সুধা পান করাইবার জন্য নিজে ভগ্নীগণকে অতি সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রাপ্ত দান বণ্টন করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। এ দৃশ্য কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যাই বটে!

চিন্তা

আমরা সীতা, সাবিত্রি, দময়ন্তী প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্রের আলোচনা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, কিন্তু শ্রীবৎস মহিষী চিন্তা দেবীর কথা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মহাভারতের চিন্তা-চরিত্র রমণীগণের একটী প্রধান আলোচনার বিষয়। চিন্তা দেবী প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী! সীতা, সাবিত্রি, দময়ন্তী অপেক্ষা তিনি কোনও অংশে ন্যূন নহেন। চিন্তা দেবীর পতিভক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, পরোপকারিতা, সত্যনিষ্ঠা, প্রভৃতি অতি প্রগাঢ়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও তদ্রূপ সুমার্জ্জিত। যখন গ্রহদেবতা শনি এবং সিন্ধুসুতা লক্ষ্মী উভয়ে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পরস্পর বিবাদ করিয়া মহারাজ

শ্রীবৎসের নিকটে বিবাদ মীমাংসার্থ উপস্থিত হইলেন, তখন মহারাজ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে পর দিবস আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। পরে মহিষীর নিকটে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া তিনি দুঃখ করিতে লাগি- বুদ্ধিমতী মহিষী চিন্তা রাজাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন —

"চিন্তা বলে মহারাজ চিন্তা করা মিছা।
যে দিন যা হবে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

কি সুন্দর ভগবানে বিশ্বাস! কি গভীর !! রাজা ভবিষ্যৎ চিন্তায় কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাণী কিছু মাত্র বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার ন্যায় সহিষ্ণুতা কয় জন রমণীর আছে? তাঁহার এই অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, রমণী মাত্রেরই শিক্ষনীয়!

যখন গ্রহদেবতা শনির কোপে শ্রীবৎস রাজার রাজ্য ধ্বংস হইল, তখন রাজা বন গমন করিবার অভিপ্রায় করিয়া রাণীকে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সতী কি তাহা পারেন? পতির দুর্দ্দিনে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচ্ছন্দতা লাভ করা কি সতীর সাধ্য? সুতরাং তিনি পিত্রালয়ে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, পতিসহ বনগমন করাই তিনি শ্রেয় ও সুখকর মনে করিলেন। রাজমহিষী সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পথে মায়া নদী সৃজন করিয়া শনি রাজা ও রাণীর সঞ্চিত মণি, মুক্তা, প্রবালাদি সহ কন্থা খানি লইয়া প্রস্থান করিলেন, রাজা ও রাণী তাহাতে সর্ব্বশান্ত হইলেন। রাজা হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা বনমধ্যে পর্ণ কুটির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। কাননে কত বিপদ, কত দুঃখকষ্ট, চিন্তা অকাতরে সে সব সহ্য করিতেন। রাজরাজেশ্বর স্বামীর কষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিছু দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া মহারাজ শ্রীবৎস দীনবেশে এক কাঠুরিয়ার আলয়ে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং কাঠুরিয়াদিগের সহিত কাননে কাষ্ঠাহরণ করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন মহারাণী চিন্তাও কাঠুরিয়া পত্নীগণের সহিত সানন্দ চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে রাজমহিষী এ গর্ব্ব তাঁহার উন্নত হৃদয়ে আদৌ স্থান পাইত না। তিনি স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়াপত্নীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। চিন্তার এ মহত্ত্ব স্মরণ করিলে বাস্তবিক বড় আনন্দ হয়।

এক বণিকের নৌকা যখন দেবমায়ায় আবদ্ধ হইল, ছদ্মবেশী শনি দৈবজ্ঞের বেশে গণনা করিয়া কহিলেন কাঠুরিয়া পত্নীগণের মধ্যে একজন সাধ্বি রমণী আছেন, তিনি আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলেই নৌকা উদ্ধার হইবে। তৎশ্রবণে সেই বণিক কাঠুরিয়া ভবনে

পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। একে একে রমণীগণ সকলে নৌকা স্পর্শ করিতে লাগিল কিন্তু বণিকের নৌকা উদ্ধার হইল না। বণিক হতাশ্বাস হইয়া দৈবজ্ঞের কথা মিথ্যা বলিয়া ভাবিলেন। পরে জানিতে পারিলেন একজন কাঠুরিয়া পত্নী আসেন নাই। তখন বণিকের দৃঢ় বিশ্বাস হইল সেই রমণীই সাধ্বী, সেই রমণী আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলেই তাঁহার নৌকা উদ্ধার হইবে। বণিক তখন পুনর্ব্বার কাঠুরিয়া-আলয়ে উপস্থিত হইয়া অতি কাতরভাবে চিন্তা দেবীকে নিজের বিপদের বার্ত্তা বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। চিন্তা দেবী তখন বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এক দিকে শরণাগতকে রক্ষা করিতে হইবে, অপর দিকে পতির বিনা অনুমতিতে তিনি কি প্রকারে যাইবেন। শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করা মহা অধর্ম্ম, বণিক বিপদে পতিত, রাজার আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব, তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বণিকের কাতরতা দেখিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় বিচলিত হইল। আর্ত্তকে রক্ষা না করিলে মহা অধর্ম্ম হইবে, হয়ত রাজা শুনিয়া রাগ করিবেন, শ্রীবৎস ধর্ম্মশীল, এই ভাবিয়া তিনি সেই অপরিচিত বণিকসহ গমন করিলেন। কি গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস! কি উদার হৃদয়! তিনি নিজের বিপদ আদৌ চিন্তা করিলেন না। তিনি পরের উপকারের জন্য সকল কথা বিস্মৃত হইলেন। চিন্তা পরের উপকারের জন্য অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি তরণী স্পর্শ করিবা মাত্র তরণী উদ্ধার হইল, জলের উপর ভাসিয়া চলিল।

দুর্ম্মতি ধূর্ত্ত বণিক প্রথমতঃ চিন্তার রূপগুণে বিমোহিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ সে মনে ভাবিল পুনরায় যদি নৌকা কোন স্থলে আবদ্ধ হইয়া যায়, এই রমণী নৌকায় থাকিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না, অতএব এই স্ত্রীলোকটীকে যেমন করিয়া পারি লইয়া যাই। এই ভাবিয়া দুর্ম্মতি নরাধম বণিক বলপূর্ব্বক চিন্তাকে নৌকায় উত্তোলন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সে চিন্তার অনুনয় বিনয় ও কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। সতীকে পতিসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পাষণ্ড পলায়ন করিল। চিন্তা তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় রূপরাশি লুক্কায়িত করিবার নিমিত্ত ভগবান অংশুমালীর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান অংশুমালী সতীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, এবং শীঘ্র পতিসহ মিলন হইবে ও স্বীয়রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। সতী জরাগ্রস্ত, রোগক্লিষ্ট দেহ লইয়া নিষ্ঠুর বণিকের নৌকার এক পার্শ্বে পতিত রহিলেন। মনে মনে পতি পদ চিন্তা এবং ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কত দিন অতিত

হইয়া গেল। দুঃখে, কষ্টে, পতিবিচ্ছেদে তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা রহিল না, তথাপি তিনি মুহুর্ত্তের জন্যও স্বীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই।

চিন্তা অসীম ধর্ম্ম বলে পুনরায় পতি সহ মিলিত হইলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে গ্রহ দেবতা শনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। মহারাজ শ্রীবৎস পুনশ্চ স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পরে ভদ্রা নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া চিন্তা, ভদ্রা, দুই মহিষী লইয়া মহারাজ সুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। চিন্তা দেবীর সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, পতি ভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলই অতুলনীয়! তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে হৃদয়ে অপার আনন্দ এবং পবিত্রতার উদয় হয়। চিন্তার ন্যায় ধর্ম্মশীলা নারীগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা ভারত রমণী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি। আমাদের দোষ এই, আমরা পরের গৃহে উত্তম দ্রব্য দেখিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি। আমাদেরই গৃহে যে কত অমূল্য রত্ন রাশি বিরাজিত, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। সাহসে, ধর্ম্মে, সতীত্বে, ভারত রমণীর ন্যায় আর কোন দেশের রমণী আছে? ভারতে বিদুষী রমণীরও অভাব নাই। পুরাকালের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় আমরা কি ছিলাম, আর এখন কি হইয়াছি। বারান্তরে এ বিষয়ের আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা যদি পুরাকালের রমণীগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্য করিতে শিখি, তাহা হইলে আমাদের গৃহে গৃহে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে। মনোমালিন্য, কলহ-বিবাদ আমাদের গৃহ হইতে দূরে পলায়ন করিবে। সংসার ধর্ম্ম বড় কঠিন ধর্ম্ম, এখানে স্বার্থ বলিদান দিয়া ঈশ্বর-চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে সংসারের সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম সকলই নষ্ট হইয়া যায়, গৃহ অশান্তির আলয় হইয়া উঠে।

শ্রীমতী চারু শীলা মিত্র।
হুগলী।

বামারচনা।

পালিব আদেশ তাঁর।

পরম ব্রহ্মের নাম নিয়ে সদা সত্য পথেতে
চলিব
আসুক দৈন্য, আসুক দুঃখ, না টলিব না
টলিব।
মঙ্গলময়ে করিয়া আশ্রয় চলিব মঙ্গল পথে
আসুক রোগ, আসুক শোক, ফিরিব না
কোন মতে।
সত্যের নাম করিয়া স্মরণ ছুটিব সত্যের
পানে।

আড়ম্বর হীন সাধু জীবন যাপিব তাঁহার ধ্যানে।
আনন্দময়ের অনন্ত মহিমা বুঝিবে শকতি কার?
শুধু আনত মস্তকে পলকে পলকে পালিব আদেশ তাঁর।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

স্মৃতি

শ্রাবণের ঘন আঁধারের মাঝে
এসেছিল সে যে ধরা উজলিতে।
জুড়াইতে মার ছোট বুক খানি
ক্ষণিকের হাসি পরাণে ছাইতে॥
কত সুখ-উৎস ছুটিল হিয়ায়
বুকে লয়ে এই অযাচিত দান।
দেবতা নির্ম্মাল্য চরণ রেণুকা
ফুলবাস সম তার ক্ষুদ্র প্রাণ॥
পথ ভুলে সে যে এসেছিল হেথা
চকিতের দেখা এ মর ভবনে॥
ক্ষণেকের তরে বাঁধিতে মায়ায়
আবরি শুধুই কুহেলি নয়নে॥
ছিল বুঝি কিম্বা কোন অভিশাপ
নীরবে এসেছিল মায়ের কোলে।
শুধু ছিল সে গো নিরাশাস্বপন
ভেসে গেছে কোথা তীব্র আঁখি জলে॥
এসেছিল কি না বলে ভ্রম হয় মনে
ঘুমায়ে ছিলুম যবে আশার কুহকে।
গেল ফিরে উঁকি মেরে এই হৃদি কোণে
আঁকিয়া অমর নাম হৃদয়ফলকে॥

শ্রীসুনীতি ভাদুড়ী।

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 614. October 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৪ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২১। অক্টোবর, ১৯১৪। | ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

দিব্যজ্ঞান ও বাক্‌পটুতা।

কোন সুপণ্ডিত কথক, এমন সুন্দর-রূপে মানবীয় ভাব চিত্রিত করিতে পারিতেন যে, সম্পন্ন সাত্ত্বিক হিন্দুগৃহে পুরাণ-ব্যাখ্যা-কার্য্যে তাঁহাকে সততই ব্যাপৃত থাকিতে হইত। অপরের সাধুভাব উদ্দীপণার অসাধারণ দক্ষতা তাঁহার ছিল বটে, কিন্তু সে শক্তি তাঁহার আপন চরিত্রের উপর, কোন প্রভাবই প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। নিজে তিনি ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস ছিলেন।

অশেষ প্রলোভনদ্বারা, কোন পতিপ্রাণা তরুণী বিধবাকে তিনি বিপথ-গামিনী করেন এবং তাহার প্রতি এত আসক্ত হইয়া পড়েন যে, কথকতা উপলক্ষে দূরদেশ-গমনের পূর্ব্বেই, সেই হতভাগিনীকে সঙ্গোপনে তথায় প্রেরণ করিতেন। লোকমুখে তাঁহার সহস্র সাধুবাদ কিন্তু এদিকে নৈশ দুর্ব্বৃত্ততার নিকট তিনি চিরবিক্রীত।

একদিন, রামায়ণবর্ণিত প্রেতপুরে বিভিন্ন প্রকার পাপের অসহ্য দণ্ড এমনই ভীষণ রূপে শ্রোতৃবর্গের মানসপটে অঙ্কিত করিলেন যে, চারিদিকে অনুতাপের ঘোর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। তাঁহার বর্ণনা-চাতুর্য্যে, নিজ নিজ দণ্ডের পূর্ব্বাভাস, এই মর্ত্ত্যলোকেই অপরাধিগণ অনুভব করিল।

সদনুষ্ঠানে হিন্দুদ্বার অবারিত। সুতরাং এই ব্যাখ্যাকালে, হতভাগিনীর গমনব্যাঘাত ঘটে নাই। কুলটার ভীষণ চিত্রে, সে অস্থ নিজপ্রতিকৃতি দেখিতে পাইল। ভয়ে তাহার প্রাণ আকুল হইল। অবৈধ ইন্দ্রিয়-সুখলালসা মরীচিকাবৎ তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্দ্ধান করিল এবং অনুতাপের অসহ্য উত্তপ্ত ঝটিকায় তাহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। সে দিব্যচক্ষে দেখিল ভীষণ নরক-দ্বার তাহার জন্য উদ্ঘাটিত। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে কাতরে

পতিতপাবন হরিকে ডাকিতেছে আর অশ্রুজলে ভাসিতেছে। কথকঠাকুর কথা সাঙ্গ করিয়া গৃহে আসিয়া দ্বার বন্ধ দেখিয়া বিস্মিতমস্তক হইলেন। পরে সেই রমণীর অবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "দেখ ও নরকভোগ করার কথা, আমিই ত বলিয়াছি, আবার আমি বলিতেছি ও কল্পিত বর্ণনা। প্রেয়সি! আমি দিবসের শ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি, হাস্য মুখে আমায় প্রাণ জুড়াও।" অনুতপ্ত রমণী বলিল "ঠাকুর তুমিত বহুরূপী, তোমার এ কথায় আর ভুলি না। পাপের আগুনে প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে আর পাপ করিব না। তোমার দেওয়া রত্ন-অলঙ্কার সব তুমি লইয়া যাও। আমি চিরজীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া রমণী সে গৃহ ও কথকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

১—সত্য।

১। গর্ভস্থ শিশুর শ্বাসক্রিয়া ও পুষ্টিসাধন, মাতার শ্বাস ও পুষ্টিতে হয়, মাতার সঙ্গে ভ্রূণের জীবনের এমনি নিগূঢ় যোগ।

২। পূর্ণ সত্যের আদর্শ জীবনে হাতে-কলমে আনিতে গিয়া পাঠশালের হাঁড়ি কুঁড়ি লিখে ফেলি।

৩। অসার অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-দেহে ইন্দ্রিয়াতীত সার আত্মার যোগ দ্বারা জড় অপেক্ষা নিরাকার প্রাণস্বরূপের সারত্ব অধিক জানা যায়। অরূপী প্রাণের বিরহে স্থূল দেহ বিনষ্ট হয়।

৪। দৃশ্যমান অথচ অসার ছায়ায় সারবান অদৃশ্য মূল পদার্থ দেখাইয়া দেয়। ছায়ার আকার প্রকার দেখেও, মূলের বিষয় কতক জানা যায়। এই বিশ্ব সেই সর্ব্বমূলের ছায়া।

৫। তারকাগণ চিরকালই নমিত দৃষ্টিতে পৃথিবীর পানে তাকাইয়া আছে। বাহিরের তীব্র আলোক না গেলে, তাহাদের জ্যোতিঃ চক্ষে পড়ে না। সূর্য্যগ্রহণকালে তারকার উদয় দ্বিপ্রহরেও হইয়া থাকে।

৬। মানুষ ছোট ছেলের ভালবাসা পরীক্ষা করার জন্য তা'র পুতুল ও তাহার মিষ্ট খাবার চায়। যে ছেলে অমনি দেয়, তার ভালবাসা প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

আত্মীয়, টাকা-কড়ি ও মান মর্য্যাদা দ্বারা আমাদের সত্যস্বরূপে ভালবাসার পরীক্ষা হয়। ভগবানের উক্তি এই—

(১) 'যে পূজে রণরঘু
ভিটেয় তার চরে ঘুঘু।'

(২) 'যে করে আমার আশ
তার করি সর্ব্বনাশ।
তবু যদি না ছাড়ে পাশ
তার হই দাসানুদাস।'

২—জ্ঞান।

১। শরীরপালন-জন্য আবশ্যক মাতৃস্তন্য, জল, বাতাস প্রভৃতি আয়োজন করার জন্য আমরা জন্মের পূর্ব্বে আবেদন করি নাই, জানিতামও না। তুমিই অপার জ্ঞানকৌশলে ও পূর্ব্বদর্শনবলে জানিয়া সব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলে।

২। স্বার্থসুখরত নরনারী, জড়ের মত অক্ষম শিশুর জন্য ক্লেশ লইবে না জানিয়া, নিজেই স্নেহ রূপে মাতার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া জীবপালনের এই রীতি তোমারই অপার জ্ঞানের কৌশল।

৩। তোমারই অপার-জ্ঞান-প্রভাবে মাটী কত সুরস ফল, কত সুসৌরভ ফুল উৎপন্ন করে।

৪। জীবনের সম্বল যা পেয়েছি তার কিছুরই জন্য কখনও প্রার্থনা করি নাই। আমার জন্য যা ভাল তা নিজেই জেনে-শুনে দিয়েছ।

৫। নিদ্রায় মড়ার মত অন্ধকারে অজ্ঞান হয়ে থাকি। পেটের ভিতর দেওয়া কঠিন ও তরল জিনিষ নিজহাতে অপার জ্ঞানকৌশলে রস, রক্ত, অস্থি মজ্জায় পরিণত কর। আমি বুদ্ধি করে কিছুই করি না।

৬। মানুষ আত্মসুখে তাঁকে ভুলে যায়। তাই তিনি সময়ে সময়ে দূত স্বরূপ একটী একটী শিশু পাঠায়ে আপনার কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

৩—অনন্ত

১। বিশাল সাগরবক্ষে প্রকাণ্ড সূর্য্য যেমন প্রকাশিত হয়, শিশিরবিন্দুতেও তেমনি, ছোট বলে তাঁকে ঘৃণা করে না। তার ছোট দেহের মধ্যে ছোট হয়ে প্রবিষ্ট হয়। ক্ষুদ্র মানবের প্রাণে সেই মহানের আবির্ভাব ঠিক সেইরূপ।

২। মহানের সম্মুখে যখনই আসি অমনি আপনাকে হারাইয়া ফেলি, আমার আমিত্ব আত্মহত্যা করে। অহঙ্কার চূর্ণ করার নিগূঢ় যন্ত্র এমন আর নাই।

৩। বারিবিন্দু অপেক্ষাও মানুষ অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই অনন্ত জলধিতে মিশিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব হারাইয়া অনন্তই হইয়া যায়। যতক্ষণ তাহাতে অধিষ্ঠিত, ততক্ষণ সে মহান।

৪। ডিমের ক্ষুদ্র আবরণ মধ্যে যতক্ষণ, ততক্ষণ প্রাণী সকলই ক্ষুদ্র দেখে—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কেবল আপনি। কিন্তু যাই সেই আবরণ ভেদ হয়, অমনি অনন্তের ক্রোড়ে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তার ক্ষুদ্রতার সমান ক্ষুদ্র আর কাহাকেও দেখে না—সকলই প্রকাণ্ড অসীম—অদ্ভুত। সমস্ত অহঙ্কার, আত্মাভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। এই অন্ধতার আবরণ ভেদ

সেই মাতৃপক্ষীর চঞ্চু ব্যতীত হয় না। মানুষ ইচ্ছা করিয়া এই অজ্ঞানতার আবরণ ভেদ করিতে পারেনা, তাহা কেবল সেই অনন্ত দেবই করিয়া থাকেন।

হারানিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রঙ্গময়ী তরঙ্গদিদি আর একটা রঙ্গ পাইলেন ও যখন তখন বিদ্রূপ করিতেন,—"দীনবন্ধু বাবুর 'ললিত-লীলাবতী' আর আমাদের 'শরৎ-লীলাবতী' হ'ল যে।" দু'চার দিন এই ঠাট্টা শোনার পর, আমি বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। লীলাকে আমি ছোট বনের মত ভালবাসি, স্নেহ করি, লীলাও আমায় ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসে। তরঙ্গদিদির মুখের আঁট নাই, এ রকম ঠাট্টা করাটা তাঁর উচিৎ হয় না। আমি দিন কতক আর যোগেন বাবুর বাড়ী গেলাম না।

একদিন সন্ধ্যার সময় উপরের ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, বারাণ্ডায় যোগেনবাবুর গলার স্বর পাইলাম, তিনি হাঁসি ভরা প্রফুল্ল স্বরে বলিতেছেন, "কোথায় প্রাণের পতি ললিত মোহন?" আমি উঠিতে যাইতে ছিলাম কিন্তু তাহা আর হইল না, ততক্ষণে যোগেনবাবু একেবারে গৃহমধ্যে এসেছেন আমি সাগ্রহে তাহাকে বসিতে বলিলাম কিন্তু তিনি তেমনি স্মিত বদনে উত্তর করিলেন, "আর ভাই বসব কি—

"দেখ আসি অস্তমিত লীলার জীবন।" আমি যোগেনবাবুর কৌতুক বুঝিলাম, কোন উত্তর না দিয়া পুস্তকে চক্ষু নিবিষ্ট করিলাম। যোগেন বাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন্, তিনি বলিলেন,"বলেছিলে বিপদেতে হবে অধিষ্ঠান,কই তবে গেলে আজ বাঁচাইতে প্রাণ?" আমি ঈষদ্‌হাস্যে উত্তর করিলাম, "আমাদের পরীক্ষার আর দেরী নাই, এখন একটু পড়ার দরকার, আপনার ওরূপ হাঁসি রহস্য শুনিলে আর পড়ায় মন রাখিতে পারিব না।"

যোগেনবাবু একেবারে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সহসা তাঁহার এরূপ হাসিতে আমি একেবারে চমকিয়া উঠিলাম ও অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। হাঁসি থামিলে তিনি উত্তর করিলেন "ওহে শরৎ! আমি যে তোমাকে একটি প্রকৃত কালেজের ছাত্র ভাবিয়া ছিলাম, তোমার দাদা কি শুধু বইয়ের পোকা করিয়া তোমায় রাখিয়া গিয়াছেন? এই সুযোগে এক অঙ্ক প্রেম-অভিনয় দেখিয়া লও।"

আমি দ্বিগুণ লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। যোগেনবাবু আমার হাত ধরিয়া টানিলেন 'ওঠ ওঠ আজ ওখানে খাবে।' আমি তখন আস্তে আস্তে বলিলাম "কিন্তু আপনারা ও রকম অন্যায় ঠাট্টা করলে আর আমি যাব না, এটা আপনাদের বড় অন্যায়"—

হাস্যময় যোগেনবাবু উত্তর দিলেন "কি জানি ভাই সংস্কৃত শাস্ত্রটা তো বেশী পড়ি নাই, সুতরাং ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানটাও তথৈবচ তা এখন চল তোমার জন্য গৃহিনী "উত্তাল তরঙ্গ" হইয়া রহিয়াছেন। কথাটায় একটু হাঁসি আসিল, কিছু না বলিয়া যোগেন বাবুর সঙ্গে চলিলাম।

আমাকে দেখিয়াই লীলা ছুটিয়া আসিল। "শরৎ দাদা এসেছ বেস্ হয়েছে, আমার মেয়ের আজ বিয়ে হ'চ্চে দেখ্‌বে এস— তোমার নেমন্তন্ন শরৎ দাদা।" আমায় কোন কথারও অবসর না দিয়া লীলা একেবারে হাত ধরিয়া বিবাহসভায় উপস্থিত করিল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! লীলার সই, বেলফুল, টগর, ল্যাবেণ্ডার প্রভৃতি আত্মীয় কুটুম্ব এবং তৎপুত্রকন্যার পরিবার-বর্গে বিবাহ-সভা ঝল ঝলায়মান্, ছোট ছোট ল্যাম্প ও বাতির আলোকে উদ্ভাসিত। লীলা কত যত্নে ফুল ও মালা দিয়া সে সভা যে কি সুন্দর সাজাইয়াছে, কি বলিব! আমি ঈষৎহাস্যে বলিলাম, "সভা তো বেস সাজিয়েছ, তোমার ক'নে কই লীলা? সাগ্রহে লীলা বর ক'নে আনিয়া আমায় দেখাইল, আমি তো আগে এ বিবাহ-ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না, এখন আশীর্ব্বাদী কি দিব? অথচ কিছু না দেওয়ায় ভাল দেখায় না, আমার আঙ্গুলের নামলেখা আংটিটি খুলিয়া বলিলাম "লীলা আগে আমায় বিবাহের খবর দাও নি, সেজন্য তোমার মেয়ে-জামাইয়ের জন্য কিছু তো আনিতে পারি নাই। এই আংটিটা তোমার মেয়ের নাম ক'রে তোমায় পরিয়ে দিই" ব লয়া লীলার কচি আঙ্গুলটিতে আংটিটি পরাইয়া দিলাম, ঠিক এই সময় তরঙ্গদিদির মধুর হাসির স্বর চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল; একে তো রাতদিনই আমি তরঙ্গ দিদির শিকার হইয়া আছি তার উপর ঠিক এই সময় না জানি আমায় কি ভাবে পাইয়া বসেন, ভাবিয়া আমি একেবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলাম। পরক্ষণে একটা শাঁকে ফুঁ দিতে দিতে যোগেনবাবুর হাত ধরিয়া তরঙ্গদিদি সেখানে উপস্থিত। সর্ব্বনাশ! আমি তো নেই! যোগেনবাবু হাসিয়া বলিলেন "লীলা দেখি দেখি পোর নামে পোয়াতি বাঁচে রে—তা এ শুভক্ষণটা তোরি বা বাদ যায় কেন, এই মালা গাছ-টা তুইও শরতের গলায় দিয়ে দে।" সরলা বালিকা যথার্থই অতি আহ্লাদে মালা লইয়া আসিল, আমি দেখিলাম বড়ই বিপদ—আস্তে আস্তে সেখান হইতে বাহিরে পলাইয়া আসিলাম।

পরদিন কলেজে গিয়া দেখি আমার আংটি দেওয়ার কথা ক্লাসে অতি হাস্যকর ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছে। এ কাহার কাজ খোঁজ করায় জানিলাম যোগেনবাবুই নিজে এ কথা সকলকে বলিয়াছেন। মনে মনে বড়ই রাগ হইল কিন্তু ক্লাসের ছেলে-দের হাত হইতে উদ্ধার পাইলে তবে তো রাগ। কেহ গান, কেহ পদ্য, কেহ ছড়া কত রকমে যে আমায় জ্বালাইতে আরম্ভ করিল বলিতে পারি না। আমি দেখিলাম

আর বহরমপুরে থাকা চলে না, এইবার পালাইতে হইল, পনর দিনের ছুটি প্রার্থনা করিয়া সন্ধ্যার সময় বড় দাদার নিকট চলিয়া গেলাম।

কিন্তু হায়! "অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকায়ে যায়।" এখানেও সেই খবর পৌছিয়াছে, বাড়ীতে পা দিতে না দিতে বৌদিদি আমায় বিশেষরূপে আক্রমণ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে স্থানাভাব দেখিয়া বড় দাদার নিকট বিশ্রাম করিতে গেলাম, সেখানেও ছাড়ান নাই, বরং সেখানে আবার একটু পাকা পাকি গোছ, যোগেন বাবু যে শুধু আমাকেই এরূপ ভূত নাচাইতেন তাহা নহে, দেখিলাম সত্য সত্যই তিনি বড় দাদার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ রূপ কথা বার্ত্তা করিতেছেন। তখন মনে মনে হরি স্মরণ করিলাম, বুঝিলাম চারিদিকে বেড়া দিয়া যোগেনবাবু আগুন জ্বালাইয়াছেন।

দিন ছয় সাত যাইতে না যাইতে সেখানে আমার স্নেহময়ী দিদিমা দর্শন দিলেন। বৌদিদি তো একে চায় আরে পায়, দিদিমার নিকট "সবিশেষ নিবেদনম্" করিতে আরম্ভ করিলেন। দিদিমা তখন সুর তুলিলেন "আমি কবে আছি কবে নেই, আমার রাজলক্ষ্মী তো বেঁচে নেই যে ওদের বৌ নিয়ে সাধ আহ্লাদ করবে। তবু এই বুড়ির কোলে যদি দুদিন বসতে পারে তো আমার জন্ম সার্থক হবে। আমি যখন এতদূর এসেছি সে মেয়েটিকে একবার চক্ষে না দেখিয়া যাইতেছি না।"

বড় দাদা কিন্তু হাসিয়া বলিলেন "বল কি দিদিমা! শরতের এরই মধ্যে বিয়ে কি? বিএ টাই আগে পাশ হোক্, তার পর দু পয়সা আন্‌তে শিখুক।"

দিদিমা বিরাশী সিক্কা ওজনের এক তাড়া উঠাইয়া বলিলেন "ন'লে! তুই ভারী জ্যেঠা হয়েছিস্ দেখ্‌চি, এমন নাত্‌বৌয়ের সঙ্গে থেকেও তোর বুদ্ধি শুদ্ধি হ'ল না।"

বড় দাদা বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, বৌদিদি দিদিমার বোঁচকা বাধিয়া যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন।

দিদিমা লীলাকে দেখিয়া একেবারে আট খানা। তার উপর তরঙ্গদিদি লীলার হাতের আংটি দেখাইয়া সত্য মিথ্যা অনেক গল্প জুড়িয়া দিলেন। আর কোথা যায়! দিদিমা গম্ভীর নির্ঘোষে প্রচার করিলেন "শরতের যখন এত ইচ্ছা তখন আমি বিবাহ না দিয়া যাইব না।" কি আপদ! আমার তো মাথা হেঁট, বাবা শুনিলে কি বলিবেন।

পরীক্ষার পরই বিবাহ হওয়ার স্থির হইয়া গেল। বড় দাদার ছুটি নাই, সে জন্য বহরমপুর হইতেই বিবাহ হওয়ার কথা হইল।

৬

পরীক্ষা বোধ হয় মন্দ দিই নাই, গেজেটের যে কোন স্থানে নামের প্রত্যাশা করিতে পারি বলিয়া আশা হইতেছে, কিন্তু এদিকে জীবনের মহা পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত! লীলাকে জীবনের

সঙ্গিনী পাওয়া আমার দুর্লভ সাধনার ফল কিন্তু লীলার—। ত্রয়োদশবর্ষীয়া সরলা বালিকাও কি আমারই মত আনন্দে দিন গুনিতেছে? কে জানে লীলার মনে কি ভাব, কিন্তু হে ঈশ্বর লীলার মাতৃহীন হৃদয় যেন এ হতভাগার হাতে পড়িয়া ব্যথিত না হয় এই মাত্র প্রার্থনা।

বাবা, পিসিমা, ও মেজদাদা সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। মেজবৌদিদির নূতন উদ্যমে আক্রমণে আমি দিন কতক নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শেষে ছেলে মেয়ে গুলার দলের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হাত এড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিতাম।

বিবাহের দিন সকালে বাবার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে কোন ভয় নাই বলিয়া বড় দাদা বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দুপুর পর্য্যন্ত বেহুঁস থাকিয়া পরে বাবার একটু জ্ঞান হইল, বড় দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন "আজ বিবাহ স্থগিত রাখ, আমি কাল রাত্রে ও এখনও অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি ও কেবলই বোধ হইতেছে, তোমার জননী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। আমার মনে কেবলই সন্দেহ হইতেছে এ বিবাহে অশুভ হইবে, তার সাক্ষী দেখ আমি জ্বরে পড়িলাম, এও একটা বাধার মধ্যে গণ্য। আষাঢ মাসের প্রথমেই বিবাহ দেওয়া যাইবে।

বড় দাদা যোগেনবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, তিনি সমস্ত শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, বলিলেন "সে কি মহাশয়! আমি প্রায় সাত আট শত লোক নিমন্ত্রণ করিয়াছি, বাড়ীতে বোধ হয় এতক্ষণ রান্না বান্নাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এখন কি বিবাহ স্থগিত হয়?" বড় দাদা মেজদাদাও এ কথায় সায় দিলেন, বাবার কিন্তু একান্ত অমত। শেষে দিদিমা আসিয়া অনুরোধ করায় বাবাকে অগত্যা সম্মতি দিতে হইল।

যে লীলাকে আমি শুধু স্বর্গের ছবি বলিয়াই জানিতাম, যে লীলাকে দেখিলে আমি অতুল আনন্দে ভাসিতাম, আমার পাঠে, ভ্রমণে, নিত্যকার্য্যে, যে লীলার ধ্যান আমার চিরসঙ্গী ছিল, সেই লীলা আজ আমার হইল। আমি খেলার ছলে যে হাতে আংটি পরাইয়া ছিলাম, সত্য সত্যই আজ সে কোমল বাহু দুটি আমার হৃদয় বেষ্টন করিল। আমি অভাগা মাতৃহীন চির দুঃখী। আমার অদৃষ্টেও এই নন্দনের সুধা সঞ্চিত ছিল। আমার চক্ষে জল আসিল, আমি কি লীলাকে সুখী করিতে পারিব?

মহোৎসবে লীলাকে লইয়া বাড়ী আসিলাম, কিন্তু এ কি! বাড়ীতে যেন শোকের কাল মেঘ মলিন ছায়া বিছাইয়া দিয়াছে। বৌ দিদিদের সে হাসি কৌতুক নাই, দিদিমার সে আনন্দ গদ্‌গদ্‌ স্বরে স্বর্গগতা জননীর জন্য বিলাপ নাই, এমন কি ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত ভাল কাপড় পরিয়া সাজে নাই। আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া

উঠিল, তবে কি বাবার অসুখ গুরুতর হইয়াছে? বৌ দিদি ম্লান মুখে আমাদের বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

৭

আমি ছুটিয়া উপরে বাবাকে দেখিতে গেলাম, গিয়া কি দেখিলাম—বাবা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া খাটের উপর বসিয়া আছেন, মেঝের উপর বড় দাদা মেজ দাদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন, বাবা নিতান্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বড় দাদাকে তিরস্কার করিতেছেন। আমি গিয়া দাঁড়াইতেই বাবার তিরস্কারের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল, শেষে বলিলেন "শরৎ আমার কথায় রাজী আছে কি না জিজ্ঞাসা কর।" বড় দাদা আমার হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া বলিলেন "শরৎ! ভাই! বড় বিপদে পড়িয়াছি—"

এ পর্য্যন্ত আমি এ গোলমালের কোন মর্ম্মই বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি বলুন দেখি।" দাদা বলিলেন "ব্যাপার বড়ই গুরুতর দাঁড়াইয়াছে,' তোমার শ্বশুরের এক জ্ঞাতি এই বিবাহের সম্বাদ পাইয়া বাবার কাছে আসিয়াছিল, সে বলিতেছে, লীলার পিতামহ নিজ বিধবা ভগ্নির বিবাহ দিয়া তাহাকে নিজ গৃহেই রাখিয়া ছিলেন। সেজন্য সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করেন এখন লীলাকে লইয়া যদি আমরা ঘর করি তবে আমরাও সমাজে ঠেলা হইয়া থাকিব সেই জন্য বাবা বলিতেছেন হয় তুমি লীলাকে পরিত্যাগ কর বাবা তোমার অন্য বিবাহ দিবেন, নয় আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া লীলাকে লইয়া পৃথক হও।"

বড়দাদা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আমার আর শুনিবার ক্ষমতা রহিল না—আমি সেই খানেই দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম, মনে হইতে লাগিল আমার মাথার ভিতর হইতে হু হু করিয়া অগ্নিস্রোত সমস্ত শরীরে ব্যস্ত হইতেছে। অস্ফুট স্বরে মুখ হইতে বাহির হইল "হা ভগবান! একি করিলে?"

তাড়াতাড়ি বড় দাদা আমার মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এ সংবাদ আপনারা এতদিন পাইলেন না আর এখন এ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, এর অর্থ কি? যোগেনবাবুও ইহা গোপন করিলেন এই বা কেমন কথা?

"যোগেন বাবু ইচ্ছা করিয়া গোপন করেন নাই, লীলার পিতামহ যখন এখানে বাস করেন তখন লীলার পিতা বালক মাত্র। তাহার দুই এক বৎসর পরেই তাঁহার ভগিনী ও ভগ্নিপতি বর্ম্মায় চলিয়া যান তারপর আর তাঁহাদের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং লীলার পিতারই পিতৃস্বসার কথা ভাল মনে ছিল না। যোগেনবাবু যখন বিবাহ করেন তখন এ সব অনুসন্ধানের কোন আবশ্যক হয় নাই, কেন না যোগেন বাবু পিতৃমাতৃহীন, সুতরাং এতদিন এ কথার উত্থাপন হয় নাই।"

"আর আজ আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিতেই বুঝি এমনি ভাবে ইহার অনুসন্ধান করিলেন ?"

"শরৎ রাগ ক'রোনা ভাই, আমরা এর অনুসন্ধান করি নি। 'লীলার পিতৃসম্পত্তি অনেক আছে, যে লীলাকে বিবাহ করিবে সে প্রভূতসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে,' —এ সংবাদ যিনি দিয়াছেন তাঁহার এক দৌহিত্রের সঙ্গে লীলার বিবাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিফলমনোরথ হওয়ায় এই শত্রুতা সাধন করিয়াছেন।"

"কথাটা সত্য কিনা খোঁজ লইয়াছিলেন ?"

"হাঁ, বাবা এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ না লইয়া বিশ্বাস করেন নাই।"

"বড়দাদা—বড়দাদা!! তবে আপনারা কি স্থির করিয়াছেন ? সত্যই কি আমায় লীলাকে ত্যাগ করিতে হইবে ?—" আর কথা বাহির হইল না, আমি বড়দাদার বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমার বোধ হইল আমার মস্তকের উপরে বড়দাদার তপ্ত-অশ্রু ফোঁটার পর ফোঁটা বহিয়া পড়িতেছে।

৮

এ কি হইল! আমার জ্যোৎস্না-ধবলিতা মধুর রজনীকে কে এমন কালি মাখাইয়া দিল ? আমার সুধার আধার পূর্ণচন্দ্র কোন্ নিষ্ঠুর রাহু সহসা গ্রাস করিল ? আমার প্রস্ফুটিত কুসুমকুঞ্জ কোন যাদুকর মোহিনীমন্ত্রে এক নিমেষে মরুভূমিতে পরিণত করিল ? আমি যে মুহূর্ত্তপূর্ব্বেও অগাধ অমৃতে আকণ্ঠ ডুবিয়া ছিলাম—, কে আমায় এ অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল ? আমি যে যাই! কাহার মুখ চাহিব, কে আমায় রক্ষা করিবে ? হা ভগবান্ এ কি করিলে ?

লীলা আমার অমৃতময়ী লীলা! আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব! তুমি আমার কে লীলা! আমার নয়নের জ্যোতিঃ, হৃদয়ের আশা, জীবনের সাধনা, বাসনার কেন্দ্র, মরমের গ্রন্থি, আমার গৃহের সুখ, কর্ম্মের সাফল্য, জীবনের শান্তি, প্রণয়ের প্রতিমা, আমার কি নয়—লীলা, আমি দূর হইতে যাহাকে দেখিয়া আত্মহারা হইতাম, যাহার বিমল আকাঙ্ক্ষায় স্বর্গের সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম, সেই অমূল্য রত্ন হৃদয়ে ধরিয়া আমি দূরে নিক্ষেপ করিব ? তবে আমি কি লইয়া জীবিত থাকিব—। ওগো, তোমরা বলিয়া দাও এ হতভাগ্যের জগতে আর কি অবলম্বন আছে ?

তবে কি বাবাকে, স্নেহময় দাদাদের, স্নেহের পরিজনদের ত্যাগ করিব! যাঁদের তিল তিল স্নেহ দিনে দিনে সঞ্চিত হইয়া এ অভাগার শুষ্ক হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, আমি না চাহিতে যাঁদের উন্মুক্ত হৃদয় আমার জন্য অক্ষয় ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, যে স্নেহে ও দয়ায় আমার দেহ, আমার জ্ঞান, আমার লীলা, আমি সেই স্নেহ এক নিমেষে হেলায় পদতলে বিমর্দ্দিত করিব—তারপর! যখন সংসারের

তাপ এই মুক্ত ছায়াহীন মস্তকের উপর ভীষণ তেজ বিকীর্ণ করিবে তখন অভাগা কোন স্নিগ্ধ ছায়ায় সে জ্বালা অপনোদন করিবে? সংসারচক্রের নিষ্পেষণে যখন শুষ্ক হৃদয় 'ত্রাহি ত্রাহি' করিবে তখন কোন্ স্নেহধারা তাহার মুখে অমৃত সেচন করিবে! হায়, একবার হেলায় হারাইলে এ ধন আর কোথায় পাইব; কি করিব? বল প্রভু! এ অধম সন্তানকে পথ বলে দাও। আমি কোন দিক রাখি?

শয্যায় পড়িয়া তাহাই ভাবিতেছি। হায়, এ না ফুলশয্যা? জীবনে এমন দিন কি দম্পতির আর আছে! প্রস্ফুটিত-কুসুমগন্ধে প্রথম মিলনশয্যায় পতিপত্নী প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ করিবে, এমন পবিত্র তীর্থ প্রাণীর আর কোথায় আছে! আর সেই দিনে সেই শয্যায় আমি কি ভাবিতেছি—আমার সেই লীলাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিব? ইহাপেক্ষা কঠিন আঘাত কোন্ হৃদয় সহ্য করিয়াছে? মাগো কেন তুমি শৈশবে আমায় সঙ্গে লও নাই?

মৃদু মৃদু পদশব্দে আমার চিন্তাগ্রন্থি ছিন্ন হইল, চাহিয়া দেখিতেও সাহস হইল না, শয্যাপার্শ্বের ভিত্তিগাত্রে অবগুণ্ঠনাবৃতার ম্লানছায়া নিপতিত হইল। হায়—আমার লীলা—অভাগিনী লীলা প্রথম পতিসম্ভাষণে আসিতেছে! আমার আর সহ্য হইল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলাম।

তখন সেই বালিকা, সেই লজ্জাবিজড়িতা অভিসারিকা নববধূ দু'খানি ফুল্ল-করে আমার হাত চাপিয়া ধরিল (এত দুঃখেও হাসি পায়)। প্রথম সম্ভাষণে লীলা সেই পুরাতন আহ্বানে ডাকিয়া ফেলিল "শরৎ দা," আবার তখনই সামলাইয়া লইল। বলিল "কেঁদনা শোন, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

অদৃষ্ট তোমার এ কি পরিহাস? যে লীলার মুখ ফুটাইতে আজ আমার কত সাধিতে হইত সে আজ আমার দু'হাত ধরিয়া তাহার কথা শুনিতে সাধিতেছে! কিম্বা শৈশবে যে মাতৃহীন, জগতের সকল বিধিই বুঝি তাহার ভাগ্যে বিপরীত?

আমি কোন মতে অশ্রুজল রোধ করিয়া উঠিয়া বসিলাম, কিন্তু লীলার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। লীলা বুঝিল কিনা জানি না, আমি তখন কত কষ্টে ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, যদি একবার সে মুখের দিকে চাহিতাম সে চেষ্টা তখনই বিফল হইয়া যাইত।

লীলা বলিল "কেন এত কাঁদিতেছ বল দেখি।" হায়! বালিকার সকলই অদ্ভুত! তাহাকে লইয়া এই কাণ্ড হইতেছে, আর সে কিনা পরম নিশ্চিন্তের ন্যায় আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছে "কেন কাঁদিতেছ বল দেখি?" এই সরলার কথার উত্তরে আমি ঐ নির্ম্মল হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিব—যার পায়ে কাঁটা ফোটার কল্পনাতেও হৃদয় ব্যথিত হয়, তাহাকে বুঝাইতে হইবে তাহার জন্য কি বেদনা স্বামী-

ক্কত হইতেছে। কি উত্তর দিব—বলিলাম "লীলা তুমি কি কিছুই শোন নি ?"

"শুনেছি বই কি—দিদির কাছে সব শুনেছি. কিন্তু তোমার এত কাতর হওয়ার কি আছে ? বাবা যদিও আমায় গৃহে স্থান না দেন, তুমিত আমার পর হইবে না।"

আমার হাসি আসিল, বলিলাম, "যদি তুমি আমি একত্রে ঘরই না করিতে পারিলাম, তবে আর আপনার থাকিলাম কি করিয়া ?"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল "বিধবারা স্বামীর আপনার থাকে কি করিয়া ?"

আমি একটু বিস্মিত হইলাম, এই কি সেই খেলানিরতা সরলা লীলা।—বলিলাম, "লীলা, বিধবা সন্ন্যাসিনী, তুমিও না হয় আপনা-বিস্মৃত হইয়া স্বামীর ধ্যানে রহিলে, কিন্তু এ হতভাগার কথা ভাবিয়াছ কি লীলা ? আমি ত তোমার ভাবনা এখনও ভাবি নাই, আমার নিজের চিন্তাই যে আমায় পাগল করিয়াছে।

লীলা সস্নেহে আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইল এবং সেই কোমল আয়ত চক্ষুদুটীতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "দেখ এত প্রেম, এত ভালবাসা কি কখনও বিফলে যায় ? তোমার এই প্রেমে যখন আমি সুখী হব, আমি কি তোমায় তা থেকে কিছু কম ভালবাস্‌ব ? তুমিত আমায় ত্যাগ করবে না। তবে বাপের মনে দুঃখ দিয়া আমায় গ্রহণ করিতে কিছুতেই দিব না। আমি শুধু তোমার প্রণয়ভাগিনী নই, তোমার গৃহিণী, সহধর্ম্মিণী, তোমার গৃহে যেদিন আমার নিজের স্থান আমি নিজে অধিকার করিতে পারিব, সেদিন সগর্ব্বে তোমার পদতলে বসিয়া দাসীদের দাসী করিব। ভগবান আমাদের দুজনকে বাঁধিয়াছেন, কে বিচ্ছিন্ন করিবে ? তুমি কেবল আমায় ভালবাসিও, দেখিও সেই বলে আমি আমার নিজের গৃহে আবার আসিব। তুমি আমার জন্য একটুও কাতর হইও না।"

আমার মনে হইল, স্বর্গ হইতে আশাময়-দৈববাণী আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে, বলিলাম "লীলা তা পারিবে ?"

সগর্ব্বে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া লীলা উত্তর করিল "কেন পারিব না ? আমিত পরের জিনিষ চুরী করিব না, আমার নিজের জিনিষ, ভগবান আমায় ফিরাইয়া দিবেন।"

আঃ আশার কথাটিও কত মিষ্ট ! লীলার কথায় আমার হৃদয় জুড়াইয়া গেল। এতক্ষণ পরে দুই হাতে লীলার মুখখানি তুলিয়া ধরিলাম, মরি মরি—কি সুন্দর ! আমি বিস্ময়ের মত সেই চারু অধরে চুম্বন করিলাম— যে লীলা এতক্ষণ সগর্ব্বে কত কথা কহিতেছিল আরক্ত মুখে মৃদু হাসিয়া চক্ষের পল্লব অবনত করিল— তরুণীর ফুল্ল মুখে লজ্জা রক্তিম ফুটিয়া উঠিল, আমার এই অতৃপ্ত চক্ষে সে ছবি কি সুন্দর !

যে[illegible] বাবু ও তরঙ্গদিদি সকলই

শুনিলেন : তরঙ্গদিদি, যাঁহাকে এতদিন পর্য্যন্ত এক মূহূর্ত্তের জন্য বিষণ্ণ দেখি নাই, তিনি আজ প্রথম ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সে মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপে পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

যোগেনবাবু মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। তাঁহারাও সবিশেষ খোঁজ লইয়াছেন, সংবাদ সকলই সত্য। হায়! কেন আমি জন্মিয়াই মরি নাই?

লীলা তরঙ্গদিদির গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল "দিদি ওঠ" "দিদি ওঠ।"

তখন তরঙ্গদিদি উঠিয়া লীলাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "শরৎকে কেহ একবার ডাকিয়া দাও।" আমি কাছেই ছিলাম, প্রবাহিত অশ্রুবারি রুমালে মুছিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, তরঙ্গদিদি বসিতে বলিলেন। আমি বসিলে তিনি হাত ধরিয়া বলিলেন "শরৎ আমার এ ননীর পুতুলকে কি সত্যই ত্যাগ করিবে? একবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। শরৎ, কে এমন পাষাণ আছে যে, তুচ্ছ লোকনিন্দাভয়ে এ স্বর্ণপ্রতিমা ত্যাগ করিতে পারে? শরৎ, শত নিন্দা এক দিকে, আর এই নিরপরাধীর এক এক বিন্দু চক্ষের জল এক দিকে। লীলার যে তপ্তনিঃশ্বাস পড়িবে, তাহাতে যে তোমাদের সংসার দগ্ধ হইয়া যাইবে। শরৎ, আমি কি লীলাকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের হাতে সমর্পণ করিয়াছি?"—দিদি আর বলিতে পারিলেন না। দুঃখবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

আমি বলিলাম, "দিদি আমিত লীলাকে ত্যাগ করি নাই, আর যে সম্পর্ক জীবনে মরনে গাঁথা, তাহা কি মুখের কথাতেই ত্যাগ হয়। আপনিও হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের হাতে লীলাকে দেন নাই, আর আমিও শুধু কাঠের পুতুলকে বিবাহ করি নাই। দিদি, লীলা নিজের স্থান নিজে অধিকার করিবে।"

তরঙ্গদিদি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন, আমি বলিলাম "লীলার যদি সে ক্ষমতা না থাকে তবে হাতে তুলিয়া দিলেও ত সে নিজের অধিকার রাখিতে পারিবে না। লীলাকে জিজ্ঞাসা করুন, লীলার সে শক্তি আছে কি না?" তখন লীলা বলিল "সত্যই দিদি, আমি নিজের গৃহে নিজে স্থান করিয়া লইব। এ গুণটুকুও যদি আমার না থাকে, তবে গৃহ হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হওয়াই আমার উচিত।"

তরঙ্গদিদি লীলার মুখে উপর্য্যুপরি চুম্বন করিয়া বলিলেন "তাই হোক, লীলা, তাই হোক, তোর জীবন যেন বিফলে না যায়, যেমন করিয়া হোক্ তোর নিজের গৃহে যেন রাজরাণী হোস্।"

"দিদি, তোমরা সেই আশীর্ব্বাদই কর। তোমার পায়ের ধুলো দাও দিদি, তারই জোরে আমার সর্ব্ব-সিদ্ধি হবে।" লীলা দিদির পায়ের ধুলা লইতে গেল।

"দূর ছুঁড়ি এত দুঃখেও তোর জ্ঞান হইল না। ঐ দ্যাখ যার পায়ের ধুলায়

সত্য সত্যই তোর মঙ্গল হবে, সে ঐ তোর সামনে, ও পায়ের ধূলো আগে নিগে।”

তরঙ্গদিদির দুঃখেও রঙ্গ যায় না। আমি পলাইতে পথ পাইলাম না।

১০

ইহার পরে সুখে দুঃখে প্রায় তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমি লীলাকে সর্ব্বদাই পত্র লিখিয়াছি। লীলাও ত প্রায় প্রত্যহই পত্র দেয়, কিন্তু মিলন আর হয় নাই। কেহ ভাবিবেন না যে, নিতান্ত পিতৃ আজ্ঞা পরবশ হইয়াই আমি এমন কাজ করিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তাহা হইলে যে, গোপনে লীলাকে না দেখিতাম তাহা নহে, তবে গুটিকতক কারণে কেবল দেখা করি নাই। প্রথমতঃ বাবা সেই হইতে আর দেশে যান নাই, কারণ ম্যালেরিয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হইয়াছিল। বড় দাদাও আলিপুরে বদলি হইয়াছিলেন। সুতরাং বাবা ও বড় দাদার চোখের সামনে মিথ্যা ছুতার কোনও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই বা সে টুকুতে একটু অনাস্থাও ছিল বলিলে মিথ্যা হয় না। তার উপর ভাবিলাম, যে কষ্টে লীলাকে ছাড়িয়া হৃদয় বাঁধিয়া অনবরত অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি, একবার দর্শনে যদি সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। সেই মুখ, সেই হৃদয়, আমার সেই হৃদয়ের নিধি, সে কি আমার কম আকর্ষণ, কম প্রলোভন! এই দূরে, সুদীর্ঘ তিন বৎসরের বিচ্ছেদে, তবুও যাহার চিন্তা মাত্র এক এক বার মন উন্মত্তের মত হইয়া উঠে, আর তাহার দর্শনে আমার কি হইবে কে বলিতে পারে? আমার বা লীলার ভাগ্যে যাহাই হউক, বাবা যতদিন স্বেচ্ছায় আমায় লীলাকে দান না করিবেন ততদিন তাঁহার মর্ম্মে বেদনা দিব না, ইহা স্থির করিলাম। তবে নিজের এই উদ্দাম-চিন্তাটীকে যদি আয়ত্ত করিতে পারিতাম তবে গোপনে দুই একবার সে চাঁদমুখ দেখার সুখসাধে বঞ্চিত থাকিতাম না। সেও আমার অদৃষ্টের ফল।

শ্রাবণমাসে একদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বড়দাদা কাতর ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। বৌদিদি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বড়দাদা বলিলেন “শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ হইতেছে।” ইহার পূর্ব্বেই আষাঢ় মাসে বড়দাদার জ্যেষ্ঠা-কন্যার বিবাহে তাঁহার শরীরের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণেই বোধ হয় জ্বর হইয়া থাকিবে বলিয়া বড়দাদা ডাক্তার ডাকিতে দিলেন না। তার উপর এ সময় উপস্থিত কন্যা-দায় হইতে মুক্ত হইয়া হাত একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বড়দাদা শীঘ্র ডাক্তার খরচে রাজী নন্। অল্পে সারিবে বলিয়া দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। সারিবার কোন লক্ষণ ত নাই, উপরন্তু বড় দাদার যাতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন আর থাকা যায় না, ভাল দেখিয়া একজন ডাক্তার আনা হইল।

প্রায় সপ্তাহ হইতে চলিল কিন্তু ডাক্তা-

রের চিকিৎসায় কোনই ফল হইল না, রোগ ক্রমশঃ গুরুতর হইতে লাগিল। পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা। অসহ্য যাতনায় রোগী দিনরাত অস্থির হইয়া পড়িল।

তখন বৌদিদি কাতর হইয়া পড়িলেন, বলিলেন "ঠাকুরপো, এই আমার অবশিষ্ট গহনা নাও, উহা বিক্রয় করিয়া টাকা যোগাড় কর। আমি সিভিল সার্জ্জন দিয়া তোমার বড়দাদার চিকিৎসা করাইব।"

একে কন্যাদায়ে বৌদিদির অধিকাংশ গহনা বন্দক পড়িয়াছিল। যাহা ছিল তাহা লইতে আমার হাত উঠিতেছিল না। বৌদিদি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন 'ঠাকুরপো, দেখিতে পাইতেছ না, সম্মুখে আমার কি বিপদ্! মেজ ঠাকুরপোর মাহিনায় নিজেরই কুলায় না। তোমার এখনও উপার্জ্জন নাই, এ ভিন্ন তোমার দাদার কি দিয়া জীবন রক্ষা করিব? ঐ প্রাণের অপেক্ষা জগতে আমার আর কি প্রিয় আছে।—" বলিতে বলিতে তাঁহার দু'টি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। নিজের প্রাণে সব সয়। বড়দাদা ও বৌদিদির পায়ে কাঁটার আঁচড়ও বুঝি আমার বুকে সয় না। বৌদিদির চক্ষের জলে আমার চক্ষের জল অসামাল হইয়া আসিতেছিল। গহনা কয়খানি লইয়া চলিয়া আসিলাম।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন পাকস্থলীতে ফোড়া হইয়াছে, 'অপারেশন' করিতে হইবে। যে ৬০০৲ টাকা, বৌদিদির গহনা বিক্রয় করিয়া হইয়াছিল, কয়দিনে প্রায় তাহার ২৫০৲ টাকা খরচ হইয়া গেল কাল "অপারেশন" বাকি টাকায় কালই সব খরচ কুলাইবে কিনা সন্দেহ। তার পরে কি দিয়া বড়দাদার চিকিৎসা হইবে? যখন বৌদিদিকে এই কথা বলিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে উন্মাদিনীর মত বৌদিদি আমার পায়ের কাছে পড়িলেন ও বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো আমার আর জ্ঞান নাই। তোমরা ওঁকে বাঁচাও। ওগো, আমি তোমাদের পায়ে ধরিতেছি, 'তোমরা যেমন করিয়া পার ওঁর প্রাণ দান দাও'। বৌদিদির কাতর আর্ত্তনাদে বাবা সেখানে ছুটিয়া আসিলেন্। সজল চক্ষে বৌদিদির মাথায় হাত দিয়া বাবা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমি সেই অবসরে বাহিরে পলাইয়া গেলাম।

বড়দাদার অবস্থা জানাইয়া মেজ দাদাকে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। সেই দিন মেজদা পৌঁছিয়াছেন। বাড়ীতে বাবা ও মেজদাদা রহিলেন আমি একবার পুরাতন বন্ধুদের খোঁজে চলিলাম। যদি ভগবান সদয় হন, হয়ত কোন বন্ধুর নিকট অর্থের যোগাড়ও করিতে পারি।

মনে একটা অভিসন্ধি লইয়া বাহির হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু অন্তরের দারুণ দুর্ভাবনার বশে কোন্ দিকে যে যাইতে ছিলাম, কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। হটাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলাম। সবিস্ময়ে দেখিলাম, লীলাদের পুরাতন ভৃত্য—হরিদাস। আমার এই বিপদের সময় হরিদাসকে দেখিয়াও যেন

মন একটু আশ্বস্ত হইল। ভাবিলাম তাহা হইলে যোগেন বাবু নিশ্চয় কলিকাতায় আছেন, এই বিপদের সময় তাঁর কাছে যদি কোন সাহায্য পাই। বলিলাম "হরিদাস তুমি এখানে কার সঙ্গে এলে ?"

"আজ্ঞে ছোটদিদির সঙ্গে এসেছি। আপনি কোথায় যাচ্চেন, এই তো আমাদের বাসা, একবার বসতে আজ্ঞা হউক।" মন—আমার চির অবোধ মন আবার অবাধ্যতা করিল। বড়দার অত অসুখ, মাথার উপর অত ভাবনা, বিপদের এই ভীষণ কশাঘাত, মুহূর্ত্তে সব বিস্মৃত হইলাম। সম্মুখে এইখানে আমার লীলা, ইহা শুনিবামাত্র মন যেন উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "চল একবার চল, একবার দেখিয়া লও।"

হায়! চরণও যে আর চলে না, উঠিয়া সম্মুখের ঘরে বসিয়া পড়িলাম। হরিদাস বলিল "জামাই বাবু ও ঘরটা নয়—এই পাশের ঘরে আসুন।"

হরিদাস পাশের ঘরে কেন আহ্বান করিল বুঝিতে বাকি রহিল না, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। মুহূর্ত্ত পরেই লীলা—আমার ধ্যানের ছবি—লীলা, চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ননীবালা দেবী

জগতে নারী।

প্রেমের প্রতিমা, দয়ার সাগর,
করুণা-নির্ঝর, স্নেহের নদী।
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
পৃথিবীতে তুমি না থাকিতে যদি।

যে মহাত্মা উপরের কবিতাটী লিখিয়া নারীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই জগতে নারীর আসন যে কত উচ্চ তাহা অনেকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে যদি মায়ের স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা ও স্ত্রীর আত্মসমর্পণ না থাকিত তাহা হইলে সংসার যে নিতান্তই মরুভূমিসম নীরস ও উত্তপ্তবালুকাময় বোধ হইত তাহা নিশ্চয়। কিন্তু দেশ, কাল, অবস্থা, ও শিক্ষা ভেদে সকল দেশেই নারীজাতি যে ঐ উচ্চ আসন হইতে কত নীচে নামিয়াছে, পুরুষ যে নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, আমরা ক্রমশঃ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সমস্ত জগতের সম্বন্ধে কোন বিষয় লিখিতে বা বলিতে গেলে পুরাতন মহাদ্বীপের কথাই আমাদের মনে প্রথমে উদয় হয়। উহার মধ্যে আবার এসিয়া-মহাদেশ ও উহার সমাজ-ব্যবস্থা সর্ব্বা-

পেক্ষা প্রাচীন, সেজন্য এসিয়ার মহিলাদিগের বর্ণনা লেখা আমাদের প্রথম কাজ। কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি, সুতরাং সমস্ত পৃথক-জাতীয় ভারতললনাদের বৃত্তান্ত প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া ও তাহার আলোচনা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের বাসভূমি এত বড় প্রকাণ্ড দেশ এবং ইহাতে এতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও তাহাদের এত বিভিন্ন আচার ব্যবহার, রীতিনীতি দেখা যায় যে, তাহা হইতে সমগ্র ভারতমহিলার চরিত্র ও বর্ত্তমান অবস্থা সঠিক বর্ণনা করা একরূপ অসাধ্য। কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ কাজ যতদূর কঠিন ছিল, এখন রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে সর্ব্বত্র যাতায়াতের ও মেলামেশার সুবিধা হওয়ায় এক্ষণে ইহা ততদূর কষ্টসাধ্য বোধ হয় না।

পূর্ব্বে মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক, বাঙ্গালীর স্ত্রীলোক ও পাঞ্জাবী মহিলায় কখন দেখা সাক্ষাৎই হইত না। কিন্তু এখন কত মার্হাট্টীয় মহিলা বাঙ্গালায় বাস করেন, কত বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পাঞ্জাবে বা মহীশূরে যান। আমরা সকলেই যে ভারতে জন্মিয়াছি, এ ভাব এখন আমরা অনেকটা বোধ করিতে শিখিয়াছি। লোকে বলে "পৃথিবীর এক অর্দ্ধের লোক অন্য অর্দ্ধের অধিবাসীরা কিরূপে দিন কাটায় তাহা জানে না।"

কিন্তু বৌদ্ধ, মুসলমান, জড়োপাসক ও পার্সী নারীদের বাদ দিয়াও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কেবল হিন্দুনারীদের মধ্যেও এত প্রভেদ দেখা যায় যে, এক প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা অন্য প্রদেশের নারীদের বিষয় কিছুই জানেন না। এক দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে এত বিভিন্নতা ও অজ্ঞতা কেবল আমাদের ভারতবর্ষেই দেখা যায়। এ অজ্ঞতা বা শৈথিল্যের কারণও খুঁজিতে হয় না। আমাদের দেশের জাতিভেদ ও সমাজবন্ধন এমন অদ্ভুত ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমাজে এত ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি চলিত ও উহা অপর দেশীয় লোকের কাছে এতদূর অগম্য যে, এক প্রদেশবাসীদের পক্ষে অন্য ভাগের অধিবাসীদের বিষয় সমস্ত ভালরূপে জানা এক প্রকার দুঃসাধ্য। আবার অবরোধ প্রথা বশতঃ ভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় স্ত্রালোকদের বিষয় জানিবার সুবিধা ও উপায় অতি অল্প।

আমরা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, মনে করিতাম সকল হিন্দুস্ত্রীলোকদের অবস্থাই বুঝি আমাদের মত, এবং ভারতের অন্যান্য দেশীয় মহিলাদের চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে আমাদের অবস্থা মিলাইয়া নিজেদের উন্নতি করিতে প্রয়াস পাইতাম না। কিন্তু আজকাল শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য দেশীয় ভগিনীদের বিষয় জানিবার জন্য কৌতুহল জন্মিয়াছে, এখন আমরা বুঝিয়াছি যে বঙ্গদেশ সমস্ত ভারতবর্ষ নয়, এবং বঙ্গনারী হিন্দুস্থানের অন্যান্য রমণীদের প্রতিকৃতি নয়। এই জ্ঞানার্জ্জনের ভাব আমাদের মনে যখন জাগিয়াছে তখন উহা দ্বারা জ্ঞান বিস্তার করা একান্ত কর্ত্তব্য ভাবিয়া

আমি সাধামত ভারতীয় নারীগণের অবস্থা সংগ্রহ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে রাজপুত মহিলাগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই সংসারে উচ্চ সম্মানের পদ পাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সে অধিকারে পুরুষজাতি হস্তক্ষেপ করেন নাই। নারীগণ সর্ব্বদাই সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত আচরিত হন, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে সম্মানসূচক দেবী ও মা ভিন্ন অন্য কোন নামে ডাকিতে সাহস পায় না। যদিও মোগল সম্রাটদিগের অনুকরণে দুই চারি জন রাজা ও মহারাজা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বহুবিবাহ কখন প্রশ্রয় পায় নাই. তাঁহাদের মধ্যে একভার্য্যা গ্রহণ প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। আর পত্নীর প্রতি স্নেহ ও যত্নে রাজপুত পুরুষেরা অন্যান্য হিন্দুদিগের অনেক উপরে। "উভয়ের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস যাবজ্জীবন থাকুক"—বিবাহকালে এই সরল প্রতিজ্ঞা বাক্যই উঁহাদের দম্পতির প্রেম ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেয়। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঐ প্রতিজ্ঞা কঠিন আইনের কার্য্য করে।

আমরা বাল্যকাল হইতে যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি চিরপ্রসিদ্ধ আদর্শ নারীদের পূজা করিতে শিখি, তাঁহারা সকলেই রাজপুত মহিলা ছিলেন। যে ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনীর সতীত্ব ও সাহসের কথা পড়িয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হই সেই বীরনারী পদ্মিনী রাজপুত মহিলা। যে কৃষ্টকুমারীর অকাল মৃত্যুতে হৃদয় গলিয়া যায়, অথচ বালিকার মনের তেজ ও পিতৃভক্তি দেখিয়া আমরা বার বার প্রশংসা করি—সেই ধর্ম্মপ্রাণা কৃষ্টও রাজপুতবালা।

একথা সত্য যে মুসলমানদিগের রাজত্ব কাল হইতে অন্যান্য হিন্দুদিগের ন্যায় ভদ্র রাজপুতদিগের কন্যাগণও অপেক্ষাকৃত অবরুদ্ধ থাকেন, কিন্তু তাহা দ্বারা পুরুষদের উপর নারীর প্রভাব কিংবা সংসারে তাহার অধিকার কখন কমিয়া যায় নাই। গৃহে উঁহারা যেরূপ সুখ, সম্মান ও মর্য্যাদা ভোগ করেন তাহাতে রাজপুত নারীদের অবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য রমণীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। রাজপুত স্ত্রী সংসারে স্বামীর দক্ষিণ হস্ত, তাঁর সহিত পরামর্শ না করিয়া গৃহকর্ত্তা কখন কোন কাজে অগ্রসর হন না। রাজপুত বীরেরা জননীর আশীর্ব্বাদ না লইয়া কখন কোন কার্য্যে যাইতেন না। স্ত্রীলোক যে গৃহের দেবীর ন্যায়, তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য, এ জ্ঞান প্রতি রাজপুতের শিরায় শিরায় নিবিষ্ট ছিল।

ইতিহাসে পড়িয়াছি, রাজপুত বালাদের প্রেম ও প্রশংসা লাভের আশায় এবং উহাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার অভিপ্রায়ে পুরুষেরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিত। পুরাকালে স্বয়ংবর প্রথা রাজপুতদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন তাহারা সেরূপ প্রকাশ্যে পতিবরণের অধিকার হইতে

বঞ্চিত হইলেও গোপনে পতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাসী।

নারীর সহানুভূতি।

The good God giveth love for all,
The earnest heart to cheer and help;
As his own smiles of glory fall
On hidden flowers unseen but felt.

Massey.

ভগবানের কি অদ্ভুত লীলা! মহিমাময়ের মহিমা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞানচক্ষুতে দেখিলে, এবং বিবেক-কর্ণে শুনিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্বে এক বিশ্বব্যাপী সাম্য-ভাব—কেমন মধুর কোমলতা,—কেমন বিশ্বপরিচালক নিয়মের শৃঙ্খলতা—রহিয়াছে। পদার্থ সকলের উৎপত্তি-তত্ত্ব এবং তাহাদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা যতই স্থির হইয়া চিন্তা করি, ততই বুঝিতে পারি যে সৃষ্টির মধ্যে অসংলগ্নতা কুত্রাপি নাই, কৃপাময়ের কি অসীম কৃপা! তিনি জগৎকে শুধু মরুময় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, কারণ তাহা হইলে ইহার শোভা হয় না। শুধু পর্ব্বত রাজিতে পরিপূরিত করিলেন না—কারণ সমতল ভূমি ও উপত্যকা না থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্য—তাহার বিচিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে শুধু পুরুষপ্রকৃতিক করিয়া সৃজন করিতে পারেন নাই, কারণ শুধু কাঠিন্যের আধিপত্য থাকিলে সংসার এত সুন্দর বলিয়া বোধ হইত না—এমন কি বিশ্ব পুরুষপ্রকৃতিক হইলে সৃষ্টি তাঁহাকে প্রেমময় বলিয়া হৃদয়ে রাখিতে উন্মত্ত প্রায় হইত না। তাই দয়াময়—প্রেমময়—ভগবান কোমলতার চরম করিয়া হৃদয়, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি দিয়া স্ত্রী প্রকৃতি সৃজন করিলেন। জননী, ভগিনী, দারা ও সুতা এই মধুর চতুর্মূর্ত্তিতে তিনি রমণী জাতিকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। স্নেহে জননী দেবী—সহানুভূতিতে ভগ্নী—প্রেমে পত্নী—ভক্তিতে সুতা। সকল সময়ে আমরা এই চারিমূর্ত্তি নারীকে আমাদের পার্শ্বে দেখিতে পাই। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, হর্ষে শোকে, কোন সময়েই রমণী আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। এমন পবিত্র ও নিঃস্বার্থ সাহায্য আমরা আর কোথাও পাই না। ধন্য ভগবানের লীলা—ধন্য তাঁহার সৃষ্টির মহিমা।

সহানুভূতি প্রদর্শন ও কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য রমণীগণ জগতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মত সাহায্যকারিণী আর কে আছে? সূর্য্যমুখী ফুল যেমন

দিনকরের দিকে আকুল নয়নে তাকাইয়া থাকে, সূর্য্য যে দিকে ফিরেন বেচারা পুষ্পও সেই দিকেই আপন মুখ ফিরাইয়া দীন নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে. রমণীর প্রাণও সেইরূপ দুঃখী তাপী পীড়িত-দিগের মুখ পানে তাকাইয়া থাকেন। সেই হতভাগা ও হতভাগিনীদিগের জন্য তাঁহাদের প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদে। পুত্র কন্যা পীড়িত হইলে জননীর আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায় ভ্রাতার অবসাদে ভগ্নী ম্রিয়মান হইয়া পড়েন এবং সর্ব্বদা কাছে থাকিয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সেই অবসাদ-টুকু বিদূরিত করিতে প্রয়াস পান। পতির দুঃখে পত্নী অধীরা হইয়া পড়েন এবং তাঁহার দুঃখ নাশ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন। পিতার চক্ষুতে জল দেখিলে কন্যার প্রাণ কাঁদে। যদিও তাঁহারা হৃদ-য়ের ব্যাধি বিনাশ করিতে পারেন না, তথাপি তাঁহাদের স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও সহানুভূতিতে সব জ্বালা দূর হইয়া যায়। শোকে বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ব্যথার তাড়নায় ক্ষুদ্র হৃদয়খানি মথিত হইতেছে, কিন্তু ঐ রমণী আমার মুখ পানে মুখ তুলিয়া তাকাইলে ব্যথা জ্বালা সব দূর হইয়া যায়, শান্তি পাই। রোগে, শোকে, তাপে, রমণীর সহানুভূতি বিশল্য করনী সদৃশ। পরিশ্রম, ক্লান্তি, বিপদ, কষ্ট সবই অম্লান বদনে, হাসি মুখে তিনি সহ্য করিতেছেন শুধু ঐ দীনহীন, দুঃখক্লিষ্ট, রোগশোকাক্রান্ত হতভাগার মুখ পানে তাকাইয়া। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তিনি মাতৃরূপে বসিয়া আছেন। প্রলাপ বকিতে বকিতে রোগী "মা" "মা" বলিয়া চমকিয়া উঠিল, রমণীর হৃদয়ে তড়িত প্রবাহ ছুটিল, ভগবান তাঁহাকে মাতৃরূপে প্রেরণ করিলেন—তিনি মুমূর্ষুর মস্তক আপন ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত হৃদয় তন্ত্রীকে নাচাইয়া ও কাঁপাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, রোগীকে প্রত্যুত্তর দান করিলেন "কি বাবা"! ভগবান সে স্বর? -

—সেই স্নেহস্বর,

দুঃখপূর্ণ জগতের শান্তির সঙ্গীত।

হায় এই সংসারে আসিয়া আমরা কত না দুঃখের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পুড়িয়া মরি। যাহারা দুঃখের চাপে নিরাশ হইয়া পড়ে, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া দিশেহারা হইয়া যায়—রমণীর সহানুভূতি না থাকিলে—রমণী আপনার স্নেহাশ্রয়ে টানিয়া না লইলে, এতদিনে সংসারে কত লোকের অস্তিত্ব লোপ পাইত। রমণী আছেন বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। তাঁহা-দের দয়ায় আমরা প্রাণ ধারণ করিতেছি। বিখ্যাত পাশ্চাত্য কবি ও উপন্যাসকার স্যার ওয়াল্টার স্কট বলিয়াছেন :-

"O woman! in our hours of ease,
Uncertain Coy, and hard to please.
And variable as the shade
By the light quivering aspen made
When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou."

সভ্যজগতে কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞান-বিৎ, সাধারণ লোক সকলেই এক বাক্যে রমণীর গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন—নারীকে বন্দনা করেন। পাষাণেরাও নারীর সম্মান বুঝিয়া থাকে। রমণীর চরিত্র যতই কলুষিত হউক না কেন ক্রোধশীলা, হিংসাময়ী, অনিষ্টকারিণী, তিনি যাহাই হউন না কেন বিপদ আগমনে তাঁহার চরিত্রের সেই সকল ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

শত্রু হইলেও শোকে তাপে তিনি প্রাণ দিয়া তাহার কর্ম্ম করেন, মান অভিমান ভুলিয়া যান, হিংসা প্রতিহিংসা বিস্মৃত হইয়া বিপন্নের সেবায় আত্মা নিয়োজিত করিয়া থাকেন। ধন্য রমণীর মহিমা! প্রসিদ্ধ মার্কিন গ্রন্থকার চিরকুমার ওয়াশিংটন আরভিং বলিয়াছেন "এ জগতে এমন একজন আছেন যিনি পরের দুঃখ আপন বুকে লইয়া সেই দুঃখের তীব্রতা অনুভব করিতে পারেন—এমন একজন আছেন যিনি অপরের সুখে প্রকৃত সুখী হইতে পারেন—এমন একজন আছেন যিনি অপরের দোষগুণ আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারেন—এমন একজন আছেন যিনি দয়া, স্নেহ, প্রেম, কোমলতা, পরোপকার ও ভক্তিতে আপনার স্বার্থ নিয়োজিত করিয়া ফেলেন এবং সাহায্য করিতে সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হন। সেই একজন অন্য কেহই নহেন—সংসারের নারী য।"

বিধাতা যে শুধু ইউরোপীয় মহিলাদিগের অন্তর দয়ামায়া ও কোমলতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে। সমগ্র নারী জাতির অন্তর একবিধ উপকরণে গঠিত। তবে সমাজ, জাতি, কাল ও পাত্র ভেদে কিছু পার্থক্য হইয়াছে। কেহ কেহ গৃহে, আপন পরিবারের মধ্যে, কেহ স্বদেশে, কেহ বিদেশে এবং কেহ বা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কর্ম্ম করিয়া আপনার দয়ামায়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। দয়ামায়ার রাজ্যে জাতিভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই। ইংরাজের দুঃখে বঙ্গ মহিলার প্রাণ কাঁদে, এবং ভারতবাসীর হাহাকারে বিদেশীয় মহিলাকুলের প্রাণ কাঁদিয়া থাকে। ভারত-দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত ভারতমাতার কত শত অনাহারী সন্তানের ক্রন্দনরবে জগত পরিপূরিত হইল, প্রাণ কাঁদিল মার্কিণ সুতাদিগের—রুষ মহিলারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না—ইংরাজ ললনারা আকুল হইলেন। মহামারীতে শত কোটী লোকের প্রাণ নাশ হইতে লাগিল, শুশ্রূষা অভাবে কত নর নারী অকালে নিয়তির রাজ্যে চলিয়া গেল, ইংলণ্ডসুতা ভগ্নী বেশে ভারতে নামিলেন। জাতি, কুল, মান, বর্ণভেদ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া দয়াময়ী রোগীর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কৃপাময়ী ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন—রোগী শান্তি পাইল। বিশ্বের নারী একই উপকরণে গঠিত। রমণীর দয়া সীমাবদ্ধ নহে, যদি বিশ্বব্যাপিনী বলিয়া এই সংসারে কোন দ্রব্য থাকে তাহা হইলে তাহা স্ত্রী-

জাতির দয়া, মায়া, স্নেহ ও সহানুভূতি। বিখ্যাত পর্য্যটক লেইয়ার্ড মহোদয় বলেন যে "ডেনমার্কের অনুর্ব্বর ভূমি—নিরীহ সুইডেন রাজ্য—শীত এবং তুহিনাবৃত ল্যাপল্যাণ্ড দেশ—অসভ্য এবং কর্কশ ফিনল্যাণ্ড—সুবিস্তৃতা রুশিয়া এবং তাতার দেশের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যদি পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইত—যদি ক্ষুধায় মৃতবৎ হইয়া পড়িতাম তাহা হইলে মাতৃরূপিনী স্ত্রীজাতি আমাকে অন্ন ও জল দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিতেন। আমার সৌরতাপ-দগ্ধ মুখ দেখিয়া, আমার ভ্রমণের দারুন কষ্টপূর্ণ শরীর দেখিয়া তাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাকে শান্ত করিতেন। "ধন্য ভগবান! ধন্য তোমার কৃপা! এই মা-কে সৃজন না করিলে আমরা এত স্নেহ পাইতাম কোথা হইতে? রমণীর প্রাণে দয়া ও স্নেহ না থাকিলে মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের নাম আমরা শুনিতে পাইতাম না। মাতৃ সদৃশা তির্ব্বত রমণীরা তাঁহাকে আপনাপন স্নেহক্রোড়ে লুকাইয়া না রাখিলে রামমোহন পুনরায় স্বদেশে ফিরিতে পারিতেন না। ভগ্নী ডোরা, সারা স্মাণ্ড, কুমারী নাইটিংগেল, কুমারী গারট্রুড, মেরী লভেল পিকার্ড, কুমারী প্রে, বিশ্বের নরনারীসেবায় আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। নরসেবা তাঁহারা শুধু গৌরব বলিয়া মনে করিতেন না, নরসেবা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। ভগবানের নাম করিয়া তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিতে, পাপী তাপীর অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া ভগবানের পথে সাদরে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য—বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য—নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, অনাহারীকে, অন্ন পিপাসুকে বারি দিবার জন্য বিধাতা রমনীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্য বটে, গৃহে রমণী লক্ষ্মী-সদৃশ। সংসারে পরিবারকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালন করিতে, সন্তানকে লালন পালন করিতে, বার্দ্ধক্যে উপনীত, জরা জীর্ণ, শয্যা শায়িত, দুঃখ ক্লিষ্ট পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে, ভাই ভগ্নীর তত্ত্বাবধান করিতে, ভৃত্য, অনুগতজনকে আদর ও যত্নে তুষ্ট করিতে, আত্মীয় ও অতিথীর সৎকার করিতে, সদা মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় রমণী সংসারে দয়া বিরাজমান। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের স্নেহ, প্রীতি ও সহানুভূতি কেবল পরিবারে আবদ্ধ নহে। মার্কিণের দুঃখে বঙ্গ রমণী কাঁদিতে জানে। গারট্রুডের মৃত্যুতে বঙ্গ ললনা কাঁদিয়া ছিল। ফাদার ডামিয়েনের মৃত্যুতে ভারতসুতারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দুঃখে "আহা" বলিতে, প্রাণ ভরিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, হিন্দু মহিলারা বেশ জানেন। তাঁহাদের প্রাণে দয়া, মায়া, কোমলতা আছে। তবে যে তাঁহারা সাধারণে প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা কেবল লজ্জায় ও সমাজের ভয়ে। আমাদের দেশ এখনও এতদুর সমুন্নত হয়

নাই যে আমাদের মাতৃজাতি প্রকাশ্যে যাইয়া সকলের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন নারী সম্মান আজও আমাদের দেশের লোকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন নাই। অধিকন্তু স্ত্রীজাতির নিন্দা করিতে হইলে আমাদের দেশের পুরুষদিগের এক মুখের পরিবর্ত্তে পঞ্চ মুখের সৃষ্টি হয়। বিদ্বান, মূর্খ, এমন কি মহামাননীয় সংবাদ পত্র পরিচালকগণও তাহা লইয়া দেশ মাতাইয়া থাকেন। এইত আমাদের দেশের দশা।

ধরাতলে নারীজাতি প্রাণপণে বৃদ্ধ পিতা মাতা, ভাই ভগ্নীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন দেখিয়া নারীগণও প্রফুল্লিত হন। ভাই, ভারতবাসী আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকিও না, আর আর্য্য নামে কলঙ্কারোপ করিও না। ভাই, অনেক খেলা খেলিয়াছ, জীবনে ও চরিত্রে অনেক রকম দৃশ্য দেখাইয়াছ, ক্ষান্ত হও ভাই, নিন্দা কুৎসা ছাড়িয়া দাও, সমাজের পুনঃ সংস্কার কর। সভ্য জগতের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ, ভাই! ভাল মন্দ, আলো ও ছায়া সব সমাজে আছে। আমাদের দেশের বৈধব্য দশা বড়ই শোচনীয়।

শুভ্র পবিত্র বিধবার দিকে কেহই কুভাবে তাকাইতে পারেন না। বিধবাদিগের জীবন শূন্য, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও, তাঁহাদের চরিত্র গঠন কর, তাঁহাদিগকে দীন দুঃখীর সেবায় নিয়োজিত কর। ভাই, একবার দেশের পথ ঘাটের হতভাগাদিগের দিকে তাকাইয়া দেখ, যে দৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন শত কোটী সেইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইবে। ভারত মাতা রত্নপ্রসবিনী, এখনও মার অনেক আছে। ভাই তোমরা এদেশের রমণীকে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় স্বাধীনতা দিতে না চাও ক্ষতি নাই। দেশে ধনী অনেকেই আছেন, তাঁহারা সাহায্য করুন তোমরা গৃহ সংস্করণ কর, দরিদ্র সেবা আশ্রম প্রস্তুত কর। সেখানে বিধবাদিগকে প্রেরণ কর তাঁহারা সেই আশ্রমে অন্দরে পর্দ্দার ভিতর থাকিয়াও সেবা করিবেন, জননী হইয়া অনাথ সন্তানগণকে পালন করিবেন। ভাই আর ঘুমাইও না আর বৃথা আমোদে মত্ত হইয়া সময় ক্ষেপন করিও না। সংসার অনিত্য, নিত্য শুধু কীর্ত্তি। পুরাকালে আর্য্যেরা কত উদার কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রেম বিশ্বব্যাপী ছিল, তাই তাঁহাদের কীর্ত্তি আজও রহিয়াছে, তাই আর্য্যচরণে জগতবাসী আজও মস্তক অবনত করিয়া থাকেন।

ভাই, প্রেমেই প্রেমের জয়। রমণীকে সম্মান করিতে শিখ, তোমাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তোমাদের নিজের উন্নতি সাধন হইবে। তাঁহাকে পবিত্র চক্ষে দেখ, সর্ব্বত্র পবিত্রতা দেখিতে পাইবে। তাঁহাকে বিশ্বাস কর রমণী তোমাদের বিশ্বাসের ব্যভিচার করিতে কখনই সাহসী হইবেন না। নারীকে মাতৃভাবে দেখ, তোমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও গুরুর উপদেশ বাক্যমতে নিরীক্ষণ কর সংসার পবিত্রতাময় দেখিবে। আমাদের দোষেই আমাদের

দেশের আজ এই অবস্থা! তাই বলি আর বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিও না। আর জগৎমাতা জগদ্ধাত্রীর দুর্গতিনাশিনীরূপ চিন্তা করিয়া নারীর মুখ পানে তাকাও, দেখিতে পাইবে :—

সমুদয় নারীজাতি মাতা।

আরও বলি স্বদেশীয় নারীজাতিকে—তোমরা আমাদের মাতৃবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা আমাদিগকে রক্ষা কর। মাতৃরূপে, ভগ্নীরূপে, পত্নীরূপে ও কন্যারূপে আমাদিগের পাশে থাকিয়া অন্ধকার পথ হইতে আমাদিগকে জ্যোতি-র্ম্ময় পথে লইয়া যাও। সংসারে তোমরা মা হইয়া থাক, ভগ্নী হইয়া থাক। আমরা তোমাদের স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। তোমাদের পবিত্রতা ও শুভ্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্রতাময়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকি। (ক্রমশঃ)

দানবীর মহাত্মা ৺তারকনাথ পালিত

অনন্ত বিশ্বপাতা যে গুণে এই ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি প্রাণিবৃন্দকে পালন করিতে-ছেন, যাঁহার প্রভাবে জীবগণের জন্মমাত্র মাতৃবক্ষ হইতে স্তন্যামৃতধারা প্রস্রুত হয়,

যে গুণপ্রভাবে ক্ষুৎপ্রপীড়িত একটী প্রাণী স্বকবলোন্মুখ অন্ন অন্যের মুখে প্রদান করে, যাহাতে স্বার্থরূপ আমিষের গন্ধ পর্য্যন্তও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, সেই সত্ত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে নিয়ত উৎসারিত সাত্ত্বিকদান ; পুণ্যের একটী প্রধান অঙ্গ। অগ্নিহোত্র ব্যতিরেকে যদ্রূপ বৈদিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না, তদ্রূপ এই সাত্ত্বিকদান ব্যতীত পুণ্য কর্ম্ম কখনও সম্ভবপর নহে। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া করুণার্দ্রচেতা তারক নাথ পালিত মহাশয়ের হৃদয় যথার্থই দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল, এবং সেই কারণেই তিনি ভারতবাসীদিগের জন্য সর্ব্বতোভাবে ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত একটী উচ্চতর-বিজ্ঞান বিদ্যালয় স্থাপন কল্পে গত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের হস্তে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা ন্যস্ত করেন। এই প্রভূত বিত্তের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য তাঁহার পুত্রাদির অভাব ছিল না, এবং তিনি বহু ক্রোরপতিও ছিলেন না যে এই ধন দান করিয়া পুনরায় তাঁহার পুত্রদিগকে অন্য ধন দিবেন, কারণ উহাই তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি ছিল। তথাপি তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম, তাঁহাকে এই বিত্ত তাঁহার পুত্রদিগকে প্রদান করিতে দেয় নাই। ইহা একবার স্মরণ করিলে, তাঁহার নিগূঢ় স্বদেশপ্রেম দর্শন করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসী মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। যে দেশে সমৃদ্ধিসম্পন্ন অসংখ্য নরনারী তাঁহাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য স্বদেশহিতৈষণায় দান করা অপেক্ষা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকেই তাহার উত্তরাধিকারী করা শ্রেয়োজ্ঞান করেন, সেই হতভাগ্য দেশের অজ্ঞানঘনঘটাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে পালিত মহাশয়ের এই উদাহরণ, উজ্জ্বল তারকার ন্যায় চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে এবং দিশাহারা পথিকদিগের ন্যায় ভাবী সন্তানগণকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিবে। তাঁহার এই সাত্ত্বিক দান জনিত পুণ্যে তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তি ও মুক্তিফল লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। সেই জন্য অদ্য তাঁহার সমগ্রদেশবাসী তাঁহাকে "ধন্য, ধন্য, তুমিই ধন্য" এই সাধুবাদ প্রদান করিতেছে।

মাননীয় তারকনাথ পালিত মহাশয় যে, এই দান দ্বারাই তাঁহার স্বদেশবাসীগণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি তাঁহার স্বদেশ প্রীতি ও উদারচিত্ততা দর্শন করাইয়া বঙ্গবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা সমিতি (National Council of Education) কে তাঁহার বাটী ও উক্ত দান হইতে বঞ্চিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ঐ অর্থ সমর্পণকালে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু তিন চির দিনই

স্বাধীনচেতা ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি গভীর চিন্তাদ্বারা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার স্বদেশের যে মহৎ কল্যাণ সাধন করিতে প্রয়াসী, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির তৎসাধন সুদূর-পরাহত। এই জন্যই তিনি স্বদেশ-বাসির আশু কল্যাণের নিমিত্ত ঐ প্রভূত ধনরাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষা-সমিতিকে উক্ত অর্থ প্রদান করিলে, তিনি যে স্বদেশ-বাসীদিগের নিকট অধিক প্রিয় ও দাতা বলিয়া পূজিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্বারা তাঁহার মহদুদ্দেশ্য শীঘ্র সাধিত হইত কি না সন্দেহ। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই, "কোন্ কার্য্যটী আমার পক্ষে উত্তম," "কোন কার্য্যটী আমার সুখসাধ্য," অথবা "কোন্ কার্য্য সাধারণের অনুমোদিত" কিম্বা "কোন্ কার্য্যটী আমার পক্ষে লাভজনক" ইত্যাদি চিন্তা-তেই সর্ব্বদাই ব্যস্ত ; তাহারা প্রায় কেহই "কোন্ কার্য্যটী আমার ন্যায়সঙ্গত," তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না। তারকনাথ কিন্তু তাহাই ভাবিয়াছিলেন, তিনি চাহিয়াছিলেন, "ন্যায় আমাকে কোন্ পথে যাইতে বলে ?", ন্যায় যে পথ তাঁহাকে দেখাইয়াছিল, তিনি সেই পথেই গমন [illegible] দান [illegible] কিন্তু দেশ, কাল, আপন[illegible]রপূর্ব্বক দান[illegible]শ্রেষ্ঠ।

সেই [illegible] মৃত্যুর পর শ্রীমতী আনি বেসান্ত (Annie Besant) [illegible]হার বিষয়ে [illegible] মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। তিনি "New India" নামক পত্রে লিখিয়াছেন :—

"Sir T. N. Palit has passed away after a long illness. His antagonism to religion made him quarrel with the best members of the National Council of Education and made him withdraw his lakhs from it, crippling its activities and depriving it of its houseroom. He transferred his money to the Government, and the gift was rewarded by a title, but the act cost him the respect and gratitude of the lovers of India. His bitterness against religion was surprising, and the "Godlessness" of the Government was its great attraction to him. It was strange he should have been born into a religious nation ; perhaps he was superstitious in his last incarnation, and in the next one will return to religion. "A little knowledge inclineth a man to atheism, but increase of it bringeth him back to religion."

মহাত্মা তারকনাথ পালিত মহাশয়, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে, ২৫শে অক্টোবর তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ শুনা যায় যে তাঁহার পিতা দানশীলতার জন্য

সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন এবং পরহিতে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তারকনাথ প্রথমতঃ Hare Schoolএ শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আইন অধ্যয়নার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। তথা হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ওকালতী (Barrister কার্য্য) করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। পিতার ন্যায় তিনিও যে দানশীল ছিলেন তাহা আমরা স্পষ্ট দর্শন করিয়াছি। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্টভাবে জানিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে পালিত মহাশয়ের চিত্ত সর্ব্বদাই কিরূপ গভীর করুণায় আর্দ্র থাকিত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যভঙ্গ-হেতু তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মে মাস হইতে তিনি কঠিন হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু এ সকল কিছুই তাঁহার সেই প্রফুল্ল ভাবকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যাকালে মেলা ফুরাইলে, খেলা ভাঙ্গিলে, যদ্রূপ সন্তানের মন তাহার বাড়ী পানে ধাবিত হয়, তখন যেমন তাহার জননীর ক্রোড় ভিন্ন আর কিছুই তার ভাল লাগে না, তদ্রূপ এই মহাত্মা, তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার যেন আর কিছুই ভাল লাগিতেছিলনা তিনি ক্রমাগত হৃদয়বিদারক আকুলতার সহিত বলিতেন "বাড়ী যাব,—আমি যে বাড়ী হতে এসেছি সেই বাড়ী যাব। এ আমার বাড়ী নয়, আমি বাড়ী যাব—বাড়ী যাব, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।" অবশেষে গত ৩রা অক্টোবর, শনিবার প্রাতে প্রায় ৯॥০ সাড়ে নয়টার সময় ভবমেলার খেলা সব সাঙ্গ করিয়া তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এই পূজাবকাশে দেশাগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিশ্রামার্থ অন্যত্র অবস্থান করায় তাঁহার শেষমুহূর্ত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি তাহার দেশবাসিগণ তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহার স্বর্গারোহণ-বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে ৩৷০ ঘটিকার সময় ৮০ জন ছাত্র শুভ্রবাস পরিধান করিয়া নগ্নপদে শবাধার কালীঘাটে লইয়া যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু লোক কালীঘাটের শ্মশানভূমিতে পুষ্পাদি লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। অবশেষে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে ৺ মহাত্মার কোনও আত্মীয় পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাকারীদিগকে কোনও সংবাদ প্রদান না করিয়া Motor carএ তাঁহাকে নিমতলার ঘাটে লইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত [illegible] এবং বান্ধবৃন্দ ৺ মহাত্মার [illegible] করিয়া তথায় তাঁহাকে না পাই[illegible] নাই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। [illegible] আমি জানিথা আমাকে লে, আমি তখন দ্রুতপদে নিমতলায় গমন করিয়াই দেখিলেন যে [illegible]রূপ অবন্দোবস্ত সত্বেও তথায় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ নী[illegible] রতন সরকার প্রভৃতি দেশের বিদ্বান ব্যক্তি

গণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পালিত মহাশয়ের চিতা পুষ্প মাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল এবং সর্ব্বোপরি শুভ্রপুষ্পে নির্ম্মিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ও coat of arms সম্বলিত একটী মাল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের vice-chancellor শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর প্রতিনিধিরূপে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক "সংসারলীলাং পরিত্যজ্য দূরে ক্রোড়ে দ্রুতং গচ্ছ জগজ্জনন্যাঃ" এই কথা বলিতে বলিতে স্থাপিত হয়। অতঃপর সকলের অভিবাদনান্তে ফটো লওয়া হয় তাহার পর প্রচলিত হিন্দু বিধানানুসারে দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।

মানবের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রায়ই মানব-চক্ষুর অন্তরালে থাকে। আমরা যাহাকে মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করি, বিশ্ববিধাতার চক্ষুতে হয়ত তাহা কত ক্ষুদ্র, এবং যাহা অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া আমাদিগের দৃষ্টি সম্মুখ দিয়া অন্তরালে চলিয়া যায়, তাহাই প্রকৃত মহত্ত্ব। তারকনাথ একজন প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। আজীবন তিনি তেজস্বী, নির্ভীক, সত্যপরায়ণ, স্বদেশহিতৈষী, করুণার্দ্রচেতা ও উদার-হৃদয় ছিলেন। ভগবান তাঁহার পবিত্র আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যান এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্ত্রী ও পুত্র কন্যা-দিগকে শান্তি প্রদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ৺ মহাত্মা তারকনাথ পালিত যিনি বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট মিষ্টার টি, পালিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে আমরা আজ আর কি বলিব? আমরা বলি —

"যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি
দুঃখ আঁধার যথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে
কেবলি আনন্দ স্রোত চলিছে প্রবাহি।
যাওরে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য কিরণে,
যথা "দানব্রত", সত্যব্রত পুণ্যবান,
যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে॥

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

পুজার আমোদ।

চারিজনে

একজন কোন বাঙ্গালী বাবু হিন্দী উন্মত্ত কথা কহিতে ভাল বাসেন। তাঁহা[র] দ্বারবান বা দাস দাসীর নিকট [ই]হিন্দীর কিছু বাড়াবাড়ী হইয়া থাকে। [দি]ন বাবু আপনার বাঙ্গালী চাকরকে কহিলেন,— "ধোবি কো ঘরছে হামারা কাপড়া জল্দি লে আও।" চাকর বুঝিল, বাবু ধোপার বাড়ীর কাপড় না কাচিয়া স্পর্শ করিবেন না, উহা জল দিয়া কাচিয়া আনিতে বলিলেন। চাকর ধোপার বাড়ী হইতে বাসি ধোপের ইস্ত্রী করা কাপড়

গুলি লইয়া একটা ঘোলা জলের পুকুরে ফেলিল এবং কিয়ংক্ষণ পরে এক বোঝা ভিজা কাপড় বাবুজীর সম্মুখে দাখিল করিল। বাবু বস্ত্রগুলির দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন এবং ভৃত্যকে দণ্ড দিবার জন্য অন্য ভৃত্যকে চাবুক আনিবার আদেশ দিলেন। চাবুক আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অপরাধী ভৃত্য করযোড়ে কহিল,—

"হুজুর, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, যতক্ষণ চাবুক না আসে, ততক্ষণ কেন আমার কান মলিতে আরম্ভ করুন না,—সময়টা বৃথা যায় কেন? বাবুজী হাসিয়া তাহাকে বিনা দণ্ডেই বিদায় দিলেন।

২। হুগলী রেলষ্টেশনের নিকট অনেকগুলি দোকান ও চটি আছে। ঐ সকল দোকান ও চটিতে প্রতি দিনই ভিন্ন ভিন্ন জেলার বহুতর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। একদা বর্দ্ধমান জেলার এক জন লোক, "বর্দ্ধমান অঞ্চলের জল উৎকৃষ্ট,—জলের গুণে যা খাও, তাই হজম হইয়া যায়,—"ইত্যাদি প্রকার গল্প করিতেছিল। সেই গল্প শুনিয়া চব্বিশ পরগণার কোন ব্যক্তি কহিল,—'রেখে দাও তোমার বর্দ্ধমান,—এই হুগলীর আড়পার হাজিসহর গ্রাম আছে, জানকি? সেখানকার জলে ঘটী পর্য্যন্ত হজম হয়ে যায়।" ঘটী হজমের কথা শুনিয়া সকলেই কহিল; "সে কিরূপ বাবু?"

"আমি এক দিন জল খাইবার জন্য হাজিসহরের একটা কুয়ায় ঘটী নামাইয়াছিলাম। ক্ষণকাল পরে রসি তুলিলাম। শুধু ফাঁসটা উঠিল—ঘটীটা কুয়ার জলে হজম হইয়া গেল। আমার কপাল ভাল, তাই সেদিন রক্ষা পাইয়াছি, নচেৎ সে জল খাইলে আমি শুদ্ধ হজম হইয়া যাইতাম।"

৩। এ দেশের শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগুলি প্রায়ই সরল ও আশু বিশ্বাসী। কোন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শান্তিপুরের পার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন। তীরভূমিতে বস্ত্রাদির গাঁটরিটী রাখিয়াছিলেন। একটী ৬।৭ বৎসরের বালক আসিয়া সেই গাঁটরিটী তুলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে কহিল,—

"মেসো মশায় আপনি স্নান করিয়াই আমাদের বাড়ী আসুন। ঐ দেখুন, গাছ তলায় আমার মা আপনার অপেক্ষা দাঁড়াইয়া আছেন।" ঠাকুর মহাশয় বালকের নির্দ্দেশ মতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই তীরে তরুতলে এক পরমা সুন্দরী যুবতী তাঁহার প্রতি দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না, ভাবিলেন,—

"তাইত, আমার এমন সুন্দরী শালি এখানে আছেন, তাহা পর্য্যন্ত আমি জানিতাম না, আমার ব্রাহ্মণীর একথা আমাকে বলা উচিত ছিল, তাহা হইলে আমি পূর্ব্বেই উহার বাটি যাইতাম। যাহাই হউক, আজ উহাকে বিশেষ রূপেই আপ্যায়িত করিতে হইবে।"

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গাঁটরি রক্ষ

বিষয়ে তিনি নিরুদ্বেগ হইলেন। পূর্ব্বে গাঁটরিরপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্নান করিতে বড়ই অসুবিধা বোধ হইতেছিল, এখন পরমাত্মীয়া কুটাম্বিনীর কৃপায় সে অসুবিধা দূর হইল। নিশ্চিন্ত ভাবে স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া তীরে উঠিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব দৃষ্ট তরুতলে শ্যালিকাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, "জনতাপূর্ণ ঘাটের পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্যালিকা অবশ্যই অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছেন। এক এক পদ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন,কিন্তু শ্যালিকা বা তৎপুত্র কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন ভাবনা হইল, গাঁটরির মধ্যে গরদের ধুতি চাদর এবং ২।৪ টাকা নগদও ছিল। তাঁহার পরিধান আর্দ্র বস্ত্র, স্কন্ধে জলবাস মাত্র সম্বল। তিনি বৎসহারা গাভীর ন্যায় শান্তিপুরের পথে পথে শ্যালিকার সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। পথে যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন,—

"ওগো, তোমরা কেহ বলিতে পার আমি কার মেসো?"

৪। কোন বাঙ্গালী বাবুর বৈটকখানায় চারিজনে গ্রাবু খেলিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন গ্রাবু খেলোয়াড় খেলার আমোদে উন্মত্তবৎ। এমন সময়ে কাশিতে কাশিতে তাঁহার নিষ্ঠীবনত্যাগের প্রয়োজন উপস্থিত হইল। সজোরে ফেলিবার জন্য তাস হাতে লইয়াই জানলার নিকটে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাস খানি বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাসের আসরের ঠিক মধ্যস্থলে গয়ের নিঃক্ষেপ করিলেন। খেলোয়াড় বটে!

আর একজন খেলোয়াড় খেলিতে খেলিতে জননীর মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিরূপে মায়ের মৃত্যু হইল?"

উত্তর পাইলেন—"সর্পাঘাতে।" তখন খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সাপ? "উত্তর হইল গোখুরা। খেলোয়াড় বলিলেন কাবের সাপ? কাদের সাপ? বলিতে বলিতে খেলায় মাতিলেন।

একজন ভদ্রবংশীয় মাতাল গ্রাম্য দেবতাকে প্রণাম করিয়া বর মাগিতেছিলেন—"মা আমাকে হাতী কর। আর মদ খাইয়া লুকোচুরি করিতে পারি না। হাতী হইলে মদ খাইয়া গোপনে পড়িয়া থাকিব।" উপরিউক্ত খেলোয়াড় গণ এই হাতীত্ব পাইয়াছিলেন।

৫। একজন কৃষক কোন মোকদ্দমায় এডিসনাল জজের নিকট সাক্ষ্য দিতেছিল। এই সাক্ষ্যের মধ্যে "জোতান গরু" এই শব্দের উল্লেখ করে। হাকিম্ ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জোতান গরু" কাহাকে বলে? সাক্ষী কহিল,—

"ধর্ম্মাবতার, জজসাহেবের যেমন তুমি, আমাদের জোতান গরুও সেইরূপ।"

৬। এক ব্রাহ্মণ কোন গ্রামের প্রান্ত স্থিত দোকানে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে তাঁহার রাত্রি যাপন করিবার ইচ্ছা।

দোকানে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ওহে বাপু, তোমাদের এই গ্রামে মশা কেমন?" উপবিষ্ট ব্যক্তি সাতিশয় বিনয় সহকারে কহিল,—

"মহাশয়, আমাদের গ্রামের মশাগুলি কৃষ্ণবর্ণ, ষট্পদ ও শুণ্ডধারী।"

"তুমি মশার যে প্রকার রূপ বর্ণনা করিলে, আমি কি তা জানি না? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, মশা লাগে কেমন?"

"মহাশয়, আমিত মশা কখন খাই নাই,—কেমন লাগে কিরূপে বলিব?

"আরে মলো বেটা ছোট লোক,—বলি মশার উৎপাত কেমন?"

"মশাতে কাহারও বাড়ী চুরী ডাকাইতি করিয়াছে, কি কাহারও ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে, কি কাহারও স্ত্রী পরিবারের অবমাননা করিয়াছে, আমি কখনও মশার এরূপ উৎপাতের সম্বাদ শুনি নাই।"

বাঙ্গালের কথায় ব্রাহ্মণ বড়ই বিরক্ত হইলেন, ক্রোধে তাঁহার অন্তর গরগর করিতে লাগিল। কিন্তু আর কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কোনরূপে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে স্থানান্তরে গমনে উদ্যত হইয়া একটি খালের ধারে উপনীত হইলেন। খালটি হাঁটিয়া পার হইতে হইবে। কিন্তু কোন্ খানে কত জল তাহা তিনি জানেন না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইল। দেখিলেন, একটা লোক খালের ধারে বসিয়া মৃত্তিকা সৌচ করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাপুহে, এখানের জলে কি কাপড় ভিজিবে? পৃষ্ট ব্যক্তি কহিল,

"আজ্ঞে হাঁ! কাপড় কেন? লেপ, কাঁথা, কম্বল, সতরঞ্জ, যাহা ফেলিবেন, তাহাই ভিজিবে।"

ব্রাহ্মণ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ওহে আমি ওরূপ ভাবের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, বলি, এই খানে জল কত?",

মহাশয়, আমিত খালের জল কখনো মাপিয়া দেখি নাই তা কেমন করিয়া বলিব যে খালে জল কত?

"ওরে, তুই সেই কালকের নচ্ছার ব্যাটা বটে?

"আজ্ঞে মহাশয়।"

এখানে "মহাশয়" শব্দের সহিত ও পূর্ব্ব বাক্যের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে।

কুমারীরতন।

১

গুণবতী বিদ্যাবতী যাঁর কন্যা হন,
সে গৃহীর অলঙ্কার কুমারী রতন।
কত শোভা সে হৃদয়ে বর্ণিতে কে পারে

স্বাধীনতা পবিত্রতা মিলে একধারে।
স্বর্গের অপূর্ব্ব জ্যোতি করে বিকিরণ,
কুসুম সদৃশ প্রাণ ফুটন্ত জীবন।
হেরিলে জুড়ায় আঁখি পরিতৃপ্ত প্রাণ,
কে আছে জগতে বল কুমারী সমান।

২

আহা মরি কি মাধুরী খেলে সে অধরে ?
স্বর্গের অমিয়বাণী ঝরে ঝরে পড়ে।
দাস দাসী পরিজন সবে তুষ্ট হয়,
করুণায় মূর্ত্তিমতী কুমারী হৃদয়।
পড়েনি পাপের কালি সদা হাসা মুখী,
সবারে সে ভালবেসে কত হয় সুখী।
বিধাতার একি সৃষ্টি বড় চমৎকার,
সরলতা হৃদয়ের স্বরূপ যাহার।

৩

গুরুজনে সেবা করে কায়মন প্রাণে,
পর বলে সে কুমারী কারে নাহি জানে।
দীন দুঃখী কাঙ্গালের মুছাতে নয়ন,
সদাই হয়গো তার আকুলিত মন।
প্রাণসম ভাই বোনে কত স্নেহ প্রীতি,
মধুময় সে জীবন মেনে ধর্ম্মনীতি।
মাতার স্নেহের ছায়ে বিকশিত হয়,
পদ্ম সে মৃণালে বাঁধা কভু ছাড়া নয়।

৪

সে গৃহের আস্‌বাব্ কিবা পরিপাটি,
সুন্দর কাঁসার পাত্র মাজা ঘটি বাটি।
বিচিত্র শোভন চিত্র যা দেখিবে ঘরে,
বাঁধান পুস্তকগুলি ঝক্‌মক্ করে।
নিজ হাতে সে কুমারী করে কত কাজ,
তাহাতে নাহিক তার একটু ও লাজ।
কিবা শান্ত শীলা বালা বিনয়েতে নত,
ইচ্ছা হয় মরে পুনঃ হই তার মত।

৫

কিবা তার মতি গতি মধুর জীবন,
বৃথা সে যে বাক্যালাপ করে না কখন।
সদ্‌গ্রন্থ শাস্ত্রপাঠ করে নিয়মিত,
কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা করে সমুচিত।
সরল ব্যাকুল প্রাণ ধর্ম্মের কারণ,
হৃদয়ে পরম নিধি করে অন্বেষণ ;
কি সুরে বাঁধিয়া লয় হৃদয়ের বীণা,
সঙ্গীতে উঠেগো তার স্নিগ্ধ মাধুরীমা।

৬

বিধাতার হাতে গড়া এ হেন জীবন,
তাহাতে করোনা লোভ পাষণ্ড যেজন।
নারীর হৃদয় তন্ত্রী লয়ে নিজ করে,
চতুর বাদক বিনা কে বাজাতে পারে ?
ধন্য সেই নরশ্রেষ্ঠ প্রেমিক সুজন
রাখিতে নারীর মান ব্যস্ত অনুক্ষণ।
নাহি প্রেম প্রতিদান করে অকারণ,
নারী যদি পতি বলে না করে বরণ।

বামারচনা।

বামাবোধিনীর জন্ম দিনের প্রীতি উপহার।

গাঁথি বন ফুলে মালা,
এনেছি ভরিয়ে ডালা
ভগিনী ! পরাতে আজি গলেতে তোমার।
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে,

আজি তব জন্ম দিনে
লহ ভগিনীর এই প্রীতি উপহার।
রমণীর বন্ধু তুমি,
অভাগা এ বঙ্গ ভূমি
এ দেশে রমণীগণ চির পরাধিনী।
তুমি তাহাদের তরে,
নিজ প্রাণ পণ ক'রে
অবহেলে খাটিতেছ দিবস যামিনী।
তুমিই তাদের প্রাণে,
জ্ঞানের আলোক দানে
সাধিতেছ তাহাদের এ শুভ সাধনা।
পরার্থে আপনা হারা
কে আছে তোমার পারা ?
নারীর মঙ্গল সুধু তোমার কামনা।
ভগিনীর দান ব'লে,
ধর ভগ্নি ! পর গলে
যতনে গেঁথেছি এই বনফুল হার।
বিভু আশীর্ব্বাদ লয়ে,
এমনি নিঃস্বার্থ হয়ে
থাক ভগ্নী ! চির দিন সংসার মাঝার।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

---

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 615. November 1914

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৫ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩২১। নভেম্বর, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

শ্যামদেশীয় স্ত্রীলোক।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশস্থিত পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অন্তর্গত একটী দেশ শ্যামদেশ নামে অভিহিত। শ্যাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। এই দেশের লোকগুলি অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অপর দেশবাসীরা ইহাকে শ্যামদেশ বলে। ঐ দেশের লোকেরা আপনাদিগকে "থাই" বলে। থাই শব্দের অর্থ স্বাধীন।

এই দেশের সকলেই ঠিক কৃষ্ণবর্ণ নহে, অনেকে গৌরবর্ণ। ইহাদের কেশ কটা না হইয়া কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুও কৃষ্ণবর্ণ, দাঁতে মিশি দেয় বলিয়া দাঁত ও কৃষ্ণ বর্ণ। সুতরাং ইহাদের বর্ণ ঠিক কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও কেশ ও চক্ষু স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া এবং দন্তও কৃত্রিম উপায়ে অনেকে কৃষ্ণবর্ণ করে বলিয়া বোধ হয় বিদেশীয়গণ এই দেশকে শ্যাম দেশ বলে।

এই দেশে অনেক চীন ও ব্রহ্মদেশীয় লোকও বাস করে। কিন্তু থৈ বা থাই এ রাজ্যের প্রকৃত অধিবাসী। এই দেশে কাটা কাপড়ের ব্যবহার কম। এদেশবাসীরা আমাদের দেশের লোকদের ন্যায় ধু'তি পরে ও গলায় চাদর দেয়। অবস্থানুসারে অনেকে রেশমী কাপড়ও পরিয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই চক্ষুতে অঞ্জন দিত, এক্ষণে কেবল বাঙ্গালা দেশে ছোট ছোট শিশুদিগের চক্ষুতে অঞ্জন দেওয়া হয়। অবশ্য বঙ্গ প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন কোন প্রদেশবিশেষে এখনও সকলেরই অঞ্জন দেওয়ার কিছু কিছু রীতি আছে, কিন্তু শ্যাম দেশে প্রত্যেক স্ত্রীলোক ভ্রূতে অঞ্জন দিয়া থাকে। এখানকার (শ্যামের) মহিলারা আমাদের দেশের মহিলাদিগের ন্যায় ভূষণপ্রিয়। হস্তে বলয়ের ন্যায় ও পায়ে খাড়ুয়ার ন্যায় মোটা ও

ভারি অলঙ্কার পরে। গলায় যে গহনা পরে তাহা দেখিতে কোন কোনটা আমাদের দেশের হারের মত, কোন কোনটা বা তাবিচ সমষ্টির মত। এ দেশের স্ত্রী লোকদিগের ন্যায় শ্যাম দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মাথায় বড় চুল রাখা ভাল বাসেন। ওখানকার পুরুষেরা মাথার সমস্ত চুল কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীলোকেরা মাথা মুড়াইয়া ফেলে না বটে, কিন্তু চুল খাট করিয়া কাটে। এই খাট চুলদ্বারা যেরূপ হইতে পারে সেইরূপ ভাবে তাহারা মাথায় একটা খোপা বাঁধে।

এই দেশের স্ত্রীলোকেরা বেশ শ্রমশীল। যে সকল চাষীলোকে মাঠে কাজ করে, তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সহিত কাজ করে। যে পুরুষের যে জাতীয় ব্যবসায়, তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের সেই কার্য্যের সহায়তা করে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে শ্যামদেশের বিবরণ পাঠে বোধ হয় শ্যামদেশে স্ত্রী লোকেরা শ্রমরতা, কিন্তু পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত অলস। অনেক পুরুষ আমোদ প্রমোদে দিন কাটায়। কেহ ঘুড়ি উড়ায়, কেহ মাছ ধরে, কেহ বা মাছের খেলা দেখে। সেই দেশে এইরূপ আরও অনেক বিধ আমোদ আছে।

এই দেশের লোকেরা বেশ সভ্য, বিনয়ী ও সদয় কিন্তু নির্ব্বিবোধ। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরই আদব কায়দা খুব ভাল। যাহার প্রতি যেরূপ সম্মান দেখাইতে হয়, তাহার প্রতি তাহাই সকলে দেখাইয়া থাকে। যেরূপ কথায় লোকে কষ্ট পাইতে পারে তাহারা সেরূপ কথা কখনও বলে না। তাহারা বয়োবৃদ্ধ পুরুষদিগকে পিতার ন্যায় ও বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে মাতার ন্যায় সম্মান করে। বয়ঃকনিষ্ঠ স্ত্রী-পুরুষকে তাহারা কন্যাপুত্রের ন্যায় স্নেহ করে। কেহ কাহারও নিকটে কোন অপরাধ করিলে পরক্ষণেই আত্মদোষ বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। একের বিপদ দেখিলে অপরে সাধ্যমত তাহার উপকার করে। এদেশে বিবাদ বিসম্বাদের সংখ্যা অতি অল্প। অনেক পুরুষ ও অনেক স্ত্রীলোক এক পরিবারের মধ্যে বাস করে, অথচ ইহাদের মধ্যে কলহ নাই।

ইহাদের মধ্যে পুরুষেরা একের অধিক বিবাহ করে না। কিন্তু ধনী লোকদের মধ্যে অনেকে অনেকগুলি করিয়া সেবিকা বা দাসী রাখে। ঐ সকল সেবিকারা বাস্তবিক পক্ষে ভার্য্যা হইলেও বিবাহিতা স্ত্রী হইতে আদরণীয়া নহে বলিয়া বোধ হয়। ইহারা বাঁদী বা সেবিকা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পনর হইতে সতের বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে প্রায় ঐ জাতীয় বালিকাদের বিবাহ হয়। ক্বচিৎ কোন কোন প্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে, আমাদের দেশের প্রাচীন কালে প্রচলিত গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহিতা হইতে দেখা যায়। অনেক পুরুষকেই পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। যাহারা পণ দিয়া বিবাহ করে, তাহারা ইচ্ছা করিলে আবার স্ত্রী ত্যাগও করিতে পারে। কিন্তু যে

রমণী পিত্রালয় হইতে ভূষণ, যৌতুক ও নগদ টাকা লইয়া আইসে. স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাকে ত্যাগ বা বিক্রয় করিতে পারে না।

আমাদের দেশে যেমন বর কন্যার রাশি নক্ষত্র ও গণ প্রভৃতি মিলিয়া গেলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা হয়, সেইরূপ শ্যামদেশে কন্যার ও বরের জন্ম বৎসরানুসারে তুলনা করিয়া শুভাশুভ বিচার করা হয়। গণক ঐরূপ শুভাশুভ বিচার করিয়া যে বৎসরে জাত কন্যার সহিত যে বৎসরে জাত বরের বিবাহে দোষ নাই বলিয়া দেন সেই বর কন্যারই বিবাহ হইয়া থাকে। পরে জ্যোতির্ব্বিদ আবার বিবাহের শুভলগ্ন স্থির করিয়া দেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যা বরের বাড়ীতে গেলে, পুরোহিত ধর্ম্মপুস্তক হইতে কতিপয় মন্ত্র পাঠ করিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। কন্যা যব নিকার আড়ালে থাকে এবং সেই অবস্থায় ঐরূপ আশীর্ব্বাদ করা হয়। পরে পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়া হইলে অন্য লোকে তাহা দের উপর মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চন করে। তৎপরে পুরোহিত আবার মন্ত্র পাঠ করেন। এইরূপে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে, আরও দুই দিন ক্রমাগত উৎসব ব্যাপার চলিতে থাকে।

বিবাহ হইয়া গেলে যত দিন প্রথম পুত্রের জন্ম না হয়, ততদিন বর তাহার শ্বশুরালয়ে থাকে। আমাদের দেশে যে রূপ সূতিকা গৃহে সন্তান জন্মে শ্যামদেশেও ঐরূপ ভাবে পৃথক সূতিকা গৃহে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। ঐ গৃহে আগুণ জ্বালিয়া রাখিতে হয় এবং প্রসূতিকে কিছু দিন ঐ ঘরে থাকিতে হয়।

শ্যাম দেশের শিশুদিগকে এক প্রকার দোলায় করিয়া কখন কখন খেলা করান ও ঘুম পাড়ান হইয়া থাকে। ঐ দোলনা দেখিতে কতকটা টুকরির মত। ঐ দোলনা দড়ি দিয়া ঘরের আড়কাটে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ছেলেকে ঐরূপ ঝুলাইয়া রাখিয়া মাতা অনেক গৃহকর্ম্ম ও প্রয়োজনীয় কার্য্য সারিয়া লয়।

বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বয়স হইলে পুরোহিতদিগের নিকটে শিক্ষার্থে পাঠান হয়। শ্যামদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে এবং সেই দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিতগণ ছাত্র দিগকে প্রধানতঃ ধর্ম্ম শিক্ষাই দিয়া থাকেন। উক্ত পুরোহিতদিগের বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের যাওয়ার ও শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম নাই। বহু বৎসর হইল শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক নগরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আরও অনেক স্থলে বালিকাবিদ্যালয় হইয়াছে এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম।

তাসের ঘর।

সন্ধ্যার পরে আমি আমার ঘরটীতে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, পার্শ্বে আমার পঞ্চম-বর্ষ-বয়স্কা দৌহিত্রী বীণা কতকগুলি তাস লইয়া আপন মনে খেলা করিতেছে। আমি এক এক বার তাহার খেলা দেখিতেছি আবার অন্য মনে কি ভাবিতেছি। আকাশের অবস্থা সেদিন ভাল ছিল না। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল এবং বাতাসও একটু জোরে বহিতেছিল। বহির্জগতের এই অস্বচ্ছন্দতার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক্, আমার শরীরটা সে দিন বড় ভাল ছিল না। এক পার্শ্বে একটা কেরাসিনের আলো সমুজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে, সম্মুখে অমর-কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য রহিয়াছে, কিন্তু আমার তখন পুস্তক-পাঠে মন ছিল না, আমি তখন কি ভাবিতেছিলাম কে জানে?

বীণা খেলা করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার দু'খানি হাত আকর্ষণ করিয়া আব্দারের স্বরে বলিল, "দিদি মা আমার তাসের ঘর ক'রে দাও।" রাজ্যেশ্বরের আদেশ পালন করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিলে, তাহাতেও মুক্তির সম্ভাবনা আছে, এবং সময় চাহিলেও পাওয়া যায়, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র রাজ্ঞী আমাকে একটুও সময় দিলেন না। কাজেই আমি চিন্তা-সূত্র ছিন্ন করিয়া, তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান হইলাম। আমি নিরতিশয় গাম্ভীর্য্য এবং অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাসের কেল্লা প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেলাম।

সার আইজাক নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আবিষ্কারের সময় বোধ হয় এতদূর মনোযোগী হন নাই। কলম্বস নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের জন্য এমন উদ্যোগী হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

যা' হউক অনেকক্ষণ ধরিয়া, অনেক কারি-কুরি করিয়া, সুন্দর তাসের ঘর প্রস্তুত করিলাম। বীণা ঘর দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল, ছোট ছোট হাত দুখানিতে তালি দিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। হরি! হরি! তাহার সেই আনন্দ-ধ্বনি না থামিতে,—কচি মুখের হাসি টুকু না মিলাইতে তাহার সেই সাধের ঘর ঝুপ করিয়া পড়িয়া গেল, বুঝি হাত তালি দিতে দিতে কেমন করিয়া একটু আঘাত সেই ঘরে লাগিয়াছিল। ক্ষীণ-প্রাণ কেল্লা, সেই কচি হাতের কোমল আঘাতটুকুও সহ্য করিতে পারিল না, তাহার দুর্ব্বল দেহ লইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমি-সাৎ হইল। বীণা নিতান্ত বিষণ্ন ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "ঘর ভেঙ্গে গেছে, তা'র জন্য দুঃখ কি? আমি আবার এখনি ঘর করে দিতেছি।"

আবার তাসের কেল্লা প্রস্তুত হইল, বীণার বিষণ্ন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু হায় দুর্দ্দৈব! উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া

হঠাৎ এক ঝট্‌কা বাতাস আসিয়া বীণার ঘর আবার ফেলিয়া দিয়া গেল। শিশু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। বীণা আমার বুকের ভিতর ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া রোদনবিজড়িত স্বরে বলিল, "আমার ঘর ভুবার ভুবার পড়ে গেল কেন দিদিমা?"

হায়! ক্ষুদ্র শিশুর এ কথার উত্তর কে দিবে? এই মায়াময় জগতে এমন কত সাধের ঘর অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গৃহ কর্ত্তার আনন্দ-কোলাহল না থামিতে, অধরের হাসি না ফুরাইতে, ঘোর ঝঞ্ঝা-বায়ু হঠাৎ কত সুখনিকেতন ভাঙ্গিয়া দিতেছে কে তাহার নির্ণয় করে? এত জগতের নিত্য ঘটনা। কিন্তু হায়! সাজান ঘর পুনঃপুন কেন ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার উত্তর কে দিবে? আমি বীণাকে কোলে করিয়া নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বীণা কিছুক্ষণ কাঁদিয়া আমার কোলের ভিতরে ঘুমাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যায় রাখিয়া আবার চিন্তা সাগরে নিমজ্জিত হইলাম।

দয়াময় বিধাতার রাজ্যে এমন অবিচার কেন? তিনিত অবিবেচক নন। তিনি ত নির্দ্দয় নন, তবে কেন এমন হয়? মানুষ কত সাধ করিয়া—কত সুখ কল্পনার আনন্দে বাসা প্রস্তুত করে, কালের এক ফুৎকারে তাহা কোথায় উড়িয়া যায় আর তাহার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। এমন ঘটে কেন?

হায়! এ জগৎ কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনশীল। আজ যেখানে আনন্দের হাসি, কাল সেখানে বিষাদের কান্না! আজ যেখানে সুধাধবলিত রমণীয় হর্ম্ম্যমালা সগর্ব্বে দণ্ডায়মান আছে, কাল হয়তঃ কালের অপ্রতিহত-গতি-প্রভাবে সে স্থানে বিস্তীর্ণ মরু ধু ধু করিতেছে। আজ যে স্থান আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত, আবার হয়তঃ কাল সে স্থান ঘোর শ্মশানে পরিণত—শবমাংসাহারী জীব-সমুদয়ের চীৎকারে পরিপূরিত। হায়! আমাদের এই দুনিয়ার খেলা ঐ তাসের কেল্লার মত, এই আছে, এই নাই, একটী নিশ্বাসের ভর সহে না।

ভাগ্যনিয়তি অখণ্ডনীয়। বিধাতার ইচ্ছার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহা ঘটিবেই। কিন্তু যাহা প্রতিবিধান করিবার ক্ষমতা আছে, নির্ব্বোধ মানব কেন তাহার প্রতিকূল পথে অগ্রসর হয় না? কেন ইচ্ছা করিয়া অশান্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে? তাসের ঘর একদিন ভাঙ্গিবেই, কালের নিঃশ্বাস বায়ুতেই হউক, অথবা মানবকৃত অসাবধানতার আঘাতেই হউক। মানব একটু সাবধান হইলে ঘরটি কিছু দিন অভগ্ন অবস্থায় থাকিতে পারে, কিন্তু হায়! এইটীই অধিক পরিতাপের বিষয় যে, যে ঘর কিছু দিন অন্ততঃ অভগ্নভাবে থাকিত, নির্ব্বোধ মানবের

অসাবধানতায় তাহা অচিরাৎ ভূমিসাৎ হয়।

এক ঘর গৃহস্থ কত কল্পনার কুহকে আশার আনন্দে সাধের ঘর বাঁধিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কোন দুঃখ ক্লেশ নাই, হঠাৎ কি জানি কখন কি ভাবে কাহার অন্তরে একটু অসন্তোষের ছায়া পড়িল। প্রথম হইতে চেষ্টা করিলে অল্পায়াসেই সেই ছায়াটুকু দূরীভূত হইয়া সংসার সুখের হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া, সেই অসন্তোষটুকু হৃদয়ে পুষিয়া অনুকূল বাতাস দিয়া, উত্তরোত্তর তাহাকে বাড়াইতে লাগিল। ইহার ফলে এই হইল, পরস্পরের হৃদয় হিংসা ও দ্বেষে জর্জ্জর হইতে লাগিল। শান্তিদেবী সে বাড়ী হইতে দূরে পলায়ন করিলেন। সেই গৃহ মধ্যে এক জনের অন্ততঃ যদি সহিষ্ণুতা গুণ থাকিত, যদি একজনও একটু ন্যূনতা স্বীকার করিত, তাহা হইলে সেই অশান্তি টুকু বিদূরিত হইয়া সংসারে পুনঃ শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারিত। সংসার সোনার সংসারে পরিণত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া, সেই সাধের সংসার ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। এ ঘটনা জগতে বিরল নহে।

একটী গল্প মনে পড়িল, তাহা সংক্ষেপে বলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

এক গ্রামে এক ঘর বনিয়াদী গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহারা খুব ধনী না হইলেও দরিদ্র ছিলেন না। গৃহকর্ত্তার নাম শিবশঙ্কর রায়। তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। বিষয় সম্পত্তির আয় হইতে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি বার মাসে যোল পার্ব্বন সমস্তই হইত। ইহা ছাড়া অতিথি সেবা ঠাকুর সেবা, যথা নিয়মে সম্পন্ন হইত। রায় মহাশয় দুঃখী বিপন্ন জনের পরম বন্ধু ছিলেন। কেহ কোন দায় জানাইলে সাধ্যমত তাহার প্রতিকারে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে দুইজন উপযুক্ত হইয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ প্রবোধ চন্দ্র কলিকাতায় কোন সওদাগরী আফিসে চাকুরী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। মধ্যম প্রকাশচন্দ্র গ্রাম্য মাইনার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কনিষ্ঠ প্রতুলচন্দ্র পঠদ্দশায় আছেন তাঁহার সংসারে কোনরূপ অভাব, দুঃখ, দৈন্য কিছুই ছিল না। লোকে সেই সংসারকে শান্তির সংসার বলিত।

যতদিন বৃদ্ধ রায় মহাশয় জীবিত ছিলেন। ততদিন সে সংসারে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। দুঃখ ক্লেশের বার্ত্তা ও কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রায় পরিবারের অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ হইল। গৃহে যেন শনির দৃষ্টি পড়িল। রায়-গৃহিণী ইতঃপূর্ব্বেই পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সাধের সংসারের অধঃপতন আর তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই।

প্রবোধ চন্দ্র প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, কাজেই তাঁহার পত্নী একটু গর্ব্বিতা ছিলেন। এতদিন মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও শ্বশুরের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। এখন সময় পাইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার স্বামী কত কষ্টে বিদেশে থাকিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন, আর পাঁচ জনে বাড়ী বসিয়া তাই নষ্ট করে, বড় বধূর তাহা সহ্য হইবে কেন? তিনি প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বেশ দু'কথা শুনাইতে লাগিলেন। প্রকাশচন্দ্র ত নিতান্ত মূর্খ নন, একেবারে অক্ষমও নন, তিনি পঁচিশ টাকা বেতনের কার্য্য করেন। ছেলে পড়ানর জন্য উপরিও কিছু উপার্জ্জন আছে। কাজেই তাঁহার স্ত্রী, বড় বধূর তীব্র বাক্য নীরবে সহ্য না করিয়া সমুচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়া উভয়ে পৃথক হইলেন। প্রবোধ চন্দ্র কলিকাতায় চাকরী করেন, সুতরাং তিনি সপরিবারে কলিকাতায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাণ শিবশঙ্কর রায়ের বিস্তীর্ণ বাস ভবন বিক্রীত হইয়া তুল্যাংশে বিভক্ত হইল। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার নব নির্ম্মিত বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ প্রতুলচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের এই জঘন্য ব্যবহারে মনের দুঃখে কোথায় বিরাগী হইয়া চলিয়া গেলেন। পিতৃ মাতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণ করা সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। সে সময় তাঁহারা পৈতৃক বিষয়াদি বিভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। হায় স্বার্থ!!

আর কি বলিব? যে বাড়ীতে এক মাতৃস্তন্যে পালিত সহোদর ভ্রাতার মধ্যে এমন বিসম্বাদ ঘটে, কমলা কি সেখানে স্থিরভাবে থাকিতে পারেন? শীঘ্রই তিনি রায়বাটী হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এক দিন যে চণ্ডীমণ্ডপ গীত বাদ্যের মধুর শব্দে অনুপ্রাণিত ছিল, যে স্থান অতিথিগণের আনন্দ-কোলাহলে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, সে চণ্ডীমণ্ডপ এখন পথিকপরিত্যক্ত পান্থশালার ন্যায় নীরব, জনহীন এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়া চর্ম্মচটিকা, বাদুড় প্রভৃতির আবাসস্থল হইল, এবং কিছু দিনের মধ্যেই শিবশঙ্কর রায়ের সেই রমণীয় নয়নরঞ্জন শান্তিকুটীর ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইল!!

এই সমস্ত চিন্তা যুগপৎ আমার মনে উদিত হইয়া হৃদয়কে বড় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মধ্যে মধ্যে বীণার সেই অর্দ্ধ-স্ফুটিত রোদনজড়িত কোমল স্বরও কাণে বাজিতে ছিল। "আমার ঘর দু'-বার দু'বার পড়ে গেল কেন?"

নানারূপ চিন্তায় সে রাত্রি আমার ভাল নিদ্রা হইল না।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।
বারুইপাড়া, খুলনা।

ভূত না মানুষ?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চন্দনীর চেষ্টা ও চণ্ডদেবের বাহাদুরী।

বীর নন্দক সাত্যকী নামক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রাজপুতনাভিমুখে রওনা হইলে চন্দনীর তাহার মাতার পরামর্শে দেবদত্তও গোপনে নন্দকের অনুসরণ করিলেন। তিনি অতিশয় সতর্কভাবে নন্দকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। নন্দক যখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেন তখন তিনি তাঁহার নন্দক দত্ত বাসুকী নামক অশ্ব ছুটাইয়া দিতেন, আবার নন্দক দৃষ্টির মধ্যে আসিলেই অশ্বের গতি থামাইয়া ফেলিতেন। এইরূপে তিনি নন্দকের সঙ্গে রাজপুতনা পর্য্যন্ত পঁহুছিলেন এবং তাহার সঙ্গেই পুনরায় পুংমণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে নন্দক এই দেবদত্তের অশ্বপদধ্বনিই শ্রুত হইয়াছিলেন।

নন্দক ও দেবদত্ত চলিয়া গেলেন দেখিয়া চন্দনী ও তাহার মাতা দুইজন উপবেশন করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মাতা। এটা সদাসর্ব্বদা এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কেন?

চন্দনী। (অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন) জানিনা, বোধ হয় নন্দকের তরবারীর আঘাতটা গুরুতর হইয়াছিল তাহা এখনও সাম্লাইয়া উঠিতে পারে নাই।

মাতা। ক্ষত তো শুষ্ক হইয়াছে দেখিতেছি।

চন্দনী। তা হোক্, ভিতরে দোষ আছে নিশ্চয়ই;

মাতা। আচ্ছা এক কাজ করিলে কেমন হয়?

চন্দনী। কি কাজ মা? ওকে জব্দ করিবার চেষ্টা?

মাতা। এস আমরা দুই জনে একত্র হইয়া ওকে একটু জব্দ করি।

চন্দনী। একটু কেন? ভাল করেই কর না কেন? নন্দকতো আর কাছে নাই।

মাতা। বেশ কথা আমিও ইহাই ভাবিতেছি। তবে তুই এক কাজ কর্।

চন্দনী। কি কাজ?

মাতা। তুই মনোহর সাজে সজ্জিতা হ'।

চন্দনী। কেন? এ দেহে আর সাজের দরকার কি মা আমি যে পতিতা। হটাৎ চন্দনীর নেত্র পল্লব অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

মাতা। মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া তোমাকে উহার নিকটে যাইতে হইবে।

চন্দনী। কেন?

মাতা। যাইয়া প্রস্তাব কর যে সে তোমাকে বিবাহ করে। তাহাকে

চেষ্টা কর যে সে তোমাকে বিবাহ করিতে দায়ী, কারণ সে তোমাকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছে এবং তুমিও তাহার জন্য লালাইতা।

চন্দনী। লালায়িতা? ইহা হইতে মিথ্যা কথা যে আর সম্ভবে না।

মাতা। ইহা খুবই সত্য কিন্তু এখানে তোমাকে মিথ্যারই অবতারণা করিতে হইবে।

চন্দনী। আচ্ছা করিব, কিন্তু ইহাতে কি ফল পাইব তাহা আমাকে বুঝাও।

মাতা। ইহাতে অপরাধির খোঁজ পাইবে।

চন্দনী। কি প্রকারে?

মাতা। সে তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য যদি লালায়িত হয় এবং বিবাহ কথাটা যদি স্বীকার করে, তবে এমন কি পূর্ব্বের অপরাধও স্বীকার করিয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতে পারে।

চন্দনী। করুক্ তাহাতেই বা কি বুঝিবে?

মাতা। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে এই ব্যক্তিই অনিষ্টকারী। এমন কি ভাব দেখাইয়া তুমি তাহার নিকট হইতে প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর খোঁজ ও বাহির করিয়া লইতে পার।

চন্দনী। ছি মা আমি তাহা পারব না।

মাতা। তোমাকে ইহা করিতেই হইবে, দেখিবে নন্দকের অগ্রেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে।

চন্দনী। আচ্ছা আমি ইহা করিব। হাব ভাব দেখাইয়া মূঢ়কে মুগ্ধ করিয়া প্রকৃত কথা বাহির করিয়া লইব। একবার সে মহা ভয়ে অস্থির হইয়া বলিয়াছিল "রাজ," কিন্তু সে কথার অনেক অর্থ হয়।

মাতা। হাঁ তাহা পারিবে, অতি সতর্ক হইয়া তাহার নিকট যাতায়াত কর, দেখিবে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। নন্দক এ তাবৎ কাল কপাল ঘামাইয়া যাহা করিতে পারে নাই তুমি তাহা অতি অল্প দিনেই তাহা সাধন করিবে।

চন্দনী। হাঁ, আমি সবই বুঝিতে পারিয়াছি, আমি পারিব, নিশ্চয় পারিব, কিন্তু তুমি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গিয়া সেই কক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মানা রহ, পাষণ্ড যদি বল প্রয়োগ করে তুমিও করিও।

মাতা কন্যাকে মনোহর সাজে সজ্জিতা করিয়া কৃত্রিম অভিসারে প্রেরণ করিলেন।

রজনী যখন দ্বিযামা চণ্ডদেবের তখন যেন কাহার স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চণ্ডদেব চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই রহিল কিন্তু তাহার বুঝিবার বাকি রহিল না যে কে এক জন আসিয়া তাহার শয্যার উপর উপবেশন করিল। এইরূপ বুঝিতে পারিয়া ভীত ও চকিত চণ্ডদেব শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া শয্যার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

যে আসিয়াছিল সে কহিল একবার চক্ষুই মেলনা।

একি, এ যে রমণীর কণ্ঠস্বর। শুধু তাহাই নহে এস্বর যে চণ্ডদেবের পরি-

চিত্ত. এ যে চন্দনীর কণ্ঠস্বর। চণ্ডদেব সাহসে নির্ভর করিয়া দেখিল চন্দনী সুবেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া মৃত মৃদু হাস্য করিতেছে।

চণ্ডদেব চন্দনীকে তদবস্থায় অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল কিন্তু কোন কথা কহিল না।

চন্দনী কহিল এর মধ্যেই বিস্মৃতি এসে উপস্থিত হয়েছে দেখ্‌ছি?

চণ্ডদেবের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে চণ্ডদেব যেন এ কথার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছে না।

চন্দনী কহিলেন "ধূর্ত্ত চূড়ামণি এখনও ধূর্ত্তম ত্যাগ কর। উঠিয়া বস তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। একটি প্রার্থনাও আছে তোমাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে।" চণ্ডদেব কথা কহিল না, তাহার চক্ষুতে মুখে যেন বিস্ময়ের ভাবই প্রকাশ পাইতেছিল।

চন্দনী পুনরায় কহিল "পূর্ণ করিবে না?" চন্দনীর স্বরে প্রেমের ভাব জড়িত ছিল। তথাপি চণ্ডদেবকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দনী কহিল "চণ্ডদেব! তুমি আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, বিশেষ তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ দায়ী। এ কথার তাৎপর্য্য তুমি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে।"

চণ্ডদেব নীরব হইয়া রহিল। চন্দনী কহিতে লাগিল, "চণ্ডদেব তুমি আমাকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়াছ, এখন আমাকে বিবাহ করিয়া লোকলজ্জা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

চন্দনী দেখিল তাহার কথা শ্রবণ করিয়া চণ্ডদেব যেন লজ্জা ও ঘৃণায় জড়বৎ হইয়া যাইতেছে।

চন্দনী আবার কহিতে লাগিল "যখন তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে তখন আমি তোমাকে ঘৃণা করিতাম, কিন্তু এখন আমি তোমাকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছি, তুমি আমাকে বিবাহ কর।"

চণ্ডদেব কোন কথা কহিল না। চন্দনী দেখিল চণ্ডদেবের মুখ ক্রমে ক্রমে যেন মৃত ব্যক্তির ন্যায় সাদা হইয়া উঠিতেছে।

চন্দনী তখন কহিল "তুমি আমাকে প্রতারণা করিও না, প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীকে ভুলিয়া আমাকে গ্রহণ কর। চণ্ডদেব! আমি তোমার হইব। চন্দনীর চক্ষুতে জল ঝরিতে লাগিল। কারণ দুঃখ, ব্যথা ও ঘৃণা তাহাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে ছিল। চণ্ডদেব কথা ত কহিলই না উপরন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া রহিল। চন্দনী কহিল "আমাকে ভুলিও না, আমার নিকট কিছু গোপনও করিও না, আমাকে বিশ্বাস কর, চণ্ডদেব! আমি তোমার।" মুদ্রিত নেত্রে চণ্ডদেব দেখিল না যে এই কথা বলিতেই চন্দনীর ললাটের প্রত্যেক শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডদেব স্থানুবৎ অচল ও মূকবৎ নীরব। চন্দনী কহিল "আমার নিকট ব্যক্ত কর তাহার দুইজন কোথায় আছে? আমি তাহা দিগকে হত্যা করিয়া আপনার পথ মু

করিব, তাহারা বর্ত্তমানে তুমি আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না।" চণ্ডদেব চন্দনীর কথায় কোন উত্তর দিল না।

চন্দনী দেখিল এখানে আর বসিয়া থাকিয়া কোন ফল নাই। চণ্ডদেব সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে। অতএব এ উপায়ে কৃতকার্য্য হইবার কোন আশা নাই। এই ভাবিয়া চন্দনী সর্পিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার মা দেওয়ালের অন্তরালেই লুক্কায়িতা ছিলেন। কন্যার সঙ্গে সম্মিলিতা হইয়া মাতা স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক এইরূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মাতা। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তুমি নীরব নিশীথে একাকিনী তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রেমালাপ করিয়াও তাহার মন গলাইতে পারিলে না?

চন্দনী। কি আর করব? চেষ্টার ক্রটী করি নাই ত?

মাতা। সে আমাদের পরামর্শের বিষয় জানিতে পারিয়াছে।

চন্দনী। আশ্চর্য্য।

মাতা। আশ্চর্য্য কি? স্মরণ করিয়া দেখ, তুমি প্রতিধ্বনির ঘরে রাত্রিতে অন্ধকারে লুকাইয়া অনুচ্চস্বরে তাহার বিরুদ্ধে যে কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলে,সে এ বাড়ীতে থাকিয়া কেমন করিয়া তাহা শুনিল? তাহার যে সকল কর্ম্মচারী প্রতিধ্বনিকে লইতে আসিয়াছিল তাহারাও ত সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

চন্দনী নীরব রহিল।

মাতা। ফলতঃ সে কেমন করিয়া সে কথা শুনিয়াছিল এবং তোমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল?

চন্দনী। হাঁ বুঝিলাম তাহার অসাধ্য কর্ম্ম পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সে আমাদের পরামর্শের বিষয় কোন রূপে জ্ঞাত হইয়াছে। যাক্ সে কথা, আর একদিনচেষ্টা করিয়া দেখি কি করিতে পারে।

তাহার পর দিবস সন্ধ্যা হইতেই একটু অধিক গ্রীষ্মানুভব হইতেছিল, তাহাতে অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, বৃষ্টি হইবে। চণ্ডদেবের শয়ন কক্ষের দরজা জানালা সমুদয়ই মুক্ত ছিল। সে শয্যার উপরে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিল। তখন রজনী দ্বিযামা। চন্দনী ধীরে ধীরে চণ্ডদেবের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। চণ্ডদেবের ঘরে জ্যোৎস্নার সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহার চক্ষুতে, মুখে, শয্যার উপাধানে, অধরে, কেশগুচ্ছে, গণ্ডগ্রীবায় ও বক্ষে পড়িয়াছিল। চণ্ডদেব যেন সরোবরের মধ্যে শারদীয় পদ্ম বা কহ্লাদবৎ শোভা পাইতেছিল। চন্দনী চণ্ডদেবের নিকটে আসিয়া ঘৃণায় যত অস্থির হইবে ভাবিয়াছিল কার্য্যকালে সে তত অস্থির হইল না। চণ্ডদেবের নিকটে বসিয়া অনিমেষ লোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘৃণা অথবা ক্রোধ তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিল না। চণ্ডদেব বয়সে যৌবন সীমা অতি-

ক্রম করিয়াছে কিন্তু যৌবনের রূপ লাবণ্য তাহাকে ত্যাগ করে নাই। চন্দনী দেখিতে লাগিল যেন দ্বাবিংশ বৎসরের একটী যুবা পুরুষ কতিপয় মল্লিকা মালিকা শুভ্র বিছানায় পতিত রহিয়াছে। চন্দনী চণ্ডদেবকে অনেক বার দেখিয়াছে কিন্তু চণ্ডদেবের রূপে যে তত মধুরতা আছে তাহা সে একবারও দেখে নাই। চণ্ডদেব তাহার শত্রু। চণ্ডদেবই তাহাকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছে। চন্দনী জানিয়াছে, চণ্ডদেব অধার্ম্মিক, অধম, অধমাধম। যাহার বাতাসে চন্দনী চৈতন্য-হীন হইয়া পড়ে সেই চণ্ডদেবকে দেখিয়া আজ তাহার প্রাণ জুড়াইল কেন? যাহাকে দেখিলে চন্দনীর চক্ষু মুদিয়া পলাইবার সাধ হইত আজ তাহাকেই দেখিতে তাহার এত বাসনা হইল কেন? চন্দনী স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, চণ্ডদেবকে ডাকিতেও তাহার সাহস হইল না। সে ভাবিতে লাগিল ভাই নন্দকের কথাই কি তবে ঠিক? চণ্ডদেব কি সত্যসত্যই নির্দ্দোষী ও সত্যবাদী? চণ্ডদেবের রূপ ধরিয়া অন্য কেহ কি আমার অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। আহা তাহাই যদি সত্য হইত! চন্দনীর অশ্রুজল তাহার গণ্ডগ্রীবায় গড়াইয়া পড়িল। সে অঞ্চলদ্বারা আপন চক্ষুর জল মুছিয়া মধুর কণ্ঠে ডাকিল:—"দেব"

চণ্ডদেব চক্ষুও মেলিল না কথাও কহিল না।

চন্দনী কহিল:—চণ্ডদেব! চক্ষু মেলিয়া তাকাও। ভয় নাই, আমি চন্দনী, যদি তোমার ভ্রান্তি হইয়া থাকে তবে সেই ভ্রান্তি দূর কর।

চণ্ডদেব তথাপি কথা কহিল না।

চন্দনী। চণ্ডদেব আমি চন্দনী। যাহাকে তুমি অকৃত্রিম স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছিলে, আমি সেই চন্দনী। আমার সহিত কথা কও। ভগিনীর সহিত কথা কহিতে লজ্জা কিসের?

চণ্ডদেব কোন কথা কহিল না। তাহার শরীরের কোন অঙ্গও কম্পিত হইল না। সে নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহাও অনুভব করা গেল না। চন্দনী বিস্মিতা ও চকিতা হইয়া কম্পিতা হইতে লাগিল। তাহার সুমোহন কবরী খসিয়া পড়িল, সুবাসিত অঞ্চল স্খলিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, এত ধৈর্য্য! মানুষের কি এত ধৈর্য্য সম্ভবে? চণ্ডদেব কি দেবতা? না ইহা আমারই ভ্রান্তি। যাহার বিপক্ষে শত শত প্রমাণ রহিয়াছে তাহাকে দেবতা ভাবিয়া আমি কি নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন হইলাম না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চন্দনী ভাবনায় অতিশয় ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। সে ডাকিতে লাগিল, "চণ্ডদেব! চণ্ডদেব! চণ্ডদেব!"

চণ্ডদেব নীরব, নিস্পন্দ। চন্দনী সেখানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। তাহার মাতা অদূরেই তাহার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি চন্দনীকে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস"। তখন

মা ও মেয়ে উভয়ে একত্র হইয়া স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

চন্দনী। এত ধৈর্য্য মানুষের কি সম্ভবে, মা?

মাতা। ভূতের সম্ভবে।

চন্দনী। মানবেরা ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমাশীলকেই দেবতা বলিয়া থাকেন।

মাতা। দেবতা! চণ্ডদেব কি তবে দেবতা? তুমি বল কি? তোমার প্রকৃতি স্থির আছে ত? উন্মাদ গ্রস্ত হও নাই ত?

চন্দনী। চণ্ডদেবের ধৈর্য্য আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ধৈর্য্যেরও ত সীমা আছে?

মাতা। তুমি আবার যাও। অধরে অধর রাখিয়া তাহাকে চুম্বন কর। দেখিব পিশাচের কত ধৈর্য্য। কোন পৈশাচিক শক্তির বলেই সে এরূপ করিতেছে।

চন্দনী। হাঁ তাহাই হইবে। এই বলিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া অনুচ্চস্বরে গাহিল

মরণের পরপারে
আছে এক অপূর্ব্ব নগর
মরণের পরে সেথা
অমর হইবে নারী নর।
হেম ফুল ফুটে সেথা
হেম শাখে হেম পাখী গায়,
দেহ-মুক্ত আত্মা সব
হেথা আসি চির শান্তি পায়।

পরদিন সন্ধ্যা হইতেই চন্দনী সুমোহন সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। আজ সে চণ্ডদেবকে বিচলিত না করিয়া ফিরিবে না। ইহাই তাহার মাতৃ আজ্ঞা। চণ্ডদেব ঘরের সমুদয় দরজা বন্ধ করিয়া শয্যার উপর শুইয়া সময় সময় এইরূপ গাইতেছিল, কিন্তু তাহার জানালাগুলি সমুদয় খোলা ছিল।

আমিত তোমারে আসিতে বলি না
তুমি কেন কাছে এস,
আমিত তোমারে ভাল বাসি না
তুমি কেন ভাল বাস?
আমি চাহিনা প্রেম চাহিনা পুণ্য
আপনি যাচিয়া দাও,
সঞ্চিত পাপের প্রলেপটী মম
যতনে মুছিয়া নাও।
আপনি সাধিয়া দিতেছ সকলি
তথাপি ও সরবদা,
দেহ দেহ করি তুলি কোলাহল
ভঙ্গ করি পবিত্রতা।
ধনে জনে ধনী করেছ দীনেরে
তবুও কাঙ্গাল সম,
অতৃপ্তি অশান্তি জ্বলিছে হৃদয়ে
অহো কি নিয়তি মম।

চন্দনী কাঠের জানালা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য দিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "কেও বলিয়া" চণ্ডদেব উঠিতেছিল। সামনে সুমোহনবেশ চন্দনীকে দর্শন করিয়া শয্যার উপরে নিদ্রিতের ন্যায় শুইয়া রহিল।

মুক্ত জানালা পথে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে সুরভিত বায়ুর ঢেউও খেলিতেছিল। চন্দনী চন্দন বিলেপিত বাহু উত্তোলন-

পূর্ব্বক চণ্ডদেবের হস্ত ধারণ করিয়া মধুর কণ্ঠে ডাকিল, "দেবতা! একবার উঠিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ কর," এবং অনিমেষ লোচনে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিল। চণ্ডদেব অটল অচল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ভালরূপে চলাচল করিতেছিল কি না তাহাও বুঝা যাইতে ছিল না। চন্দনী ভাবিতে লাগিল ইহার অর্থ কি? এই মানুষ গান গাইতেছিল, এই উঠিয়া বসিল, আবার আমাকে দেখিয়া শুইয়া পড়িল, সেই মানুষ এক মুহূর্ত্ত ও অতীত না হই-তেই মৃতবৎ। সে নিদ্রিত কি জাগরিত তাহাও বুঝা যাইতেছে না। এ কি? এ কি কোন পৈশাচিক বল না দৈবশক্তি না অত্যধিক ভয়? ভয়ই বা কিসের? বুঝিতে পারি না। সে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, চন্দনীকে দেখিয়া তাহার ভয়ই বা কিসের? এ ভয় কি পাপের ভয়? বারাঙ্গানাকে দেখিয়া সাধু পুরুষেরা ভয় পান। এ ভয় কি সেই ভয়? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অধিক অত্যাচার করিতেও তাহার সাহস অথবা ইচ্ছা হইল না। অত্যাচার করিলেও যে কোন সুফল পাওয়া যাইবে তাহার আভাসও সে পাইল না। অতএব চণ্ডদেবকে দেখিতে দেখিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী গুপ্তা।

চরিত্রের মাধুর্য্য।

গোলাপটী গাছে ফুটিয়া রহিয়াছে। গন্ধে চারিদিক আমোদিত। গোলাপের সৌন্দর্য্য ও কম নহে। রূপ ও গুণে গোলাপ সর্ব্ব-জনের আদৃত। যেই গোলাপটী হাতে নিতেছে, সেই বলিতেছে আহা ফুলটি কি সুন্দর। আহা ইহার ঘ্রাণ কি মধুর। গোলাপের মান আছে কি না জানি না। গোলাপ আত্মপ্রশংসা বুঝিতে পারে কি না তাহা ও জানি না। গোলাপ অচেতন জড়, এই সিদ্ধান্তে লোকে বলিয়া থাকে গোলাপের আত্মজ্ঞান কি পদার্থজ্ঞান কিছুই নাই। আমাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা কে বলিবে, যদি গোলাপ জন্ম লইয়া, সেই স্মৃতি লইয়া আবার মানব জন্ম লইতে পারিতাম তাহা হইলে কথঞ্চিৎ বলিতে পারিতাম গোলাপ অচেতন না সচেতন। সে যাহা হউক সে বিষয়ের আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আবহমান সংস্কার হইতে ধরিয়া লই যে গোলাপের আত্মজ্ঞান নাই এবং সে যে মানবদিগকে এত আনন্দ দিতেছে তদ্বিষয়ে তাহার চৈতন্য নাই। তাহার যে এত রূপ ও গুণ আছে তাহাও সে বুঝে না, কেহ বলিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না। এইত ভাল। গোলাপের রূপ ও গুণের জ্ঞান থাকিলে বোধ হয় গোলাপ একটু স্ফীত

হইত, স্বভাব সুলভ গর্ব্ব আসিয়া তাহার মাথাটা একটু ঘুরাইয়া দিত, গোলাপের পক্ষে তাহা হয় নাই। কিন্তু মানুষ জ্ঞান চৈতন্য লাভ করিয়া যেমন বিমল আনন্দের অধিকারী হইয়াছে তেমন সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমান ও গর্ব্ব আসিয়া তাহার সেই পূর্ব্ব আনন্দ ভোগের একটু ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। যে পুরুষ এবং মহিলা গোলাপের ন্যায় রূপে গুণে বিভূষিত হইয়া ও অবিচলিত থাকিতে পারেন তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই প্রকৃত আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। গোলাপের রূপ কিংবা গন্ধ স্বোপার্জ্জিত জিনিষ নহে। সে স্বভাব হইতে তাহা পাইয়াছে। যদি কোন কর্ত্তা কর্ত্তৃক ইহা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা হইলেও সে কর্ত্তা গোলাপের অতীত স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সুতরাং গোলাপের যাহা আছে তাহা কিছুই নিজের বলিবার অধিকার নাই। মানুষের যদি ঠিক তাহাই হইত তাহা হইলে মানুষও হয়ত গোলাপের মত নিরভিমানী ও নিরহঙ্কারী হইতে পারিত। কিন্তু মানুষ মনে করে যে তাহার গুণের কতকটা তাহার স্বোপার্জ্জিত (acquired)। রূপ সম্বন্ধে অনেকের ধারণা অন্য রূপ হইলেও তজ্জন্য কেহ কেহ গর্ব্বিত হইতে বিরত হয় না। মানুষের রূপ ও গুণ সকলই গোলাপের ন্যায় ভগবদ্দত্ত কি না তদ্বিষয়ে মীমাংসা করা কঠিন। এতদ্বিষয়ে মতের স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা বলেন আমাদের রূপ ও গুণের কতকটা স্বোপার্জ্জিত (acquired), কতকটা পুরুষানুক্রমিক (hereditary), কতকটা স্বাভাবিক (natural)। অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা বলেন যে, যাহাকে স্বোপার্জ্জিত বলা হয় তাহাও পুরুষানুক্রমিক এবং স্বাভাবিকের ন্যায় ব্যক্তিত্বে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন কর্ত্তার যত্ন দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহাকে আমরা যত্ন সম্ভূত সাধনার ফল বলি তাহা বাস্তবিক কতগুলি অপর লক্ষিত শক্তির ক্রিয়ার ফল। সেই শক্তি কমাইবার উপর মানবের কোন হাত নাই। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। যাক, বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাহা লক্ষ্য নহে। তবে যে সকল গুণ মানবের স্বোপার্জ্জিত বলিয়া বিশ্বাস, সেই সকল গুণ সম্বন্ধে তাহার স্বভাবতঃ গর্ব্ব আসিতে পারে। আমি যাহা করিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যদি দশ জনে আমাকে প্রশংসা করে তাহা হইলে আমি স্ফীত হইব না কেন? এই রূপ আত্মপ্রসাদে আমাকে তদ্রূপ কার্য্য করিবার জন্য আরও প্রোৎসাহিত করে। সুতরাং আত্মপ্রসাদের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। আত্মপ্রসাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও গর্ব্বের স্থান কোথায়? অন্যের সহিত নিজকে তুলনা করিয়া যখন নিজের একটু শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান হয় তখনই গর্ব্ব আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি বলিয়া মনে করি তজ্জন্য চিত্তে একটু আনন্দ আসিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি

সেই স্বোপার্জ্জিত গুণের সহিত অন্যের গুণের তুলনা করিব কেন? বরং আমি যদি গোলাপের মত কেবল ফুটিয়া থাকিতে পারি তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। সকলে আমার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হউক, সকলে আমার গুণের সৌরভে পুলকিত হউক। আমি গোলাপের মত অচেতন জড় হইয়া থাকি একটুকুও যেন বিচলিত না হই। তাহাই আমার মনুষ্যত্ব, তাহাকে দেবত্ব বলিতে চাও ক্ষতি নাই, আমি সেই দেবত্বই চাই। যদি বল গোলাপের মত জড় অচেতন হইলে লাভ কি? আমি বলি এস্থলে গোলাপের সহিত একটু স্বাতন্ত্র্য রহিল। গোলাপ জানেনা তাহার কি আছে, কি নাই। যে স্বভাবের নিয়মে ফুটিয়া রহিয়াছে স্বভাবের নিয়মে সকলের সেবা করিতেছে। আমার কিন্তু সেরূপ নাই, আমি আপনি ফুটিয়াছি, আপনি ভাই ভগিনীদের সেবা করিতেছি। স্বভাব লইয়া আমার যতটুকু সম্বন্ধ তাহার কথা বলিয়া আমাকে লইয়া আমার যতটুকু সম্বন্ধ সে গুণ ও সে রূপের কথা বলিতেছি। আমি যতটুকু ফুটিয়াছি এবং যতটুকু সেবা করিতেছি তজ্জন্য নিজের কৃতিত্ব মনে না করিয়া আমি যাহার তাঁহার কৃতিত্ব মনে করিলেই গর্ব্ব স্থান পাইবে না। আমি গোলাপের মত নিস্তব্ধ নিস্ফল থাকিতে পারিব।

শ্রীচণ্ডী কিশোর কুমারী।

শিখগ্রন্থ সুখমণি সাহিব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

শরীর কটাই হোমৈ করি বাড়ী।
বরত নেম করৈ বহু ভাতী॥
নহী তুলি রাম বীচার।
নানক গুরু মুখি নাম জপিয়ৈ ইকবার॥১

শরীরকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহার দ্বারা হোম করা, অনেক প্রকার ব্রত নিয়ম করা, এ সকলকে রাম নামের সমান বলিয়া কখনও বিচার করিওনা। নানক বলিতেছেন, যদি শিষ্য একবার মাত্র নাম জপ করে, তাহা হইলেই এ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গতি লাভ করে।

নব খণ্ড পৃথিবী ফিরৈ চিরজীবৈ।
মহা উদাস তপীসরূথী বৈ॥
অগনি মাহি হোম তপ রায়।
কনিক অশ্ব হৈবর ভূমি দান॥
ন্যোলী কর্ম্ম করৈ বহু আসন।
জৈন মারগ সংযম অতি সাধন॥
নিমখ নিমখ করি শরীর কটাবৈ।
তৌভি হৈমৈ মৈলুন যাবৈ॥
হরিকে নাম সমসরি কছু নাহি।
নানক গুরুমুখি নাম জপত গতি পাহি॥২

নব খণ্ড যুক্ত পৃথিবী ঘুরিলেও এবং চির জীবন লাভ করিলেও মহা উদাসী

এবং তপস্বী হইলেও, শরীরকে অগ্নিমধ্যে হোম করিলেও, স্বর্ণ, অশ্ব, হস্তি এবং ভূমি দান করিলেও, যোগ কর্ম্ম এবং বহু আসন দান করিলেও, জৈন মার্গে কঠোর সংযম করিলেও, চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া শরীরকে খণ্ড খণ্ড করাইলেও, তথাপি অহঙ্কারের মলা যায় না। হরি নামের সমান কিছুই নহে। নানক বলিতেছেন, শিষ্য হরি নাম জপ করিলে গতি পাইবে ॥২

মন কামনা তীরথ দেহ ছুটৈ।
গর্ব্ব গুমান ন মনতে হুটৈ ॥
শোচ করৈ দিনসু অরু রাতি।
মনকী মৈলুন তনভে যাতি ॥
ইসু দেহী কৌ বহু সাধনা করৈ।
মনতে করহুঁ ন বিষ্যা উরৈ ॥
জাল ধোবৈ বহু দেহ অনীতি।
শুদ্ধ কহা হোই কাচী ভীতি ॥
মন হরিকে নামকী মহিমা উচ।
নানক নামি উধরে পতিত বহু মূঢ় ॥৩

তীর্থে গমন করিলে মনের বাসনা দূর হয় না, মনের গর্ব্ব এবং অহঙ্কার দূর হয় না। দিন রাত কেন শৌচ কার্য্য কর না, তথাপি মনের ময়লা শরীর হইতে যায় না। এই শরীরে অনেক প্রকার সাধনা কর না কেন, মন হইতে কিছুতেই বিষয় দূর হয় না। জল দ্বারা ধৌত কর তত্রাপি শরীরে অনেক দুর্নীতি থাকে। কাঁচা ইটের গাঁথুনিতে কি কখন পাকা গাঁথুনী হয়? মন হরি নামের মহিমাতেই উচ্চ হয়, নানক বলিতেছেন, অসংখ্য পতিত ব্যক্তি ভগবানের নামে উদ্ধার পায় ॥৩

বহুত সিয়া পপ যমকা তৌ ব্যাপৈ।
অনেক যত্ন করি তৃষ্ণা না ধ্রাপৈ ॥
ভেষ অনেক অগনি নহীঁ বুঝৈথ।
কোটি উপর দরগহ নহীঁ সিঝৈ ॥
মোহ খিয়াবৈ মায়া জাল ॥
ছুটসি নাহীঁ উভ পয়াল।
অচর করতুভি সগলি যম ডানৈ।
গোবিংদ ভজন বিনু তিল নহীঁ মানৈ ॥
হরিকা নাম জপত দুখ যাই।
নানক বোলৈ সহজি সুভাই ॥৪

অনেক সেয়াস্থমী সত্বেও যমভয় যায় না, অনেক যত্নেও তৃষ্ণা দূর হয় না। নানা প্রকার ভেখ ধারণ করিলেও মনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না।
কোটী উপর করিলেও ভগবানের দ্বারে যাইবার অধিকারী হয় না।
জন্ম ও মরণ হইতে তাহার মুক্তি হয় না।
মোহ এবং মায়া জাল ব্যাপ্ত করে।
আর সকল কার্য্যেই যমের দণ্ড পতিত হয়।
গোবিন্দ ভজন ব্যতীত কোথাও তিল মাত্র সম্মান নাই।
হরি নাম জপ করিলে দুঃখ দূর হয়।
নানক বলিতেছেন, ইহাতে সহজেই সুখ হয় ॥৪

চায় পদারথ যে কো মাগৈ।
সাধ জন কী সেবা লাগৈ।
যে কো অপনা দুখ মিটাবৈ।
হরি হরি নাম রিদৈ সদ গাবৈ।
যে কী অপনী সোভা লোরৈ।
সাধ সঙ্গ ইহ হউ মৈ ছোরৈ থ।
কো জনম মরণ তে ডরৈ।

সাধ জনা কী সরণী পরৈ।
জিস জন কউ প্রভ দরশ পিয়াসা।
নানক তাকৈ বলি বলি যাসা॥৫
যে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি পদার্থ লাভ করিতে চায়,
তাহার উচিত সাধু জনের সেবা করা।
যে নিজের দুঃখ নিবারণে অভিলাষী হয়,
সে হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা হরি নাম গান করুক।
যে নীজের শোভা দর্শন করিতে চায়,
সাধু সঙ্গ করিয়া সে নিজের অহঙ্কর ত্যাগ করুক।
যাহার জন্ম মরণের ভয় আছে,
সে সাধুজনের স্মরণ লউক।
যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে প্রভুকে দর্শন করিবার পিপাসা আছে।
নানক বলিতেছে, সেই ব্যক্তিকে বলিহারি যাই॥৫
সকল পুরুষ মহি পুরুষ প্রধান।
সাধ সংগ যাকা মিটৈ অভিমান।
আপন কউ যো জনৈ নীচা।
সউ গনীয়ৈ সভতে উচা।
যাকা মন হোয় সগল কী রীনা।
হরি হরি নাম তিন ঘটি ঘটি চীনা।
মন অপনেতে বুরা মিটানা।
পেখৈ সগল সৃষ্টি সাজ না।
সুখ দুঃখ জন সম দৃষ্টেতা।
নানক পাপ পুংন নহী লেপা।৬
সকল পুরুষের মধ্যে তিনিই পুরুষ শ্রেষ্ঠ যাহার অভিমান সাধু সঙ্গে দূর হইয়াছে।
যিনি আপনাকে নীচ বলিয়া জানেন,
তাঁহাকেই সকলের উচ্চ বলিয়া গণনা করা হয়।
যাঁহার মন সকলের পদরেণু হইয়া থাকে
তিনি ঘটে ঘটে হরিনাম দর্শন করেন।
যিনি নিজের মনেতেই মনবিকারকে নষ্ট করিয়াছেন,
তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে বন্ধুকে দর্শন করেন।
যাঁহার সুখ ও দুঃখে সম দৃষ্টি
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে পাপ পুণ্যে লিপ্ত করিতে পারে না॥৬
নিরধন কউ ধন তেরী নাউ।
নিথাবে কউ নাউ তেরী থাউ।
সগল ঘটা কউ দেবহু দান।
করন করাবন হার স্বামী।
সগল ঘটাকে অংতর জামী।
অপনী গতি মিতি জানহু আপে।
আপন সংগি আপি প্রভ রাতে।
তুমরী উসততী তুমতে হোয়।
নানক অবর ন জানসি কোয়॥৭
হে প্রভু! তোমার নাম নির্ধনের ধন।
যাহার গৃহ নাই তাহার তুমি গৃহ।
যাহার মান নাই, তাহার তুমি সম্মান।
সকল জীবকে তুমি দান করিতেছ।
হে স্বামী! তুমি সকল সৃষ্টির কারণ।
সকল জীবের তুমি অন্তর যামী।
তোমার গতি এবং কার্য্য তুমি আপনিই জান।
হে প্রভু! তুমি নিজের আনন্দে নিজেই মগ্ন।
তোমার স্তুতি তুমিই করিতে পার।

নানক বলিতেছে, অপর কেহ তোমার মহিমা জানে না ॥৭

সরব ধর্ম্ম মহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
হরি কো নাম জপি নির্ম্মল কর্ম্ম।
সগল ক্রিয়া মহি উত্তম কিরিয়া।
সাধ সংগ দুর্ম্মতি মল হিরিয়া।
সগল উদম মহি উদম ভলা।
হরি কা নাম জপহু জীয় সদা।
সগল বাণী মহি অমৃত বাণী।
হরি কো যশ শুন রসন বখানী।
সগল থান তে ওহু উত্তম থান।
নানক জিহ ঘট বসৈ হরি নাম ॥৮

সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম
নির্ম্মল কর্ম্ম হরিনাম জপ করা।
সকল ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া
সাধু সঙ্গে মনের মলা দূর হয়।
সকল উদ্যমের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ উদ্যম
যদি জীব সর্ব্বদা হরিনাম জপ করে।
সকল বাণীর মধ্যে সেই অমৃত বাণী,
যদি হরির যশ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা হয়।
সকল স্থান হইতে সেই উত্তম স্থান,
নানক বলিতেছেন, হৃদয়ে হরিনাম বর্ত্তমান।

৪ শ্লোক।

নিরগুনিয়ার ইয়ানিয়া সো প্রভু সদা সমালি।
জিন কীয়া তিস্ চীতি রখ নানক নিবহী নালি।

হে গুনহীন, হে মূর্খ সেই প্রভুকে সর্ব্বদা মনে রাখ। নানক বলিতেছেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে চিত্তে রাখ। তিনি সঙ্গে যাইবেন।

অষ্টপদী।

রমঈয়া কে গুণ চেত পরাণী।
কবন মূল তে কবন দ্রিষ্টানী॥
জিন তূঁ সাজি সবার সীগারিয়া।
গরভ অগন মহি জিনহি উবারিয়া॥
বার বিবস্থা তুঝহি পিয়ারৈ দুধ।
ভরি জোবন ভোজন সুখ সুধ॥
বিরধ ভয়া উপর সাক সৈন।
মুখ অপিয়াউ বৈঠ কউ দৈন॥
ইহ নির গুণ গুণ কছু ন বুঝৈ।
বখস লেহু তউ নানক সীঝৈ॥১

হে প্রাণী, যিনি সকলের মধ্যে রমণ করিতেছেন তাঁর গুণ মনে রাখ।
যিনি সকলের মূল তাঁহার দৃষ্টান্ত কি আছে?
যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও শোভিত করিয়াছেন,
যিনি তোমাকে গর্ভ অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।
শৈশব কালে যিনি দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
যৌবন কালে ভোজন, সুখ ও আনন্দ দিয়াছেন।
বৃদ্ধকালে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে রাখিয়া দেন।
তোমার মুখে আহার দিতেছেন, যাহাতে তুমি বসিয়া থাকিতে পার।
হে প্রভু! গুণহীন ব্যক্তি তোমার গুণ কিছুই বুঝেন না।

নানক বলিতেছেন, ক্ষমা কর তাহা হই-
লেই আমি সিদ্ধ হইব ॥১

যিহ প্রসাদি ধর উপর সুখ বসাই।
সুত ভ্রাত মীত বনিতা সংগি হসাই।
জিহ প্রসাদি পীবহি শীতল জলা।
সুখদাই পবন পাবক অমুলা।
জিহ প্রসাদি ভোগহি সভ রসা।
সগল সমগ্রী সংগী সাথ বসা।
দীনে হসত পাব কবন নেত্র রসনা।
তিসহি তিয়াগ আবর সংগি রচনা।
ঐসে দোষ মুঢ় অন্ধ বিয়াপে।
নানক কাঢ় লেহু প্রভ আপে ॥২

যাঁর প্রসাদে ধরার উপর সুখে বাস করি-
তেছ,
এবং সুত ভ্রাতা বন্ধু ও স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-
তেছ,
যাঁর প্রসাদে শীতল জল পান করিতেছ,
সুখদায়ক পবন সেবন করিতেছ এবং
অমূল্য অগ্নি পাইয়াছ,
যাঁহার প্রসাদে সকল প্রকার রস ভোগ
করিতেছ,
এবং সকল সামগ্রী সহ সুখে বসিয়া আছ।
যিনি হস্ত, পদ, কর্ণ, নেত্র ও রসনা দিয়া-
ছেন।
তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তুমি অন্য কর্ম্মে
মত্ত,
এই দোষ মুঢ় অন্ধকে ব্যাপিয়া আছে।
নানক বলিতেছেন, হে প্রভু তুমি নিজে
আমাকে টানিয়া লও ॥২

আদি অন্ত যো রাখন হায়।
তিস সিউ প্রীতি ন করৈ গবার।
যাকী সেবা নবনিধি পাবৈ।
তাসিউ মুঢ়া মন নহী লাবৈ।
যো ঠাকুর সদ সদা হজুরে।
তাকউ অন্ধা জানত দূরে।
যাকী পাবৈ দরগহ মান।
তিসহি বিসারৈ মুগধ অজান।
সদা সদা তহু ভুলন হার।
নানক রাখন হার অপার ॥৩

যিনি আদিতে এবং অন্তে রক্ষা করেন
মূর্খ ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই প্রীতি করে না।
যাঁর সেবাতে নবনিধি পাওয়া যায়
মূর্খ ব্যক্তিগণ তাঁহার দিকে মন দেয় না।
যে ঠাকুর সর্ব্বদা সম্মুখে আছেন
অন্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দূরে মনে করে।
যাঁহাকে পাইলে ভগবানের দ্বারে সম্মান
হয়।
মুগ্ধ অজ্ঞ তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে।
সদা সর্ব্বদা এইরূপ ভুল হইতেছে।
নানক বলিতেছেন, তাঁহার রক্ষা করাও
অপার ॥৩

রতন তিয়াগী কৌড়ী সংগি রচৈ।
সাচ ছোড় ঝুট সংগি মচৈ ॥
যো ছড়না সু অসথির কর মানৈ।
যো হোবন সো দুর পরানৈ ॥
ছোড় যায় তিসকা শ্রম করৈ।
সংগি সহাই তিস পর হরৈ ॥
চংদন লেপ উতারৈ ধোয়।
গরধব প্রীতি ভসম সংগ হোয় ॥
অন্ধ কূপ মহি পতিত বিকরাল।
নানক কার লেহু প্রভ দয়াল ॥৪

রত্ন ত্যাগ করিয়া কড়ি লইয়া খেলিতেছ,

সত্য ছাড়িয়া মিথ্যাতে মজিলে,
যাহা অনিত্য তাহাকে নিত্য বলিয়া বুঝিলে,
যাহা সত্য তাহাকে দূরে ফেলিলে,
যাহা থাকিবে না তাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছ,
যাহা সঙ্গে যাইবে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে।
চন্দনের লেপ তুমি ধুইয়া ফেলিলে
কারণ গর্দ্দভের প্রীতি ভস্মের সঙ্গেই হইয়া থাকে।
যে মহা অন্ধ কূপে পতিত
হে দয়াল প্রভু! সেই নানককে উদ্ধার কর ॥৪

করতুতি পশুকী মানস জাতি।
লোক পচারা করৈ দিন রাতি।
বাহর ভেষ অন্তর মল মায়া।
ছপসি নাহি কুছ করৈ ছপায়া।
বাহর জ্ঞান ধ্যান ইস্‌নান।
অন্তর বিয়াপৈ লোভ সুআনি।
অন্তর অগনি বাহরি তন সুয়াহ।
গল পাথর কৈসে তরে অথাহ।
জাকৈ অন্তর বসৈ প্রভু আপি।
নানক ভেজন সহজি সমাতি ॥৫

কার্য্যে পশুর ন্যায় জাতিতে মানুষ,
এই প্রকারে পৃথিবীতে দিন রাত্রি ঘুরিতেছে।
বাহিরে ভেথ, অন্তরে মায়ার মলা,
তাহারা চেষ্টা করিয়াও ঢাকা দিয়া রাখিতে পারে না।
বাহিরে জ্ঞান ধ্যান এবং স্নান,
কিন্তু অন্তরে কুকুরের ন্যায় লোভ,
অন্তরে অগ্নি বাহিরে ভস্ম দিয়া ঢাকা।
গলায় পাথর বাঁধা কিরূপে অগাধ সমুদ্রে তরিবে?
যাহাদের অন্তরে প্রভু আপনি আসেন,
নানক বলিতেছেন, তাহারা সহজেই তাঁহাতে মগ্ন হয় ॥৫

শুণ অন্ধা কৈসে মারগ পাবৈ।
কর গহি লেহ ওড় নিবহাবৈ।
কহা বুঝারত বূঝৈ ডোরা।
নিমি কহীয়ে তউ সমঝৈ ভোরা।
কহা বিষম পদ গাবৈ গুংগ।
যতন করৈ তউভী সুর ভংগ।
কহ পিংগল পরবত পর ভবন।
নহী হোত উহা উস গবন।
করতার করুণা মৈ দীন বেনতী করৈ।
নানক তুমারী কিরপা তরৈ ॥৬

শুধু কর্ণে শুনিয়া অন্ধ কিরূপে পথ পাইবে!
তাহার হস্ত ধরিয়া পথে লইয়া যাইতে হইবে।
বধির ব্যক্তি কূট বাক্য কিরূপে বুঝিবে?
যদি তাহাকে বল রাত্রি সে বুঝিবে ভোর।
গঙ্গা কি কখন বিষ্ণুর গান গাহিতে পারে
যত্ন করিলেও সুর ভঙ্গ হইয়া যায়।
খঞ্জ ব্যক্তি কি কখনও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে?
সে কখনই পর পারে যাইতে পারে না।
হে সৃষ্টি কর্ত্তা, করুণাময়! দীন তোমাকে মিনতি করিতেছে।
নানক তোমার কৃপাতেই তরিতে পারে ॥৬

সংগি সহাই সুপাবৈ ন চীতি।

যো বৈরাই তাসি উ প্রীতি।
বলুয়া কে গৃহ ভীতর বসৈ।
অনদ কেলি মায়া রংগি রসৈ।
দৃঢ় করি মানৈ মনহি প্রতীত।
কাল ন আবৈ মূঢ়ে চীতি।
বৈর বিরোধ কাম ক্রোধ মোহ।
ঝুট বিকার মহা লোভ ধ্রোহ।
ইয়াহু জুগতি বিহনে কই জনম।
নানক রাখ লেহু আপন কর করম ॥৭
যিনি সঙ্গী ও সহায় তাঁহাকে মনে পড়ে না।
যাহার সঙ্গে বৈরতা, তাহারই প্রতি প্রীতি করে।
বালির গৃহেতে বাস করে,
এবং সেখানে মায়ার রঙ্গরসে সে মাতে।
মায়ার কার্য্যকেই মনে দৃঢ় করিয়া মানে।
কালের ভাবনা সেই মূঢ়ের মন মধ্যে আসে না।
বৈরতা, বিরোধ, কাম, ক্রোধ এবং মোহ,
মিথ্যা এবং মনবিকার, মহালোভ ও খলতা।
এই সকল লইয়া কত জন্মই যাওয়া আসা করে।
নানক বলিতেছেন, প্রভু আপনার দয়া বিস্তার করিয়া রক্ষা কর ॥৭
তুঁ ঠাকুর তুম পহি অবদাস।
জীউ পিংড সভ তেরী রাস ॥
তুম মাত পিতা হম বারিক তেরে।
তুমরী কৃপা মহি সুখ ঘনেরে ॥
কোয় ন জানৈ তুমরা অন্ত।
উচে তে উচ্চ ভগবন্ত ॥

সগল সামগ্রী তুমরে সুত্রধারী।
তুমতে হোয় সু আজ্ঞাকারী ॥
তুমরী গতি মিতি তুমহী জানী।
নানক দাস সদা কুরবানী ॥৮
তুমিই ঠাকুর, তোমার নিকট নিবেদন,
আত্মা এবং শরীর সকলই তোমার বস্তু।
তুমিই মাতা পিতা, আমরা তোমার সন্তান,
তোমার কৃপার মধ্যেই সুখ।
তোমার অন্ত কেহ জানে না।
তুমি ভগবান উচ্চ হইতেও উচ্চ।
তোমার সূত্রে সকল সামগ্রী গাঁথা।
তোমারই সৃষ্ট সকল তোমারই আজ্ঞাকারী
তোমার গতি মতি প্রভু তুমিই জান।
নানক দাস সর্ব্বদা তোমাতেই আত্মবলি দিতেছে।৮

৫ শ্লোক।

দেনহার প্রভ ছাড়িকৈ লাগহি আন সুয়ায়।
নানক কহু ন সীঝই বিন নাবৈ পতি যায় ॥১
দয়ার আধার প্রভুকে ছাড়িয়া যে অন্যতে আকৃষ্ট হয়,
নানক বলিতেছেন, সে কখনও সিদ্ধি লাভ করে না,
নাম না পাইয়া সে পতিত হয় ॥১

অষ্টপদী।

দশ বস্তুলে পাছে পাবৈ।
এক বস্তু কারণ বিখোট গবাবৈ ॥
এক ভী ন দেয় দশ ভী হিরি লেয়।
তউ মূঢ়া কহু কহা করেয় ॥
জিস ঠাকুর সিউ নাহী চারা।
তাকউ কীজৈ সদ নমস্কারা ॥

জকৈ মন লাগা প্রভু মীঠা।
সরব সুখ তাহু মন বুটা॥
জিস্ জন আপনা হুকুম মনায়া।
সব থোক নানক তিন পায়া॥১

ভগবানের দত্ত দশ বস্তু লইয়া তুমি নিকটে রাখিলে,
কিন্তু আবার এক বস্তু লাভের চেষ্টায় বিশ্বাসকে হারাইলে।
তোমার বিশ্বাস চলিয়া যাওয়ায় তুমি সে বস্তু পাইলে না এবং দশ বস্তু যাহা ছিল তাহাও হারাইলে।
হে মূঢ়, বল তখন তুমি কি করিবে?
যে ঠাকুর ব্যতীত আর কোন উপায় নাই,
হে মানব, তাঁহাকেই সর্ব্বদা নমস্কার কর।
যে মানুষের মনে প্রভুকে মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়,
তাহার মধ্যে সর্ব্বদা সুখ ও শান্তি বিরাজ করে।
যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশ মানিয়া চলে,
নানক বলিতেছেন, সকল বস্তুই সে প্রাপ্ত হয়॥১

অগনত সাহু অপনী দে রাস।
খাত পীত বরতৈ অনন্দ উলাস॥
অপনী অমান কুছ বহুর সাহু লেয়।
অজ্ঞানী মন রোস করেয়॥
অপনী প্রতীতি আপহী খোবৈ।
বহুর উস্‌কা বিশ্বাস ন হোবৈ॥
জিনকী বস্তু তিস আগৈ রাখৈ॥
প্রভুকী আজ্ঞা মানৈ মাথৈ।
উস্‌তে চৌগুন করৈ নিহাল।
নানক সাহিব সদা দয়াল॥২

অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ভগবান কত বস্তু দিতেছেন।
মানুষ তাহা আহার ও পান ও আনন্দে ভোগ করিতেছে।
ভগবান নিজে নির্লিপ্ত, কিন্তু কিছু যদি আবার মানুষের নিকট হইতে ফিরাইয়া লন,
অজ্ঞান মানুষ তাহাতে রাগ করে।
তখন তাহার মনের বিশ্বাস চলিয়া যায়।
পুনরায় তাহার বিশ্বাস মনে আসে না।
হে মানব, যাঁর বস্তু তাঁর সম্মুখে রাখ,
এবং তাঁর আজ্ঞা মস্তকে রাখিয়া পালন কর।
তাহা হইলে ভগবান তোমাকে চার গুণ কৃতার্থ করিবেন।
নানক বলিতেছেন, সেই প্রভু সদা দয়াল॥২

অনিক ভাতি মায়া কে হেতু।
সরপর হোবত জান অনেত॥
বিরথকী ছায়া সিউরংগ লাবৈ।
ওহ বিনসৈ ওহ মন পছতাবৈ॥
যো দীসৈ সো চালন হার।
লপট রহিও তহ অন্ধ অন্ধার॥
বটাউ সিউ যো লবৈ নেহ।
তাবউ হাথি ন আবৈ নেহ।
মন হরিকে নামকী প্রীত সুখদাই।
কর কিরপা নানক আপ লও লাউ॥৩

মায়ার বস্তুতে অনেক যত্ন করিতেছ,
কিন্তু তাহা অনিত্য, চলিয়া যাইবে।
যদি কেহ বৃক্ষের ছায়ায় আনন্দ করিতে থাকে,

ছায়া চলিয়া গেলে, মনে অনুতাপ করে।
যাহা দেখিতেছ তাহা অস্থায়ী।
যে ইহাতে মাতিয়া থাকে সে একেবারে অন্ধ।
যে পথিকের প্রতি প্রেম করে,
তাহার কিছুই প্রাপ্তি হয় না।
হে মন, হরি নামে প্রীতিই শান্তিকর
নানক বলিতেছেন তিনি কৃপা করিয়া এই প্রেম দান করেন ॥৩

মিথিয়া তন ধন কুটংব সবায়া।
মিথিয়া হউমৈ মমতা মায়া ॥
মিথিয়া রাজ জোবন ধন মাল।
মিথিয়া কাম ক্রোধ বিকরাল ॥
মিথিয়া রথ হস্তী অশ্ব বস্ত্রা।
মিথিয়া রংগ সংগ মায়া পেন হস্তা ॥
মিথিয়া ক্রোধ মোহ অভিমান।
মিথিয়া আপস উপর করত গুমান ॥
অস্থির ভগত সাধকী সরন।
নানক জপ জপ জীবৈ হরিকে চরণ ॥৪

বৃথা তনু, ধন এবং কুটুম্ববর্গ
বৃথা অহঙ্কার এবং মায়া মমতা।
বৃথা রাজা, যৌবন, ধন এবং বিষয়।
বৃথা শম এবং বৃথা বিকট ক্রোধ।
বৃথা রথ, হস্তী, অশ্ব এবং বস্ত্র।
বৃথা মায়ার রঙ্গ সঙ্গ, বৃথা দৃশ্য এবং হাস্য।
বৃথা ক্রোধ মোহ এবং অভিমান।
আপনাকে বড় মনে কর, তাহাও বৃথা।
সাধু ভক্তের শরণ লইয়া সাধন করাই স্থায়ী কার্য্য।
নানক বলিতেছেন, হে জীব অহরহ হরি চরণ জপ কর ॥৪

মিথিয়া শ্রবণ পর নিংদা শুনহি।
মিথিয়া হস্ত পর দরব কউ হিরহি।
মিথিয়া নেত্র পেখত পর ত্রিয় রূপাদ।
মিথিয়া রসনা ভোজন অনস্বাদ।
মিথিয়া চরণ পর বিকার কউ ধাবহি।
মিথিয়া মন পর লোভ লুভাবহি।
মিথিয়া তন নহী পর উপকারা।
মিথিয়া বাস লেড বিকারা।
বিন বুঝে মিথিয়া সভ ভও।
সফল দেহ নানক হরি হরি নাম লও ॥ ৫

কর্ণ বৃথা যদি তাহা পরনিন্দা শ্রবণ করে।
হস্ত বৃথা যদি তাহা পরদ্রব্য হরণ করে।
নেত্র বৃথা যদি তাহা পর স্ত্রীর রূপ দর্শন করে।
রসনা বৃথা যদি তাহা অভোজ্য ভোজন করে।
চরণ বৃথা যদি তাহা পরকে কষ্ট দিবার জন্য ধাবমান হয়।
মন বৃথা যদি তাহা পরবস্তু লোভে মুগ্ধ হয়।
শরীর ধারণ বৃথা, যদি তাহা পর উপকার না করে।
বাস গৃহ বৃথা যদি তাহাতে এইরূপ বিকার হয়।
ভগবানকে না বুঝিলে সকলই বৃথা হয়।
নানক বলিতেছেন, হরি নাম লইলেই সফল দেহ হয় ।৫

(ক্রমশঃ)

অজিতের সন্ন্যাস।

বেলা অবসান প্রায় দুইটী যুবক আগ্রার তাজ মহলের ভিতর, একটা প্রবেশ দ্বারের উপর বসিয়া ছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণবর্ণ কিরণছটা, উদ্যানের বৃক্ষের মাথায় ও তাজের চুড়ার উপর খেলা করিতেছিল। স্থানটি শান্ত এবং নিস্তব্ধ। যুবকদ্বয়ের এক জন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অজিত! এখানে বস্‌লে কি আর বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়?" অজিত বলিলেন, "সত্য বল্‌ছি উপেন, আমার এখানে বস্‌লে বাড়ীর কথা একটুও মনে হয় না, মনে যেন কি একটা ভাব আসে। আজ কি ঐশ্বর্য্য, কি বিলাস, কি উদ্ভাবনী শক্তি, কি শিল্পের পরিচয় দিতেছে! কিন্তু দেখ জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে, এই শিল্পী, এই ধনবান, ইহাদেরও ত বিনাশ আছে।"

উপেন। তা' আছে বৈকি! আরও দেখ কাল পরিবর্ত্তনশীল, যেস্থান এক দিন প্রহরী বেষ্টিত থাকিয়া লোকলোচনের অগোচর ছিল, আজ তাহা আমাদের মত নগণ্য লোকদেরও দেখা দিয়া তৃপ্ত করিতেছে। আজ যে দুঃখী কাল সে সুখী, আজ যে ধনবান কাল সে নির্দ্ধন, আজ আমরা গরিব কাল হয়ত বড়লোক হ'তে পারি।

অজিত। আমার পক্ষে আর তা'হা হ'বে না।

উপেন তা' বলা যায় না। বিশেষ তুমি এম্‌. এ, পাশ করা ছেলে, তোমার উন্নতি,ত হয়েই আছে।

অজিত। সে কাল আর নাই, এখন এম, এ, পাশের ভাগে ৫০৲ টাকা মাহিনার চাকরী। তবে যদি আলফলায়লার আবুহোসেনের মত কোন দিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি যে সম্রাট হয়েছি, সে কথা স্বতন্ত্র।

উপেন। দেখ অজিত, একটা কথা মনে হ'ল, তুমি বিয়ে কর্‌বে? আমার একটা সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু আমার মন নাই, তুমি করত দিয়ে দিই।

অজিত হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বলেছ, এদিকে ন পিতা ন মাতা, এদিকে আপনার বলতে একটী পয়সা নাই, মেসে থাকি, স্কুলে মাষ্টারি করে দিন চালাই, এই বিয়ের উপযুক্ত অবস্থাই বটে। তুমি বরং কর তোমার অবস্থা অনেক ভাল, ও সব সন্ন্যাস ফন্ন্যাসের মতলব ছেড়ে দাও, বিয়ে হ'লেই মনের বৈরাগ্য কমে যা'বে।

উপেন। না অজিত, সম্বন্ধটী খুব ভাল, বাপের একটি মেয়ে তাদের অগাধ পয়সা, তা'রা একটী ভাল ছেলে চায়, নিজের বাড়ীতেই রাখবে। আমিত কর্‌বই না, যদি তুমি কর ত এখনি দিয়ে দিই।

অজিত মন্দ নয় বটে, কিন্তু তা'রা কি আমায় পছন্দ করবে? যদি করে ত দেখ।

উপেন। আমার মনে হয় কর্‌বে, কিন্তু

তা'হ'লে তুমি কত বড়লোক হ'বে, হয়ত আমাকে চিনিতেই পার্‌বে না।

অজিত। আমার যদি কখনও পয়সা হয়, অহংকার বলে জিনিসটা শরীরে স্থানই পাবে না। এই দরিদ্রাবস্থা থেকে যদি কখনও উন্নত হ'তে পারি, দেখো জগতের কত উপকার কর্‌ব, গ্রামে গ্রামে জলাশয় খনন কর্‌ব, দরিদ্রের জন্য অতিথিশালা স্থাপন কর্‌ব, দুষ্ট ছাত্রের জন্য স্কুল খুল্‌ব, কন্যা দায়গ্রস্তকে সাহায্য কর্‌ব —

বাধা দিয়া উপেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "থাক্ থাক্ আর না, সে আর পেরে উঠ্‌বে না, পয়সা হ'লে কি ও সব মনে থাকে? তখন "চেরিব্লসম" ভাল না "হাসনা হানা" ভাল? স্বদেশী পমেটম কিছু নয় "ভিনোলিয়া" পমেটম ভাল! ঘুড়ীচড়া সেকেলে ফ্যাসান, মটরকার চাই।

অজিত বলিলেন, "আচ্ছা যদি কখনও হয় দেখো, পরোপকারে আত্মজীবন নিয়োগ কর্‌ব। এখন এস একটু বেড়াই।"

উভয়ে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত তাজমহল, মধ্যে একটি গম্বুজ ও চারি পার্শ্বে চারিটি মিনার, ভূমি তলে স্থানে স্থানে নানাবর্ণের প্রস্তরে গালিচা অঙ্কিত, অট্টালিকার গাত্রে অতি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে, সুন্দর নানাবর্ণের প্রস্তরে খচিত লতাপাতা দ্বারের পার্শ্বে ও উপরে, স্তম্ভগাত্রে শোভিত আছে, গোর স্থানে মধুর মৃগনাভির সুগন্ধ। তাজমহলের উদ্যানে হরিৎ, লোহিত নানাবর্ণের তৃণে গালিচা বিনির্ম্মিত হইয়া দর্শকের ভ্রম ও প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, প্রবেশ দ্বার হইতে তাজের সোপানে উঠিতে পথের দুইপার্শ্বে কৃত্রিম জলাশয়, তাহাতে আবার ২।১টী পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এবং একটীতে মধুমক্ষিকা চক্র প্রস্তুত করিয়াছে। তাজের পার্শ্ব দিয়া যমুনা প্রবাহিত, তাহার অপর পারে হরিৎবর্ণ শস্য ক্ষেত্র, তাহার পার্শ্বে গ্রাম, কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শ্রেণী দূর হইতে যেন খেলা ঘরের মত দেখাইতেছে। অজিত ও উপেন্দ্র প্রীতি-বিকশিত নয়নে সমস্ত চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পরে উপেন্দ্রের যত্নে কলিকাতার সেই ধনী কন্যা পঙ্কজিনীর সহিত অজিতের বিবাহ হইয়াছিল। অজিতের সুগঠন ও অবয়ব, সৎ চরিত্র, বিদ্যা ও নম্রস্বভাব, ধনীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সে জন্য দীন হীনকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়া তিনি নিজগৃহে রাখিয়া দিলেন।

২

অজিতের বাহিরের ঘরে উজ্জ্বল দীপালোক প্রতিফলিত, সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অজিত নয়ন মুদিত করিয়া মখমল মণ্ডিত চেয়ারের উপর অর্দ্ধ শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের স্থূল গৌরবর্ণ অঙ্গুলির উপর হীরকাঙ্গুরীয় দীপালোকে ঝক্‌মক করিতেছে, মাথার উপর পাখা চলিতেছে, অজিতের সুবিন্যস্ত কেশের সুগন্ধতৈলের সৌরভ বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, উপেন্দ্র আসিয়া

দ্বারের উপর দাঁড়াইলেন। সেই শীর্ণ দীন হীন যুবকের পরিবর্ত্তে, এই হৃষ্টপুষ্ট অবয়ব দেখিয়া তিনি যেমন সুখী হইলেন, তেমনই সেই নম্র, সঙ্কোচময়, সরল মুখের পরিবর্ত্তে অসৎভাব প্রতিফলিত দাম্ভিক মুখচ্ছবি দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক অসুখী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "অজিত"! আহ্বানে চক্ষু চাহিয়া অজিত বলিলেন, "উপেন, এসেছ? এস! তুমি যে ভারি সন্ন্যাসী হয়ে পড়লে, একেবারে পরিব্রাজক হয়ে কোথায় যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ, খুঁজেও পাই না। কবে এসেছ?"

উপেন অন্য চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "এদেশে ছিলাম না, সম্প্রতি এসেছি।" ২।১টা কথার পর উপেন বলিলেন, আমি চার পাঁচ বৎসর আগে যখন যাই, তখন দেখিয়া গেলাম তোমার শ্বশুর যে লোহার কারবার করে দিলেন তা'তে খুব উন্নতি করেছিলে, আর নিজের পয়সায় নানা সৎকার্য্য করতে ও সৎচরিত্র ছিলে। কিন্তু এই কয় বৎসর পরে এসে দেখি যে, সে স্বভাব একেবারে হারিয়েছ, লোকের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার কর, লোককে ফাঁকি দাও, কোন রকম সৎকার্য্য আর কর না, নিজে অসৎ চরিত্র হয়েছ। অজিত! তোমার মত শিক্ষিত যুবার কি এই পরিণাম?

অজিত। নিজের চরিত্র কৈ নষ্ট করেছি, আর কারেই বা ফাঁকি দিয়েছি? বাঙ্গালীর স্বভাব, লোকের ভাল হলেই তার সঙ্গে লাগে।

উপেন। তুমি কি ইংরাজ? বাঙ্গালীর নিন্দা অন্য জাতি কর্‌লে বরং সহ্য হয়, কিন্তু বাঙ্গালী কর্‌লে বড় প্রাণে লাগে। বাঙ্গালীর সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তার নিন্দা না করে সংশোধনের চেষ্টা করাই ত উচিত। একটা বিশাল জাতি যত পুরাতন হইয়া আসে, তাহাতে নানা প্রকারের লোক উৎপন্ন হইয়া তাহাকে কতকটা নিন্দনীয় করে কিন্তু আবার তেমনই মনস্বী ব্যক্তি উৎপাদিত হইয়া তাহার দোষ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তোমার চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোমার মুখে এখনও কিসের গন্ধ বল দেখি?

অজিত উগ্রভাবে বলিলেন, "ও সব লেকচার দিবার জন্য তুমি এসোনা, ওসব কথা বলত আসবার দরকার নাই, আমার ঢের বন্ধু আছে।"

উপেন। তা'রা তোমার বন্ধু না শত্রু যাহারা তোমার পয়সায় তোমায় নষ্ট করে? সেই পশুগুলা কি তোমার মত সুশিক্ষিত যুবার উপযুক্ত?

অজিত সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "রাত্রি ৮টা বাজে, আমার বিশ্রামের সময় হয়েছে, এ সময় আমি কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারি না, তুমি বিদায় হও।" অজিত অন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন।

৩

অজিতের চরিত্র দোষ দেখিয়া তাঁহার শ্বশুর বড় বিরক্ত হইতেন, এবং অজিতও তাহা বুঝিয়া বিরক্ত হইতেন, এইরূপে

দিন দিন উভয়ের মনোমালিন্য জন্মিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর অজিত আসিয়া আপন শয়ন কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন, তাঁহার চরণ যুগল টলিতেছিল। গৃহমধ্যে পঙ্কজিনী পালঙ্কের কাষ্ঠদণ্ডে মস্তক রক্ষা করিয়া ভূতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। পঙ্কজিনীর কিসের চিন্তা? অথবা অসৎ স্বামীর পত্নীর আবার চিন্তার অভাব কি? চিন্তা এবং অশ্রুজল তাঁহার অঙ্গের আভরণ, মুখের মলিন ও স্ফূর্ত্তিশূন্য ভাব, নয়নের বিষাদময়ী দৃষ্টি, তাঁহাদের মনোবেদনার সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি হৃদয়ে সতত যে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেন, অন্য শত আনন্দে তাহা অপসারিত হয় না। সে বেদনা হীরার নেক্‌লেস, মুক্তার মালা, সিল্কের জ্যাকেটের অন্তরালে থাকিয়াও অভাগিনীর জীবন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করে।

পঙ্কজিনীর ছোট ছেলেটী ও মেয়েটী নিকটে বসিয়া খেলা করিতেছিল। মেয়েটি মাতার নয়নে অশ্রু দেখিয়া খেলা পরিত্যাগ করিয়া নিকটে আসিল, এবং মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "মা! তুমি রাত দিন কাঁদ কেন?" অজিত দ্বারের উপর হইতে বলিলেন, "ঠিক কথা রাত দিন কান্না ভাল লাগে না।" পঙ্কজিনী স্বামাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া শয্যার উপর বসাইলেন, অজিত শয্যায় বসিয়া বলিলেন, "এ কান্নার একটা নিষ্পত্তি কর, রাত দিন এ যে ভাল লাগে না।" পঙ্কজিনী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুমি কাঁদাও তাই কাঁদি!"

অজিত। কিন্তু আমিত তা' ভাল বাসি না, তাহ'লে তোমায় অন্য জায়গায় গিয়া থাকতে হ'বে। পঙ্কজিনীর পিতা গৃহের বাহির দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া বলিলেন, "ওর অন্য জায়গায় গিয়ে থাক্‌বার কথা নয়, তুমি এখনি অন্য জায়গায় গিয়ে থাক"।

অজিত আরক্ত মুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই চল্লেম, তোমার মতন দশটা শ্বশুরকে আমার চাকর রাখ্‌বার ক্ষমতা আছে। তোমাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, আমি কালই আবার বিয়ে কর্‌বো।"

অজিত সক্রোধে টলিতে টলিতে চলিলেন, শ্বশুর একটু জোরের সহিত বলিলেন, "আর খবরদার এ মুখো হয়োনা। পঙ্কজিনী! তুই মনে করিস্ তুই বিধবা। রামদয়াল! পাঁড়েকে বলে দে, এই লক্ষ্মীছাড়াকে আর যেন ফটকের এদিকে আস্‌তে না দেয়।"

অজিত চলিয়া গেলেন, পঙ্কজিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে অজিত একটী সামান্য ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, "কালের কি বিচিত্র লীলা, এক মুহূর্ত্তে ভিখারীকে রাজা ও রাজাকে ভিখারী করে। গরিবের ছেলে, কত কষ্টে লেখা পড়া শিখলেম, আমার অদৃষ্টে

কত উন্নতি হ'ল, আবার শশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলাম, দুই বৎসরের মধ্যে কারবারে লোকসান হয়ে আজ পথের ভিখারী হলেম। যখন চলে আসি শ্বশুর কারবার কেড়ে নিতে পারতেন, শুধু পঙ্কজিনীর জন্য নেন নাই, পাছে খেতে না পায়। আহা! আমার অসৎ প্রবৃত্তিতে সতী কত কেঁদেছ, যখন চলে আসি, কত চিঠি দিয়েছ, লোক পাঠায়েছ, আমি যাই নাই, চিঠির উত্তর দিই নাই। আমার প্রাণের তপেন্দ্র ও চারুহাসিনী এখন কত বড় হয়েছে, আমি পামর পিতা তা'দের ভুলে আছি। এখন এই সব উৎকৃষ্ট গ্রন্থই আমার সান্ত্বনা! ভগবানের চরণছায়ায় আমার চিরের সন্তাপ দূরে যাবে।"

উপেন্দ্র আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "অজিত! ঘরে আছ?" "এসেছ? উপেন এসেছ? আমি যে এখন রোজ তোমায় মনে করি।" বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া অজিত বালকের ন্যায় উপেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। উপেন বলিলেন "অজিত! অজিত! আজ যেন আমাদের শৈশব কাল আবার ফিরে এল, তখন স্কুলে পড়িতাম।" উপেনের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। অজিতের শীর্ণ দেহ, মলিনবর্ণ, ম্লান মুখ, দেখিয়া উপেন অশ্রুমোচন করিলেন।

আহারের পর রাত্রিতে যখন অজিত একটী ক্ষুদ্র ট্রঙ্কে আপন পুস্তকগুলি গুছাইতে ছিলেন, দ্বারের উপর যেন একটি স্ত্রীলোকের ছায়া পড়িল। অজিত মুখ তুলিয়া দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটে গেলেন, এবং সাদরে আগন্তুকার হাত ধরিয়া বলিলেন, পঙ্কজিনী! আজ আমি মনে করছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি, কিন্তু তুমি যে কত যেতে বলেছ, আমি যে যাই নাই পঙ্কজিনী, তাই আজ যেতে লজ্জা হচ্ছিল।

স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া পঙ্কজিনী বলিলেন, "অন্য লোকের কাছে লজ্জা হয় বলে কি আমার কাছেও লজ্জা করবে?" স্বামীর শীর্ণদেহ, সামান্য গৃহসজ্জা, অন্ধকার অপ্রশস্ত গৃহ, দেখিয়া সতী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কয়েকটি কথার পর পঙ্কজিনী বলিলেন, "বাবা মারা গিয়াছেন আমি তোমায় ডাকিতে আসিয়াছি ঘরে এস। শ্বশুরের কথা শুনিয়া আক্ষেপ করিয়া অজিত বলিলেন, "আমি একবার গিয়ে মাপ চাইবার সময় পেলাম না।" উভয়ে অনেক কথা হইল, অজিতের বিপদের কথা, কারবারের কথা, অন্নকষ্টের কথা শুনিয়া কতবার পঙ্কজিনীর ক্ষুদ্র হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল, কতবার তাহার ইন্দীবর নেত্রে শিশির বিন্দুর মত অশ্রু প্রকাশ পাইল। তাহার মনোকষ্টের কথা, কিরূপে সে চিন্তায় দিবা যামিনী কাটাইয়াছে, বিনিদ্র নয়নে নিশা যাপন করিয়াছে, পিতার নিকট যাইতে চাহায় রোরুদ্যমান শিশু পুত্রকে সে কিরূপে সান্ত্বনা দিয়াছেন, সমস্ত শুনিয়া অভাগা অজিতের বক্ষ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

কয়েকটী কথার পর অজিত বলিলেন, "পঙ্কজিনী আমি আর ঘরে ফিরে যা'ব না,

কয়েক মাস ধরে আমার ভগবানে মন হয়েছে, অমি আজ উপেনের সঙ্গে ঠিক করেছি কাল তার সঙ্গে নেপালে যা'ব, তা'র সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বাগানে বাগানে বেড়িয়ে বেড়া'ব, ভগবানের লীলা দেখে দেখে না যুগল ঢালতেছিল। ... পঙ্কজিনী পাকে আরাধনা কর্‌বো।” অনেক বাদানুবাদের পর পঙ্কজিনী বলিলেন, “তবে আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব, উপেন্দ্র ও চারুহাসিনী মার কাছে থাক্‌বে, তোমার যে গতি আমারও সেই গতি।” অনেক কথার পর তাহাই ঠিক হইল।

পরদিন অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পঙ্কজিনী গেরুয়া বসন পরিধান করিলেন ও অজিত সার্ট কোট খুলিয়া গেরুয়া বস্ত্র ও চাদর পরিলেন। অজিত হাসিয়া বলিলেন, “পঙ্কজিনী! বিবাহের রাত্রিতে যে দুজনে সেজে ছিলাম, সিল্ক ভেলভেট, হীরা, মুক্তা, পুষ্প চন্দন প্রভৃতিতে, আর আজ এই সাজ, কোনটায় আমাদের ভাল মানাইয়াছে বল দেখি?”

পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিলেন, “এইতেই মানাইয়াছে, কিন্তু কেবল গেরুয়া পরিলে চলিবে না, হৃদয় যখন গেরুয়া পরিয়া বৈরাগ্যের পরিচয় দেয়, তখনই প্রকৃত গৈরিক ধারণ করা হয়, নচেৎ গৈরিক ধারণে কেবল মানুষকে প্রতারণা করা ও ভগবানের নিকট অপরাধ করা হয় মাত্র।

অজিত বলিলেন, “আমার মতে বাহিরে গৈরিক ধারণের কোন প্রয়োজন নাই, অন্তর যদি গৈরিক ধারণ করে, ভগবান তাহাতেই প্রীত হন।”

সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

বামারচনা।

সন্তোষ।

যাহা আছে তাই ঢের
তাহা লয়ে রব মেতে,
যাহা নাহি, নাহি থাক্
নাহি সাধ তাহা পেতে,

আমার ভাবনা তুমি
আমা হতে ভাব বেশি,
সেধে যাব আমি শুধু
নিজ কাজ দিবানিশি।

৩

তুমি ত প্রেমের খনি
চির সত্য, শুভময়,
তোমারি সন্তান আমি
আমার কিসের ভয়?

পাঠায়েছ ভব গেহে
খেলিতে জীবন খেলা
স্নেহ ভরে লবে ডেকে
ভাঙ্গিলে সাধের মেলা।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত,
চট্টগ্রাম।

বউ কথা কও।

কে তুমি হে পিকবর গগনে উধাও
মধুর সমীর ভরে
উধাও অম্বর পরে
প্রাণ খুলে গাহ গান—"বউ কথা কও"—

২

উদাস বাতাসে সদা ঘুরিয়া বেড়াও
নিকুঞ্জ কানন তলে
মধুর সঙ্গীত বোলে
সুললিত কণ্ঠে গাহ "বউ কথা কও"—

৩

লতা পাতা বিজড়িত নিবিড় কানন
পাতা গুলি রহি রহি
বিরহ সঙ্গীত গাহি
হুতাশে নিদাঘ শ্বাসে ঝরিছে কেমন।

৪

তুমিরে বিহগ সদা গগণে উধাও—
হেথায় সে বঙ্গবালা
সহিছে অসহ্য জ্বালা
আবার আবার গাহ "বউ কথা কও-

৫

পশ্চিম গগণে ওই তপন লুকায়
কলসী ডুবায়ে জলে
কমনীয় কক্ষে তুলে
ধীরে ধীরে কুলবধূ গৃহ পানে যায়।

ঘোমটায় ঢাকি মুখ ধীরে চলে যায়
শ্বাশুড়ীর কটু ভাষে
ননদের ঈর্ষা দ্বেষে
ভেঙ্গে গেছে ভাঙ্গা প্রান বিষ বেদনায়

৭

অলস হতাশ মনে প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়
অমনি আড়ালে রয়ে
বউ কথা কও গেয়ে
মরমে কৌতুক পাখী জাগাও তথায়

৮

কুলবধূ গণে পাখী সাধিয়া বেড়াও
তারা সব বসি ঘাটে
নীরবে গাসন মাঝে
এমন সময়ে গাহ -"বউ কথা কও"

নব পরিণীতা বধু তোমারি কুজনে
কভু আনমনে থাকি
বসনে আনন ঢাকি
লজ্জায় আরক্ত মুখী পশে গৃহ কোণে-

১০

ধন্য হে সাধক তুমি তব সাধনায়
নিগূঢ় রহস্য কথা
প্রকৃতির পটে গাঁথা
পতি বুকে কুলবধু সলাজে লুকায়।

১১

বরিষার মেঘারম্ভে আঁধার গগন
মেঘ গুলি ছুটে এসে
চপলা বিজলী পাশে
লুব্ধ প্রেম আলিঙ্গনে বেড়ায় কেমন।

১২

নিসঙ্গ অবলা কুলে তুমি সহচর
সমাজের নিপীড়নে
রমণী সহিছে প্রাণে
"বউ কথা কও" বুলি ভাবে নিরন্তর

১৩

কাঁদিও না [illegible]
পরদিন [illegible]
প্রাণ ভরা কত আশা
অপূরণ ভাল বাসা,
আবার আবার গাহ—"বউ কথা কও"

১৪

কত সে কাঁদিবে আর কুল অভাগিনী
সদা গৃহ কোণে রয়ে
কতই যাতনা সয়ে
পুষিবে পরাণে সদা জ্বলন্ত আগুনি।

১৫

বিহগ তোমার ভাই স্বাধীন জীবন
ঘৃণা নাই লজ্জা নাই
শত্রু উপহাস নাই
তবু তুমি কর কেন এ হেন সাধন।

১৬

শীতল সমীর সনে ঘুড়িয়া বেড়াও
কুল বধু বসি যেথা
ত্বরায় যাইয়া সেথা
কৌতুলে গাহলো গান "বউ কথা কও"

১৭

জানিনারে পাখী তোর সাধনা কেমন
নিভৃতে পরাণ পুরে
কত জ্বালা আছে ঘিরে
তুমি কি বুঝিবে ভাই প্রাণান্ত বেদন।

১৮

অনন্ত সুনিলাকাশে ঘুরিয়া বেড়াও
তোমা ছাড়া আর ভাই
এমন সুজন কই
আবার আবার গাহ "বউ কথা কও"

শ্রীমতী প্রিয় বালা রায়।

নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 616. December 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৬ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩২১। ডিসেম্বর, ১৯১৪। ১০ম কল্প ৩য় ভাগ

অতীত-পূজা।*

আমি অতীত পূজার আবশ্যকতা-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন লইয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। প্রবন্ধ লিখিয়া নিজ কৃতিত্ব-প্রকাশরূপ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। ভাবের অভাব, ভাষার দরিদ্রতা এবং যুক্তিহীন-কল্পনা হয়ত সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান; তাহা জানিয়াও যে নিরস্ত হই নাই, তাহার উদ্দেশ্য, আজিকার পূত পুণ্য তিথিতে কলি কলুষ-নাশন প্রেমময়ের প্রেমপূর্ণ নামে, তদীয় কথাপ্রসঙ্গে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। আমার সহায়—সেই সর্ব্বৈক-সম্বল শ্রুতপূর্ব্ব প্রাচীন কাহিনী, এবং ভরসা—চিন্তাশীল জন-সাধারণের সহৃদয়তা।

প্রতিপাদ্য প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন অনুকূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে, আমার বোধ হয়, যেন দেশ, কাল এবং অবস্থা-বিপর্য্যয়রূপ কঠিন অর্গলে তাহা চির রুদ্ধ হইয়া আছে। ভগবানের আদেশ, শাস্ত্র, মহাজনবাক্য এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বাস সেই রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিবার প্রধান সহায়। বিশ্বাসকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিবার কারণ এই যে তাহার অভাবে অর্থাৎ অবিশ্বাসী হইলে, প্রথমোক্ত উপায়সমূহের কার্য্যকারী হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য বিশ্বাস সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বাস মানব-প্রকৃতির সহিত চির-বিজড়িত-ভাবে কি কার্য্যারম্ভে, কি কার্য্যশেষে, সকল সময়েই কখন কার্য্য-পরিচালক, কখন উৎপত্তি-কারকরূপে প্রতিভাত হয়। কখন কার্য্য-ফল হইতে বিশ্বাস জন্মে, আবার কখন বা

* জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পূর্ণিয়া-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

বিশ্বাস হইতে কার্য্য প্রসূত হয়। সে হিসাবে বিশ্বাসকে পরস্পর-সংযুক্ত-ধর্ম্মাক্রান্ত (Co-relative) বলা যাইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রেও বোধ হয় এই জন্যই, "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি" বলিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে বিশ্বাস যে ধর্ম্মের মূল, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অতএব ধর্ম্ম মানিতে হইলে, প্রথমেই বিশ্বাস মানিতে হইবে। ধর্ম্ম এবং বিশ্বাস এতদুভয়ের মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, ধর্ম্ম কি, তাহাও অবগত হওয়া আবশ্যক। ধৃ-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ম-প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা ধরা; অতএব যাহা ধরিবার বা ধারণীয়, অথবা জীবকুল যাহা ধারণ করিয়া স্থির হইয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যায় আরও অনেক প্রকার উক্তি আছে; তন্মধ্যে জ্ঞানবাদ-মতে "মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম।" ধর্ম্মের এই শেষোক্ত অর্থ অতি কঠিন সত্য। ধর্ম্মের প্রথমোক্ত ধাত্বর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, ধর্ম্ম ছাড়িয়া জীব এক মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে পারে না। সমগ্র জীবকুল একই ধর্ম্মপ্রভাবে ধরাধামে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু মানবজাতি, জীব-পর্য্যায়ে এক হইলেও, এবং আহার নিদ্রা মৈথুন প্রভৃতি একই সাধারণ ধর্ম্মনিয়ন্ত্রিত হইলেও একমাত্র জ্ঞানবলে মানবেতর জীব হইতে সম্পূর্ণরূপে আপন স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া জীবজগতে শ্রেষ্ঠপদবাচ্য হইয়াছে। ক্ষুধা পাইলে খাইতে হয়, এ সাধারণ জ্ঞান সর্ব্বজীবেরই আছে, মানবেরও আছে। মানবেতর জাতি খাদ্যদ্রব্য অপক্কাবস্থায় ভক্ষণ করে, কিন্তু মানব তাহা করে না; সে উন্নত জ্ঞান-প্রভাবে সেই একই আহার্য্য নানা উপায়ে অবস্থান্তরিত করিয়া, রসনা-পরিতৃপ্তিকর করিয়া লয়। মানবের ঈদৃশ জ্ঞানই কি তাহাকে জীব-জগতে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করিয়াছে? ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ সাধারণ ধর্ম্মসাধন সকল জীবেই করিয়া থাকে, তাহা হইলে মানবের মানবত্ব কোথায়! মানবে আর পশুতে প্রভেদ কই? প্রভেদ আছে—যে ত্রিবিধ কর্ম্ম মানব এবং তদিতর জাতি কর্ত্তৃক সমভাবে অবলম্বিত, উহা সর্ব্বজীবের সাধারণ ধর্ম্ম; তাহা ব্যতীত যাহা, তাহাই মানবের "স্বধর্ম্ম॥" এই স্বধর্ম্ম অর্থে কোন জাতি বা দেশ অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম নহে, উহা সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্ম। "স্ব" শব্দে আত্মাকে বুঝায়, অতএব স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম; সে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, আত্মার আধারভূত এই দেহ অগ্রেই রক্ষণীয়। চলিত কথায় আছে, "আত্ম রেখে ধর্ম্ম," সেই আপনাকে রাখিতে বা জানিতে হইলে, ঐহিক স্বচ্ছন্দতা (বিলাসিতা নহে) আবশ্যক, তাহাও বুঝিতে পারি; কিন্তু বুঝি না কেন আমরা ধর্ম্মের নামে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করি? ভগবান বলিয়াছেন

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"
গীতা, ৩য় অঃ ৩৫ শ্লোক।

এই ভগবদুক্তির সাধারণ অর্থে বুঝা যায় যে, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা আপন ধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও, তাহাতে মঙ্গল হয়। ভয়াবহ পরধর্ম্ম অপেক্ষা নিজ ধর্ম্মে মৃত্যুও কল্যাণপ্রদ।

জ্ঞানবাদ্ ধর্ম্মশব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পাইয়াছি—পরমাত্মার প্রতি যাহাতে ভক্তি জন্মায়, তাহাই ধর্ম্ম। "স্বধর্ম্ম" অর্থে আত্ম-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম, তাহাও পাইয়াছি। জীবাত্মার প্রতি লক্ষ্যই স্বধর্ম্মের গূঢ়ার্থ এবং সেই সূত্রে 'পরধর্ম্ম' অর্থে অন্য জাতি বা দেশ বা সম্প্রদায় নহে, উহা পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। এজন্য পরধর্ম্ম অর্থে পরমাত্মা সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম। জ্ঞানবাদের কথা যদি মানিতে হয়, তবে উক্ত ভগবদ্বাক্যের অর্থ অন্যরূপ হইয়া পড়ে অর্থাৎ পরমাত্মা সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হওয়াও মঙ্গলকর; কারণ, পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম, যাহা জীবাত্মাকে না জানিলে হয় না, তাহা অগ্রে অনুষ্ঠিত হইলে, নিশ্চয়ই ভয়প্রদ হয়। বৃক্ষে আরোহণ না করিলে ফলপ্রাপ্তি ঘটে না।

অর্জ্জুন কতকটা সেই রকম আশা করিয়াছিলেন। তিনি অধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মযুদ্ধ ত্যাগ করিয়া, যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ উপদেশ দ্বারা তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত করেন। তাঁহার উক্ত বাক্যও যে অভ্রান্ত, তাহাও অর্জ্জুনকে দিয়াই প্রতিপন্ন করেন। তিনি বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ তাঁহাকে সেই রূপের একাংশ মাত্র প্রদর্শন করেন; অর্জ্জুন তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর রক্ষা কর, আমাকে তোমার সেই পূর্ব্বেকার সৌম্যমূর্ত্তি প্রদর্শন কর।" আমার বোধ হয়, ধর্ম্মের নামে আমাদের ভয়ের কারণ আর কিছুই নহে কেবল একলক্ষে সাগর পার হইয়া সীতাদেবীর সংবাদ আনিতে সমর্থ নহি—সেইজন্য। কি হইলে যে সীতাতত্ত্ব জানিতে পারি, তাহা আমরা ভাবিয়াছি কি? বক্ষ চিরিয়া শ্রীরাম সীতার যুগলমূর্ত্তি দেখাইতে আমাদের সাধ্য হয় কি? যদি আপনাকে সেইরূপে জানিতে পারিয়া থাকি, ভালই, নতুবা আগে সেই জীবাত্মাকে ভালবাসিয়া আত্মসমর্পণ করি; তার পর জ্ঞান-বাদের বাক্যানুসারে সেই পরের ধর্ম্ম পরাৎপর পরমাত্মাকে ভালবাসিয়া, আত্মপর অভেদ হইয়া অনন্ত মিলন-রসের যেন অধিকারী হই।

বক্তব্য বিষয়ের সহিত প্রস্তুত বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, পরোক্ষ সম্বন্ধ আছে। আমাদের অতীত-পূজার উদ্দেশ্য— সকল মানবেরই সাধারণ জীবধর্ম্মের সংযত ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করিয়া, পরিশেষে মানবদেহ ধারণের সাফল্য-জ্ঞাপক

জ্ঞানপ্রাপ্তি এবং সেই জ্ঞানের শেষ পরিণতি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার পরম মিলন মহাযোগ সমাধি হেতু। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, ন্যায়, মীমাংসা-পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ এবং অলঙ্কার প্রভৃতি সকলই এক-তানে পরম মিলন-রস-সঙ্গীতে আমাদিগকে সেই মিলন-পথের পথিক হইতে আহ্বান করিতেছে। অতীত-নির্দ্দিষ্ট সে পথে চলিতে হইলে যে সংযম বা ধৈর্য্য এবং সময় আবশ্যক, মানবের কি তাহা নাই? অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার সেই সময় সেই ধৈর্য্য থাকা সত্ত্বেও সে, সংযম এবং সময়াভাবের অভিযোগ আনিয়া, "অবিদ্যা-সম্ভূত "সংশয়"-রাশিকে হৃদয়মধ্যে পোষণ করত আত্ম-বিজ্ঞানের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে বিরত হয় না। আমাদের অতীত আদর্শ মানবের সেই সংযম সেই সময় সুপথে চালিত করিয়া, মানবকে প্রকৃত মানব হইতে উপদেশ দেয়। অতীত বলে,—"হে বর্ত্তমান শিশু! অবিদ্যারূপ আবর্জ্জনা-রাশি ধুইয়া মুছিয়া ফেল, যদি বলের আবশ্যকতা থাকে, আমি তোমাকে কর্ম্ম রূপ মহাবল প্রদান করিতেছি। সেই বলে, জ্ঞানরূপ যৌবনে আপন অঙ্গ সুশোভিত কর এবং পরিশেষে যৌবনদৃপ্ত-কলেবরে বিশ্বসুহৃদয়ে সেই ভবিষ্যৎ মহামিলনের পথে অগ্রসর হও।" অতীতের এই প্রাণপ্রদ শিক্ষায় এই মিলনরস-ভঙ্গিমা উপলব্ধি করিয়াই কোনও বর্ত্তমান কবি উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিয়াছেন,—"অতীত-গৌরব-গীতি কুলুকুলু গাহে তরঙ্গিণী"; আমি জিজ্ঞাসা করি, উক্ত বাক্য কি শুধু ভাবপ্রবণ হৃদয়ের কাল্পনিক উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি? না, উহার মধ্যে কোন অবিনশ্বর সুমহৎ সরল সত্য সুপ্রতিষ্ঠীত? কেহ আমার এ প্রশ্নের উত্তর না দিলেও আজিকার এই দিন—যাহা নৈসর্গিক আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত—তিথি মাস ঋতু বর্ষ অতীত হইয়াছে,—শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে, কালের নিভৃত অঙ্কে যুগ যুগান্তর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে—কত ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রবিপ্লব ভারতবক্ষে বহিয়া গিয়াছে—বলিতে হইবে কি একমাত্র নিত্য মাধুর্য্যময় অতীতের সজীব মহৎ সত্যের প্রাণপ্রদ পীযুষধারা সেই ভারতে—জীবনশক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এখনও কবিবাক্যের সাফল্য জ্ঞাপন করিতেছে! অতীত যেন কোন অগম্য যবনিকার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বিস্মৃতি-সুষুপ্তি হইতে জাগাইবার জন্য সুখশয্যাশায়ী নিদ্রালু প্রাণে দূরাগত নিশীথ-বাঁশরী-সঙ্গীত ঢালিয়া, অথবা নব দিশার প্রথম আলোক-রশ্মি ফুটাইয়া, নব আশা নব বল নবোদ্যম নবপ্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া বলিতেছে,—"বর্ত্তমান অতীতের শিশু।" সেখানে বিচার নাই, বিতর্ক নাই মীমাংসা নাই; শোক নাই, হর্ষ নাই, অবসাদ নাই, অশ্রু নাই, হাসি নাই, অথচ সরল সত্যের গুরু গম্ভীর ঘোষণা আছে। আজিকার সুতিথি সেই সত্য কি ভাবে প্রমাণিত করিতেছে, তাহা

আমাদের বলিয়া দিতে হইবে না। আর্য্য-ভূমির প্রতিনগরে, প্রতিগ্রামে, প্রতি পল্লীতে, প্রতিগৃহে, প্রতিহৃদয়ে যদি অন্বেষণ করি, কি দেখিব? দেখিব, অতীতের লুপ্ত ছবি আজ গৃহে গৃহে হৃদয়ে হৃদয়ে সজীব বর্ত্তমান! নিন্দক-বদন এজন্য আমাদিগকে অতীত-পূজকরূপে অভিহিত করিলেও, তাহা সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয়। কারণ, মানব যাহাতে পশুত্ব ছাড়াইয়া জীবজগতের সর্ব্বোচ্চ পদবী—মানবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের অতীত তাহাই উপদেশ দেয়। (ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং আমার বক্তব্য বিষয়ের সম্বন্ধ এইখানে।) বাস্তবিকই কি আমরা বর্ত্তমানের জন্য অতীতের পূজা করি? না। কবির ভাষায় বলিতে হইলে, আমাদের "লক্ষ্য ভবিষ্যতে"! অনন্ত অতীতের তুলনায় "বর্ত্তমান" বালক মাত্র। সরল শিশু "বর্ত্তমান" অতীত-নির্দ্দেশিত পন্থার অনুসরণে "ভবিষ্যৎ" গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রসঙ্গতঃ একটি গল্পের অবতারণা করিতেছি। কথিত আছে, বঙ্গের কোন পল্লীগ্রামে এক ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ বাস করিতেন। গৃহে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহমূর্ত্তির নিত্যসেবার ব্যবস্থা ছিল। একদা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণের গ্রামান্তরে গমনের প্রয়োজন হইলে, গৃহ দেবতার নিত্যসেবার বিঘ্নভয়ে ব্রাহ্মণের মহাচিন্তার কারণ উপস্থিত হয়। একদিকে সামাজিক প্রথানুসারে নিমন্ত্রণ রক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় অপর পক্ষে দেবসেবার বিঘ্নভয়। ব্রাহ্মণের পত্নী কহিলেন,—প্রতিবাসী কোন ব্রাহ্মণের দ্বারা দুই চারি দিন দেবসেবা চালাইয়া লইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহা মনে ধরিল না। পরিশেষে ব্রাহ্মণ কি ভাবিয়া, স্বীয় বালক পুত্রকে বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিমন্ত্রণ-রক্ষায় গমন করিলেন। ক্রমে পূজার সময়ে ব্রাহ্মণবালক পিতৃনিদেশ অনুসারে পূজা শেষ করিলে, বালকের মাতা আসিয়া, দেবতার ভোগের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীবিগ্রহসমীপে সন্নিবেশিত করিয়া অন্তরালে গমন করিলেন। বালকও প্রথানুযায়ী মন্দির-দ্বার রোধ করিয়া বিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভোজ্যাদি নিবেদনান্তর দেখিল, তৎসমস্তই সমভাবে বিদ্যমান, দেবতা কিছুই ভক্ষণ করেন নাই। বালকের ভয় হইল, বুঝি বা তাহার কোন ভ্রমবশতঃ ঠাকুরের আহার হয় নাই। উদ্বিগ্ন অন্তরে বালক পুনরায় পূজায় বসিল, পুনরায় বিশেষ সাবধানে আহার্য্য উৎসর্গ করিল, কিন্তু ঠাকুর খাইলেন না। বালকের দৃঢ় সরল বিশ্বাস ছিল—দেবতা ভক্ষণ করিলে, অবশিষ্ট প্রসাদ সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎপূর্ব্বে কেহ জল গ্রহণ করেন না। এখন ঠাকুর যদি আহার না করেন, তবে কাহারও প্রসাদ পাইবার আশা নাই, সুতরাং কেহই খাইতে পাইবেন না। এই নিদারুণ ধারণা বাল হৃদয়ে অতি

[illegible] না দেখিয়া, সে কোমল কম্পিত উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বালকোচিত ভাষায় কহিতে লাগিল,—"হে ঠাকুর, তুমি কেন খাইবে না বল। আমার পুজার দোষ হইয়া থাকিলে, তাও আমায় বল। আমায় শিখাইয়া দাও, কিরূপে তোমার পূজা করিতে হয়।" ঠাকুর নিরুত্তর। বালক আবার বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর, তুমি খাও, নহিলে পিতা শুনিয়া আমায় কত তিরস্কার এবং প্রহার করিবেন।" ঠাকুর তথাপি নিরুত্তর। বালক আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বিগ্রহমূর্ত্তির পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। ক্রমে বেলা অবসানপ্রায়। ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট বালক পুনরায় কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"হে ঠাকুর বেলা যে গেল, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, তোমার প্রসাদ না পাইলে যে আমার খাওয়া হইবে না।" এই শেষোক্ত মর্ম্মান্তিক বাক্যে, বালকের বোধ হইল, যেন সেই অচল পাষাণ-বিগ্রহ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সে দেখিতে পাইল, এবার তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নাই। তাহার দর্শনেন্দ্রিয় তাহাকে দেখাইল যে, তাহার আরাধ্য দেবতার অলৌকিক রূপের বিভায় দশদিক্ আলোকিত, বৈজয়ন্তী-সৌরভে দেব-মন্দির পরিপূর্ণ, ফুল্লাধরে মৃদু হাস্যের ছটা। বালক আহ্লাদে গদগদ হইয়া, সেই শ্রী-মূর্ত্তির দিকে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে [illegible] আত্মার প্রকৃতি বিদূরিত হইয়া গেল। বালকের পরিণামে কি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও কৌতূহল থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। অধুনা সে বালক নাই বা তাহার বংশীয় কেহ আছে কি না, তাহাও জানা যায় না, কিন্তু সেই অতীত কাহিনী এবং সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান!

আমাদিগের পুরাবৃত্তে এইরূপ সরল বিশ্বাসের সত্য উদাহরণ যে ভূরি ভূরি বিদ্যমান আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যে দেশে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব মাতৃবাক্যে শ্রীহরির অনুসন্ধানে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল কাননকান্তারে, গিরিগুহায়, সরিৎসাগরে, ভয়বিরহিতপ্রাণে অদম্য উৎসাহে "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি" বলিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে দেশের পুরাণগাথা-বালক প্রহ্লাদের 'হরি' বলিয়া অনলে আত্মাহুতি, 'হরি বোল হরি' বলিয়া মদমত্ত দুর্দ্দান্ত হস্তীর পদতলে পতন, মুখে 'শ্রীরাম'-নাম মাত্র লইয়া হস্ত-পদ-বদ্ধ অবস্থায় বক্ষে গুরুভার শিলা সহ তরঙ্গ-বিক্ষোভিত অগাধ সমুদ্র-সলিলে নিমজ্জন এবং কারাগারে "শ্রীগোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া বিষান্ন ভক্ষণ প্রভৃতি—সরল বিশ্বাসের পবিত্র গীত-সমূহের দিগন্তপ্লাবী কলোচ্ছ্বাসে অনন্তকাল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে দেশে উক্ত গল্প নূতন না হইলেও, উপেক্ষণীয় নহে

বিবৃত আখ্যায়িকা সত্য বা মিথ্যা হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, অনন্ত কালের তুলনায় বর্ত্তমানের 'আমরা' শিশুমাত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিবৃত গল্পে এইমাত্র পাইয়াছি যে, এক বালক সরল বিশ্বাস বলে যোগিজন দুর্লভ, শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত রাতুল চরণের অধিকারী হইয়াছিল। প্রণিধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, সেই সরল বিশ্বাসের মূল কোথায়? আমি বলিব, উহা আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রে—যাহা অতীত হইলেও [illegible] বালক-স্বভাব-সুলভ বিশ্বস্ত-[illegible] করিলে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ জীবনান্তে নহে—জীবিতাবস্থায়ই আমাদিগকে সেই অতুল মিলনানন্দ রসের অধিকারী করে। আধুনিক উন্নতির আলোকপ্রাপ্ত নবাভিধানে সহৃক্ত সরল বিশ্বাস নামান্তরিত হইয়া অন্ধবিশ্বাসরূপে পরিগণিত হইলেও, তদুভয়ের কার্য্যফল বা সার্থকতা তুল্যরূপ; তাহাতে সংশয়ের কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অঙ্কশাস্ত্রানুসারে ব্যষ্টিযোগে সমষ্টির উৎপত্তি—এ বিশ্বাস অসার হইতে পারে। কিন্তু হায়! যে মহা সমষ্টি হইতে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা ব্যষ্টিরূপে তাঁহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘোষণা করিতেছি—তাহাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে শাস্ত্র সেই পরম যোগে আমাদিগকে অনুরাগী হইতে প্রবৃত্তি জন্মায়, কালবশে তাহাই অনাদৃত এবং উপেক্ষণীয়। ভোগবিলাসের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনুকূল বিশ্বাসের অনুরাগী হইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু সেই বিশ্বাসই ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে অন্ধ হইয়া পড়ে, ইহা অপেক্ষা বিচিত্র আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মাধিকরণের প্রতি [illegible]াত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় অর্থি-প্রত্যর্থিগণ নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষার জন্য বিচারপ্রার্থী হইলে, ব্যবহারাজীবগণ অতীত মীমাংসিত আদর্শ বর্ত্তমান বিচার্য্যবিষয়ে প্রয়োগ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন এবং নবীন উভয় কালেই অতীত-আদর্শে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, ভবিষ্যতে তদনুরূপ ফল লাভ হয়, চিরন্তন বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, সুকুমারমতি বালকদিগের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনের জন্য অতীত সাধু মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠ রূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মদর্শিগণ হয় ত বলিবেন যে, ঐহিক হিতকল্পে যাহা প্রযোজ্য, পারত্রিক মঙ্গলে তাহা সম-ফল-প্রসূ না হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, একই নীতি, বিষয়ভেদে প্রযুক্ত হইলে ভিন্নফলপ্রসবিনী হইবে, এরূপ উক্তি কি নিতান্ত অসার নয়? আমাদিগের ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলই কি পরস্পর তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট নহে? দেহের অবসানের সহিত আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য-সমুদয় কি মহাকালের অনন্ত তিমির-গর্ভে যুগপৎ অন্তর্হিত

হইয়া যায়? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? যিনি জননীরূপে বক্ষঃস্থ পীযূষধারা সেচনে আমাদিগের বর্দ্ধন, পিতারূপে অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে পালন, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনরূপে হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন, গুরুরূপে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা চিত্তোৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, এক-বাক্যে যিনি আমাদের ঐহিক জীবনের সমুদয় কার্য্যবলীর মধ্যে, সমগ্র ইন্দ্রিয়-নিচয়ে, বুদ্ধি-জ্ঞান-বিবেকাদি সদ্বৃত্তিসমূহে ওতপ্রোতভাবে চিরাবিরাজিত, সেই পরম প্রেমময় পরমপুরুষ,—তাঁহার সাধের সন্তান তাঁহার নিকটে যাইতে চাহিলে, তাহার বনবাস-ব্যবস্থা করিবেন, ইহাও কি কখন সম্ভব? না—কখনও না—তিনি ত বলিয়াছেন,—"কর্ম্ম কর, 'কর্ত্তব্য' বুদ্ধিতে কর্ম্ম কর, তোমার ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়ই আমি।" সে কথা শুনিলাম কই? সে কথা মানিলাম কই? সে কথা বিশ্বাস করিলাম কই, 'তিনি আমার' এই ভালবাসার কথা তাঁহাকে বলিতে পারিলাম কই? ভালবেসে তাঁর কাছে যাইতে চাই কই? অধিকন্তু সর্ব্ব-নাশিনী রাক্ষসী অহমিকা আমায় জপাইতেছে,—'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা'। এই আত্মঘাতী মন্ত্র হইতেই আমার ও তাঁহার মধ্যে একটি বিস্তৃত ব্যবধান আনিয়া সেচ্ছায় তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি! একবারও ভাবি না,—তিনি দূরে নহেন—অতি নিকটে, বুঝি বা তার চেয়েও নিকটে, আরও আরও নিকটে; প্রাণে আর তাঁহাতে বুঝি প্রভেদ নাই; অথবা বুঝি তিনি প্রাণ, আমিটা দেহ; না, তাও নয়; দেহ সেই প্রাণের, নতুবা 'আমিত্বের' দুর্গন্ধ যায় না। সেই নিত্য প্রাণের ঐহিক বিলাস-ভূমি এই দেহ এবং সৃষ্ট জগতের মূলে সেই বিলাস-রস-মাধুরী ঝরঝরে নিত্য প্রবাহিত! কিন্তু হায়, তথাপি ব্যবধান ঘুচে না। সকল বুঝিয়াও, দেহের সহিত নিত্য বস্তুটির নৈকট্য সাধিত হয় না। নিত্য প্রাণের সহিত দেহের এত ঘনিষ্ঠতা সত্বেও কেন যে সে বস্তু দেহগ্রাহ্য নয়, হায়! এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে!

প্রাচীন শ্রাদ্ধবিধি-মধ্যে উক্ত হইয়াছে—

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ,
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তমুতোষসঃ,
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা,
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমাংস্তু সূর্য্যো,
মাধ্বী গাবো ভবন্তু নঃ।

ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু ধারণা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, জীব-জন্মের প্রত্যক্ষ দেবতা—যাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসায় অক্লান্ত আত্যন্তিক যত্নে শৈশব কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া, কালে আবার তাঁহাদেরই অবলম্বন হইতে পারিয়াছিলাম, কালের নিদারুণ বিধানে তাঁহাদের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও সে স্নেহ সে ভালবাসা সন্তানে বিস্মৃত হইতে না পারায়, অন্তরে

অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময়ী পরমা শক্তি চিরবদ্ধ থাকিয়া যায়। তৎপ্রভাবে এবং শাস্ত্রানুশাসিত নির্দ্দিষ্ট তিথিবিশেষে গোত্র নাম প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখে পার্থিব স্থূল এবং দ্যুলোকবাসী পিতৃদেবগণের সূক্ষ্ম দেহ এতদুভয়ের মধ্যে দূর ব্যবধান ঘুচাইয়া বিচিত্র-সুখ-সামীপ্য উপস্থিত করে। স্থূল-সূক্ষ্মের সে মিলনে দেহী তখন মধুময় হইয়া জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমস্ত মধ্যে সেই মাধুর্য্য নিবদ্ধ দেখিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। তাই উক্তি, জীব-প্রাণরক্ষাকারী অনিল মধুর মধুর প্রবাহিত হউক, বারিধিকুল মধুস্রাবী হউক, ওষধি সমূহ মধুময়তা লাভ করুক, রাত্রি মধুময়ী হউক, প্রাতঃকাল মধুময় হউক, পার্থিব রজঃকলাপ মধুমৎ হউক, পিতা মধুময় হউন, দ্যুলোক মধুময় হউক, বনস্পতিগণ মধুমান্ হউক, সূর্য্য মধুময় হউক। গাভী সকল মধুময় হউক, পরিশেষে 'ওঁ' এই প্রণব মন্ত্র দ্বারা সমস্ত চরাচর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মধুর মধুর মধুর হউক। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আসক্তির অভাবই আমাকে আমার সেই প্রাণের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি দেহকে ভাল বাসি কিন্তু যাঁহাকে লইয়া—যাঁহার অস্তিত্বে দেহের অস্তিত্ব, তাঁহাকে ভালবাসি না, তাই দূরত্ব—তাই ব্যবধান। অতীত-পূজায় এই দূরত্ব নষ্ট করিতে চাহে। কারণ, প্রাচীন ব্যবস্থাদি বিশেষতঃ নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহে দৃষ্ট হয় যে, তিথিবিশেষে কার্য্যবিশেষ অনুষ্ঠিত হইলে, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়। একই বিষয় পুনঃপুনঃ আচরিত হওয়ায়, সাস্ত এবং অন্তরের মধ্যে অনুরাগ বা আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া পড়ে এবং ক্রমে সেই বাক্য ও মনের অগোচর অচিন্তনীয় অখণ্ড অব্যয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে সুগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। যাগ, যজ্ঞ, হোম ব্রত জপ ধ্যান কীর্ত্তন প্রভৃতি সমস্তই সেই আসক্তি বৃদ্ধির পরিপোষক। আজি যে শুভ তিথি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই দিন হইতে সেই আসক্তি বা অনুরাগ সিদ্ধির প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। আজিকার এই দিন হইতে জগৎ বুঝিয়াছিল যে, এই চরাচর বিশ্বসংসার তাঁহার বিলাস ভূমি। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আপনা হারাইয়া 'শ্রীকৃষ্ণায় নম' বলিয়া সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই রস তাঁহাকে আস্বাদন করাইয়া জীবজন্ম সার্থক করিতেছে। এখনও কি বলিতে হইবে, কেন আমরা অতীত ভালবাসি? শ্রুতি বলিয়াছেন, ধীবর মাছ ধরিবার জাল বিস্তার করিলে, তাহায় নিক্ষিপ্ত জাল এবং পদের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে ব্যবধান রহিয়া যায় তন্মধ্যে যে সকল মৎস্য অবস্থান করে, তাহাদের যেমন জালে আবদ্ধ হইবার ভয় থাকে না, তদ্রূপ সেই পরমপুরুষরূপ ধীবর কর্তৃক কালরূপ বাগুরা অহর্নিশ বিস্তৃত হইয়া, নিয়ত জীবকুলকে ধ্বংসপুরে প্রেরণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণ সমীপাগত জীবকুলের আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, যেহেতু তাহারা

কালভয়নিবারণ অভয় পদের সন্নিহিত। আমাদের অতীত-পূজা সর্ব্বকালে সমভাবে সেই শ্রীচরণ-সমীপে অবস্থান করিতে শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার সহিত তিথিবিশেষ রূপ অনুকূল বায়ু প্রধাবিত হইয়া বহুদিন সাপেক্ষ কার্য্য নিমেষ মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভাদুড়ী।

১৩১৯ ফাল্গুন, কল্পনা হইতে উদ্ধৃত।

হারানিধি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমি যে কি দেখিলাম তাহা কি বলিব। যখন আমি লীলাকে বিবাহ করি তখনও লীলা সুন্দরী ছিল, এখন এই পূর্ণ যৌবন সমাগমে সে রূপ কি অপূর্ব্ব শোভায় বিকশিত হইয়াছে। বুঝিলাম লীলাদেবী এই অধমের ভোগ-কলুষিত হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য! এ পাপ দেহের বায়ু লাগিলে অচিরে এ ফুল্ল নলিনী শুকাইয়া উঠিত তাই ভগবান তাঁহার এ পবিত্র কুসুমটি নিজেরই অর্ঘ্যের জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আমি অনিমেষ চক্ষুতে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। লীলা কিন্তু চকিতে আমার মুখের দিকে একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিল তার পর গললগ্নীকৃত বাসে আমার পায়ে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিতে যাইতেছিলাম কিন্তু লীলা আপনিই উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল "বিধাতা আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়, আমি তোমরই খোঁজে হরিদাস দাদাকে পাঠাইতে ছিলাম কিন্তু তিনি আমার দুয়ারেই তোমাকেই আনিয়া দিলেন। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।"

"কি কথা শীঘ্র বল, লীলা! আমার বিপদের কথা জানতো, অধিকক্ষণ আমার অপেক্ষা করিবার যো নাই। সেই ফুল শয্যার পর এই দেখা, কিন্তু লীলা! আমাদের মিলনেই বিধাতার অভিসম্পাত আছে, দুই বারেই ভীষণ মনোকষ্টে দেখা হইল।

"তোমার পত্রে আমি গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত সংবাদ পাইয়াছি। পরে প্রায় এক সপ্তাহ তোমার পত্র না পাইয়াই নিতান্ত বিপদ আশঙ্কায় এখানে চলিয়া আসিয়াছি। যোগেশ বাবুর খুড়তুতো ভাইয়ের এই বাসা, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সকলেই এখানে আছেন বলিয়া আর দিদির আসা আবশ্যক হয় নাই। তাঁহাকে আসিতে হইলে আমার এত শীঘ্র আসা হইত না। সে কথা যাক্, তোমার চিঠিতে আমি তোমাদের অর্থাভাবের সন্দেহ করিয়া ছিলাম, সেটা সত্য কিনা জানিতে চাই।"

বড়দাদার সেইরূপ শয্যাশায়ী মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠিল, সজল নয়নে বলিলাম, লীলা! দাদার জীবন সঙ্কট, অর্থাভাবে বুঝি চিকিৎসাটিও বন্ধ করিতে হইবে, আমি

পথে পথে সেই চিন্তাতেই বেড়াইতেছিলাম।”

লীলা তখন হাঁটু গাড়িয়া আমার পায়ের কাছে বসিল, তার পর অঞ্চল হইতে এক তাড়া নোট খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া বলিল “প্রাণাধিক! তোমার দাসী তোমার কোনও কাজে লাগে নাই, এ তোমারই অর্থ, তোমার চরণে ইহা উৎসর্গ করে তোমার দাসীকে আজ কৃতার্থ হতে দাও!”

আমার চক্ষু তখন বাষ্পে অন্ধকার দেখিতেছিল, লীলার হাত ধরিয়া বক্ষে টানিয়া লইলাম, তিন বৎসর পরে আবার আজ সেই ওষ্ঠে চুম্বন করিলাম, কি মোহ! কি তৃপ্তি! কি আবেশ! কি মাদকতা! বলিলাম “লীলা! বক্ষ হইতে কি তোমায় বিচ্ছিন্ন করা যায়।” সুখের আবেশে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল।

লীলা বিদ্যুৎ বেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল, একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল আজ আর দেরী করো না, ২০৲ টাকা করিয়া হাজার টাকার নোট আছে, তুমি ইচ্ছামত বড় দাদার চিকিৎসা করাও। অর্থের জন্য কোনও ভাবনা নাই।”

একবার; আর একবার মাত্র, লীলার প্রতি চাহিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

১২

রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া একেবারে বড় দাদার ঘরে গেলাম, রোগী অর্দ্ধ অচৈতন্য, যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির, মেজদাদা মাথার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, বৌদিদি বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছেন। ছেলে পিলেরা সকলেই পৃথক ঘরে মেজ বৌ দিদির জিম্মায় রহিয়াছে। আমি বৌ দিদিকে হস্তসঙ্কেতে বাহিরে আনিয়া বলিলাম “বোধ হয় ঈশ্বর এবার বড়দাদার জীবন রক্ষা করিলেন, চিকিৎসার টাকা যোগাড় করিয়াছি।” বৌদিদি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “কেমন করিয়া যোগাড় করিলে? অল্প টাকার ত ব্যাপার নয়, কত টাকার যোগাড় হইল?

“এক হাজার, পরে আবশ্যক হইলে আরও পাওয়া যাইবে” বলিয়া নোটের তাড়া বৌদিদিকে দেখাইলাম। স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বৌদিদি বলিলেন, “ঠাকুরপো, বিপদে ধর্ম্মচ্যুত হ'য়োনা, টাকা না হ'লেও ভগবানের দয়ায় রোগ আরাম হয়, বল তুমি এত টাকা কোথায় পেলে।

বৌদিদির ভয় দেখিয়া আমার হাসি আসিল, আমি বলিলাম, “তোমার কি বিশ্বাস হয় বৌ দিদি! আমি টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছি।”

“অন্য কারণে হ'লে বিশ্বাস হ'ত না কিন্তু আমি জানি তোমার দাদার জীবন রক্ষার জন্য তুমি সব পার।” তখনও বৌ দিদির চক্ষু জ্বলিতে ছিল।

“না তোমার সে ভয় নাই, বল দেখি আমাদের এ বিপদে কে সাহায্য করিতে পারে?”

খানিক চিন্তা করিয়া বৌদিদি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এ জগতে ত এমন কাকেও দেখি না" আমি মৃদু স্বরে বলিলাম "তোমার হতভাগিনী বোন, লীলা।"

বৌদিদি দাঁড়াইয়া ছিলেন বসিয়া পড়িলেন, দর দর ধারে চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল, বলিলেন "ঠাকুরপো! সেই লক্ষীর শাপে আমার সংসার ভস্ম হইতে বসিয়াছে, যদি আমি দিন পাই এক দিকে জগৎ সংসার, আর এক দিকে আমার লীলাকে করিব, ওঁকে যদি আবার ফিরে পাই জানিব সে কেবল লীলারই জন্য।"

প্রাতে উঠিয়া বাবার কাছে যাইতেই বাবা ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন "শরৎ বিনা চিকিৎসায় নলিন আমার চলে যায়, টাকার কোনও উপায় হইল না।"

বাবার কথায় আমার চক্ষে জল আসিল। প্রথমে আমার কথা বাহির হইল না, একটু সামলাইয়া বলিলাম "না বাবা ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আমি টাকার যোগাড় করিয়াছি।

"কত টাকা শরৎ—

এখন ১০০০৲, প্রয়োজন হইলে আরও, পাওয়া যাইবে। কথাটা বলিতে গলাটা একটু কাঁপিল, বাবার কাছে সে টুকু গোপন রহিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "শরৎ আমি জানি তুমি আমার সহিত পরিহাস করিবে না, কিন্তু এই বিদেশে বিনা বন্দকে এত টাকা তুমি কোথায় পাইলে? যদি বহরমপুর হইত বা যোগেন বাবু কলিকাতায় থাকিতেন তবে আমি সন্দেহ করিতাম না। তুমি তাঁহাদের নিকট হইতে এ টাকা আনিয়াছ তাহা সম্ভব নহে, অথচ এত টাকা তোমায় কে দিল জানিতে চাই"

কথা আর বাহির হইতে চায় না, কিন্তু বাবার কথার উত্তর দেওয়া চাই, তাই কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, আমার স্ত্রী কলিকাতায় আসিয়াছে।"

"তাই জানিতে পারিয়াই তুমি তাঁহার নিকট টাকার জন্য দৌড়িয়াছিলে?

"আমি যাই নাই, চাইও নাই, রাস্তা হইতে লোক দিয়া আমায় ডাকাইয়া অনেক মিনতি করিয়া এই টাকা দিয়াছে?"

"কত সুদ ধার্য্য করিয়াছ?

"সুদ বা পরিশোধের কথা কিছু বলি নাই।"

"ধিক শরৎ! যাহাকে তুমি গ্রহণ করিতে পার নাই তাহার অর্থে তুমি কোন সত্বে দাবী রাখ। আমি প্রাচীন প্রথার অনুগামী লোক, সমাজকে অত্যন্ত ভয় করি, সেই জন্য জানিয়া শুনিয়াও স্বর্ণ সীতাকে গৃহহীন করিয়া রাখিয়াছি। বুঝি সেই পাপেরই আজ এই প্রতিফল। কিন্তু তাই বলিয়া আমি পিশাচ নই, শরৎ এ টাকা আমি ঋণের সত্বে ভিন্ন গ্রহণ করিতে পারি না।"

সহসা গৃহে এক নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব

হইল। বুঝিলাম এ লীলা, আমি সেখান হইতে উঠিয়া একটু অন্তরালে গেলাম, লীলা সহসা বাবার নিকট কেন আসিয়াছে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতুহল হইল। লীলা বাবার চরণে প্রণতা হইয়া বলিল "ইহাতে ক্ষতি কি বাবা! সমাজ ভয়ে আপনি আমায় গৃহে স্থান দেন নাই, তাই বলে কি অন্তরের স্নেহের দাবীও আমি করিতে পারিব না? বাবা, সাক্ষাৎভাবে চরণ সেবায় বঞ্চিত হইয়াছি, তথাপি এই তুচ্ছ অর্থেও যদি একটু উপকার করিতে পারি দাসীকে সে ভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না।"

বাবা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ওঠ মা। তুমি আমার রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী, আমিই অভাগা তাই এমন মায়ের কোল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। মা তুচ্ছ অর্থ নয়, আজ তোমার অর্থে আমার নলিনের জীবন রক্ষার উপায় হইবে। তবে মা ছেলের একটা আবদার রাখ, লোকে যেন তোমাকে কুপুত্রের মা বলিয়া গালি না দেয়, তুমি ঋণ হিসাবে আমায় টাকা দাও।" লীলা সহাস্যে উত্তর করিল" কিন্তু সুদের বোঝা চাপাইবেন না ত?"

বাবা বলিলেন, "হাবা মায়ের কাছে ছেলেরা পাইয়া বসে, কিন্তু সেয়ানা মাকে ত পারিবার যো নাই মা?"

তখন লীলা আবার বাবার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইয়া বলিল, "বাবা আমি আর একটী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

"কি মা।"

"যতদিন বড়ঠাকুর পীড়িত থাকিবেন আমায় রোগীর সেবায় অনুমতি দান করুন, তিনি আরোগ্য হইলে আমি আবার চলিয়া যাইব।" বোধ হয় বাবার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল, কেন না গলাটা একটু ধরা ধরা বোধ হইল। তিনি বলিলেন, "মা তুমি আজ আমার পুত্রবধূ নও, আমি দেখিতেছি স্বয়ং জগদ্ধাত্রী আমার বিপদ নাশ করিতে আসিয়াছ মা, আজ কার সাধ্য তোমায় প্রত্যাখ্যান করে।

১৩

সেই দিন হইতে লীলা তাহার দেহ, মন, অর্থ, সকলই আমাদের সংসারে উৎসর্গ করিয়া দিল। বড় বৌদিদি দিবানিশি দুঃসহ মনঃকষ্টে পীড়িত হইয়া এক রূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, বড়দাদাকে দেখা যেমন প্রয়োজন বৌদিদিকে দেখাও সেইরূপ হইয়া উঠিল, কেহ ধরিয়া স্নান আহার না করাইলে একই ভাবে সারাদিন বড় দাদার পায়ের তলাতেই বসিয়া আছেন। বালিকা হইতে বৌদিদির যে শ্বশুরের সেবা দেবসেবা অপেক্ষা অধিকতর আদরনীয় ছিল আজ বাবার খাওয়া হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার মনে থাকে না। ছেলে মেয়ে গুলি ত মায়ের মুখ দেখা হইতেও বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে, একবার ভ্রমেও তাহাদের নাম মুখে আনিতে শুনি না। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া না শোয়াইলে কিছুতেই ঘুমাইতে চাহেন না।

আমরা ত বড় দাদাকে লইয়াই অস্থির মেজবৌদিদি বেচারি ছেলে পিলে ও সংসার লইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, লীলা বড় বৌদিদির ভার লইয়া পড়িল। আমি জানিতাম লীলার মানসিক গুণ অসামান্য হইলেও কার্য্যদক্ষতা কখনই তাহার নিকট প্রত্যাশা করিতে পারিব না, কিন্তু আমি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ছেলে মেয়েরা আজকাল মেজ বৌদিদির অঞ্চলচ্যুত হইয়া লীলার অঞ্চল প্রান্তে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। সমস্ত দিন ইহাদের লইয়া কাটাইয়া রাত্রিতে লীলা রোগীর শিয়রে বসে। এইবার আমার সঙ্গে তাহার খানিক কথাবর্ত্তা হয়। আমিও তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় দেখাইয়া বসিতে দিব না, সেও আমার বিষয়ে ঐরূপ কারণ দেখাইয়া বসিতে দিবে না, আমার সাধ্যমত ঝগড়া চালাইতে ত্রুটি না হইলেও অবশেষে প্রায়ই আমাকে হারিতে হইত। তার পর লীলার প্রসাদে যখন অবসন্ন মস্তক উপাধানে ন্যস্ত করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতাম তখন লীলার যুক্তির সারবত্তা ভালরূপেই অনুভব করিতাম।

এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য্য সেবিতা, চির-সুখ পালিতা লীলা নিজের বক্ষের রক্ত ঢালিয়া সংসারে সকলের সেবায় যেমন নিযুক্ত হইল অপর দিকে তেমন এই ভীষণ অর্থাভাবের সময় লীলার অর্থরাশি স্বর্গের পূত মন্দাকিনী ধারার মত আমাদের সকল অভাব বিদূরিত করিতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম এই সময়ে লীলা না থাকিলে আমাদিগের কি দুর্গতি হইত। সে দুর্দ্দশার কথা মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠিত। "ঈশ্বর বড়দাদাকে সুস্থ করুন, লীলার এই কঠোর তপস্যা সফল হউক" আমি সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতাম।

এক মাস কাল কখনও আশা কখনও নিরাশার সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া শেষে ডাক্তার একদিন বলিয়া গেলেন "আর ভয় নাই"

গল্পে আছে যে মায়া পাহাড়ের নিম্নদেশে বহু রাজপুত্রের পাষাণ দেহ স্তূপে স্তূপে পড়িয়াছিল, রাজকন্যা ঝরণার জল ছিটাইতে সকলে জীবিত হইয়া উঠিল, আমাদেরও বুঝি তাই হইল, এই একটী কথার উপর একটী প্রলয়ের মেঘ যেন বুকের উপর হইতে সরিয়া গেল। হতাশ পরিবারের মধ্যে আবার আশা আনন্দ একটু খানি সাড়া দিল।

বড়দাদা আরোগ্য হইতেছেন ইহা অপেক্ষা আমাদের আনন্দের আর কি আছে। কিন্তু তবু বুক কেন দুর দুর করে? থাকিয়া থাকিয়া চোখ কেন জলে পুরিয়া আসে। আজ প্রায় দুই মাস আমি যে আনন্দে, যে সুখ স্বপ্নে ভোর হইয়াছিলাম সে সুখের কি অবসান হইয়া আসিতেছে? বড়দাদা আরোগ্য হইলে সত্যই কি লীলা চলিয়া যাইবে? আবার কি সংসার আমার পক্ষে অন্ধকারময় হইয়া যাইবে? হায়! এ হতভাগা তবে কি লইয়া সংসারে থাকিবে? তবে এই সুখস্বপ্ন

থাকিতে থাকিতেই হে ঈশ্বর আমার মৃত্যু হউক, আমার আর দুঃখ বহনের শক্তি নাই।

বড়দাদা যে দিন প্রথম বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন, বৌদিদি ধীরে ধীরে বাতাস করিতে ছিলেন। বাবা কাছে বসিয়া ছিলেন, আমি অনেক দিনের পরে আজ বারান্দায় ফুলের টবগুলার মাটী খুঁড়িয়া দিতেছিলাম, দেখিলাম লীলা সুরুয়ার বাটি হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বড়দাদা বাবার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "মার অভাব এতদিনে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি থাকিলেও বোধ হয় এত যত্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। বাবাও তেমনি হাসিয়া বলিলেন "দেখনা নলিন, মা নিজের চেহারাটী কি করিয়াছেন। তুমি জান না, কি করিয়া মা একদিকে তোমার সেবা আর একদিকে এই বুড়ো ছেলে আর এত বড় সংসারের ভার বহিয়াছেন। ছোট বৌমা না থাকিলে তোমায় ফিরিয়া পাইতাম না।"

বড়দাদা ততক্ষণে সুরুয়া খাওয়া শেষ করিয়াছেন। লীলা পাত্র গুলি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। বৌ দিদি ধীরে ধীরে বাবাকে বলিলেন "লীলা আজকাল যাওয়ার কথা উত্থাপন করিতেছে" আমি প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বাবার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম। বাবা বলিলেন "অত্যন্ত পরিশ্রমে শরীর বোধ হয় খারাপ হইয়াছে, মার একটু বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।"

"না, সেজন্য নয়, লীলা বলিতেছেন "এখন ত ইনি আরোগ্য হইয়াছেন আমি আর এখানে থাকিলে যদি কেহ কিছু বলে ?"

দেখিলাম বড়দাদাও বাবার উত্তরের অপেক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

বাবা বলিলেন "তাঁহাকে বলিও যখন তাঁহাকে ঘরে আনিয়াছিলাম তখন লোকের কথাই বড় ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমার লীলার কাছে লোকের কথা অতি তুচ্ছ, বিধাতার বাণী হইলেও তাহা আর গ্রহণীয় নয়। লীলা শুধু আমার পুত্রবধূ নয় আমার সংসারের সাক্ষাৎ মঙ্গল রূপিনী দেবী।"

দেখিলাম বৌ দিদি কাঁদিতেছেন, বলিলেন "বাবা আপনার কথায় আজ প্রাণ পাইলাম। আজ আমাদের শূন্য মন্দিরের দেবী আবার ফিরিয়া আসিলেন।

১৫

আজ বাড়িতে বড় ধুম, ফুলের মালা, পাতা ও তোড়ায় ঘর পরিপূর্ণ। বিছানায় ফুলের মশারি, ফুলের পাখা, ফুলের মালা ছড়ান, ফুলের ত কথাই নাই। এসেন্সের ত ঢেউ খেলিয়াছে বলিলেই হয়, রজনীও তেমনি জ্যোৎস্না বিধৌতা। জানালা দিয়া শয্যার উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। আমি গৃহের আলো কমাইয়া দিয়া সেই জ্যোৎস্নার উপর দেহ ঢালিয়া দিলাম।

মনোহর ফুলের সাজে ভূষিতা লীলাকে লইয়া বৌদিদিরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। মেজ বৌদিদি বলিলেন "দেখো, ভাত

খাবি, না হাত ধোব কোথা, এতদিন তো ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে এসেছ আজ একটু বসবারও ক্ষমতা নেই? বলি ওঠনা গো।" আমিও কেন ছাড়ি, বলিলাম "জানত অতি ক্ষুধায় লোক দুহাতে খায়।"

"তবে অতি দর্পে হতা লঙ্কা হয়ে যাবে, উঠ্‌বে ত ওঠ নইলে লীলাকে নিয়ে চল্লুম।"

বড় বৌদিদি স্নেহ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন "ওঠনা ঠাকুরপো" মেজ বৌদিদির ছিল পরিহাস, বড় বৌদিদির আজ্ঞা, এবার আর এড়াবার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম, তাঁহারা লীলাকে আমার পাশে বসাইয়া দিলেন, দেখিলাম বৌ দিদির চক্ষুতে স্নেহাশ্রু বিগলিত হইতেছে। গদগদ কণ্ঠে বড় বৌদিদি বলিলেন, "লীলা কেবল তোরই জন্য আমি আমার স্বামী পাইয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এবার তোকেও তোর স্বামীর সঙ্গে মিলন করিয়া দিব। কিন্তু সে কেবল আমার অহঙ্কার করাই সার, তুই নিজের গুণে সাবিত্রীর মত আপনিই স্বামীর পায়ে স্থান পাইয়াছিস, লীলা! ঐস্থান তোর অক্ষয় হইয়া থাক এই আশীর্ব্বাদ করি।"

বড় বৌদিদি চলিয়া গেলেন, হাসারতা মেজ বৌদিদি যাইতে যাইতে বলিলেন "একটু বড় করে কথা ক'য়ো, ঠাকুরপো! বাহিরে থেকে যেন শুন্‌তে পাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "লীলা! ফুল শয্যার দিনের মত কি সাধিয়া ঘোমটা খুলাইতে হইবে?"

লীলা হাসিয়া বলিল "কতক্ষণ সাধিয়াছিলে মনে আছে?"

"আঃ আবার সে কথা, লীলা! আমাদের এই প্রথম মিলন।" লীলা বলিল "তবে আমিই বা কেন তোমার মান ভাঙ্গানর সুখ হইতে বঞ্চিত হই" বলিয়া ঘোমটা দিয়া বসিল।

"লীলা! জানত 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্‌'

কথাট পুরুষের অনভ্যস্ত নয়, তবে তোমার মত নারী রত্নের চরণ ধরা সত্যই পরম সৌভাগ্যের কথা, লীলা! আমি বড় ভাগ্যবান।"

হায়রে বিধি! সব উল্‌টাইয়া গেল, লীলা ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া আমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল, বলিল "ছি, ও কি কথা? আমি তোমার চরণের রেণু, আজ তোমার চরণে পড়িয়া আমার নারী জন্ম সার্থক হইল, আমায় কেবল এইখানে স্থান দিও আর কিছু আমার প্রার্থনীয় নাই।"

কণ্ঠের হার কি লোকে চরণে ফেলিয়া রাখে। আমার বুকের নিধি বুকে তুলিয়া লইলাম। দুজনেরই ঠোঁটে হাসি, চোখে জল, পূর্ণ বুক, নির্ব্বাক অধর, পরিপূর্ণ সুখে লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। এই চিরতপ্ত প্রাণ দুটির মিলন বন্ধনের প্রতি চাহিতে চাহিতে চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল।

সমাপ্ত।

শিখ গ্রন্থ—সুখমণি সাহিব

বিরথী সাকত কী আরম্ভা।
সাচ বিনা কহ হোবত সূচা।
বিরথা নাম বিনা তন অন্ধ।
মুখ আবত তাকৈ দুর্গংধ।
বিন সিমরন দিন রৈন বৃথা বিহায়।
মেঘ বিনা জিউ খেতী যায়।
গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সভ কাম।
জিউ কিরপণ কে নিরারথ দাম।
ধংন ধংন তে জন জিন জিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলি বলি যাউ॥৬
শাক্ত অর্থাৎ তান্ত্রিকদিগের চেষ্টা বৃথা।
সত্য বিনা কি প্রকারে পবিত্র হওয়া যায়?
অন্ধ তনু যদি নাম না করে ত বৃথা।
তাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।
ভগবানের স্মরণ বিনা দিবা রাত্রি বৃথা কাটায়।
যেমন জল বিনা ক্ষেত্র শুকাইয়া যায়।
গোবিন্দ ভজন ব্যতিরেকে সকল কার্য্যই বৃথা
যেমন কৃপণের ধন নিরর্থক হইয়া থাকে।
সেই জন্যই ধন্য ধন্য যাঁর হৃদয়ে হরি নাম বাস করে।
নানক বলিতেছেন, সেই জনকে বলিহারি যাই॥৬
রহত অবর কুছ অবর কমাবত।
মন নহী প্রতি মুখহু গংত লাবত।
জানন হার প্রভু পরবীন।
বাহে ভেখ ন কাহু ভীন।
অবর উপদেশৈ আপন করৈ।
আবত যাবত জনমৈ মরে।
জিসকৈ অন্তর বসৈ নিরংকার।
যেন তুম ভানে তিনি প্রত যাতা।
নানক উন জন চরণ পরাতা॥৭
মানুষ ও কাজ এ কাজ করিতেছে।
ভিতরে প্রেম নাই মুখে ভালবাসা দেখাইতেছে।
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সব জানেন।
মানুষ বাহিরে ভেক লইয়াছে কিন্তু ভিতরে প্রেম নাই।
অপরকে উপদেশ দে নিজে কিছু করে না।
আসিতেছে যাইতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে।
যাঁহার অন্তরে নিরহঙ্কার বাস করে
তাঁহার উপদেশে সংসার তরিয়া যায়
প্রভু তুমি যাহাদের ভাল বাস তাহারাই তোমাকে জানিতে পারে।
নানক এমন সব ভক্তের চরণে পতিত হয়॥৭
করৌ বেনতি পারব্রহ্ম সভ জানৈ।
অপরা কিয়া আপহি মানৈ॥
আপহি আপ আপি করতা নিবেরা।
কিসৈ দূরি জনাবত কিসৈ বুঝাবত নেরা॥
উপাব সিয়ানপ সগল তে রহতে।
সভ কুছ জানৈ অন্তরী রহত॥
জিসু ভাবৈ তিসু লয়ে লড়িলাই।
আন অনন্তর বহ্যা সমাই॥
যো সেবক বিসু কিরপাকরী।
নিমষ নিমষ জপ ন নক হরি॥৮
তাঁহাকে স্তুতি কর, পরব্রহ্ম সকল জানেন
তিনি আপনার কার্য্য আপনি দেখিতেছেন

তিনি আপনিই কর্ত্তা হইয়া সব করিতেছেন।
কাহাকেও জানান তিনি দূরে আছেন,
কাহাকেও বুঝান তিনি নিকটে।
তিনি ধূর্ত্ততা এবং কূট বুদ্ধি রহিত।
তিনিই সেই আত্মার গতি জানেন।
যাঁহার প্রতি তিনি কৃপা করেন তাঁহা
কেই তিনি নিজের বশে টানিয়া লন।
তিনি সকল স্থানেই প্রবেশ করিয়া আছেন।
সেই তাঁহার সেবক যাহার প্রতি তিনি কৃপা করেন।
নানক বলিতেছেন, প্রতি নিমেষে হরি নাম জপ কর ॥৮

৬ শ্লোক।

কম ক্রোধ অরু লোভ মোহ বিনশি যাই অহংমেব।
নানক প্রভু স্মরণাগতী করি প্রসাদ গুরু দেব ॥১
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং অহঙ্কার তাহার নষ্ট হইয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, যাহাকে গুরুদেব কৃপা
করিয়া প্রভুর স্মরণাগত করিয়াছেন ॥১

অষ্টপদী।

জিহ প্রসাদি ছত্তীহ অমৃত খাহি।
তিস কৌ সিমরত পরম গতি পাবহি ॥
জিহ প্রসাদি বসহি সুখ মংদার।
তিসহি ভিয়াই সদা মন অংদার ॥
জিহ প্রসাদি গৃহ সংগি সুখ সব বসনা।
আট পহর সিমরহে তিসু রসনা ॥
জিহ প্রসাদি রংগ রস ভোগ।
নানক সদা ধ্যাইয়ৈ ধ্যাবন যোগ ॥১
যাঁহার প্রসাদে ছত্রিশ ব্যঞ্জন অন্ন খাইতেছ।
তাঁহাকে স্মরণ কর, পরম গতি লাভ করিবে।
যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ।
তাঁহাকে সতত মনমধ্যে ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার জন্য সকল প্রকার গৃহ সুখ রহিয়াছে।
অষ্ট প্রহর রসনাতে তাঁহাকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ।
নানক বলিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে ধ্যান কর, তিনি ধ্যানের যোগ্য ॥১
যিহ প্রসাদি পাট পটংবর হইবহি।
তিসহি ত্যাগি কত অবর লুভাবহি ॥
জিহ প্রসাদি সুখি শেজ শেইজৈ।
মন আট পহর তাকা যশ গাবীজৈ ॥
জিহ প্রসাদি তুঝ সব কোউ মানৈ।
মুখি তা কো যশ রসন বখানৈ ॥
জিহ প্রসাদি তেরো রহতা ধর্ম্ম।
মন সদা ধ্যাই কেবল পার ব্রহ্ম ॥
প্রভুজী জপত দরগহ মান পাবহি।
নানক পতিসেতী ঘর যাবহি ॥২
যাঁহার প্রসাদে রেসমের বস্ত্র পরিধান করিতেছ,
তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কি বিষয়ের জন্য লোভ করিতেছ?
যাঁহার প্রসাদে সুখ শয্যাতে নিদ্রা যাও,
হে মন তাঁহার যশ অষ্ট প্রহর গান কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমাকে সকলে মান্ত করে,
তাঁহার যশ মুখ ও রসনা ব্যাখ্যান করুক।
যাঁহার প্রসাদে তোমার ধর্ম্ম হইয়া থাকে,
হে মন, সেই পরব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান কর।
প্রভুর নাম জপ করিলে তাঁহার দ্বারে সম্মান পাইবে।
নানক বলিতেছেন, সম্মানের সহিত তাঁহার গৃহে যাইবে॥২
যিহ প্রসাদি আরোগ কংচন দেহী।
লিব লাবহু তিস্ রাম সনেহী॥
জিহ প্রসাদি তেরা ওলা রহত।
মন সুখ পাবহি হরি হরি যশু কহত॥
যিহ প্রসাদি তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে।
মন শরনী পরু ঠাকুর প্রভু তাকৈ॥
জিহ প্রসাদি তুয় কোন পহুঁচৈ।
মন শাসি শাসি সিমরহু প্রভু উচে॥
যিহ প্রসাদি পাই দুর্লভ দেহ।
নানক তাকী ভগতি করেহ॥৩
যাঁহার প্রসাদে তোমার অরুগ্ন এবং স্বর্ণকান্তি দেহ,
হে বন্ধু সেই রামকে হৃদয়ে ধারণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার উপর আবরণ রহিয়াছে,
হে মন, সেই হরি যশ গান করিয়া সুখ লাভ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সকল দোষ ঢাকিয়া যায়,
হে মন, সেই প্রভুর স্মরণাপন্ন হও।
যাঁহার প্রসাদে তোমার তুল্য কেহ হইতে পারে না,
হে মন প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেই উচ্চ প্রভুকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে দুর্লভ দেহ পাইয়াছ,
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি কর॥৩
যিহ প্রসাদি আভূষণ পহিরিজৈ
মন তিস্ সিমরত কোঁ আলস কি কৈ॥
যিহ প্রসাদি অশ্ব হস্তি অসবারী।
মন তিস প্রভুকো কবহুঁ ন বিসারী॥
যিহ প্রসাদি বাগ মিলখ ধনা।
রাখু পরোহ প্রভু অপনে মনা॥
যিন তেরী মন বনত বনাই।
উঠত বৈঠত সদা তিসহি ধিয়াই॥
তিসহি ধ্যাই যো এক্ অলখৈ।
ইহা উহা নানক তেরী রখৈ॥৪
যাঁহার প্রসাদে সমস্ত ভূষণ পরিধান করিতেছ,
হে মন, তাঁহাকে স্মরণ করিতে আলস্য কর কেন?
যাঁহার প্রসাদে তুমি অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পাইয়াছ,
হে মন, সেই প্রভুকে কখনও ভুলিও না।
যাঁহার প্রসাদে উদ্যান, বিষয় এবং ধন পাইয়াছ,
সেই প্রভুকে আপনার মনে বাঁধিয়া রাখ।
যিনি তোমার মনকে ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত করিয়াছেন,
তাঁহাকে উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা ধ্যান কর।
সেই এক অলক্ষ্য পুরুষকে ধ্যান কর,
নানক বলিতেছেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়ই রক্ষা করিবেন॥৪

যিহ প্রসাদি করহি পুণ্য বহু দান।
মন অষ্ট প্রহর করি তিসকা ধ্যান।
যিহ প্রসাদি তুঁ আচার ব্যাহারী।
যিস প্রভুকৌ সাসি সাসি চিতারী।
যিহ প্রসাদি তেরা সুন্দর রূপ।
সো প্রভু সিমরহু সদা অনূপ।
যিহ প্রসাদি তেরী নীকী জাতি।
সো প্রভু সিমরে সদা দিন রাতি।
যিহ প্রসাদি তেরী পতি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক যশ কহৈ ॥৫

যাঁহার কৃপায় তুমি অনেক দান পুণ্য কর।
হে মন অষ্ট প্রহর তাঁহার ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার আচার ব্যবহার,
সেই প্রভুকে শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সুন্দর রূপ,
সেই অনুপম প্রভুকে সদা স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উত্তম জাতিতে জন্মিয়াছ।
সেই প্রভুকে রাত্রিদিন স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্মানিত,
নামক বলিতেছেন, গুরু প্রসাদেই তাঁহার যশ গান করা যায় ॥৫

যিহ প্রসাদি শুনহি কর্ণ নাদ।
যিহ প্রসাদি পেখহি বিসমাদ।
যিহ প্রসাদি বোলহি বোলহি অমৃত রসনা।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজে বসনা।
যিহ প্রসাদি হস্ত কর চলহি।
যিহ প্রসাদি সম্পুরণ ফলহি।
যিহ প্রসাদি পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজ সমাবহি।
ঐসা প্রভু ত্যাগি অবর কত লাগহু।
গুরু প্রসাদি নানক মন জাগাহু ॥৬

যাঁহার প্রসাদে কর্ণ শ্রবণ করিতেছে,
যাঁহার প্রসাদে নানা প্রকার বস্তু দর্শন করিতেছ।
যাঁহার প্রসাদে রসনায় মিষ্ট কথা বলিতেছ,
যাঁহার প্রসাদে সুখে শান্তিতে বাস করিতেছ,
যাঁহার প্রসাদে হস্ত পদ চলিতেছে,
যাঁহার প্রসাদে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়,
যাঁহার প্রসাদে মানব পরম গতি লাভ করে,
যাঁহার প্রসাদে সুখে ও শান্তিতে মানুষ অবস্থিতি করে,
সে প্রভুকে ছাড়িয়া অপর বস্তুতে কেন লিপ্ত হইতেছ?
নানক বলিতেছেন, গুরু প্রসাদে জাগরিত হও ॥৬

যিহ প্রসাদি তু প্রগট সংসারি।
তিস প্রভুকৌ মুনি ন মনহু বিসারি।
যিহ প্রসাদি তেরা পরতাপু।
রে মন মূঢ় তু তাকৌ জাপু।
যিহ প্রসাদি তেরে কারয় পূরে।
তিসহি জান মন সদা হজুরে।
যিহ প্রসাদি তু পাবহি সাচু।
রে মন তু মেরে তু তাসো রাচু।
যিহ প্রসাদি সভাকি গতি হোই।
নানক জাপু জপৈ জপ সোই ॥৭

যাঁহার প্রসাদে তুমি সংসারে সম্মানিত,
সেই প্রভুকে তুমি কোন প্রকারে ভুলিও না

যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রতাপবান,
রে মূঢ় মন তাঁহাকে জপ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার কার্য্য পূর্ণ হয়,
তাঁহাকে সর্ব্বদা মনোমধ্যে রাখিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সত্য লাভ কর,
রে মন তুমি তাঁহাতেই রত থাক।
যাঁহার প্রসাদে সকলের গতি হয়,
নানক বলিতেছেন, জপ কর, তিনিই জপ করিবার যোগ্য ॥৭
আপি জপায়ে জপৈ সো নাউ।
আপি গাবায়েস্থ হরি গুন গাউ।
প্রভু কিরপাতে হোই প্রশাসু।
প্রভু দয়াতে কমল বিগাসু।
প্রভু সুপ্রসন্ন বসৈ মন সোই।
প্রভু দয়াতে মতি উত্তম হোই।
সর্ব্ব নিধান প্রভু তেরি মায়া।
আপহু কছু ন কি নহু লয়া।
গিতু গিতু লাওহু তিতু লগহি হরি নাথ।
নানক নকৈ কছু নই হাথ ॥৮
তিনি আপনিই মানুষকে নাম জপ করান,
আপনিই নিজের গুন গান করান।
প্রভুর কৃপাতেই জ্ঞান প্রকাশ পায়।
প্রভুর দয়াতেই হৃদয় কমল বিকাশ হয়।
যাঁহার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন, তাঁহারই মন প্রভুতে রত থাকে।
প্রভুর দয়াতেই মানুষের সুমতি হয়।
হে সর্ব্ব নিধান প্রভু, সকলই তোমার মায়া।
তুমি নিজে কিছুই কর না বা কিছুই লও না।
হে হরি, হে নাথ, তুমি যাহাতে লাগাও তাহাতেই থাকি।
নানক বলিতেছেন, মানুষের কোন হাত নাই ॥৮

(ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

একি ? একি ইন্দ্রজাল অথবা স্বপ্ন বিভ্রাট ?

আদিত্য দেবের আগমন বার্ত্তা শ্রুত হইয়া নীল সৌন্দর্য্যধারিণী নিশীথিনী গমনোদ্যত হইয়াছেন। এই কালে দেবদত্ত পুরমণ্ডল গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন। নন্দক তখনও তাঁহার পশ্চাতে ছিল। দেবদত্ত কৌশল ক্রমে অন্য পথ দিয়া আগমন করিয়া নন্দককে পশ্চাতে ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু নন্দকই অগ্রে পুরমণ্ডলে প্রবেশ করুক এই তাঁহার ইচ্ছা। অতএব তিনি পথ ছাড়িয়া একটী কুসুমিত বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা নন্দকের অশ্বের পদধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

তখন নন্দকের আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিতে পারিয়া দেবদত্ত লতা পাতা দ্বারা বাসুকীকে বনাভ্যন্তরে বন্ধন করিয়া স্বয়ং একটী কুসুমিত পলাশ বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে নন্দক সেই কুসুমিত বন অতিক্রম করিয়া পুরমণ্ডল গ্রামে প্রবেশ করিলেন। নন্দক চলিয়া গেলেন দেখিয়া দেবদত্ত সেই নিভৃত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বারোহণে উদ্যত হইলেন।

সহসা তিনি কতকগুলি মানুষের পদ শব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন জনকতক লোক দুইটি শব দেহ বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে। অস্তমিত চন্দ্রের ক্ষীণালোকে সেই শব বাহক মনুষ্যগণ দেবদত্তকে চিনিতে পারিল। তখন তাহারা এত দ্রুত গতিতে হাঁটীতে আরম্ভ করিল যে দেখিতে দেখিতে তাহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল,তাহার আর ঠিকানা রহিল না। দেবদত্ত জ্ঞান হীনের ন্যায় এতক্ষণ সেই দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়! একি করিলাম, ইহাদিগকে ধৃত করিলাম না কেন? ইহারা অবশ্যই দোষী লোক, কাহাকে খুন করিয়া অথবা বাঁধিয়া লইয়া পলাইতেছে। আমি চক্ষে দেখিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলাম না। এইরূপ চিন্তাতিশয্যে অবসন্ন হইয়া তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন হায়! আমি কি করিলাম, কি করিলাম! গুরুতর অপরাধ করিয়া কয়েক জন লোক এইরূপে লইয়া যাইতেছে দেখিয়াও আমি তাহার প্রতিকার করিলাম না। ধিক্! আমার বাহুবলে ধিক্! আমার পুরুষত্বে ধিক্! এস বাসুকী এস আমি তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অপরাধিদিগের অন্বেষণে গমন করি। বাসুকী হ্রেষারব করিয়া উঠিল. দেবদত্ত ভাবনা চিন্তায় মগ্ন-প্রায়ের ন্যায় টলিতে টলিতে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অপরাধিগণ যে দিকে গমন করিয়াছিল সেই দিকে গমন করিলেন। তৎকালে উষা দেবীর আগমন হইয়াছিল এবং সুর সুন্দরী উষার রক্তিমাধর ও কপোল দেশ হইতে আলো রাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীকে আলোকিত করিতেছিল। দেবদত্ত অনবরত যাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিরাম নাই, একবারও বিশ্রাম না করিয়া তিনি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দীর্ঘ পথ অবলম্বন করিয়া ছুটিতে লাগিলেন। যখন তপন দেবের প্রখর কিরণে ধরণীতল উত্তপ্ততা প্রাপ্ত হইল, সমীরণ উষ্ণ হইয়া উঠিল, তখনও তিনি গমনে ক্ষান্ত হইলেন না। কিন্তু ক্রমে আদিত্যদেব পূর্ব্বাকাশ পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচল চূড়ে লুক্কায়িত হইলেন, সন্ধ্যার ধূসর বর্ণে ধরণী ধূসরিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি গমনে অসমর্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র এক ইষ্টকখণ্ডে উপবেশনান্তর একটী সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় তাল তরুতে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া

রহিলেন। তৎপর আলস্য বশতঃ তাঁহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ক্ষণকাল থাকিতে হইয়াছিল। এমন সময় কে এক জন তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইলেন সুবৃহৎ শিখা-ধারী চন্দন চর্চ্চিত ললাট, দীর্ঘ অবয়ব ও কুৎসিত উত্তরীয় কৃষ্ণ বর্ণ পরিশোভিত স্কন্ধ বিশিষ্ট একজন মানব তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেবদত্ত তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন "আপনি কে ও কি চান?"

আগন্তুক কহিলেন "আপনাকে ক্লান্ত দেখিতেছি আপনী আমার সঙ্গে আগমন করিলে ক্লান্তি দূর করিতে পারিবেন। দেবদত্ত বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। বাসুকীও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। সন্ধ্যা কালের অন্ধকারে দিকদিগন্ত সমাচ্ছন্ন ছিল। তিনি সাবধানে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। পথের দুই দিকে লতাপত্র ও পুষ্পবৃক্ষ। অন্ধকারের মধ্যেও বিশদ ফুলগুলির প্রফুল্লতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মন ঐশ্বরীক ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ঈশ্বর বিষয়ক এই কবিতাটী আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন :—

১

জগন্নাথ! জয় যুক্ত জগত তোমার
সুখময়ী সর্ব্বরীর সুষুপ্তির কোলে
প্রকৃতি দিয়াছে ঢালি আঁধারের ভার,
হাসিছে তিমির নীরে কুসুমের দলে।

দূরে কত দূরে স্থিত আকাশ মণ্ডল,
তথা হতে বরষিছে নিহার সলিল
সুসজ্জিতা হইতেছে মহা মহিতল
শীতলতা লভিতেছে অনন্ত অনিল।

৩

জগন্নাথ! জয় যুক্ত প্রকৃতি তোমার
ফল পুষ্প সুপ্রসব করে নিত্য নব
ষষ্ঠ ভরা হীরা সুসমা তটীনীর হার
জলধি মেখলা রূপে বাড়ায় গৌরব।

৪

কি সুন্দর কি মধুর জগন্নাথ নাম
এ নামে পাপীর প্রাণে প্রেম ধারা বয়
কোটী কণ্ঠে করে ধরা তব নাম গান
জয় জগবন্ধু! তব জয় জয় জয়।

ত্বরিতে তড়িৎ জলে নীরদের কোলে
তাহাতেও তোমারই পাই পরিচয়
বজ্র যে ভাঙ্গিয়া পড়ে নর বক্ষস্থলে
তাহাও মহিমা তব হে মহিমালয়।

৬

শিশুরা বর্দ্ধিত হয় দিবসে দিবসে
জ্ঞান পেয়ে তব নাম শুনিবারে পায়,
বৃদ্ধেরা মৃত্যুতে যায় কালের আদেশে
আত্মারূপে সেখানেও তোমাতে মিশায়।

৭

আদিতেও তুমি নাথ! অন্তেতেও তুমি
উত্তরে দক্ষিণে তুমি, তুমি মধ্য স্থলে
পূর্ব্বে পশ্চিমে তুমি, তোমাময় আমি
অধোতে, উর্দ্ধেতে, মস্তকেতে, পদতলে।

অন্তরে বিরাজ কর হয়ে অন্তর্যামী
নয়নের জ্যোতি হয়ে জগত দেখাও,
দুঃখ দিয়ে শাসন করিছ পূজ্যস্বামী
জ্ঞান জবা ফুটাইয়া নিজেকে জানাও

৯

প্রণাম তোমাকে নাথ! প্রণাম তোমাকে
আজীবন করি যেন তব নাম গান
শিখাও আমাকে নাথ শিখাও আমাকে
তোমাকে সঁপিয়া দিব তব দত্ত প্রাণ।

এই কবিতাটী সমাপ্ত করিয়া দেবদত্ত উর্দ্ধমুখে ও যুক্তকরে সেই মহামহিমাময়কে প্রণাম করিলেন। তৎপরে স্বনৈঃ স্বনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন ও মাঠ। মাঠের উপর দিয়া একটি পথ বাহির হইয়াছিল, এই পথ ধরিয়াই তাঁহারা দুই জন গমন করিতেছিলেন। ঘোর অন্ধকারে আকাশ মণ্ডল আবৃত। দেবদত্তের অন্তরে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। চোর ডাকাইতের ভয়েই তিনি শঙ্কিত হইতে ছিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সেকালে এই সব ভয়ই অত্যধিক দেখা যাইত। কিন্তু তিনি খাপবদ্ধ তীক্ষ্ণ তরবারীর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া মন হইতে ভয় ভাবনা বিদূরিত করিয়া দিলেন। সম্মুখে একটী গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বলিয়া বোধ হইল। সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার বিশ্রামোপযোগী সমুদয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন। হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ফল মূল ও দুগ্ধ দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া সুশীতল শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল বিশ্রামের পর হটাৎ যেন তাঁহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। কি একটা অস্থিরতা যেন তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন জনকতক লোক তাঁহাকে বন্ধন করিয়া শবাকারে মাথায় করিয়া লইয়া চলিল। তিনি আপনার তীক্ষ্ণ তরবারীর উপরে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু পারিলেন না, চীৎকার করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহাও যেন তাঁহার শক্তি হইল না। তাহার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যেন তিনি একখানা নৌকার অনাবৃত কাষ্ঠের উপর শায়িত রহিয়াছেন। বহু লোক একত্র হইয়া নৌকার দাঁড় বাহিলে যেরূপ শব্দ হয় তাঁহার কর্ণে যেন সেই রূপ শব্দ আসিতে লাগিল। তখনও তাঁহার আপন তরবারি ধারণ করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলেন না। চীৎকার করিতেও তিনি পারিলেন না। তাহার পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যেন তিনি এক শিবিকা মধ্যে শায়িত হইয়া কোনও বড় পথ দিয়া নীত হইতেছিলেন। এই সময়েই যেন তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিল এবং ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা তিনি দেখিতে পাইলেন শ্যামল তৃণবৃত একখানি বিস্তির্ণ মাঠের প্রান্তভাগে তিনি শায়িত রহিয়াছেন। নন্দক তাঁহার নিদ্রিত মস্তক ক্রোড়ে

করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নন্দকের মাতা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অধোমুখে তাঁহার চোখে মুখে জল সেচন করিতেছেন। তাঁহাকে জাগ্রত দেখিয়া তাঁহারা দুই জনে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।
খুলনা।

ক্ষুদ্রের প্রভাব।

THE POWER OF LITTLES.

এই বিশাল ভ্রাম্যমান ও পরিদৃশ্যমান জগৎ ক্ষুদ্রের সমাবেশ মাত্র। আমরা যে দিকে নিরীক্ষণ করি, দেখিতে পাই ক্ষুদ্রেরই প্রভাব বিরাজ করিতেছে। ক্ষুদ্র একটী একটী করিয়া মহতের সৃষ্টি করিতেছে। ক্ষুদ্র শক্তিহীন নহে, ক্ষুদ্রের শক্তি আছে। জগতে দশটী ক্ষুদ্র একত্র হইলে মহৎ অতি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। অনেকে মনে করেন এই বস্তুটী ক্ষুদ্র, ইহার ক্ষমতা কি? এই বাক্যটী সামান্য, ইহার ক্ষমতা বা মূল্য কি? এই কার্য্যটী ক্ষুদ্র, ইহার গুরুত্ব বা আবশ্যকতা কি? কিন্তু তাহা নহে, সকল ক্ষুদ্রেরই শক্তি, আবশ্যকতা ও মূল্য আছে। ঈশ্বরের প্রতি কার্য্য তাঁহার মহত্ব প্রকাশ করিতেছে।

বিন্দু বিন্দু বারিসম্পাতে অকূল প্রকাণ্ড সিন্ধু সংগঠিত হইতেছে, বিন্দু বিন্দু বারি একত্রিত হইয়া জগতের কি না হিতসাধন করিতেছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকণা সংমিলিত ভাবে ভূধর শিখর হইতে বহির্গত হইয়া স্রোতস্বিনী নামে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে। সেই স্রোতস্বিনী কুল কুল নাদে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে মনোহর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। জীবকুল তাহার মঙ্গলময় সমাগমে কত না উপকার লাভ করিতেছে। তাহারা তাহার জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, তাহার আশীর্ব্বাদ রূপ ফল, ফুল, শস্য গ্রহণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে। আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ একত্র হইয়া বিরাট এবং ভীষণ রূপ ধারণ করিতেছে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা দ্বারা পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে। বারি বিন্দুর বর্ষণ পাইয়া তরুরাজি সুন্দর ফল, ফুল ও নব পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইতেছে, প্রকৃতি ভাণ্ডার ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া বসুন্ধরাকে হাস্যময়ী করিতেছে। পুষ্করিণীতে বারি বিন্দু একত্র হইয়া তৃষা নিবারণ পূর্ব্বক জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের এই অসীম সৃষ্ট সংসার ক্ষুদ্রের সমাবেশ মাত্র। উন্নত দিগন্তব্যাপী মহীরুহ ক্ষুদ্রের সমষ্টি। দেশ, মহাদেশ

সকল ক্ষুদ্রের সম্মিলন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুক সংমিলিত হইয়া ভূধর ও মহাদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বলি ক্ষুদ্রকে তাচ্ছল্য করিবার কিছুই নাই। ক্ষুদ্র শক্তিমান, ক্ষুদ্র মূল্যবান, ক্ষুদ্র আবশ্যকতার উপযোগী, হিতকর বস্তু। তাই কবি বলিয়াছেন ;—

"Little drops of water, little grains of sand,
Make the boundless ocean, and the beauteous land;
And the little moments, humble though they be,
Make the mighty ages of eternity."

"বিন্দু বিন্দু বারি করে সাগর গঠন,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালি করে নগর সৃজন,
সামান্য মুহূর্ত্তে করে হইয়া মিলন,
বলশালী অনন্ত সে কাল নিরূপণ।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোৎ সমবায়ে বনরাজি আলোকিত হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লীর ঝি ঝি গহন কানন মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমে উদ্যান সকল সুসজ্জিত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণা সম্পাতে গিরিরাজশিরে সুন্দর মুকুটের সৃষ্টি হইতেছে। তাহাতে সূর্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রশ্মিকণাগ্রথিত কিরণমালা পতিত হইয়া কত না অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাই দেখিতে পাই ক্ষুদ্রের প্রভাব সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। কি জীবরাজ্যে কি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্রের বল ও বিক্রম দেদীপ্যমান। জীব জন্তু প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত, তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে স্বপ্নাতীত অদ্ভুত আবিষ্কার সকল স্বল্প স্বল্প করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আবার উক্ত আবিষ্কার সকল অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে সম্ভূত হইতেছে। বৃহৎ দীর্ঘকালব্যাপী মানব জীবন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমষ্টিমাত্র মানব চরিত্রও তাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য দ্বারা মানব-চরিত্র গ্রথিত। আমাদিগের চির জীবনের গৃহ সুখও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা নিচয়ের উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্রই আমাদিগের দৈনিক গৃহ সুখের মূল। দয়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণসমূহ ঐ সুখের ভিত্তি ও সুব্যঞ্জক। উহাতে আমাদিগের গৃহস্থলী পবিত্র ও সুখময় স্বর্গরূপ ধারণ করে।

"Little deeds of kindness, little words of love,
Make the earth an Eden, like the heaven above."

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়া কার্য্য, প্রণয় বচন,
সুখ স্বর্গ করে এই অবনী ভবন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা করে স্বভাব সৃজন,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে জীবন গঠন।
গৃহ মধ্যে সুখ যাহা ক্ষুদ্র কার্য্যে হয়,
ক্ষুদ্র বলে কেহ তাই ফেলিবার নয়।"

আমাদিগের এই পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ ক্ষুদ্র হইতে উৎপন্ন, ক্ষুদ্রতে বিলুপ্ত হয়।

আমরা অল্প অল্প ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মন প্রশস্ত করিতে পারি এবং ইহ জীবনকে সুখের অধিকারী করিতে পারি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মকার্য্য আমাদিগের পরপারে যাইবার সম্বল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মকার্য্য সকলই কেবলমাত্র আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের চরণতলে লইয়া যাইতে পারগ হয়। ক্ষুদ্রের প্রভাব সর্ব্বত্রই প্রতীয়মান।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

সাধু বচন সংগ্রহ।

অন্যের দুঃখের সঙ্গে করিলে তুলনা।
আপন দুঃখের ভারে গুরুত্ব থাকে না। ১
পরেতে দেখিয়া দোষ নিন্দিবে যেমন,
সাবধানে ত্যাগ তাহা করিবে তেমন। ২
নির্দ্দয় মৃত্যুর বুঝি বধির শ্রবণ,
স্তুতি মিনতির বশ নহে সে কখন। ৩
কুচিন্তায় করিওনা অন্তর কুটিল,
কু কথায় করিওনা রসনা পঙ্কিল। ৪
বিপন্ন জীবন রক্ষা করে যে প্রকারে,
সত্য রক্ষা কর সেই বিধি অনুসারে। ৫
স্বার্থ সংস্কারে তত্ত্ব রহে আচ্ছাদিত,
বিচার বিতর্ক তাই নিতান্ত উচিত। ৬
কর্ম্মঠতা আছে যার দরিদ্র 'সে' নয়,
শ্রম সহ ঐশ্বর্য্যের তুলনা না হয়। ৭
দুঃখ আর দরিদ্রতা অঙ্কুশ যুগল,
যত্ন আর পরিশ্রমে রাখিছে সবল। ৮
চিকিৎসায় যে রোগের নহে প্রতীকার।
বিদূরিত করে তারে সংযত আহার। ৯
মন্দ যার অভিসন্ধি, দুষ্ট যার মন,
তারে ছাড়ি দূর দেশে পলাবে সুজন। ১০
দুর্দ্দিনে যাহার তরে অনুতাপ হয়,
করিওনা হেন কাজ সৌভাগ্য সময়। ১১
যে জন আপন কাজে উপযুক্ত হয়,
এক দিন পুরস্কার পাবে সে নিশ্চয়। ১২
প্রভাতে যে কাজ পার রাখিও সারিয়া,
সায়াহ্নের তরে তাহা দিওনা রাখিয়া। ১৩
মন্দ পরিহরি ভাল করিবে সদাই,
মানব কর্ত্তব্য আর ইহা ছাড়া নাই। ১৪
মন্দ বলি কাহারেও করিওনা ঘৃণা,
সংশোধনে চিত্ত শুদ্ধি কাহার ঘটে না। ১৫
সকল বিপদ হ'তে প্রাণে বাঁচা যায়,
আপনার হাত হ'তে পালাবে কোথায়। ১৬
শরীর মনের স্বাস্থ্য মূলধন যার,
কোন দেশে কোন কালে কি অভাব তার? ১৭
জানিতে বিশ্বের তত্ত্ব ব্যাকুল সবাই,
আপনার তত্ত্ব কিন্তু কারো মনে নাই। ১৮
শরীরের রোগে করে সবাই ক্রন্দন,
স্মরিয়া মনের রোগ কাঁদে কয় জন? ১৯
বাহিরের পরিচ্ছদে বড় যত্ন যার,
ভিতরে দেখিলে তার উঠিবে হাহাকার। ২০
উন্মিলীত চক্ষু রহে গণ্ডীর ভিতরে,
নিমীলিত চক্ষু ছুটে ব্রহ্মাণ্ডের পারে। ২১
না করিলে ইষ্ট দেবে প্রাণ সমর্পণ,
বালকের খেলা সব সাধন ভজন। ২২

মশক দংশনে হয় যে দেহ চঞ্চল,
সে কিস্তু সহিবে দীপ্ত চিতার অনল।২৩
কি ফল থাকিলে ধন কৃপণের ঘরে?
খনিস্থিত মণি কার উপকার করে? ২৪
যে মণ্ডূক চিরদিন কূপে করে বাস,
সে কেন বাসিবে ভাল বিমুক্ত বাতাস।২৫

বামারচনা।

উদাসীন দান।

দাও ভেঙ্গে দাও সুখের স্বপন
নিশা না হইতে ভোর,
দাও টুটি দাও প্রাণের মধুর
সুদৃঢ় প্রণয় ডোর।

নিভাও নিভাও আশার আলোক
শুকাও বাসনাকলি,
বিলাও বিলাও সকলি ধরায়,
যা কিছু আপনা বলি।

আসিবার আগে গোধূলি আঁধার
ভাঙ্গিবার আগে মেলা,
কর সমাধান ওহে জগদীশ!
আমার জীবন খেলা।

কন্যার বিয়োগে মাতার শোকোচ্ছাস।

এ হেন চাঁদিমা রাতে চলে গেছ তুমি,
স্নেহ পাশে বেঁধে রাখিতে নারিনু আমি,
কি বার্ত্তা পাইলে, কারো কথা না কহিলে,
ধ্যানযোগে মগ্ন হয়ে অনন্তে মিশিলে।

ভাবেতে বিভোর হয়ে বিভুর বন্দনা,
গাইতে যখন তুমি আনন্দে মগনা,
স্বর্গ মর্ত্ত ভেদাভেদ থাকিত না আর,
সবার হৃদয় থেকে দূরে যেতো ভার।

প্রফুল্ল-নলিনী-সম ফুটে ছিলে ঘরে,
কতই আনন্দ শান্তি দিয়েছিলে মোরে,
তোমার সঙ্গীত ধ্বনি মরমে ধ্বনিছে,
মধুর বীণার তান নীরব হয়েছে।

রোগ জীর্ণ পিতা তব শোকেতে আকুল,
সান্ত্বনা না মানে হৃদি পরাণ ব্যাকুল,
তব কণ্ঠে ব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে,
যাইবেন ভবপারে সাধ ছিল চিতে।

মনের বাসনা সব মনেতে রহিল,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সব শূন্যেতে মিশাল,
সব সুখে সুখী হয়ে ছিলাম সংসারে,
দয়াময় নাম গানে যাব ভব পারে।

৬

ধর্ম্ম কর্ম্ম একাধারে অনুপম রূপে,
ফুটিয়া উঠিতেছিল তোমার ভিতরে,
ধনী, জ্ঞানী, দুঃখী, তাপি সর্ব্বজনে তুষি,
স্মৃতিতে অমর হয়ে স্বর্গে আছ বসি।

৭

তুমি এনেছিলে ঘরে জোছনার রাশি,
তোমার বিয়োগে অমানিশা দিবানিশি,
অমরার ফুল তুমি গেছ কোথা চলে,
বুক ভরা বেদনা যে দিয়ে মোরে গেলে।

৮

বুঝিনু সংসার নহে তব যোগ্য স্থান,
হেথায় পূরেনা আশা নাহি প্রতিদান,
তাই বুঝি চলে গেলে জীবন উষায়,
ত্যজিয়া মরত ভূমি অমর যথায়।

৯

দু দিনের তরে বাছা আসিয়ে হেথায়,
বিভু প্রেম সুধারসে ভাসালে সবায়,
তব তরে আঁখি ঝরে কত নারী নরে,
অকালে নিঠুর কাল লয়ে গেল তোরে।

১০

জীবনে যে ব্রহ্ম নাম সাধন করিলে,
মরণের কালে সবে সাক্ষ্য দিয়ে গেলে,
সে দেশ স্বদেশ তব আগে জেনে ছিলে,
দয়াময় নাম গানে জীবন ত্যজিলে।

১১

ওহে প্রভু দয়াময় কি বলিব আর,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ জীবনে আমার,
তুমি এনে ছিলে হেথা, রেখে ছিলে তারে,
অযোগ্য দেখিয়া মোরে নিলে ত্বরা করে।

১২

এবে এই ভিক্ষা প্রভু মাগি তব ঠাঁই,
তব কোলে হেরে তারে জীবন জুড়াই,
ইহ পরলোক এক করে দাও দেখি,
ঘুচে যাক্ ব্যবধান খুলে যাক্ আঁখি।

১৩

দীন দয়াময় তুমি পতিতপাবন,
শরণাগতেরে রাখ জানে সর্ব্বজন,
সযতনে শান্তি ভাবে রেখো সে আত্মায়,
দেহান্তে মিলিব মোরা গিয়ে তব পায়।

বেহুলা

কবি-কেশরীর মানস-সম্ভবা,
প্রতিভা-শালিনী, সুষমা বৈভবা,
রাণী—মহারাণী সীমন্তিনী কুলে,
সতী-শিরোমণি বেহুলে! ১

সুধীরা সুশীলা, করুণা-রূপিণী,
দিব্য প্রেম তেজে মহা তেজস্বিনী,
অটলা, অচলা বিপদ অকূলে,
দুখিনী—সুখিনী বেহুলে। ২

অয়ি লীলাবতি, তব লীলা ভবে
তব কীর্ত্তি খ্যাতি চিরদিন রবে,
চির দিন কবি তব পাদমূলে
আশ্রয় লভিবে বেহুলে। ৩

পাষাণী পদ্মার নাগকুলভয়ে
সারা নিশি জাগ ব্যাকুল হৃদয়ে,
অঙ্কে লয়ে পতি চরণ রাতুলে
লৌহের বাসরে বেহুলে। ৪

অদৃষ্ট বিধানে সুপ্ত নখিন্দর,
গরজে বাহিরে কাল বিষধর,
"দুর্গা দুর্গা" বলে ডাকিলে আকুলে
তুমি ভক্তিমতী, বেহুলে। ৫

সূচাগ্র প্রমান রন্ধ্রপথে চরে
মনসার নাগ মনসার বরে,
ছিল রন্ধ্র এক কামারের ভুলে
বাসরে তোমার বেহুলে! ৬

পশিল পন্নগ, হায় হায় হায়?
এ কালের হাতে কে এসে বাঁচায়?
(তুমি) হানিলা ছুরিকা দৃঢ় করে তুলে,
নাশিলে অরাতি, বেহুলে। ৭

(তবু) বিধাতার লিপি কে করে খণ্ডন?
মনসার কোপ করে প্রশমন?
যত বিনাশিলে তুমি অহিকুলে,
তত এলো ধেয়ে, বেহুলে! ৮

কালকূট নাগ কালসহোদর,
অশরীরী পশি বাসর ভিতর
দংশিল নিঠুর শিরে কেশমূলে
নখিন্দরে তব, বেহুলে। ৯

(আহা) মুহূর্ত্তে শুকাল প্রাণপ্রস্রাণ,
কোথা সে সুন্দর দেহের বরণ
কালিমা পড়েছে বদন মণ্ডলে,
নখিন্দরের তব, বেহুলে। ১০

সহসা আতঙ্কে শিহরিল প্রাণ,
ডুবিল চন্দ্রমা, আঁধার গগন।
ঝাঁপিলে অতল বিপদ অকূলে,
শোকে বিবসনা বেহুলে। ১১

নীরব নিজন নিথর অবনী
রাক্ষসীর বেশে আসিয়া রজনী
তব প্রাণপতি নিয়ে পলাইলে।
হায়! অভাগিনী বেহুলে! ১২

বিষাদ বেদনে হৃদয় দহিল
সুখের কল্পনা কোথা মিলাইল?
শিরে করাঘাত কাতরে হানিলে,
তুমি শোকাকুলা বেহুলে। ১৩

চারিদিক শূন্য, শূন্য এ অবনী,
দুখেতে আচ্ছন্ন শোকে উন্মাদিনী;
বুকে লয়ে পতি চরণ রাতুলে,
মুরছি পড়িলে বেহুলে। ১৪

হায়, ভগবান কি ভালে লিখিলে?
বিবাহ বাসরে পতিরে হরালে?
অদৃষ্টকে নিন্দি কত যে কাঁদিলে,
লৌহের বাসরে বেহুলে। ১৫

সতীর বিলাপে ধরণী কাঁপিল,
কালকূট নাগ তরাসে লুকাল,
(বুঝি) সতী ক্রোধানলে পৃথিবী দহিলে,
আগ্নি তেজস্বিনী বেহুলে। ১৬

হৃদয় দেবতা।

জয় সর্ব্বাশ্রয়, তুমি বিশ্বময়
অগতির গতি,
তোমার চরণে, ভক্তিযুক্ত প্রাণে,
অসংখ্য প্রণতি
দয়াময় হরি, ভব-ভয়-হারি
করুণা-সাগর,
সৃজন পালন, মঙ্গল কারণ,
জয় পরমেশ্বর!
কোথা কৃপাসিন্ধু, অনাথের বন্ধু,
অনাদি মহান,
এ অভাগা দীনে, অধম সন্তানে,
কর কৃপা দান।
তব প্রেম লাগি, যেন দিবা রাতি
জাগে এ হৃদয়,
তোমার কৃপায়, যেন দিন যায়
ওহে দয়াময়।
তোমার আশীষে, থেকে ভববাসে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত,
করিয়ে সাধন, করি সমাপন,
জীবনের ব্রত।
জয় বিশ্বপতি, করি এ মিনতি,
তোমার চরণে,—
যখন যে ভাবে, থাকি এই ভবে,
জীবনে মরণে—
হয়ে তব দাস, করি গো নিবাস,
এ ভব ভবনে,
তোমার চরণ, নিয়ত স্মরণ
থাকে যেন মনে।
সে অন্তিমে বল, তুমিই সম্বল
প্রেমময় হরি,
শেষের সে দিনে অভয় চরণে
দিও প্রভো তরি।
নমো ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান,
প্রভো নিরঞ্জন!
আমার হৃদয়ে, তিমির নাশিয়ে,
এস নারায়ণ।

শ্রীমনোরমা রায়।
পুরুড়া, ময়মনসিংহ।

পরলোক

পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর,
প্রেরিয়াছি প্রাণসম সুহৃদ প্রচুর।
তোমার কৌমুদীময় শান্ত স্বর্গলোকে,
হেরিয়া তাদের মুখ ভুলি সব শোকে।
এ আনন্দে মন মম হয় ভরপুর,—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।
মিষ্ট আলাপন হবে তাহাদের সনে,
হাসিব কাঁদিব কত সুখ সম্মিলনে।
পূর্ব্ব স্মৃতি কত শত জাগি উঠি যত
দিবে যে আনন্দ মোরে শত মনোমত।
মন্দাকিনী তীরে হবে মিলন মধুর—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।
জুড়ায়ে হৃদয় ব্যথা বহে সমীরণ
শশাঙ্কের হ্রাস বৃদ্ধি না হয় কখন।
যেতে সেই স্বপ্নরাজ্যে মন তৃষাতুর—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।

শ্রীমতী হে—ন—দেবী।

বন্দনা।

অনন্ত করুণাময়
জগত-জীবন,
বন্দনা করিছে বিশ্ব
যুগল চরণ'
নীলাকাশে রবি শশী
তারকা নিকর
তোমারি মহিমা গায়
আনন্দ অন্তর।
জল, স্থল, শূন্য, আর
অনল, বাতাস,
করিতেছে কত তব
মহিমা প্রকাশ।
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, পশু
নানা জীবদল
বন্দনা করিছে তব
চরণ যুগল।
নদ নদী পারাবার
কান্তার প্রান্তর
তোমার মহিমা গায়,
মীন সরোবর।
শ্যামল বিটপীশ্রেণী
গলাগলি করি
গায় তব পুণ্য নাম
দিবা বিভাবরী।
ফুলে ফুলে বসি সুখে
ভ্রমর গুঞ্জরে,
তোমার [illegible]
মুখে মধু ঝরে।
কুল্‌কুল্‌ কল্লোলিনী
তব নাম গায়,
বিহগ তোমারি গানে
ভুবন মাতায়।
জগতের নর নারী
আনন্দিত মন,
নিয়ত তোমারি পদে
ঢালি প্রাণ মন,
ভক্তি ভরে প্রেম ফুলে
পূজে অনিবার,
প্রণিপাত করে বিভো
চরণে তোমার।

শ্রীমনোরমা রায়।
পুরুড়া, ময়মনসিংহ

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 617. January 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৭ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২১। জানুয়ারী, ১৯১৫। | ১০ম কল্প ৩য় ভাগ

সমাজে রমণীর স্থান।

প্রকৃতির মধ্য দিয়া বিশ্বের শক্তি বিকশিত ও প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রকৃতির দুইটি উৎস, একটি বিশ্ব-প্রকৃতি অথবা জড়-প্রকৃতি,—আর, একটি আদ্যা প্রকৃতি। এই উভয় প্রকৃতি বিশ্বের মধ্যে যে এক অদ্ভুত রহস্য-জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, যুগে যুগে কত কবির ধ্যান, দার্শনিকের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান তাহা ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিতরের প্রকৃত সত্যটী যে কোন কালে ধরা পড়ে নাই তাহা নহে, তাহা অনেক বারই ধরা পড়িয়াছে। প্রত্যেক যুগের সাধক তাঁহার সাধনার মধ্যে সেই সত্য পাইয়াছেন এবং বিশ্বমানবকে তাহা দান করিয়াছেন। কিন্তু সাধকের সাধনাকে নিজের জীবনে সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে ব্যক্তিগত সাধনার প্রয়োজন, তাই পৃথিবীতে এত সাধুপুরুষ থাকিতেও পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই অসাধু। সেই জন্যই প্রত্যেক নব যুগকে নূতন করিয়া তাহার সাধনপথ খুঁজিয়া লইতে হয়। শক্তিকে আয়ত্ত করিবার এই যে চেষ্টা ইহা কতকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না, কতকাল চলিবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। শক্তির একটা বিশেষত্ব এই যে তাহাকে সংযত করিতে না পারিলে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকবে—উহা তেমন জিনিষই নয়, সুতরাং সৃষ্টি করিতে না পারিলে তাহা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে। সৃষ্টি ও ধ্বংস একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ।

উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করিতে মানুষ যত চেষ্টা করিয়াছে সমাজগঠনকে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মানুষ অনেক ভাবিয়া, অনেক ভাঙ্গা গড়া করিয়া, অনেক ত্যাগ করিয়া তবে সমাজ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। এই সমাজ-সৃজনের মূল কারণ খুঁজিলে বোধ হয় সেখানে রমণীকেই পাওয়া যাইবে। নারী-সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়াই মানবসমাজের সৃষ্টি, কিন্তু অদ্যাপি সেই সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর এতগুলি সভ্যসমাজ এই দুরূহ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর ঠিক করিতে পারেন নাই. সেই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ নারীসমাজের সহিত নরসমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

নারীজাতির যথার্থ মূল্য বুঝিতে না পারিলে তাহার যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আমাদের ভাষায় রমণীকে 'অবলা' বলে, শক্তিহীন, মৃতজাতির ভাষায়ই নারীকে অবলা বলা সাজে। ভাষার ভিতর দিয়া জাতির চরিত্র প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজ রমণী জাতিকে fair sex বলিয়া জানে, সেখানে রমণী বিশেষ ভাবে বিলাসের সামগ্রী। তাঁহারা সভ্যতার যতই বড়াই করুন না কেন, স্ত্রীদিগকে যতই স্বাধীনতা দিন না কেন, স্ত্রীশক্তির যথার্থ কেন্দ্রটীর খোঁজ তাঁহারা পান নাই। সে সন্ধান প্রাচীন ভারত পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে রমণী অবলা নহে, "fair sex" ও নহে, রমণী সেখানে প্রকৃতি হইয়া দেখা দিয়াছিল। রমণীর আখ্যা ছিল জননী, স্ত্রীজাতিকে তাঁহারা জননীর জাতি বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাই বিশ্বের আদি কারণকে সেখানে রমণী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বিশ্বশক্তিকে রমণী বলিয়া কল্পনা করিয়া প্রত্যেক নারীকে সেই শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ বলিয়া জ্ঞান করাই তাঁহাদের সভ্যতার সাধনা ছিল। ভগবানকে নমস্কার জানাইবার মন্ত্র ছিল "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।" রমণীকে তাঁহারা শক্তির উৎস বলিয়া জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা শক্তিশালী জাতি ছিলেন। যে জাতি যে পরিমাণে এই নারীশক্তির ক্ষমতা উপলব্ধি করিয়াছে সেই জাতি সেই পরিমাণে বড় হইয়াছে। আমাদের অপেক্ষা ইউরোপের আধুনিক জাতিগুলি বড়, তাহার কারণ আমাদের অপেক্ষা তাহারা এই স্ত্রীশক্তির অধিক মর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছে। জাতির শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণই নারী, কারণ নারীই জাতির জননী। নারী জাতি নেপথ্যে থাকিয়া প্রত্যেক জাতিকে যে জীবনরসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন তাহা কয় জন লোক ভাবিয়া দেখে? ভাবিয়া দেখে না বলিয়াই তাহারা বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিতে পারে না বলিয়াই নারীর মর্য্যাদাও করে না। যে জাতি ইহা বুঝিয়াছে তাহারাই এই শক্তিকে সম্মান করিয়া বড় হইয়া গিয়াছে। মানুষ গাছের ফুল দেখিয়াই মুগ্ধ হয়, ফল দেখিয়াই লুব্ধ হয়, কিন্তু কে যে কোথা হইতে এই ফুল

ফুটাইতেছে, ফল ফলাইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দেখিতে শিখিয়াছে সে জানে যে মাটীর নীচের গুপ্ত শিকড় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গাছকে সর্ব্বদা জীবনের রস যোগাইতেছে এবং সেই জীবনই ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক জাতিও এই গাছের মত, তাহার ফুলের বিকাশ ও ফলের প্রকাশের মূল শিকড় কোন্ নিভৃত প্রদেশে থাকিয়া যে কাজ করিতেছে তাহার খোঁজ সাধারণ মানুষ রাখে না।

মানুষ সে খোঁজ রাখুক আর নাই রাখুক কিন্তু এ কথা সত্য যে নারীই সমাজের প্রাণ। ইউরোপের বিখ্যাত নাট্য শিল্পি ইব্‌সেন্ (Ibsen) বলিয়াছেন "It is you, women, who are the pillars of society." রমণীগণই প্রত্যেক সমাজের ভিত্তি ; সে ভিত্তি যদি সুস্থ ও সবল না হয় তাহা হইলে সমাজ টিকিবে কি করিয়া ? ইব্‌সেন্ বলেন "The spirits of Truth and of Freedom—these are the Pillars of Society. সুতরাং যে সমাজে সত্য ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা নাই সে সমাজকে ভিত্তিহীন বলা যাইতে পারে।

ইব্‌সেন্ সমাজে রমণীগণের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত স্থান, সে স্থান সকলের নীচে হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে। সমাজকে উন্নত করা, নির্ম্মল করা এবং শক্তিসম্পন্ন করা অন্য কোনও সংস্কারকের কাজ নয়,—বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া সমালোচনা করিয়া সমাজের প্রকৃত উন্নতি হয় না। রমণীই সমাজের প্রকৃত সংস্কারক, রমণীগণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। পতিত জাতি যদি উঠিতে চায় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার কতকগুলি সুমাতার প্রয়োজন। নেপোলিয়ান বলিয়াছেন "The country needs nothing so much to promote its regeneration as good mothers." একথা যে কতদূর সত্য স্বয়ং নেপোলিয়ানই তাহার প্রমাণ। শুধু জন্মদান করিলেই নেপোলিয়ানের মত পুত্রের মাতা হওয়া যায় না, পুত্রকে শিক্ষা ও দান করিতে হয়। থিয়োডোর পার্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার আর দুইটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে স্ত্রীলোকগণ পুরুষাপেক্ষা সকল বিষয়েই ছোট। শারীরিক অথবা মানসিক কোনও বিষয়েই তাহারা পুরুষদের সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা যে সত্য নয় ইতিহাস হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু আবার একদল লোক আছেন তাঁহাদের মত এই যে রমণীসমাজকে সকল বিষয়ে পুরুষদের সমান অধিকার না দেওয়া নিতান্তই একদেশদর্শিতা ও স্বার্থপরতা। উভয় সমাজের সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু তাহাদের এই মত যে ভ্রান্ত তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে

হয় না, কাহাকেও ইহা বুঝাইয়া দেওয়া বোধ হয় আবশ্যক হয় না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখেন নাই নতুবা স্ত্রী পুরুষের এত বড় স্বাভাবিক পার্থক্যটা কি করিয়া তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া গেল! স্ত্রী-পুরুষে যদি কোন রকম ভেদই না থাকিবে তাহা হইলে ভগবান স্ত্রীকে স্ত্রী এবং পুরুষকে পুরুষ করিয়া গড়িয়াছিলেন্ কেন? আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে যাঁহারা স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্যকে একাকার করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।

টেনিসন্ ইহার একটা সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছেন যে রমণী পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণ নহে, কিম্বা রমণী যে চেষ্টা করিলে পরিপূর্ণ পুরুষ হইতে পারেন সে কথাও সত্য নহে। রমণী রমণী, নারীরত্নের ভিতরেই তাঁহার পরিপূর্ণ রূপ, রমণী রমণীরূপেই সম্পূর্ণ।

"Woman is not undeveloped man but diverse"

তিনি রমণীর স্থান পুরুষের পার্শ্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন উপরেও নয়, নীচেও নয়। তিনি বলেন যে রমণী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া সমাজকে সম্পূর্ণতা দান করে এবং সমাজের নিকট উভয়ের মূল্যই সমান,—কেহ কাহারও অপেক্ষা বড় নয়।

"The woman's cause is man's they rise or sink
Together, dwarfed or godlike, bound or free:
If she be small, slight natured, miserable,
How shall men grow?"

নারী যদি অশিক্ষিত, নীচ এবং হীন হয় তবে পুরুষ মহৎ হইবে কি করিয়া? তাহা যে হইতেই পারে না। রমণী তাহার ক্ষুদ্রতা লইয়া পুরুষের উন্নতিপথের বৃহৎ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। তাই টেনিসন্ বলেন যে পুরুষ পুরুষরূপেই সম্পূর্ণ হইয়া উঠুক এবং নারী নারীরূপেই বিকশিত হইয়া উঠুক, তবেই তাহাদের মিলন সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তখন একজন আর একজনের উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক স্বরূপ না হইয়া সহায় স্বরূপ হইবে—"Each fulfils defect in each."—ইহা খুব ভাল আপোষের কথা বটে কিন্তু আপোষ হইয়াছে বলিয়াত মনে হয় না। তাহা হইলে কিছুদিন আগে লয়েড্ জর্জ্জের বাড়ীর জানালা গুলির এরূপ দুরবস্থা হইত না।

মূল কথা হইতেছে এই যে আমরা পুরুষ হইয়া রমণীদের সমস্যা মীমাংসা করিতে পারি না। আমরা তাহাদের যে স্থান নির্দ্দেশ করিব হয়ত তাহা তাহাদের যথার্থ স্থান নয়। হয়ত আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান তাহাদের মনঃপূত হইবে না,—তাহাকে তাহারা স্বীকার করিতে চাহিবে না। তার পর আমাদের মধ্যেই কেহ তাহাদিগকে উর্দ্ধে, অধোতে অথবা পার্শ্বে

স্থাপন করিতেছেন সুতরাং সমাজে তাহাদের যথার্থ স্থান কোথায় সে বিষয়ে সকলের একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে নারী-সমস্যা লইয়া পুরুষদের মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন। তাহাদিগকে হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে কি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহার বিচার করিবার জন্য আমাদের গম্ভীরভাবে বিচারকের আসনে বসিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহাদের সমস্যা তাহারাই মীমাংসা করিয়া লইবে। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। যে পর্য্যন্ত না আমাদের জনসাধারণ এবং আমাদের দেশের রমণীগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে সে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের উন্নতি নাই, জাতির মঙ্গল নাই এবং দেশের কল্যাণ নাই। সমাজে রমণীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে না গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিলে তাহাদের যথার্থ উপকার করা হইবে এবং সমাজে তাহাদের স্থান কোথায় এই প্রশ্নের মীমাংসায় তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। আমরাও অনেক পরিমাণে দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

কামনা।

জগদীশ!
আমারে তোমার বিশ্বে দাও বিলাইয়া
আমি বড় স্বার্থপর
বেঁধে এক ক্ষুদ্র ঘর,
রেখেছি তাহারি মাঝে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
যা কিছু সুন্দর পূণ্য,
গিরি, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য,
যা, সব নয়নে আসে মধুরী মাখিয়া—
যত কিছু স্নেহ-প্রীতি,
আনন্দ, সুখের স্মৃতি,
খ্যাতি, কীর্ত্তি, মনুষ্যত্ব—তৃপ্তি যা' লভিয়া
আমি ভাবি সবি বুঝি আমারি লাগিয়া!

২

আমি কে বুঝিনা নাথ! স্বার্থ কিবা মম,
আমি যে কি অণু কণা,
তাও চির জানিল না,
আমার নিজস্ব কিবা চির প্রিয়তম?
কার তরে আয়োজন,
জীবনের প্রয়োজন,
শুধু খুঁজি—বুঝি না'ক বৃথা পরিশ্রম!
তাই আজি মাগি ভিক্ষা,
তুমি নিজে দেহ শিক্ষা,
করুণার কল্পতরু, গুরু হয়ে মম,
চূর্ণ কর রুদ্ধ জ্ঞান ভস্ম কর ভ্রম।

৩

আমারে দেখাও দেব! উন্মীলি নয়ন,
তোমারি লাগিয়ে আসা,
তোমাতে মিশায়ে আশা,
করি তব শুভ ইচ্ছা সাদরে বরণ।

আমার সমগ্র ধরা,
তোমাতে হউক ভরা,
তোমাতেই দিব আমি সঁপিয়া জীবন
তোমা'র বিশাল ঘরে,
ভুলি গিয়া পরাপরে,
সেবিব যতনে সবে তোমারি কারণ,
তোমারি কল্যাণ ক্ষেম,
অনন্ত অপার প্রেম,
হোক এই দীন প্রাণে রত্ন আভরণ,
পুরাও কামনা, কর সার্থক জীবন।

শ্রীমা—

৺ উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

তাঁহার লিখিত ডায়েরী।

১৮৭২। ফাল্গুন, শনিবার।

মুঙ্গের প্রাতঃভ্রমণ—ঈশ্বরের জগতে পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষশ্রেণীতে কি সুন্দর ছবি অঙ্কিত। এমন স্থান আছে যেথানে গেলে মন আপনা হইতে ঈশ্বরে ধাবমান হয়। সূর্য্যের কিরণে তাঁর জ্যোতি, সমীরণে তাঁর প্রেমপ্রবাহ, পক্ষীর কূজনে তাঁর মধুরতা অনুভূত হয়—কত সুখ, কত শান্তি। সুখের রাজ্যে বাস করিয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে দুঃখী করিয়া রাখি।

নির্জন সাধন মনের অনেক দিনের বাসনা আর পূর্ণ হয় না, কত অবস্থা আসিয়া তাহার প্রতিকূল হয়। সুযোগ পাইলে ভুলিও না। আমরা কেন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতীক্ষা করি না। আজ ৫ মিনিট চেষ্টা করিলাম, হইল না, কালি হইল না—এইরূপে বৃথা চেষ্টা হয়। ঈশ্বর বলেন কৈ না হইলে ত আমার সন্তানের চলে, সেও অধিকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করে না। প্রতীক্ষার মধ্যে ঈশ্বর দর্শনের সঙ্কেত।

১৩ই ফাল্গুন রবিবার।

ভাগলপুর নগরসঙ্কীর্ত্তন Not as to be expected as nothing was prepared. How the wide universe appeared dwelling house, where the sun and sky glorified God and we joined with them. The very thought is sublime.

Sermon যাহা আমার পক্ষে অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব, এই দৃঢ় বিশ্বাস চাই।

আলোচনা—বুদ্ধিগত মতকে বিশ্বাসে পরিণত করিতে হইলে সেই মত পরিষ্কাররূপে বুঝা এবং হৃদয়ের ভাব সেইরূপ হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। অকৃতজ্ঞ পুত্র সেই প্রণালীতে কৃতজ্ঞ হয়।

আপনার দিকের সকল বিষয় সম্পূর্ণ থাকিলেও পবিত্র হইতে পারি না—ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ছাড়িয়া যত

তাঁহাতে বিশ্বাস হইবে তত উপকার হইবে। তত উপকার পাওয়া যাইবে। Self abnegation লুথারের মত।

রাত্রি—এই সংসার ছাড়া এমন একটী রাজ্য আছে তথায় আধ্যাত্মিক সমুদায় ব্যাপার স্পষ্ট লাভ হয়—যেমন সংসারিক ব্যাপার এখানে। কল্পনার কথা নয়। অনেকে সে রাজ্যে গিয়াছেন, আমরাও সময় সময় গিয়া থাকি। সেই রাজ্যে বাস করিতে না পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন নিরর্থক।

১লা মাঘ—১২৮০

ধর্ম্মপরিবার না হইলে চিরকাল আত্মা কোথায় থাকিবে? ঈশ্বরের চরণতলে মস্তক রাখিয়া সকলের সহিত এই পরিবার বন্ধন করিব।

১৬ই চৈত্র ১২৮০

বিভিন্ন ইচ্ছা সকল বিলুপ্ত করিয়া এক ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সকলে সংযুক্ত হও, প্রেম পরিবার হইবে।

বিজয় বাবু—ধর্ম্ম প্রচার করা জীবন্ত সর্প লইয়া খেলা করা।

ভূমিতে যত ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ে, তাহা বিফল হয় না, দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবেই হউক, ভূমির উর্ব্বরতার সহায়তা করে।

শূন্য ছোট ও বড় সকলেরই সমান মূল্য।

ইচ্ছা—অর্থ কেবল ইচ্ছা নয়, কিন্তু তজ্জন্য জীবনের ব্যাকুলতা। যদি তাহা না হয় আপনার সাধু ইচ্ছা বলিয়া প্রতারিত হইও না। মনের গতি যদি কুদিকে থাকে, হাজার ভাল ইচ্ছা থাকিলেও আমি পাপে মগ্ন আছি তাহার সন্দেহ নাই।

একটী বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া না লাগিলে উদাসীন ভাবে কোন ফল লাভ হয় না।

২৬-৩৮০

(১) অসুরকে সামান্য বলিয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিলে ভয়ানক হইয়া প্রাণ বধ করে। ভয়ানক অসুরও উপবাস ও হোম যজ্ঞ দ্বারা নিশ্চয় দমন ও বিনষ্ট হয়। Keep with youlfelf at all time the secret of subduing the monsters. They well know their slaves, never leave them but they fear the God-fearing men.

2 Good resolutions carry out immediately without carring any consequence what ever any obstacle in the way is your veteran enemy, let it be a bad habit.

৩০-১০-৮৫। (পদ্য)

তুমি প্রাণ জুড়ান ধন, হৃদয় পরশমণি
অমূল্য রতন
প্রাণান্তে তোমায় যেন ভুলিনা কখন।
রাখিব তোমায় হৃদয় ঘরে, যতনে আদর
করে,
প্রেম ভক্তি উপহারে করিব পূজন।
তোমা ধনে হয়ে ধনী ; (সুখ দুঃখ তুচ্ছ গণি)
আনন্দে দিবা রজনী,
(তব সহবাস সুখে) করিব যাপন।

পেয়েছি সুধার স্বাদ নামেতে তোমার,
ভুলিতে কি পারি ও নাম, ওকি ভুলিবার।
নাম নয় ভরা সুধা, পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা
ভকত পরাণ সদা নামে মাতোয়ারা,
প্রেম পূর্ণ শান্তি নদী, বহে নামে নিরবধি,
পরশনে মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার।
ঐ নাম সুধা পান করি, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিপুরারি,
পার হল ভববারি কত পাপী দুরাচার।
অতি যতনেরই ধন,
প্রাণের প্রাণ তুমি, প্রাণ রমণ।
হৃদয় রতন তুমি পরশ রতন।
সুধাময় করুণা নিধি, আনন্দ প্রেম জলধি,
সর্ব্বসন্তাপহরণ, সুখপ্রস্রবণ।

৫ই অক্টোবর ১৮৮৬—মঙ্গলবার।

পচম্বায় আসিবার জন্য যাত্রা করিয়া পথে চুঁচুড়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করা যায়। তাঁহার দেহে মৃত্যুর ছায়া লক্ষিত হইল, কিন্তু প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত, পরলোকের সুখাস্বাদন করিতেছে। আহার গিয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিকল, বিষয়ের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন প্রায়, কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার স্মরণ শক্তি, আশ্চর্য্য তাঁহার স্নেহ ভালবাসা, সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্য তাঁহার ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রহ্মানন্দোচ্ছ্বাস। কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি কয়েকটি বন্ধুকে এই শ্লোক দ্বারা তাঁহার জীবনের বর্ত্তমান চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের পরিচয় দিয়া ছিলেন :—

অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং
চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য
ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা,
ব্রহ্মলোকমভি সম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি।

ধর্ম্ম বিষয়ের আলাপে তিনি ক্লান্ত নন্ এবং মধ্যে মধ্যে যুবার ন্যায় উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার জীবনে বিশ্বাস ও ধর্ম্মের জয় কিরূপ হইয়াছে গল্প করিতে বড় আনন্দিত। ব্যাখ্যান এখন তাঁহার নিজের পক্ষে Lesson হইয়াছে বলেন। যখন ব্যাখ্যানের জ্বলন্ত উপদেশ সকল দেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে সেগুলি কিরূপে বহির্গত হইত, বুঝিতে পারিতেন না। রবিবার আহারের পর সমাজের বেদীর নীচে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে কত কি মনে আসিত। সন্ধ্যার সময় উঠিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেদীতে বসিতেন। যাহা বলিবেন একটু ভাবিয়া লইতেন। পূর্ব্ব সপ্তাহের ব্যাখ্যান পাঠে একটা সূত্র ধরিতে পারিতেন। পরে মুখ হইতে অনর্গল যাহা বলিবার বাহির হইয়া যাইত। এই সময় তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা এরূপ যে সমুদায় খোয়াইবার সম্ভাবনা। তিনি সে দিকে অল্প দৃষ্টি করিতেন দিবানিশি ধর্ম্ম বিষয় লইয়া থাকিতেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কোন বিষয়ে কিছু ক্ষতি হয় নাই।

বিদ্যুৎপুরুষ ঈশ্বর ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশবান হইবেন ব্যাখ্যা করিলেন। ঈশ্বরের অনিমেষ দৃষ্টি অনুভব সাধনের এক উৎকৃষ্ট উপায় বলিলেন। Attentive চিত্তের একাগ্রতার প্রধান সাধন বলিলেন।

অলকা

গল্প।

তখন সবে মাত্র ভোর হইয়াছে—দুই একটি দোয়েল পাখী সঙ্কীর্ণ নদীর পাড়ের বাঁশ গাছের ঝোপের মধ্যে বসিয়া আধ ঘুমঘোরে, আধ অন্ধকারে, আলস্য-বিজড়িত স্বরে, কেবল মাত্র শীস্ দিতে আরম্ভ করিয়াছে—উষার বাতাস সংসার হইতে নিদ্রাদেবীকে সরাইয়া দিবার জন্য কেবল মাত্র মৃদু মৃদু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—এমন সময় বাহিরে দরজায় হঠাৎ যেন কাহার করাঘাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম—হয়ত ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছি। মনের মধ্যে কিছুক্ষণ এই কথা তোলাপাড়া করিলাম—কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। অন্যমনস্ক হইয়া বাহিরের ঘরে একটা আরাম-কেদেরায় বসিয়া পড়িলাম। তখন বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে।—ভৃত্য আসিয়া, "চার পেয়ালা" দিয়া ডাকঘরে ডাক আনিতে চলিয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিলাম। যখন চমক ভাঙ্গিল দেখিলাম আমার কেদারার পাশে একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর কয়েক খানি পত্র রহিয়াছে। ভৃত্য কখন ফিরিয়া আসিয়া চিঠি গুলি রাখিয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই, আমি সেগুলি লইয়া একখানি একখানি করিয়া সমস্তগুলি পাঠ করিলাম। তাহার মধ্যে একখানি পত্র আমার জনৈক বন্ধু লিখিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেন। পত্রখানিতে লেখা ছিল যে, আমাকে কোনও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সেই দিনই তাঁহার কাছে যাইতে হইবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, স্নানাহার সমাপন করিয়া আমি বর্দ্ধমান হইতে বেলা দশটার গাড়ীতে রওনা হইলাম। চারি দিকে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে, কত দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। আমার বন্ধু ষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত গল্প ক'রতে করিতে তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইলাম, এবং এ কথা সে কথায় গত রাত্রের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

আমার বাটী কুসুমপুর। রেল ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। কুসুমপুর একটি গণ্ডগ্রাম—শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে এখানে অনেক দস্যুর বাসস্থান ছিল। কিন্তু এখন আর সে সমস্ত ভয়

নাই। কালে কালে সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে।

আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। চাকরী বাকরী না করিলেও মোটামুটি এক রকম চলিয়া যাইতেছিল। আমি নিজে কিছু কিছু লেখা পড়াও জানিতাম। আমাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমানে—সেখানে একটু আধটু বিষয় সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু সেখানে আমাদের সরিকানি বিবাদের জন্ম বিরক্ত হইয়া আমার পিতা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এই কুসুমপুর গ্রামে চলিয়া আসেন। তখন আমি খুব ছেলে মানুষ। আমাদের কুসুমপুরে ২।৩ বৎসর বাসের পর আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন আমার বয়স ৮ বৎসর। সেও আজ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া কিছুদিন পড়া শুনা করিয়া আমি লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলাম—সেই অবধি বাটীতেই থাকি। সংসারে কেবল আমি এবং আমার জননী। আমি আজও বিবাহ করি নাই,—মনে সঙ্কল্প আছে, বিবাহ করিবও না।

কুসুমপুরে আমার শয়নকক্ষে একটী আলমারীতে কয়েকখানি পুস্তক ছিল, কখনও তাহা পাঠ করিয়া এবং কখনও দু'একজন প্রতিবেশীর বাটীতে যাইয়া গল্পগুজবে আমার দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইত। কখন কখনও দু'একটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে দূর দেশে যাইয়া দু'এক মাস কাল কাটাইয়া আসিতাম।

কুসুমপুরে আমাদের এক ঘর প্রতি-বেশী ছিলেন—তাঁহার নাম হরিচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমি অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকটে বসিয়া অনেক গল্প শুনিতাম। হরিচরণ বাবু অপুত্রক ছিলেন। সংসারে তাহার স্নেহের বন্ধন এক ভাগিনেয়ী ছিল। তিনি তাহাকে কখনও কাছ ছাড়া করিতেন না। শুনিয়াছি তাঁহার ভগিনীপতি চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় চিরকালই দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার বৃহৎ জমীদারীর কোথায় কি হইতেছে তাহার কোনই তত্ত্বাবধান করিতেন না। কেহ তাঁহাকে সংসারে তাঁহার উক্তবিধ ঔদাসীন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "ভগবান্ যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে—আমরা অনর্থক পরস্পরে মনোমালিন্য সৃষ্টি করি কেন ?" তাঁহার এইরূপ বিষয়কার্য্যে বীতরাগ দেখিয়া কর্ম্মচারিগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যথেচ্ছরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহার শেষ ফল এই হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। হরিচরণ বাবু এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার ভগিনী ও তদীয় কন্যাকে স্বীয় বাটীতে আনয়ন করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার ভগিনীরও কালপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং বালিকা শৈশব হইতেই হরিচরণ বাবু ও তদীয় স্ত্রীর আদর ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া

ছিল। আমি কুসুমপুরে থাকিতে যখনই হরিচরণ বাবুর বাসায় যাইতাম—বালিকা ছুটীয়া বাহিরের ঘরে আসিত। তখন তাহার কোনও সঙ্কোচ বা কোনও সরম বন্ধন ছিল না। হরিচরণ বাবু যখন গল্প করিতেন—বালিকা আমার মুখের দিকে বিলোলনয়নে চাহিয়া দেখিত। তাহার সেই সঞ্চল চাহনীতে আমার তখন যেন কেমন লজ্জা বোধ হইত, আমি অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইতাম। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে আমার নয়নদৃষ্টি পুনরায় সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি সঙ্কোচহীনা বালিকার প্রতি যে কখন ধীরে ধীরে আসিয়া পতিত হইত, বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু যাক্ সে কথা।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমার প্রবাস-কার্য্য সমাধা করিয়া আমি যখন বাটী আসিয়া পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। পল্লীগ্রামের প্রায় সকলেই তখন শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে শায়িত। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশে দুই একখানি সাদা সাদা মেঘ মাঝে মাঝে ভাসিয়া যাইতেছিল, কোন কোনও বাড়ীর বহিরাঙ্গনায় বাঁধা সাদা কাল দুই চারিটী গাভী নিদ্রার ঘোরে রোমন্থন করিতেছিল এবং তাহাদের আশে পাশে দলবদ্ধ মশকের ঐক্যতান বাদন রজনীর নিস্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বাটী পৌছিয়া দুই একবার ডাকাডাকি করিবার পরেই আমার ভৃত্য চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া জননীর কক্ষ-দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম এবং তাঁহার সহিত প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া শয়ন করিতে গেলাম। জননী খাবার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম আমি খাইয়া আসিয়াছি এবং আমার শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। পথশ্রান্তিতে বিশেষ ক্লান্তি বোধ হওয়াতে অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিলাম তখন একটু বেলা হইয়াছে—চারিদিকে রৌদ্রের কিরণ পড়িয়া আমার কক্ষটী বেশ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। আমি বাহিরে যাইলাম এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া খবরের কাগজপাঠে মনঃসংযোগ করিলাম। কিন্তু কেন জানি না মন যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি পাঠ বন্ধ করিয়া হরিচরণ বাবুর বাটীর উদ্দেশে বহির্গত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, তাঁহার সদর দরজায় তালা বন্ধ। আমার আপনা আপনিই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল—যেন কিরূপ এক শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলাম—যেন কিসের অভাব বোধ হইতে লাগিল—যেন কি ছিল—এখন নাই! যেন কি আশা করিয়াছিলাম—তাহা মিটাইতে পারিলাম না।

বাড়ী আসিয়া জননীর মুখে শুনিলাম, আমি যে দিন পশ্চিমে যাই, সেই দিন

রাত্রিতে হরিচরণ বাবু সপরিবারে তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গেল। আমি পরিবর্ত্তনশীল কালের সঙ্গে সঙ্গে নবীনত্বে গা ঢালিয়া দিয়া সমস্ত পুরাতন স্মৃতি ও অতীত ঘটনা একে একে বিস্মৃত হইলাম। হঠাৎ এক দিন আমার মনে হইল আবার যেন কে আমার দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিল। তখন ঠিক মধ্য রাত্রি। আমি কেবলমাত্র বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িয়াছি। তখনও ঘুমাই নাই। আস্তে আস্তে চোরের ন্যায় উঠিয়া খুব আস্তে আস্তে দরজার নিকটে যাইলাম। মনে হইল যেন কে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি খিল খুলিয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি কে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। আমি কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম "কে?" কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না। আমার কথা যে তাহার কাণে পৌঁছিয়াছে এমনও বোধ হইল না। আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে"? অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া অনবগুণ্ঠন আরও একটু টানিয়া দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। আমি অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দিক চাহিয়া রহিলাম। কি যে ভাবিয়াছিলাম তাহা ঠিক স্মরণ নাই—কেবল এইমাত্র মনে আছে যে, একটি অবগুণ্ঠিতা রমণী লজ্জায় জড়সড় হইয়া নিস্তব্ধতার কোলে যেন কোথায় মিশাইয়া গেল। এই ঘটনার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যহই সন্ধ্যা হইলে আমার প্রাণের মাঝে কেমন যেন একটা আকুলি বিকুলি করিয়া উঠে—কেমন যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে—কেমন যেন সন্ধ্যার উদার বাতাসের সহিত একটা অনন্ত ভাবনা আপনি আপনিই আসিয়া পড়ে কিছুই বুঝিতে পারি না। যেন কি একটা অব্যক্ত কৌতূহলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি।

এইরূপে আরও কিছুদিন গেল। আমি কাহাকেও কিছু বলিলাম না।—কিন্তু অনেকেই আমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং দুই একজন আমাকে প্রশ্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সে প্রশ্ন হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

ছেলেবেলা হইতেই বিদেশ ভ্রমণের প্রলোভনটা আমার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু সকল সময় সুযোগ হইয়া উঠিত না কারণ, জননী গৃহে একা থাকিতে পারিতেন না। আমার বোধ হয় জননীর আপত্তি করিবার আরও বিশেষ একটু কারণ ছিল—সে কারণ তিনি মুখে কিছু না বলিলেও আমি বুঝিতে পারিতাম—সেটী আমার কৌমার্য্য। পাছে, আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাই, পাছে দেশ-পর্য্যটনের ছুতা করিয়া আর গৃহে ফিরিয়া না আসি, এই ভয়ে বিদেশে যাইতে চাহিলেই তাঁহার স্নেহ-বিগলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অশ্রুকণাতে

পরিণত হইয়া কঠিন শৃঙ্খলের ন্যায় আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিত—আমার আর যাওয়া হইত না। কিন্তু মনটা বিশেষ খারাপ হওয়াতে আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া এবার তাঁহার অনুমতি আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমি আমার গন্তব্য স্থান হরিদ্বার ঠিক করিয়া পরদিন পাঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম। একাকী যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম কিন্তু জননীর একান্ত ইচ্ছায় পুনরায় ভৃত্য নীলমণিকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। হরিদ্বারে একটী বাঙ্‌লো গোছের ছোট বাসা ভাড়া লইয়া কয়েক দিন সেখানে নিভৃত জীবন অতিবাহিত করিলাম। তখন শরতের প্রারম্ভ। প্রাবৃটের বর্ষণশীল জলধারা নাই বলিলেই হয়। আমি প্রাতে উঠিয়া বাঙ্গালোর বারাণ্ডায় একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া বসিয়া দেখিতাম দূরে পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে কেমন মেঘগুলি সাজিয়া থাকিত! দূরে দূরে কেমন তাহারা ভাসিয়া যাইত! পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়া রজত-সূত্রের ন্যায় ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী রৌদ্রের আলোয় কেমন চিক্‌চিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত! নীলাকাশের নীচে পাখীরা কলরব করিতে করিতে কোন্ সুদূরে উড়িয়া যাইত, দূরে জাহ্নবীর তীরে বেদ পাঠ করিতে করিতে কত সন্ন্যাসী প্রোজ্জ্বল সূর্য্যকে কতবার নমস্কার করিত—তাহাদের সুমধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদগান ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া প্রাণের মধ্যে কি এক আবেশ জাগাইয়া দিত। মনে হইত সেই সুদূর অতীতের আর্য্য ঋষিদের কথা, মনে করিয়া কতবার ভক্তি-প্রণত-চিত্তে উদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতাম। অপরাহ্ণে প্রায়ই গঙ্গার ধারে পর্ব্বতের উপরে, অনেক দূর অবধি বেড়াইয়া আসিতাম।

সেদিন শুক্লপক্ষের সপ্তমী। আমি দৈনন্দিন্ অভ্যাসানুযায়ী বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। যখন ফিরিয়া আসি তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমাকাশে ভাঙ্গা চাঁদখানি পাহাড়ের উপর হাসিতেছিল—দূরে সান্ধ্য বাতাস পাগলের মত এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। বনের ভিতর হইতে কত রকম ফুলের গন্ধ মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতেছিল। মাথার উপর কত নিশাচর পাখী কত রকম ডাক্ ডাকিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। আমি অনেক দূর তখন চলিয়া আসিয়াছি—একটা পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া যেমন সমতল ভূমিতে পদার্পণ করিব—এমন সময় সম্মুখে যেন কোনও মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম—পরক্ষণেই চক্ষু মেলিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। ও কিছু নয়—ভাবিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই আবার পূর্ব্ববৎ বোধ হইল। তখন পাশে যেখানে পর্ব্বত হইতে ঝরণা বাহির হইয়া খানিকটা সমতল ভূমিতে হঠাৎ হ্রদের মত স্থির হইয়া

আছে সেই দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে যেন মনে হইল তাহারই তীরে কে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। আমি সেই দিকে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটী রমণী—যুবতী নীরব নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান। আমি অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। যেন বোধ হইতে লাগিল রমণীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার মুখের প্রতি স্থাপিত—সে দৃষ্টি ব্যাকুলতাময়—যেন কি চায় স্থির করিতে পারিলাম না। উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তখন ক্ষীণ চন্দ্র পর্ব্বতের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাতাস গুলি ছুটিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র হ্রদের ঢেউগুলিকে সপ্রেম আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের বালুকার উপর কেমন ধীরে ধীরে শায়িত করিতেছিল—জলের মধ্যে পাথরগুলি এক একবার মাথা তুলিয়া তাহাদের খেলা দেখিয়া পুনরায় ঢেউগুলির মধ্যে কোথায় ডুবিয়া যাইতেছিল - পর্ব্বতের শৃঙ্গ শৃঙ্গে চাঁদের আলোয় গাছের পাতা গুলি কেমন চক্‌মক্ করিতে ছিল—পর্ব্বতের নীচের অন্ধকার ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া সমস্ত প্রকৃতিকে যেন স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি আর একবার রমণীর মুখের প্রতি চাহিলাম—মরি মরি—এত সৌন্দর্য্য বুঝি আর কখনও দেখি নাই। সে কি দেখিলাম কেমন করিয়া বুঝাইব। সেই করুণ দৃষ্টিতে যে কি কারুণ্য মাখান ছিল কেমন করিয়া বুঝাইব—সেই কালো কালো তারাবিশিষ্ট চক্ষু, সেই কুঞ্চিত অলকদাম—সেই যুগ্ম ভ্রূযুগল—সেই কারুণ্যমাখা মুখখানি—সেই নির্জ্জন বনমধ্যে যে কি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমি কি এক প্রকার মোহাভিভূত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে যেন কি মনে পড়িতে লাগিল—যেন কি এক অতীত স্মৃতি হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। আমার ক্ষীণকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—"অলি"—রমণী হাসিলেন। সে কি হাসি? ফুল ঝরিয়া যাইবার আগে যে হাসি হাসে, প্রদীপ নিভিবার আগে যেমন হাসে—চাঁদ ডুবিবার সময় যেমন হাসে এও বুঝি সেই হাসি। পৃথিবীতে সব ভুলিব সে হাসি কখন ভুলিব না—সেই মুহূর্ত্তে যদি মরিতাম—সেই মুহূর্ত্তে যদি বাতুলতা প্রাপ্ত হইতাম তাহা হইলে হয়ত ভুলিতে পারিতাম।

আমার সব মনে পড়িয়া গেল। সহস্র অতীত স্মৃতি একসঙ্গে হৃদয়ে সমুপস্থিত হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমি কেমন এক ব্যাকুল প্রাণে রমণীর দিকে অগ্রসর হইলাম—সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল—আমি যন্ত্রণা পীড়িত হৃদয়ে ডাকিলাম—"অলকা!" কোনও উত্তর পাইলাম না। রমণী পুনরায় হাসিলেন সেই ক্ষীণ হাসি!—আমি আরও অগ্রসর হইলাম—সে মূর্ত্তি যেন

চরিত্রের মধ্যে বনমাঝে কোথায় মিলাইয়া গেল। তখন চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে—অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—উন্মাদ পবন হু হু করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম—আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলাম "অলি! —অলকা!"

সেই নিস্তব্ধ নিশীথে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—"অলি! অলকা!" আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। আমি সেইদিন বাসায় ফিরিয়া অলকার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম—শুনিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ বিষম জ্বরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। অলকা হরিচরণ বাবুর ভাগিনেয়ী।

শ্রীক্ষীরোদগোপাল রায়।

রহস্য।

সংসার যখন তা'রে কোলাহল মাঝে
আকুল আহ্বানে ডেকে—আপনার কাজে
রাখে তারে ভুলাইয়া, স্নেন আবরণে
লুকাইয়া রাখে আহা! হৃদয়ে—গোপনে,—
তুমি তারে ডেকে লও ইঙ্গিতে তোমার
রাতুল চরণ-প্রান্তে;—শুধু এ'সংসার—
জেগে রয় বুকে লয়ে পবিত্র নির্ম্মল
মুক্ত-প্রাণ হাসি তা'র—যার অশ্রু জল!

তারপর—তারপর অতি ধীরে ধীরে
সংসার ঢালিয়া দেয় অনন্ত সাগরে
প্রাণের সকল ভার,—মিশে যায় সব!
আবার সেথায় উঠে নব কলরব!
এমনি মায়ার খেলা! তবু এ'সংসার—
বোঝেনা—যে যায়—সেত ফিরে নাক আর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

বারাণসী তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

হিন্দুদিগের সপ্ততীর্থ মধ্যে কাশীই প্রধান। যথা:—

কাশী কান্তী চ মায়াখ্যা ত্বযোধ্যা দ্বারবত্যপি।
মথুরাবন্তিকা চৈতাঃ সপ্ত পুর্য্যোঽত্র মোক্ষদাঃ

কাশী, কান্তী (কাঞ্চী), মায়া, অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা, অবন্তিকা—এই সাত তীর্থ মোক্ষদা বলিয়া খ্যাত।

মায়া এখন হরিদ্বারকে বলে। উক্ত সপ্ত তীর্থের মধ্যে কাশীর নামই সর্ব্ব প্রথমে রক্ষিত হইয়াছে কারণ কাশীই সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য। কাশী

অতি পুরাতন নগর, মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে কাশীর নাম উল্লেখ আছে যথা:—

দিবোদাস গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ॥
পুরুশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজো মহাযশাঃ॥

পৃথিবীতে যে সকল পুরাতন নগরের কথা আমরা অদ্যাবধি শুনিয়াছি তন্মধ্যে কাশীই যে সকলের অপেক্ষা পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যাবিলন যখন নিনেভার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, টাইরি যখন স্বীয় উপনিবেশের রাস্তা প্রশস্ততর করিতেছিল, এথেন্সের যখন অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ, রোমের বাহুবল যখন পৃথ্বীতলে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে কাশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সলোমনের নাম যখন দিগন্তবিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তখন তাঁহার রাজধানী সুশোভিত করিবার জন্য কাশী হইতে হাতির দাঁতের জিনিষ সকল রপ্তানি হইত। কাশী বহুকাল হইতেই পূজিত হইয়া অদ্যাপিও সঞ্জীবিত আছে। পৃথিবীতে কত কত রাজ্য, কত কত অভ্যুত্থান ও পতন হইয়া গিয়াছে, কাশী কিন্তু ভারতবর্ষে সমানভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী কাশীতে আগমন করে। কাশীর নাম হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। ভারতের সকল স্থান হইতেই বৃদ্ধগণ কাশীতে মরণ লালসায় আগমণ করে। কাশীর সত্র নিচয় বিস্তীর জন্য প্রতিষ্ঠিত। বিধবাগণও মন্দিরে টাকা জমা দিয়া সারাজীবন আপনাদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিতে পারে। এই সকল কারণের জন্য দূর দেশ হইতে লোকে কাশীতে আগমন করে। কাশী হিন্দু ধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির জাজ্বল্যমান প্রমাণ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহা শ্মশান এবং ষড় দর্শনের লীলা ক্ষেত্র। এইখানেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মার্থে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হীনবৃত্ত চণ্ডালের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই খানেই ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বীয় অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এই খানেই শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত হন। কালের কঠোর আঘাতে হিন্দুদিগের সবই গিয়াছে, বাকী আছে কেবল মাত্র ধর্ম্ম, তাহাও কিন্তু এখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

কাশীর সেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। প্রবাদ আছে :—

রাঁড়, সাঁড়, সিঁড়ি, সন্ন্যাসী।
ইনসে বাঁচে সেবে কাশী।

অর্থাৎ বিধবা, সাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসী হইতে যাঁহারা বাঁচেন তাঁহারাই কাশীর সেবা করিতে পারেন নতুবা নহে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাঁড় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে —দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়। তখন লোকে ভাবে আর কাশী সেবার আবশ্যকতা নাই, প্রাণ বাঁচিলে অনেক ধর্ম্ম হইবে। পক্কবিম্বাধরা বিধবাগণের সংখ্যা কম নহে সুতরাং রসিক চূড়ামণিদিগের অভাব নাই। সিঁড়ি চড়িতে চড়িতে

লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাও দেবদর্শনের একটি বাধক। সন্ন্যাসীদিগের জন্য লোককে জ্বালাতন হইতে হয়। এ সকল বাধা সত্ত্বেও তীর্থস্থান মাত্রই পুণ্যজনক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লেখা আছে :—

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ ভূমেঃ সলিলস্য চতেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতাস্মৃতা॥

ভূমির অদ্ভুত প্রভাবহেতু, সলিলের তেজ-জন্য এবং মুনিগণের পরিগ্রহ-হেতু, তীর্থসমূহ পুন্যজনক বলিয়া গণ্য।

এই জন্যই তীর্থে পাপিগণের সমাগম অধিক হয়। তাহাদিগের ধারণা যে, তীর্থগমনে সর্ব্বপাপের নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এমন সুযোগ তাহারা ছাড়িবে কেন? তাহারা জানে না যে শাস্ত্রের আদেশ অন্যরূপ ; যথা :—

যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো দাম্ভিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপমলিন এব সঃ॥
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ॥
(কাশীখণ্ড)

অর্থাৎ যে লোভী, নিন্দক, ক্রূর, দাম্ভিক, বিষয়াসক্ত, সে যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করে তাহা হইলেও সে পাপ মলিন থাকিবে।

শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, সন্দিগ্ধ, ও হেতুনিষ্ঠ এই পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তি তীর্থফলভোগী হয় না।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র আরও বলেন :—

ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্॥

অর্থাৎ অধ্যয়ন, পিতামাতার শুশ্রূষা এবং দাররক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিলে তীর্থ নরকের হেতু হইয়া থাকে।

সমস্ত সহরটা বেনারস বা কাশী নামে খ্যাত। কিন্তু কেহ কেহ সহরটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যথা, বেনারস, কাশী এবং কেদার। বর্ত্তমান সহরের উত্তরাংশের নাম বেনারস, দক্ষিণাংশের নাম কাশী এবং কাশীর দক্ষিণ কেদার নামে খ্যাত। শেষোক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পুলিস এবং মিউনিসিপাল কার্য্যের জন্য বেনারস সাত ভাগে বিভক্ত, যথা ভেলুপুরা, দশাশ্বমেধ, চৌক, চেতগঞ্জ, কোতয়ালী, জাইতপুরা এবং আদমপুরা। ইহাতে সিকরোল এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট যোগ করিলে, একুনে নয়টী বিভাগ হয়। এক একটীর বৃত্তান্ত আমরা পৃথক পৃথক বলিব। পরন্তু বর্ণনাসৌকর্য্যার্থে নদীসম্মুখস্থ স্থানগুলি হইতে আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ ভেলুপুরা।

সহরের দক্ষিণপ্রান্তে অসিনালা অবস্থিত। যে স্থানে গঙ্গা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন সেই স্থান হইতে ঘাট ও মন্দিররাজির প্রারম্ভ বলিতে হইবে।

ঘাটে শত শত নরনারী স্নান করিতেছে। নিরীহ ব্রাহ্মণগণ স্নানান্তে ঘাটে উপবেশন করিয়া পূজায় তৎপর রহিয়াছেন। মহিলাগণ জলে অবগাহন করিয়া স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতেছেন আর রমণী লাবণ্য দর্শন-লোলুপ ব্যক্তিগণ অনিমেষ নয়নে যুবতীদিগের প্রতি চাহিয়া আছেন। টিকটিকি যেমন মক্ষিকা-প্রয়াস বসিয়া থাকে পাণ্ডাগণও স্নাতক দিগের জন্য অনুরূপ প্রতীক্ষা করিতেছে। ঘাটে যাইবামাত্রই ঘাটমাহাত্ম্য শুনিতে পাওয়া যায়। স্নাতকগণও সেই ধ্বনি শুনিয়া স্বীয় গন্তব্য ঘাটে যাইয়া স্নান করিয়া থাকে। ইহাতে পাণ্ডাগণেরও কথঞ্চিত ধনাগম হয়। স্নানের জন্য প্রসিদ্ধ ঘাটপঞ্চকের মধ্যে অসিঘাট একটি। প্রবাদ এইরূপ যে, দুর্গাদেবী শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে পরাভূত করিয়া দুর্গাকুণ্ডে আগমন করতঃ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই সময়ে আপনার অসি ফেলিয়া দিলে তথায় এক নালা প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহাই এখন অসিনালা নামে খ্যাত। যাহারা এই নালাটি পার হইয়া কাশীতে গমন করে, দেবীর কৃপায় তাহারা বিগত-কল্মষ হয়। নিকটেই জগন্নাথ দেবের মন্দির। এখানে তিনটী মূর্ত্তি বিরাজমান—দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলদেব এবং মধ্যে সুভদ্রা। প্রথম মূর্ত্তিটীর হাতের উপরার্দ্ধ আছে নিম্নার্দ্ধ নাই। ইঁহার পদদ্বয়ের অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইলাম না। শেষোক্ত মূর্ত্তিটী হস্তপদ বিহীন। মূর্ত্তির একটা পারিপাট্য হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আমরা তাহা কিছু দেখিলাম না। সুতরাং ইহা হিন্দুশিল্প কিনা তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ রহিল। যে হিন্দুজাতির সভ্যতা বহু পুরাতন, যাহাদিগের শিল্প আজিও পাশ্চাত্য জগতের অনুসন্ধানের বিষয়, তাহারা যে এবম্ভূত কদর্য্য শিল্প রাখিবে ইহা আমার কল্পনায়ও আইসে না। সত্য বটে হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে বাহ্যিক পারিপাট্য লক্ষ্যের বিষয় নহে—আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যই তাহার মুখ্য লক্ষ্য, তথাপি যখন মূর্ত্তিই রাখিতে হইয়াছে তখন একটা ভাল মূর্ত্তিই রাখা উচিত ছিল। জগন্নাথদেব হিন্দুর নমস্য। সুতরাং আমরাও ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলাম। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় যখন জগন্নাথদেব রথারূঢ় হন তখন একটা বড় মেলা হইয়া থাকে। স্নানযাত্রার দিন জগন্নাথদেবকে স্নান করাইয়া সন্ধ্যাকালে ভক্তদিগকে দেখান হয়। এই সময়ে অসিঘাট হইতে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া রথে রাখা হয়। উড়িষ্যাতে জগন্নাথদেবের যেরূপ মেলা হয় তাহার অনুকরণেই এই মেলা হইয়া থাকে। মেলাটি তিন দিন থাকে। তৃতীয় দিনের মেলায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসেও এই স্থানটিতে আর একটী মেলা হয়, পরন্তু তাহা তত বড় নহে। এই মেলাটি অসি-সঙ্গম অথবা লোহারিকুণ্ডের সান্নিধ্যে হইয়া থাকে। কুণ্ডটীতে দুইটী কূপ

আছে। ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণী অহল্যা বাই, বিহারের রাজা এবং অমৃত রাও এই কূপের খননকর্ত্তা। মেলার দিন হিন্দুগণ সূর্য্যপূজার জন্য এই কুণ্ডে স্নান করেন। কূপের তিন দিকে সিঁড়ি আছে। নিম্নে অবতরণ করিতে হইলে উক্ত সিঁড়ির আশ্রয় লইতে হয়। সিঁড়ির উপর সূর্য্যদেবের মূর্ত্তিস্বরূপ একটী চক্র আছে। রবিবারে লোকে ইহার পূজা করিয়া থাকে। জগন্নাথদেবের নিকট কতকগুলি আখাড়া আছে, যাহার মধ্যে বড়া গুদড়জীর আখাড়াটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আখাড়াটী প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে প্রায় ত্রিশ জন বৈষ্ণব বৈরাগী বাস করেন। আখাড়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম গুদড়জী। বলা বাহুল্য, ইনিও একজন বৈষ্ণব ছিলেন। ছোটী গুদড়জীও বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের সম্পত্তি পরন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইহার অস্তিত্ব চলিয়া আসিতেছে এবং লোকের অনুকম্পায় আখড়াটীর সরবরাহ চলিতে থাকে। দিগম্বরী আখড়াটিতে দশ বৈরাগী ব্যক্তির বাস। ইহারা ভিক্ষোপজীবী। নগ্ন হইয়া থাকে বলিয়া ইহারা দিগম্বরী নামে খ্যাত। আখড়াটিও আধুনিক। বৈদ্য আখড়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম স্বামী রামদাসজী নন্দ। ইনিও বৈষ্ণব ছিলেন। প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই আখড়াটি তৈয়ার হয়। চুনারের সন্নিকটস্থ খজুরীপুর নামক স্থানে এই আখাড়াটীর কিছু সম্পত্তি আছে। অসি সঙ্গমের নিকট ব্রাহ্মণদিগের "পণ্ডিতজী" আখাড়া অবস্থিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে টীকাদাস নামক জনৈক ব্যক্তি এই আখাড়াটী নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানের শিষ্যগণকে ঐহিক এবং পারত্রিক সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিহারান্তর্গত আরা এবং দ্বারভাঙ্গা নামক স্থানের জমিদারী হইতে এই আখাড়াটির সরবরাহ চলিয়া থাকে। অসসঙ্গমের কৃষ্ণ আচারী নামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃষ্ণ আচারী আখাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি ১৮৭৫ খৃঃ কাশীধামে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় এবং মন্দির স্থাপন করেন। আখাড়াটীতে শিষ্যসংখ্যা প্রায় ২০ জন। আখাড়াটীর সরবরাহের জন্য ইংরাজ-সরকারের নিকট প্রায় আট হাজার টাকা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। তাহার সুদ হইতে এবং বেতিয়ার রাজার মাসিক ৫০ টাকা চাঁদা হইতে আখাড়াটীর সকল খরচ চলিয়া থাকে। কাশীতে বিষ্ণুপন্থি আখড়াটিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসিদ্ধ সংস্কারক রামানুজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই স্থানের শিষ্যগণ সকলেই ভিক্ষোপজীবী। দাদুপন্থি আখাড়া বুরুন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইনি অপুত্রক ছিলেন। এক দিন নদী-সৈকতে একটী শিশুকে অসহায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহাকে বাটী লইয়া আসিয়া তাহাকে পালন করেন। এই শিশুর নাম দাদু। সাড়ে তিন শত বৎসর

পূর্ব্বে দাদু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া দাদু পন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন অসিঘাটের নীচেই তুলসী ঘাট। মহাত্মা তুলসীদাস বারানসীক্ষেত্রে বহুকাল নিবাস করিয়া ১৬২৩ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। বঙ্গদেশের জয়দেব যেমন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, মহাত্মা তুলসীদাসও তেমন রামভক্ত ছিলেন। ইহাঁর মনোমুগ্ধকারী সরল কবিতা যিনি একবার পড়িয়াছেন, তিনি জীবনে ইহার নাম কখনও বিস্মৃত হইবেন না। হিন্দি ভাষা যতদিন সঞ্জীবিত থাকিবে ততদিন তুলসী দাসের নাম লুপ্ত হইবে না। মহাত্মা তুলসী দাসের অনেকগুলি স্মৃতিচিহ্ন মন্দিরে রক্ষিত রহিয়াছে। তিনি যে হনুমান মূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং যে তরণী করিয়া নদীর পরপারে যাইতেন তাহার কিয়দংশ এখনও আমাদিগের নয়ন পথের পথিক হয়। হনুমান ঘাটে নাগাদিগের "জুনি" আখাড়া আছে। এলাহাবাদ, হরিদ্বার উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতে উক্ত আখাড়াটীর শাখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নাগাগণ ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করে। রাজপুতানার রাজগণ এবং ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ ইহাদিগের পৃষ্টপোষক। সুতরাং তাহারা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। হনুমান ঘাটে প্রবাদ আছে যে রামদাস নামক জনৈক দ্যূতক্রীড়কের এক রাত্রির জুয়ার টাকা দ্বারা ঘাটটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘাটের উপরিস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু বল্লভাচার্য্য বাস করিতেন। ১৬২০ খৃঃ শাস্ত্র ব্যাখ্যা কালে ইনি পদস্খলিত হইয়া নদীতে পড়িয়া যান ও তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হনুমান ঘাটের পরেই রায় বলদেব সাহা এবং বাচ্ছ রাজ ঘাট। এই ঘাটের বড় বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই। অতঃপর একটী প্রসিদ্ধ শিবালয় আছে। পূজার জন্য বহু লোক এখানে আসিয়া থাকে। এখানে যে একটী দুর্গ দেখা যায়, তাহার নির্ম্মাতার নাম বৈজনাথ মিশ্র। এই খানেই রাজা চেত সিংহ বাস করিতেন। ১৭৮১ খৃঃ বিদ্রোহী হওয়ার অপরাধের জন্য তাঁহার বসত বাটীটি বেদখল করিয়া দিল্লীর সম্রাটগণের বংশধরগণকে দেওয়া হয়। কিছু দূরেই শিবালয় ঘাট। এখানে দুইটি আখাড়া আছে;—একটীর নাম নির্ব্বাণী এবং অপরটির নাম নিরঞ্জনী প্রথমটী ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে নগ্ন নাগাগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহাদিগের একটী শাখা এলাহাবাদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টিও নাগাদিগের সম্পত্তি, পরন্তু ইহাদিগের প্রধান আড্ডা বরোদায়। ইহারা নিরংকার অর্থাৎ অমূর্ত্ত দেবতার উপাসক। শিবালয় ঘাটের পরই লীলা ঘাট আর কেদার ঘাট। বাঙ্গালীদিগের কেদারেশ্বরের মন্দির হইতে এই ঘাট ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের মধ্যে কেদারেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার চারি কোণে আরও চারিটী মন্দির আছে। মধ্যে বারাণ্ডার ভিতর অনেক দেবতারই মূর্ত্তি দেখা যায়।

বাঙ্গালীগণ কেদারেশ্বরের বিশেষ ভক্ত সুতরাং মন্দিরে ভীড় লাগিয়াই থাকে। পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এখান হইতে একটি প্রশস্ত রাস্তা নদী পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছে। দরজার দুই পার্শ্বে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিদ্বয় দেখিতে অতীব সুন্দর। ইহাদিগের প্রত্যেকটীর চারি হস্ত। এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয়টীতে গদা, তৃতীয়টিতে পুষ্প এবং চতুর্থটি খালি। এই খালি হাতটি আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া যেন আগন্তুকগণকে কহিতেছেন "তোমরা এইখানে অবস্থান কর, দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও"। যখন কতকগুলি ব্যক্তি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন দরজা বন্ধ হইয়া যায়। তাহাদিগের পূজা সাঙ্গ হইলে দ্বার পুনরায় উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তখনই বহিঃস্থিত ব্যক্তিগণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পান।

উক্ত মূর্ত্তির মধ্যস্থিত স্থান দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশে সপ্তষষ্ঠী দীপ দিবার বন্দোবস্ত আছে। সায়ংকাল সমাগত হইলে এই সকল দীপরাজি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। মন্দিরের ভিতর কেদারেশ্বরের বিগ্রহ বিরাজিত। কেদারেশ্বর মহাদেবের নামান্তর মাত্র। কেদার কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। হিমালয়ে কেদার নামে একটী স্থান আছে। মহাদেব সেইখানে বাস করেন। এতদ্ধেতু তিনি কেদার নামে খ্যাত। কিন্তু বেনারসে প্রবাদ এই যে, কেদার নামে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিল। বশিষ্ঠ ঋষির সহিত তিনি হিমালয়ে যান এবং তথায় তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। মরিবার সময় মহাদেব তাঁহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন। তদবধি তিনি মহাদেবের সহিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহাদেব বশিষ্ঠ ঋষির উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি।" তখন বশিষ্ঠ মুনি এই প্রার্থনা করেন যে, আপনি বারানসী ধামে আগমন করিয়া বাস করুন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হন। তদবধি তিনি বেনারসে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বৃত্তান্তটি কাশীখণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত তুষার মণ্ডিত হিমালয়ে হরিনাথ নামে এক বিখ্যাত মন্দির আছে তাহার সন্নিকটে কেদারেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এখানেও অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

কেদারেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবমূর্ত্তিও আছে, যথা—লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরব নাথ, গনেশ এবং অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে যাওয়া যায় তাহার উপর বাঙ্গালা এবং হিন্দি ভাষায় কেদারেশ্বরের মহিমা লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে ভিখারীগণ বসিয়া থাকে। লোক দেখিবামাত্র তাহারা ভিক্ষার জন্য কেহ বা হস্ত প্রসারণ করিয়া দিতেছে এবং কেহ বা শত ছিন্ন বসন পাতিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলেই পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়।

কেদারেশ্বরের ঘাটের নীচেই গৌরী-কুণ্ড নামে একটি কূপ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, সেই কূপোদকে জ্বর আরোগ্য হয়। কেদারেশ্বরের নীচে চৌকী ঘাট। এখানে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ পথিকগণকে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। ১৫ই আষাঢ় এখানে "বাতাস পরীক্ষা" নামে একটি মেলা হয়। এইদিনে হিন্দু-গণ স্বীয় স্বীয় গুরুর পূজা করিয়া থাকেন। এতদ্ধেতু ইহা গুরু-পূর্ণিমা নামে খ্যাত। পুরাকালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সায়ংকালে এই স্থানে সমাগত হইয়া বায়ুপ্রবাহ নির্ণয় করতঃ জলদাগম ও শস্য সম্বন্ধে ভবিষ্য-দ্বাণী বলিতেন। চৌকা ঘাটে বিজয়া দশমীর দিন রামলীলার মেলা হইয়া থাকে। এই দিনে লঙ্কেশ্বর রাবণ, রাম-চন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সেই অতীত কাহিনীর স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য হিন্দুগণ রামলীলা করিয়া থাকেন। এই মেলায় অনূন ত্রিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই দিনে শমী বৃক্ষের পূজা হইয়া থাকে। যদি এই সময়ে নীলকণ্ঠ পক্ষীর দর্শন পাওয়া যায় তবে হিন্দুগণ শুভ লক্ষণ বলিয়া মানিয়া থাকেন।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম মঙ্গল অথবা শনিবারে চৌকা ঘাটে বরুণা পিয়াল মেলা হইয়া থাকে। নীচ জাতীয় ব্যক্তি-গণ এই মেলাতে মদ্য, মাংস এবং সরবত দ্বারা কালকা এবং সাহজীর পূজা করিয়া থাকে। কালকা ব্রাহ্মণী এবং সাহজী চর্ম্মকার রমণী ছিল। পূজা সমাধা হইলে ব্যক্তিগণ শিবপুরে যাইয়া অতিশয় মদ্য পান করে এবং পরদিনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হয়।

১৫ই অগ্রহায়ণ চৌক ঘাটে নগর প্রদ-ক্ষিণের মেলা হইয়া থাকে। দুই দিনে সমগ্র নগরটী প্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রথম দিনের প্রদক্ষিণকার্য্য চৌকা ঘাট হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে।

চৌকা ঘাট হইতে কিছু অগ্রসর হই-য়াই রুক্মেশ্বর দেবের মন্দির বিরাজমান। ইহার নিকট অন্যান্য মন্দিরও আছে। অতঃপর নারদ ঘাট। দেবর্ষি নারদের নামে এই ঘাটটীর নামকরণ হইয়াছে। ইহার পরেই ভেলুপুরার উত্তর সীমা।

শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী।

শিখগ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বিরথী শাকত কি আরজা। বিরথা নাম বিনা তন অন্ধ।
সাচ বিনা কহ হোবত সুচা। মুখ আবত তাকৈ দুর্গন্ধ।

বিন সিমরণ দিন রৈন বৃথা বিহার।
মেঘ বিনা যিউ খেতী যায়।
গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সভ কাম।
যিউ কিরপন কে নিররাথ দাম।
ধংন ধংন তে জন যিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলি বলি যাউ ॥৬
শাক্তদিগের জীবন বৃথা।
সত্যবিনা কেমন করিয়া পবিত্র হইবে?
নাম বিনা তনু বৃথা এবং অন্ধ;—
এমন ব্যক্তির মুখ হইতে দুর্গন্ধ আসে।
হরিস্মরণ বিনা রাত্রি এবং দিন বৃথা কাটায়;—
যেমন জল বিনা খেত নষ্ট হয়।
গোবিন্দ ভজন বিনা সকল কার্য্যই বৃথা;—
যেমন কৃপণের ধন বৃথা পড়িয়া থাকে।
সেই ব্যক্তিই ধন্য ধন্য যাহার হৃদয়ে হরিনাম বাস করে।
নানক এমন ব্যক্তিকে বলিহারি যান ॥৬
রহত অবর কিছু অবর কমাবত।
মন নহী প্রীত মুখহ গংড লাবত।
জানন হার প্রভু পর বীন।
বাহর ভেখন কাহু ভীন।
অবর উপদেসৈ আপ ন করৈ।
আবত যাবত জনমৈ মরৈ।
জিসকৈ অন্তর বসৈ নিরঙ্কারা।
তিসকী সীথ তরৈ সংসারা।
যো তুম ভানে তিনে প্রভ জাতা।
নানক উন জন চরন পরাতা ॥৭
কত রয়েছে তবুও মনে আরও বাসনা।
মুখে ভগবত প্রীতি দেখায় কিন্তু মনে নাই।
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সকল জানেন।
বাহিরে ভালবাসার ভান কিন্তু ভিতরে ভিন্ন।
অপরকে উপদেশ দেয় কিন্তু আপনি তাহা করে না।
সে কেবল আসে ও যায়, জন্মে ও মরে।
কিন্তু যার অন্তঃকরণে নিরঙ্কার বাস করেন;
তার শিক্ষাতে সংসার তরে যায়।
যাহাদিগকে প্রভু তুমি ভাল বাস, তাহারাই প্রভুকে জানে;
নানক এমন ভক্তের চরণে পতিত হন ॥৭
করউ বেনতী পারব্রহ্ম সভ জানৈ।
অপনা কীয়া আপহি মানৈ।
আপহি আপ করত নিবেরা।
কিসৈ দুর জনারত কিসৈ বুঝারত নেরা।
উপাব সিয়াপন সগল তে রহত।
সভ কছু জানৈ আতম কী রহত।
জিস ভাবৈ তিস লয়ে লড় লায়।
থান থনন্তর রহিয়া সমায়।
সো সেবক জিস কিরপা করী।
নিমখ নিমখ জপ নানক হরি ॥৮
ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি সব জানেন।
তিনি আপনার কার্য্য আপনি করিতেছেন।
তিনি আপনিই সকল ব্যবস্থা করিতেছেন।
কাহাকেও তিনি বুঝান যে তিনি দূরে আছেন, কাহাকেও জানান নিকটে আছেন।

তিনি সকল প্রকার ধূর্ত্ততা ও ফিকিরে রহিত

তিনি আত্মার গতি সব জানেন।

যাহাকে তিনি কৃপা করেন তাহাকে নিজের অঞ্চলে টানিয়া লন।

সকল স্থানে তিনি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

যাহাকে তিনি কৃপা করেন সেই তাঁহার সেবক হইতে পারে।

নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি প্রতি নিমেষে হরি নাম জপ করে।

শ্লোক ৬।

কাম ক্রোধ অরু লোভ মোহ বিনশ যায় অহমেব।

নানক প্রভ শরণাগতী কর প্রসাদ গুরুদেব॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং অহঙ্কার নষ্ট হইয়া যায়।

নানক বলিতেছেন যে প্রভুর শরণ লই য়াছে, গুরুদেব তাহাকে দয়া করেন॥

যিহ প্রসাদ ছতিহ অংমৃত খাহি।
তিস ঠাকুর কউ রখ মন মাহি।
যিহ প্রসাদ সুগংধর তন লাবহি।
তিসুকউ সিমরত পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদ বসহি সুখ মন্দর।
তিসহি ধিয়ায় সদা মন অন্দর।
যিহ প্রসাদ গৃহ সংগ সুখ বসনা।
আট প্রহর সিমরহু তিস রসনা।
যিহ প্রসাদ রংগ রস ভোগ।
নানক সদা ধ্যাই ঐ ধ্যাবন যোগ॥১

যাঁহার প্রসাদে ছত্রিশ প্রকার অন্ন খাইতেছ, সেই ঠাকুরকে মনোমধ্যে রাখ।

যাঁহার প্রসাদে সুগন্ধি বস্তু ভোগ করিতেছ, তাঁহাকে স্মরণ করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ, তাঁহাকে সর্ব্বদা মনোমধ্যে ধ্যান কর।

যাঁহার প্রসাদে সকলের সঙ্গে সুখে গৃহে বাস করিতেছ, তাঁহাকে অষ্ট প্রহর রসনায় স্মরণ কর।

যাঁহার প্রসাদে রঙ্গ রস ভোগ করিতেছ, নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা ধ্যান কর, তিনি ধ্যানের যোগ্য॥১

যিহ প্রসাদে পাট পটংবর হঢাবহি।
তিসহি ত্যাগি কত অবর লুভাবহি।
যিহ প্রসাদে সুখ শেজ শোইজৈ।
মন আট প্রহর তাকা যশ গাবিজৈ।
যিহ প্রসাদ তুঝ সভ কোউ মানৈ।
মুখ তাকো যশ রসন বখানৈ।
যিহ প্রসাদি তেরো রহতা ধর্ম্ম।
মন সদা ধ্যায় কেবল পার ব্রহ্ম।
প্রভজী জপত দরগহ মান পাবহি।
নানক পতি সেতী ঘর যাবহি॥২

যাঁহার প্রসাদে রেসমের বস্ত্র পরিধান করিতেছ।

তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কত বিষয়ে তুমি লোভ করিবে?

যাঁহার প্রসাদে সুখ শয্যায় শয়ন কর, হে মন অষ্টপ্রহর তাঁহারই যশ গাও।

যাঁহার প্রসাদে তোমাকে সকলে সম্মান করিতেছে,

তোমার মুখ যেন সর্ব্বদা তাঁহারই যশো-
গান করে।
যাঁহার প্রসাদে তুমি ধর্ম্মপথে আছ,
হে মন সর্ব্বদা সেই পরব্রহ্মেরই ধ্যান কর।
প্রভুর নাম জপ করিয়া তুমি তাঁহার দ্বারে
সম্মান পাইবে,
নানক বলিতেছেন, সম্মানের সহিত তুমি
তাঁহার ঘরে যাইবে ॥২

যিহ প্রসাদ অরোগ কংচন দেহী।
লিব লাবহু তিস রাম সনেহী।
যিহ প্রসাদ তেরা ওলা রহত।
মনু সুখ পাবহি হরি হরি যশ কহত।
যিহ প্রসাদ তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে।
মন সরনী পর ঠাকুর প্রভ তাকৈ।
যিস প্রসাদ তুঝ কো ন পহুচে।
মন শাসি শাসি সিমরহু প্রভ উচে।
যিহ প্রসাদ পাই দুর্লভ দেহ।
নানক তাকীভ গতি করেহ ॥৩

যাঁহার প্রসাদে অরোগী এবং কাঞ্চনবর্ণ
দেহ পাইয়াছ,
হে বন্ধু, সেই রামের প্রতি অন্তঃকরণকে
সম্পূর্ণরূপে লাগাও।
যাঁহার প্রসাদে তোমার উপর সর্ব্বদা
আবরণ রহিয়াছে,
হে মন, সেই হরির যশ গান কর, সুখ
পাইবে।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সকল দোষ
ঢাকিয়া যায়,
হে মন, সেই ঠাকুর সেই প্রভুকে স্মরণ কর
যাঁহার প্রসাদে তোমার তুল্য কেহ হইতে
পারে না,
হে মন সেই উচ্চ প্রভুকে প্রতিশ্বাসে স্মরণ
কর।
যাঁহার প্রসাদে দুর্লভ দেহ পাইয়াছ,
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি কর ॥৩

যিহ প্রসাদ আভূখণ পহিরিজৈ।
মন তিস সিমরত কিউ আলস কিজৈ।
যিহ প্রসাদ অশ্ব হস্ত অসবারী।
মন তিস প্রভকউ কবহু ন বিসারী।
যিহ প্রসাদ বাগ মিলখ ধনা।
রাখ পরোয় প্রভু অপনে মনা।
যিন তেরী মন বনত বনাই।
উঠত বৈঠত সদ তিসহিঁ ধিয়াই।
তিসহি ধিয়ায় যো এক অলখৈ।
ইহা উহা নানক তেরী রখৈ ॥৪

যাঁহার প্রসাদে তুমি ভূষণ পরিধান কর,
হে মন, তাঁহাকে স্মরণ করিতে আলস্য
কেন?
যাঁহার প্রসাদে তুমি অশ্ব হস্তী যান অর্থাৎ
সওয়ারিরূপে পাইয়াছ
হে মন, সেই প্রভুকে কখনও ভুলিও না।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উদ্যান, বিষয় এবং
ধন পাইয়াছ,
সেই প্রভুকে তুমি তোমার অন্তঃকরণে
গাঁথিয়া রাখ।
হে মন, যিনি তোমাকে সাজাইতেছেন,
তুমি উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা তাঁহাকেই
স্মরণ করিবে।
তাঁহাকেই ধ্যান কর, যিনি এক এবং
অলক্ষ্য।
নানক বলিতেছেন, তিনি ইহলোকে এবং
পরলোকে রক্ষা করেন।৪

যিহ প্রসাদি করহি পুংন বহু দান।
মান আট পহর করি তিস্‌কা ধ্যান।
যিহ প্রসাদ তুঁ আচার বোহারী।
তিস প্রভকউ খাসি খাসি চিতারী।
যিহ প্রসাদি তেরা সুন্দর রূপ।
সো প্রভু সিমরহু সদা অনুপ।
যিহ পসাদি তেরি নিকি জাতি।
সো প্রভু সিমরহু সদা দিন রাতি।
যিহ প্রস দ তেরী পতি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক যশ কহৈ ॥৫

যাঁহার প্রসাদে তুমি অনেক পুণ্য দান করিতেছ,
হে মন, অষ্ট প্রহর তাঁহারই ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি আচারী ও ব্যবহারী,
সেই প্রভুকে তুমি প্রতি শ্বাসে স্মরণ রাখিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সুন্দর রূপ পাইয়াছ,
সেই অনুপম প্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উত্তম জাতিতে জন্মিয়াছ,
সেই প্রভুকে রাত্রি দিন স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্মানিত হও,
নানক বলিতেছেন, গুরুপ্রসাদে তাঁহার যশ কীর্ত্তন কর ॥৫

যিহ প্রসাদি শুনহি কর্ণ নাদ।
যিহ প্রসাদি পেখহি বিসমাদ।
যিহ প্রসাদি বোলহি অংমৃত রসনা।
যিহ প্রসাদি সুখ সহজে বসনা।
যিহ প্রসাদি হসত কর চলহি।
যিহ প্রসাদি সংপূরণ ফলহি।
যিহ প্রসাদ পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদ সুখ সহজ সমাবহি।
ঐসা প্রভু তিয়াগ অবর কত লাগহু।
গুরুপ্রসাদি নানক মন জাগহু ॥৬

যাঁহার প্রসাদে কর্ণ শুনিতে পায়,
যাঁহার প্রসাদে চক্ষু নানা বস্তু দেখে,
যাঁহার প্রসাদে রসনা মিষ্ট বাক্য বলে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি সুখে ও শান্তিতে বাস কর,
যাঁহার প্রসাদে হস্ত কার্য্য করে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্পূর্ণ ফল লাভ কর,
যাঁহার প্রসাদে তুমি পরম গতি প্রাপ্ত হও,
যাঁহার প্রসাদে সুখে ও সহজে মন মগ্ন হয়,
এমন প্রভুকে ছাড়িয়া অপর কিসে আকৃষ্ট হইবে ?
নানক বলিতেছেন, গুরুপ্রসাদে জাগরিত হও ॥৬

যিস প্রসাদি তুঁ প্রগট সংসার।
তিস প্রভকউ মূল ন মনহু বিসার।
যিহ প্রসাদি তেরা পরতাপ।
রে মন মূঢ় তু তাকউ জাপ।
যিহ প্রসাদি তেরে কারয পুরে।
তিসহি জান মন সদা হজুরে।
যিহ প্রসাদি তুঁ পাবহি সাচ।
রে মন মেরে তু তাসিউ রাচ।
যিহ প্রসাদি সভকী গতি হোয়।
নানক জাপ জপৈ জপি সোয় ॥৭

যাঁহার প্রসাদে তুমি সংসারে সম্মানিত,
সেই প্রভুকে কখনও মন হইতে ভুলিও না।

যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রতাপবান্,
রে মূঢ় মন, তুমি তাঁহাকে জপ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার কার্য্য পূর্ণ হয়,
হে মন, তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে জানিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সত্যকে লাভ কর,
হে আমার মন, তুমি তাঁহারই সঙ্গে প্রেম কর।
যাঁহার প্রসাদে সকলের গতি হয়,
নানক বলিতেছেন, যদি জপ কর ত তাঁহারই জপ কর ॥৭

আপি জাগয়ে জপৈ সো নাউ।
আপি গাবায়ে সু হরিগুণ গাউ।
প্রভ কিরপা তে হোয় প্রগাস।
প্রভু দয়াতে কমল বিগাস।
প্রভু সুপ্রসংন বসৈ মন সোয়।
প্রভু দয়াতে মতি উত্তম হোয়।
সরব নিধান প্রভ তেরীময়া।
আপহু কছু ন কিনহু লয়া।
জিত জিত লাবহু তিত তিত লগহি হরি নাথ।
নানক ইনকৈ কছু ন হাথ ॥৮

তিনি যাহাকে জপান সেই নাম জপ করিতে পারে।
তিনি যাহাকে গাওয়ান, সেই হরিগুণ গান করিতে পারে।
প্রভুর কৃপাতে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশ হয়।
প্রভুর কৃপাতে হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হয়।
প্রভু সুপ্রসন্ন হইয়া যাহার হৃদয়ে বাস করেন,
প্রভুর কৃপাতে তাহার সুমতি হয়।
হে প্রভু, সকল সম্পদ তোমারই মায়া,
কাহারও কিছু আপনার নাই।
হে হরি, হে নাথ, যাহাতে তুমি লাগাও তাহাতেই যেন মানুষ থাকে।
নানক বলিতেছেন, মানুষের কিছু হাত নাই ॥৮

।* ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভুট্টার ফুল monoecious, যেহেতু ইহার পুং-অংশ (tassel) ও স্ত্রী-অংশ (ear) একই গাছে থাকে। এইরূপ আপনার আপনার মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ লইয়া যে গর্ভ হয়, তাহাকে in-breeding বলে। আবার পুং-অংশের পুষ্পরেণু অন্য বা দূরবর্ত্তী গাছের স্ত্রী-অংশের সহিত মিলিত হইয়া যে গর্ভের সৃষ্টি হয়, তাহাকে cross-breeding বলা হয়। পাঠক পাঠিকা! এক্ষণে বোধ করি in-breeding ও cross-breeding-এর কি প্রভেদ তাহা বুঝিলেন।

* এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে ১৯১৪ ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ণ রিভিউতে "Hybridization Methods in Maize" নামে লেখকের প্রবন্ধ দেখুন।

ভালরূপ ভুট্টার ফসল পাইতে হইলে in-breeding বা cross-breedingএর আবশ্যক, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। কোন কোন ফসলের, যেমন তামাক গাছের, উন্নতি করিতে হইলে, in-breedingএর আবশ্যক, কিন্তু ভুট্টার পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, in-breeding বশতঃ (১) ভুট্টা গাছ হইতে কম ফসল পাওয়া যায়, (২) ভুট্টার এক একটি বিচির অঙ্কুরোদ্গম শক্তি নিস্তেজ হয়, বীর্য্যের সে রকম তেজ থাকে না। (৩) বিচিগুলি দেরীতে পক্ক হয়; (৪) ভুট্টার আকারও ছোট হয় ও ওজনে ভারী হয় না। আমরা আমাদের দেশের ভুট্টাকে cross-breeding এর দ্বারা কিরূপে আরও ভাল করিতে পারি তাহা এইবার বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভুট্টা অনেক জাতীয় আছে। মনে করা হউক যেন আমরা আমাদের বাগানে একজাতীয় ভুট্টার বিচি বপন করিব। cross-breeding করিতে হইলে লাইন করিয়া সারি সারি ভুট্টার বিচি লাগাইতে হইবে। শ্রেণীগুলির মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকা চাই—যেমন নিম্নে দেখান হইয়াছে :—

D
১নং শ্রেণী ……………………
২নং „ ———— T
D
৩নং
৪নং
————

"D" চিহ্নিত শ্রেণীর গাছগুলি বড় হইলে, তাহাদের পুং-অংশ (অর্থাৎ tassel) বাহির হইলে (পুষ্পরেণু পড়িবার পূর্ব্বেই) ঐ পুং-অংশ সমুদায় টানিয়া ভাঙ্গিতে হইবে, কিন্তু গাছের যেন কোন অনিষ্ট না হয়। ঐ কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে শ্রেণীগুলি ধরিয়া তাহার মধ্য দিয়া দুই তিন দিন অন্তর যাওয়া আবশ্যক, কারণ সমস্ত গাছের tassel গুলি একই সময় বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ শ্রেণীকে detasseled শ্রেণী বলা হয়। এইরূপে প্রত্যেক একান্তর শ্রেণীর পুং-অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীটা "detasseled" অর্থাৎ পুং-অংশ-কাটা, এবং তাহার পরটি অর্থাৎ "T" চিহ্নিত "tasseled শ্রেণী" অর্থাৎ পুং-অংশ-যুক্ত থাকিবে। এই "T" চিহ্নিত শ্রেণীর পুং অংশ হইতে পুষ্পরেণু ১ম শ্রেণীর গাছের স্ত্রী-অংশে (অর্থাৎ সিল্কে) পড়িয়া গর্ভ উৎপাদন করিবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছেতেও পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে cross-breeding করা হইল। detasseled শ্রেণীর গাছের কিছু ভুট্টাকে বীজের জন্য রাখা উচিত, কারণ ঐগুলি দেখিতে ভাল, বড় ও বীর্য্য-বান্।

আমেরিকার চাষারা বলেন, যিনি ভুট্টার চাষ করেন, তিনিত একজন ধনী লোক হইবেন, কারণ ভুট্টার পত্রসমূহ গৃহপালিত পশুদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য এবং ইহার দানা মানব ও পশুদের অতি পুষ্টিকর খাদ্য। কত বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি যেমন চিনি,

সিরাপ, কর্ণ-ফ্লেক্স্ (যাহা ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় খাওয়া হয়), ষ্টার্চ (যাহা রজকের বিশেষ কাজে লাগে), এল্‌কহল্, থইল, রং এর জন্য তৈল, রবার, কাগজ, খোসা গুলির দ্বারা গদি, জ্বালানি দ্রব্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। বড়ই দুঃখের কথা যে, এইরূপ একটী মূল্যবান্ গাছের আদর আমাদের দেশের লোকে আমেরিকা-বাসীদের মত এখন পর্য্যন্ত করিতে শিখেন নাই।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

মুষ্টিযোগ

ঠুনকা বা স্তনে থুমকার উপায়।

শির্কা অল্প উত্তপ্ত করিয়া নেকড়া ভজাইয়া স্তনোপরি রাখিলে ঠুনকা আরোগ্য হয়।

গোল মরীচ, ঘৃতকুমারী, হলুদ পোড়া ছাই, একত্রে সমভাগে লইয়া ছাগলের দুধে বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

মুসুর ডালের প্রলেপেও উপকার হইতে পারে।

স্তনের বোঁটায় ক্ষত—

সোহাগার খৈ ও গাওয়া ঘি একত্রে মাড়িয়া স্তন-ক্ষতে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হইবে।

"রূপটান"

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মুখশ্রী বৃদ্ধি করিবার উপায়—

১। "ঝুনা নারিকেলের জল"।

প্রত্যহ নারিকেলের জলে মুখ ধুইলে মুখের কালিমা, মেচেতা, ছুলি ও ব্রণ প্রভৃতি দুর হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়। এমন কি ইহাতে বসন্তের দাগও মিলাইয়া যায়।

২। কাঁচা দুধে ময়দা গুলিয়া তাহাতে একটু কর্পূর দিয়া মুখে মাখিবে, পরে ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে মুখের চর্ম্ম কোমল ও বর্ণ উজ্জ্বল হইবে।

লোমবিনাশক ঔষধ—

"বেরি সালফায়েড" ও "এরারুট"— এই দুইটী দ্রব্য এক ভাগ ও চারি ভাগে, অর্থাৎ এক ভাগ বেরি সালফায়েড ও চারি ভাগ এরারুট মিশ্রিত করিবে। পরে একটু জলে গুলিয়া লোমযুক্ত স্থানে মাখাইয়া দিবে। কিছুক্ষণ পরে ধৌত করিলে লোম সকল উঠিয়া যাইবে।

"হরিতাল" দ্বারাও অনেকে লোম উঠায়।

"সুগন্ধি নারিকেল তৈল"—

মাথার চুল ঘন ও চুলের শোভা বৃদ্ধি করিবার উপায়—

পরিষ্কার নারিকেল তৈল এক বোতল, মাথাঘসা তৈলের মশলা চূর্ণ (উৎকৃষ্ট

ও সুগন্ধযুক্ত মশলার আবশ্যক), চারি পয়সায় যাহা পাওয়া যায়, ক্যাম্থারিস্ অয়েল—১০ ১২ ফোঁটা।

একত্রে মিশাইয়া বোতল সমেত রৌদ্রে রাখিবে। পরে ব্যবহার করিবে। ইহাতে চুল ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে। চুল উঠিবে না। অথচ চুল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। টাক পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না স্ত্রী-লোকের চুলই অঙ্গের শোভা। অতএব যাহাতে স্ত্রীলোকের চুল না উঠিয়া বরং চুল ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে আতর প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত তৈল ব্যবহার করেন। তাহাতে চুলের উপকার বৈ অপকার হয় না। আরও এই, তৈলে "মাথায় উকুন" হয় না।

বৃক্ষ।

শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে,
হাস্যভরা অঙ্গখানি সুসজ্জিত পত্রসাজে।
মহাব্রতে ব্রতী তুমি সেবাব্রত ব্রতসার,
জীবনপণে জগজ্জনের সাধ উপকার।
স্বার্থতরে ব্যর্থ প্রাণ ঘৃণা কর তুমি তায়,
পরের হিতে সদাই রত উচ্চ তুমি মহিমায়
মগ্ন তুমি শ্রেষ্ঠ ধ্যানে গর্ব্ব ত্যজি সর্ব্ব কাজে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।
সহায়হীনা লতা যবে কাতরে তব পা'য়,
ভিক্ষা মাগে উর্দ্ধমুখে তুমি বুকে লহ তায়।
জন্মে শিরে গুল্ম তাহে হৃষ্টমনে পুষ্ট কর,
তুচ্ছ ভাবি আপন ক্ষতি মূলগুচ্ছ বক্ষে ধর।
উদার তুমি, মহৎ তুমি, জগৎভরা দান,
আশ্রিতের রক্ষা তরে বিসর্জ্জিতে পার প্রাণ
শত্রু মিত্রে নাইক ভেদ, সমান তব কাছে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।
চন্দন তুমি পুষ্পপাত্রে, ইন্ধন তুমি রন্ধনে,
তরণী তুমি অর্ণবমাঝে, স্তম্ভ তুমি বন্ধনে,
হর্ম্ম্যের আলম্বন তুমি কুটীরের ধমনী,
আসনে বসনে তুমি ব্যাপিয়া আছ ধরণী।
আহারে বিহারে তুমি, ভেষজ তুমি ব্যাধিতে,
আহবে বিভবে তুমি—(তুমি) সকল কর্ম্ম সাধিতে।
প্রয়োজন মত তুমি লিপ্ত বিশ্বহিতে,
জন্মিয়াছ বৃক্ষ তুমি বিশ্বজনে শিক্ষা দিতে।
পল্লী যবে ঝিল্লীরবে মুখরিত নিশাভাগে,
ঘুমায় জগৎ, মাঝে মাঝে শিবা সব ডাকে।
তখন তুমি পক্ষিগণে যতনে বক্ষে ধর,
আঁধার ডাকি ঘরে নিজ আনি রক্ষা কর।
নিদাঘে তুমি পথিকগণে ছায়া কর দান,
সদা স্বাদু খাদ্য দানে তোষ তাদের প্রাণ।
যদিও তারা তব দেহ কাটে কুঠারঘায়,
তবুও তুমি বিতর ছায়া উচ্চ মহিমায়।
শত্রু তরে ক্ষমা ভিক্ষা কর বিভুর কাছে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।

শ্রীপঞ্চানন বসু।

বামারচনা।

সম্মিলন।

(১)

যা দিয়াছ প্রভো! দিয়াছ অনেক,
দীন আমি এত রাখিব কোথায়?
আমি তো তোমার, তব যা' আমার,
কেন দিলে প্রভো! এত যা আমায়?

(২)

অসার অনিত্যে রেখোনা রেখোনা
মায়া-বদ্ধ প্রাণে আরো মজাইয়ে,
মুক্ত কর চিত্ত মোহজাল হতে
নির্ব্বাণের পথ দাও দেখাইয়ে।

(৩)

ভবসুখরাশি, মরু মরীচিকা
না মিটায়ে তৃষা বাড়ায় দ্বিগুণ,
আমার প্রাণের নিবাও হে হরি!
ভবপিপাসার ভীষণ আগুন।

(৪)

আমি যাহা চাহি "শুদ্ধ নিরমল
শাশ্বত সুন্দর চির অনশ্বর,
জীবনে মরণে নাহি যার ক্ষয়"
সদা পূর্ণ থাক্ তাহে এ অন্তর।

৫

তব অফুরন্ত অসীমের সনে
হোক্ লয় মম সসীম জীবন,
তোমাতে আমাতে ঘুচিয়া দূরত্ব
এক হয়ে হোক্ চিরসম্মিলন।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত

বীর-সমাধি

অনন্ত শয়নে নিভৃত নির্জ্জনে
কে গো তুমি মহামতি?
তোমার শাসনে সুখী প্রজাগণে
হে দয়াল নরপতি!
এবে কেন হায় পড়িয়া ধরায়,
অনন্ত নিদ্রায় থির,
নিরন্ন ভিখারী রাজদণ্ডধারী
সম, কালকোলে, ওহে বীর,
রাজস্থান শোভা দীপ্ত তব প্রভা
অচল অটল ভবে,
জয়সিংহ বলী, মোগলকে ঠেলি,
শাসিতে প্রজায় সবে।
অন্তক শমন, করিয়া শাসন,
লয়ে যায় নিজে হ'বে,
স্মৃতিচিহ্ন যত, কাল কাছে হত,
থাকে না কিছুই প'ড়ে।

শ্রীমতী হে—জ দেবী।

প্রার্থনা।

হে পরম পিতা মাতা,
তুমি মোর ভগ্নী ভ্রাতা,
তুমিই আমার নাথ যথায় তথায়,
তোমার মহিমা যাহা,
কিছু নাহি জানি তাহা,
অজ্ঞান অবোধ আমি বিশাল ধরায়।

২

অন্ধ বোবা কর নাই,
নরের যা কিছু চাই
সকলি দিয়াছ নাথ নিজ দয়াগুণে।
কিন্তু এই দুঃখ হয়,
দেছ মোরে রিপু ছয়,
হৃদয় দগধ তাই হয় পাপাগুনে।

৩

এ ভবে করিতে ভোগ
দিয়াছ যে উপভোগ,
সে কেবল কর্ম্মভোগ আর বিড়ম্বনা।
মন তবু তাতে ধায়
অনলে পতঙ্গপ্রায়
মোহের ছলনে নাথ না ভাবি আপনা।

৪

তুমি প্রভো কৃপা করে
চৈতন্য না দিলে মোরে
কিরূপেতে মায়া-ডোর ছিঁড়িব আপনি,
যদিও আঁধার ঘোরে,
রাখিয়াছ নাথ মোরে,
তবু তব গুণে নাথ এই মাত্র জানি।

৫

তুমি নাথ নিরাকার,
তুমি সকলের সার,
এ বিশ্ব সংসার নাথ সকলি তোমার।
তোমারি করুণাবলে
আসি এই ধরাতলে
কত সুখ ভুঞ্জে নর নারী অনিবার।

৬

তুমি হও শিবময়,
তব করুণায় হয়
জীবের মঙ্গল সদা, জগতের স্বামী।
আমার মঙ্গল যাহা,
তুমিই করিবে তাহা,
আপন মঙ্গল কিছু বুঝি নাকো আমি।

৭

তুমি প্রভো নিজ গুণে,
উদ্ধারিও জ্ঞানহীনে,
অন্তিম কালেতে দিও চরণে শরণ।
ভক্তিভরে করি নাথ,
শত কোটি প্রণিপাত,
সদা যেন মনে থাকে তোমার চরণ।

শ্রীকুসুমলতা বসু।

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 618. February, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৮ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩২১। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদি ব্রাহ্মসমাজের ১১ই মাঘের সায়ংকালের উদ্বোধন।

এই প্রাঙ্গণের বাইরে বিশ্বের যে মন্দিরে সন্ধ্যাকাশের তারা জ্বলে উঠেছে, যেখানে অনন্ত আকাশের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার শান্তি পরিব্যাপ্ত, সেই মন্দিরের দ্বারে গিয়ে প্রণাম করতে তো মন কোন বাধা পায় না। বিশ্বভুবনে ফুলের যে রং সহজে পুষ্পকাননে প্রকাশ পেয়েছে, নক্ষত্রলোকে যে আলো সহজে জ্বলেছে—এখানে তো সে রং লাগা সহজ হয় নি, এখানে সম্মিলিত চিত্তের আলো তো সহজে জ্বলেনি। এই মুহূর্ত্তে সন্ধ্যাকাশের গন্ধগহন কুসুমের সভায়, নিবিড় তারারাজির দীপালোকিত প্রাঙ্গণে বিশ্বের নমস্কার কি সৌন্দর্য্যে কি একান্ত নম্রতায় নত হয়ে রয়েচে! কিন্তু যেখানে দশজন মানুষ এসেছে—সেখানে বাধার অন্ত নেই—সেখানে চিত্তবিক্ষেপ কত ঢেউ তুলেচে—কত সংশয়, কত বিরোধ, কত পরিহাস, কত অস্বীকার, কত ঔদ্ধত্য! সেখানে লোক কত কথাই বলে—এ কোন্ দলের লোক, এর কি ভাষা, এ কি ভাবে, এর চরিত্রে কোথায় কি দরিদ্রতা আছে, তাই নিয়ে এত তর্ক, এত প্রশ্ন! এত বিরুদ্ধতার মাঝখানে কেমন করে নিয়ে যাব সেই প্রদীপখানি, একটু বাতাস যার সয় না—সেই ফুলের অর্ঘ্য কেমন করে পৌঁছে দেব, একটু স্পর্শেই যা ম্লান হয়। সেই শক্তি তো আমার নেই, যার দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধতা নিরস্ত হবে, সব বিক্ষোভের তরঙ্গ শান্ত হবে। জনতার মাঝখানে যেখানে তাঁর উৎসব, সেখানে আমি ভয় পাই—এত বিরুদ্ধতাকে ঠেলে চলতে আমি কুণ্ঠিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর যেখানে তাঁর সিংহাসনে আসীন, সেখানে তাঁর

চরণে উপবেশন করতে আমি ভয় করি নি। সেখানে গিয়ে বল্‌তে পারি, হে রাজন্‌, তোমার সিংহাসনের এক পাশে আমায় স্থান দাও। তুমিতো কেবল বিশ্বের রাজা নও, আমার সঙ্গে যে তোমার অনন্ত কালের সম্বন্ধ। এ কথা বল্‌তে কণ্ঠ কম্পিত হয় না, হৃদয় দ্বিধান্বিত হয় না। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আমার বলে স্বীকার করতে কণ্ঠ যদি কম্পিত হয়, তবে মাপ কোরো হে হৃদয়েশ্বর! ভিড়ের মধ্যে যখন ডাক দাও, তখন কোন্‌ ভাষায় সাড়া দেব? তোমার চরণে হৃদয়ের যে ভাষা, সে তো নীরব ভাষা; যে স্তবগান তোমার, সে তো অশ্রুত গান। সে যে হৃদয়-বীণায় তন্ত্রে তন্ত্রে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে —সেই বীণা যে তোমার বুকের কাছে তুমি ধরে' রেখেছ। যতই ক্ষীণস্বরে সে বাজুক, সে তোমার বুকের কাছেই বাজে। কিন্তু তোমার আমার মাঝখানে যেখানে জনতার ব্যবধান, নীরবে হোক্‌ সরবে হোক্‌ অন্তরে অন্তরে যেখানে কোলাহল তরঙ্গিত, সেই ব্যবধান ভেদ করে' আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠের সঙ্গীত যে জাগবে, আমার পূজার দীপালোক যে অনির্ব্বাণ হয়ে থাকবে—এ বড় কঠিন, বড় কঠিন।

মানুষ গোড়াতেই যে প্রশ্ন করে, কেচে, তুমি কোন্‌ দলের?—এ যে উৎসব—এতো কোন এক দল নয়, এ যে শতদল। এ কাদের উৎসব—আমি কেমন করে তার নাম দেব? এক এক জন করে কত লোকের নাম বলব? হৃদয়ের ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে সমস্ত কোলাহল পার হয়ে শুদ্ধশান্ত হয়ে যাঁরা এসেছেন, আমি ত তাঁদের নাম জানি না। যাঁরা যুগে যুগে এই উৎসবের দীপ জ্বালিয়ে গেছেন এবং যাঁরা অনাগত যুগে এই দীপ জ্বালাবেন—তাঁদের কত নাম করব, আর কেমন করেই বা করব? আমি এই জানি যে, সম্প্রদায় আপনার বাইরে আস্‌তে চায় না, সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়। তাঁর দক্ষিণ মুখের যে অম্লান জ্যোতি অনন্ত আকাশে প্রকাশমান, যে জ্যোতি মনুষ্যত্বের ইতিহাসের প্রবাহে ভাসমান—সম্প্রদায় সেই জ্যোতিকেই নিজের প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চায়।

উৎসব ত ভক্তির, উৎসব ত ভক্তেরই, সে ত মতের নয়, প্রথার নয়, অনুষ্ঠানের নয়। এ চিরদিনের উৎসব, লোকলোকান্তরের উৎসব। সেই অনন্তকালের নিত্য উৎসবের আলো থেকে যে একটুখানি স্ফুলিঙ্গ এখানে এসে পড়চে—যদি কেউ হৃদয়ের দীপ-মুখে সে টুকু গ্রহণ করে, তবেই সে শিখা জ্বল্‌বে—তবেই উৎসব হবে। যদি তা না হয়—যদি কেবল দস্তুর রক্ষা করা হয়, এ যদি কেবল পঞ্জিকার জিনিষ হয়, তবে সমস্ত অন্ধকার, এখানে একটি দীপও তবে জ্বলেনি। সেই জন্য বল্‌চি এ দলের উৎসব নয়, এ হৃদয়ের ভিতরকার ভক্তির উৎসব। আমরা লোক ডেকে আলো জ্বালাতে পারি, কিন্তু লোক ডেকে তো সুধারসের উৎসকে উৎসারিত

করতে পারি না। যদি আজ কোন জায়গায় ভক্তের কোন একটি আসন পাতা হয়ে থাকে, এই সভার কোন নিভৃত প্রান্তে যদি ভক্তের হৃদয় জেগে থাকে—তবেই সার্থক হয়েচে এই প্রদীপ জ্বালা, সার্থক হয়েচে এই সঙ্গীতের ধ্বনি, এই সমস্ত উৎসবের আয়োজন।

এ উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী, পথের ধারের কোন পান্থশালাতে আমরা বদ্ধ নই। কোন বাঁধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব হয় না—চলার পথে উৎসব, চল্‌তে চল্‌তে উৎসব। এ উৎসব কবে আরম্ভ হয়েছে? যে দিন এই পৃথিবীতে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেচি, সেই দিন থেকে এই আনন্দ উৎসবের আমন্ত্রণ পৌঁচেছে—সেই আহ্বানে সেই দিন থেকে পথে বেরিয়েছি। সেই যাত্রীর সঙ্গে সেই দিন থেকে তুমি যে সহযাত্রী, তাইতো যাত্রীর উৎসব জমেছে। মনে হয়েছিল যে পথে চলচি সে সংসারের পথ, তার মাঝে সংসার, তার শেষে সংসার; তার লক্ষ্য ধনমান, তার অবসান মৃত্যুতে; কিন্তু না, পথ ত কোথাও ঠেকে না, সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়। তুমি সহযাত্রী, তার দক্ষিণ হাত ধরে' কত সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সংশয়ের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাকে পাশে নিয়ে চলেইচ; কোনো কিছুতে এসে থাম্‌তে দাও নি। সে বিদ্রূপ করেচে, বিরুদ্ধতা করেচে—কিন্তু তুমি সঙ্গে চলেছ—তুমি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছ সেই অনন্ত মনুষ্যত্বের বিরাট রাজপথে, যেখানে সমস্ত যাত্রীর দল চিরজীবনের তীর্থে চলেছে। ইতিহাসের সেই প্রশস্ত রাজপথে কি আনন্দ-কোলাহল, কি জয়ধ্বনি, সেইতো উৎসবের আনন্দধ্বনি! তুমি বদ্ধ করনি, তুমি বদ্ধ হ'তে দেবেনা, তুমি কোন মতের মধ্যে প্রথার মধ্যে মানুষকে নজরবন্দী করে রাখ্‌বে না। তুমি বলেছ মাভৈঃ—যাত্রীর দল বেরিয়ে পড়। কেন ভয় নেই, কিসে নির্ভয়? তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে চলচ। তাই ত যে চলচে সে কেবলই তোমাকে পাচ্চে। যে চলচে না সে আপনাকেই পাচ্চে, আপনার সম্প্রদায়কেই পাচ্চে।

অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেচেন, তিনি চল্‌বে ব'লে কারো জন্যে অপেক্ষা করবেন না। যে বসে রয়েচে, সে কি দেখ্‌তে পাচ্ছে না তার বন্ধন—সে কি জানে না যে এই বন্ধন না খুলে ফেল্‌লে, সে মুক্ত হবে না, সে সত্যকে পাবে না? সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেচি, এমন কথা কে বলে! অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে? তুমি যত বড় মুগ্ধ হওনা কেন তোমার মোহ অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেল্‌বে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে?

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে' বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে

আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চল্‌তে বাধা দিয়েছি—তাকে বলেচি তোমার আসন এইটুকুর মধ্যে, এর বাইরে নয়, তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ো না, তুমি সমুদ্র পেরিয়োনা। সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়া রাখ্‌ব; মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর; এমন সব স্পর্দ্ধাবাক্য আমরা এত দিন বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্দ্ধা চূর্ণ করবেন না? মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুল্‌বে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে—সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না? তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন? তিনি কি বল্‌তে পারেন যে তিনি বন্দী? তিনি এ কথা বল্‌লে সংসারকে কে বাঁচাবে? তিনি বলেচেন—সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত। এই উদ্বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র—এখনি নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্চে—অনন্ত কাল জাগ্রত থেকে তারা সেই জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র উচ্চারণ করচে—জপ করচে এই মন্ত্র সেই চিরজাগ্রত তপস্বীরা। জাগ্রত হও, জাগ্রত হও—প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখ্‌বার চেষ্টা কোরো না। সত্য তা হলে নিদারুণ হয়ে উঠ্‌বে—যে লোহার শৃঙ্খল তার হাতকে বাঁধবে, সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্র সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়েনি? সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ, সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্চ্ছিত হয় নি? অপমানে মাথা হেট হয়নি? সইবে না বন্ধন—বড় দুঃখে ভাঙবে, বড় অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্বোধনের প্রলয় মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেচে—সেই ভাঙ্‌বার মন্ত্র জেগেচে। বসে থাক্‌বার নয়, কোণের মধ্যে তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাক্‌বার নয়—চল্‌বার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের সেই উৎসব—সেই সত্যের মধ্যে উদ্বোধিত হবার উৎসব।

আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি, কালের স্রোতে ডুব্‌লনা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—অন্ত নেই, তাঁর অন্ত নেই—অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের তলে একদিন আমাদের পিতামহ এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—সেই যে মুক্তির আনন্দঘোষণার উৎসব সে কি এই ঘরের কোণে বসে আমরা ক'জনে সম্পন্ন করব? এই কল্‌কাতা সহরের এক প্রান্তে? ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এই মুক্তির উৎসবের আনন্দধ্বনি বেজে উঠ্‌বে না?

এই মুক্তির বাণীকে আমাদের পিতামহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন? এই অনন্ত আকাশের জ্যোতির ভিতর থেকে একে তিনি পেয়েছেন, বিশ্বের মর্ম্ম-কুহক থেকে এই মুক্তির মন্ত্রের ধ্বনি তিনি শুন্‌তে পেয়েছেন। এই যে মুক্তির মন্ত্র আগুনের ভাষায় আকাশে গীত হচ্চে—সেই আগুনকে তাঁরা এই ক'টী সহজ বাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই বাণী আমরা ভুলব? আর বলব, সত্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসের জীর্ণ দেয়ালে ভাঙা ঘড়ির কাঁটার মত চিরদিনের জন্য থেমে গেছে? গৌরব করে বল্‌ব আমাদেরই দেশে সচল সত্য অচল পাথর হয়ে গেছে—বুকের উপরে সেই জগদ্দল পাথরের ভার আমরা বইচি!—না কখনই না। উদ্বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজ্‌চে—যাত্রী, বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস। ভেঙে ফেল তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে যেন যারা চন্দ্র সূর্য্য তারার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে ফেলে চল্‌চে।

১১ই মাঘ সন্ধ্যার উপদেশ।

আমাদের মন্ত্রে আছে—পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি—তুমি আমাদের পিতা, তুমি পিতা আমাদের এই বোধ দাও। এই পিতার বোধ আমাদের অন্তঃকরণে সজাগ নেই বলে' আমাদের যেমনি ক্ষতি হোক, পিতার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের দিক দিয়ে তাঁর কাজ সমানই চলেচে। আমাদের বোধের অসম্পূর্ণতাতে তাঁর কোন ব্যাঘাত হয়'ন। তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানের মধ্যে চৈতন্য ও প্রাণ প্রেরণ করেছেন—তাঁর পিতৃত্ব মানবসমাজে কাজ করেই চলেচে।

কিন্তু এক জায়গায় তিনি সুপ্ত হয়ে আছেন—তিনি যেখানে আমাদের প্রিয়তম, সেখানে তিনি জাগেননি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমার প্রেম উদ্বোধিত হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নির্জ্জনতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি—এ কথা আমি জান্‌লুম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম, এ কথা সত্য। এ বল্‌লে স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ ঘটে, কারণ তিনি যদি প্রিয়তম তবে তাঁকে ভালবাসিনা কেন? কিন্তু তা বল্‌লে কি হবে—তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন? কত মানুষের ভিতরে জীবনের তৃপ্তির সন্ধান করা গেল, ধনমানের পিছনে পিছনে মরীচিকার সন্ধানে ফেরা গেল—মন ভরল না, সে কেঁদে বল্‌ল, জীবন ব্যর্থ হল—এমন একটি এককে পেলুম না যার কাছে সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে পারি, দ্বিধা সংশয়ের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে পারি। ক্ষণে ক্ষণে এ মানুষকে ও মানুষকে আশ্রয় করলুম—কিন্তু জীবনের সেই সব প্রেমের বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তগুলিকে ভরে তুলব কেমন

করে—কোন্ মাধুর্য্যের প্লাবনে ছেদগুলো সব ভরে যাবে? এমন একের কাছে আপনাকে নিবেদন করিনি বলেই এত বেদনা পাচ্ছি। তিনি যে আমার প্রিয়তম এই কথাটী জানলুম না বলেই এত দুঃখ আমার। তিনি সত্যই প্রিয়তম বলেই যা পাচ্চি তারি মধ্যে দুঃখ রয়ে যাচ্চে—তাতে প্রেম চরিতার্থ হচ্চে কই? আমরা সব সন্ধানের মধ্যে এককেই খুঁজছি—এমন কিছুকে খুঁজছি যা সব বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দেবে। জ্ঞান কি জোড়া দিতে পারে? জ্ঞান একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুকে একবার মিলিয়ে দেখে, একবার বিশ্লেষ করে দেখে। বিরোধকে মেটাতে পারে প্রেম—বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে প্রেম। বৈচিত্র্যের এই মরুভূমির মধ্যে আমাদের তৃষ্ণা কেবলি বেড়ে উঠতে থাকে—জ্ঞান সেই বৈচিত্র্যের অন্তহীন সূত্রকে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে মারবে—সে তৃষ্ণা মেটাবে কেমন করে? সেই প্রেম না জাগা পর্য্যন্ত কি ঘোরাটাই ঘুরতে হয়। একবার ভাবি ধনী হই—ধনে বিচ্ছিন্নতা ভরে দেবে—সোনায় রূপায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।—কিন্তু সোনায় রূপায় সে ফাঁক কি ভরতে পারে? খ্যাতি প্রতিপত্তি, মানুষের উপরে প্রভাব বিস্তার—কিছু দিয়েই সেই ফাঁক ভরে না। প্রেমে সব ফাঁক ভরে যায়, সব বৈচিত্র্য মিলে যায়। মানুষ যে তার সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে কেবলি সেই প্রেমকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—সত্যই যে তার প্রিয়তম। —সত্য যদি প্রিয়তম না হবেন, তবে তাঁর বিরহে মানুষ কি এমন করে লুটিয়ে পড়ত? যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে যায়, সে যখন শূন্য হ'য়ে যায়, তখন মানুষের সেই বেদনার মত বেদনা আর কি আছে? মানুষ তাই একান্তমনে এই কামনাই করচে—আমার সকল প্রেমের মধ্যে সেই একের প্রেমরস বর্ষিত হোক, আমার সব রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে যাক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে পাত্রের মত করে তাঁর প্রেমের অমৃতে পূর্ণ করে মানুষ পান করতে চায়। অন্তরাত্মার এই কামনা, এই সাধনা, এই ক্রন্দন। কিন্তু অহংএর কোলাহলে এ কান্না তার নিজের কানেই পৌঁছচ্চেনা, প্রতিবারেই সে মনে করচে বড্ড ঠকেচি আর ঠকা নয়, এবার যা চাচ্ছি তাতেই আমার সব অভাব ভরে যাবে। হায়রে, সে অভাব কি আর কিছুতে ভরে! সেই বেদনা কি ভুলে থাকার উপায় আছে। এমন মোহান্ধ কেউ নেই, যার আত্মা পরম বিরহে এই বলে কাঁদছে না—প্রিয়তম জাগলেন না। ফুলের মালা টাঙানো হয়েচে, বাতি জ্বালানো হয়েচে, সব আয়োজন পূর্ণ—শুধু তাঁকে ডাকলুম না, তাঁকে জাগালুম না।

যেখানে তিনি পিতামাতা, সেখানে তিনি অন্নপান করাচ্চেন, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখছেন। মায়ের ভাণ্ডার তো খোলা রয়েছে—ধরণীর ভোজে মা পরিবেষণ করচেন—পরিপূর্ণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সব দিচ্ছেন। সেখানে কোন বাধা নেই।

কিন্তু যখন জগতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি—এত সৌন্দর্য্য কেন? এত ফুল ফুটল কেন? আকাশে এত তারার প্রদীপ জ্বল্‌ল কেন? জীবনে মাঝে মাঝে বসন্তের দক্ষিণে হাওয়া যৌবনের মর্ম্মর-ধ্বনি জাগিয়ে তোলে কেন? তখন বুঝি যে প্রিয়তম জাগলেন না—তাঁরি জাগার অপেক্ষায় যে এত আয়োজন।

তাই আমি আমার অন্তরাত্মাকে যা কিছু এনে দিচ্ছি সে সব পরিহার করচে—সে বলচে এ নয়, এ নয়, এ নয়;—আমি আমার প্রিয়তমকে চাই। আমি তাঁকে না পেয়েই তো পাপে লুটচ্ছি, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার এই দাহ সহ্য করচি, আমি চারি দিকে আমার অশান্ত প্রবৃত্তি নিয়ে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছি। যাঁকে পেলে সব মিলবে তাঁকে পাওয়া হয়নি বলেই এত আঘাত দিচ্চি। যদি তাঁকে পেতুম, বলতুম—আমার হয়ে গেছে। আমার দিনের পর দিন, জীবনের পর জীবন ভরে গেল।

সমস্ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে যে দিন সেই সুন্দরকে দেখলুম, সমস্ত মাধুর্য্যের ভিতরে যে দিন সেই মধুরকে পেলুম, সে দিন আমার মাধুর্য্যের পরিচয় দেব কিসে? মাধুর্য্যে বিগলিত হয়ে পরিচয় দেব? না—মাধুর্য্যের পরিচয় মাধুর্য্যে নয়, মাধুর্য্যের পরিচয় বীর্য্যে। সে দিন মৃত্যুকে স্বীকার করে পরিচয় দেব! বলব—প্রিয়তমহে, মরব তোমার জন্য। আমার আর শোক নেই, ক্ষুদ্রতা নেই, ক্ষতি নেই। প্রাণের মায়া আর আমার রইল না—বলনা তুমি, প্রাণকে তোমার কোন্ কাজে দিতে হবে? তোমাকে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদে বেড়াব তা নয়, কেবল মধুর রসের গান করব তা নয় গো। যে দিন বল্‌তে পারব যিনি মধুর পরম মধুর, যিনি সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন, সে দিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দলে' চলে' যাব। সে দিন জান্‌ব যে কর্ম্মে কোন ক্লান্তি থাক্‌বে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাক্‌বে না। কোন বাধাকে বাধা বলে মান্‌ব না। মৃত্যু সে দিন সামনে দাঁড়ালে, তাকে বিদ্রূপ করে চলে' যাব। সে দিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েচে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে। দেখাতে হবে দুঃখকে মৃত্যুকে সে ভয় করে না। স্পর্দ্ধা করে বীরত্ব করলে সে বীরত্ব টেকে না—জগৎভরা আনন্দ যে দিন অন্তরে সুধাস্রোতে বয়ে যাবে, সে দিন মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব সরল হবে, তার কর্ম্ম সহজ হবে, তার ত্যাগ সহজ হবে। সে দিন মানুষ বীর। সে দিন ইচ্ছা করে সে বিপদকে বরণ করবে।

প্রিয়তম যে জাগ্‌বেন, সে খবর পাব কেমন করে? গান যে বেজে উঠবে। কি গান বাজ্‌বে? সে তো সহজ গান নয়, সে যে রুদ্র-বীণার গান। সেই গান শুনে মানুষ বলে উঠবে, সৌন্দর্য্যে অভিভূত হব বলে' এ পৃথিবীতে জন্মাই নাই—

সৌন্দর্য্যের সুধারসে পেয়ালা ভরে তাকে নিঃশেষে পান করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলে যাব। মাধুর্য্যের প্রকাশ কেবল ললিত কথায় নয়, এই সৌন্দর্য্য সুধার মধ্যে বীর্য্যের আগুন রয়েছে—মানুষ যে দিন এই সৌন্দর্য্যসুধা পান করবে, সে দিন দুঃখের মাথার উপরে সে দাঁড়াবে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মানুষ বিষয় বিষরসের মত্ততায় বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দরসকে পান করল না। সেই আনন্দের মধ্যে বীর্য্যের অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নিতেই সমস্ত গ্রহ চন্দ্রলোক দীপ্যমান হয়ে উঠেছে—সেই বীর্য্যের অগ্নি মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলল না। অথচ মানুষের অন্তরাত্মা জানে যে জগতের সুধাপাত্র পরিপূর্ণ আছে বলেই মৃত্যু এখানে কেবলি মরছে এবং জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করচে—প্রাণের কোথাও বিরাম নেই। অন্তরাত্মা জানে যে সেই সুধার ধারা জীবন থেকে জীবনান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে বয়েই চলেচে—কত যোগী, কত প্রেমী, কত মহাপুরুষ সেই সুধার ধারায় সমস্ত জীবনকে ডুবিয়ে অমৃতত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন—তোমরা অমৃতের পুত্র, মৃত্যুর পুত্র নও।

কিন্তু সে কথায় মানুষের বিশ্বাস হয় না। সে যে বিষয়ের দাসত্ব করেচে, সেইটেই তার কাছে বাস্তব—আর এ সব কথা তার কাছে শূন্য ভাবুকতা মাত্র। সে তাই এ সব কথাকে বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, অবিশ্বাস করে। যাঁরা অমৃতের বাণী এনেচেন, মানুষ তাই তাঁদের মেরেচে। তাঁরা যেমন মানুষের হাতে মার খেয়েছেন, এমন আর কেউ নয়, অথচ তাঁরাত ম'লেন না। তাঁদের প্রাণই শত সহস্র বৎসর ধরে সজীব হয়ে রইল। কারণ তাঁরাই যে মার খেতে পারেন; তাঁরা যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৃত্যুর দ্বারা তাঁরা অমৃতের প্রমাণ করেন। মানুষের দরজায় এসে দাঁড়ালে মানুষ তাঁদের আতিথ্য দেয়নি, আতিথ্য দেবে না—মানুষ তাঁদের শত্রু বলে জেনেছে। কারণ আমরা আমাদের যত কিছু মত বিশ্বাস সমস্ত পাথরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েচি, ঐ সব পাগলকে ঘরে ঢোকালে সে সমস্ত যে বিপর্য্যস্ত হয়ে যাবে, এই মানুষের মস্ত ভয়। মৃত্যুকে কৌটার মধ্যে পুরে লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েচি, ওরা ঘরে এলে কি আর রক্ষা আছে—লোহার সিন্দুক ভেঙে যে মৃত্যুকে এরা বার করবে।

সেই মৃত্যুকেই তাঁরা মারতে আসেন। তাঁরা মরে প্রমাণ করেন আছে সুধা সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে,—নিঃশেষে পরম আনন্দে সেই সুধার পাত্র থেকে তাঁরা পান করেন। তাঁরা প্রিয়তমকে জেনেছেন, প্রিয়তম তাঁদের জীবনে জেগেছেন।

আমাদের গানে তাই আমরা ডাক্‌চি—প্রিয়তমহে, জাগ জাগ জাগ। কেননা, প্রিয়তমহে তুমি জাগনি বলেই মনুষ্যত্ব

বিকাশ হ'ল না, পৌরুষ পরাহত হয়ে রহিল। তোমার কণ্ঠের বিজয়মালা দাও পরিয়ে তুমি আমাদের কণ্ঠে—জয়ী কর সংগ্রামে। সংসারের যুদ্ধে পরাভূত হ'তে দিওনা—বাঁচাও, তোমার অমৃতপাত্র আমাদের মুখে এনে দাও। অপমানের মধ্যে, পরাভবের মধ্যে তোমাকে ডাকুচি—জাগ, জাগ, জাগ। জাগরণের আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক্‌।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মহিলাসমাজের শিক্ষা—তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়।*

মহিলাদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। তবে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বলেন যে—মহিলাদিগকে শিক্ষা দিলে তাঁহাদিগের শারীরিক ক্ষতি হয়। বিদ্যালাভের জন্য মস্তিষ্কের পরিচালনা অনিবার্য্য। নারীগণের মস্তিষ্কের আত্যন্তিক আলোচনার জন্য উহার বিশেষ ক্ষতি হয়। ঐ ক্ষতি পূরণের জন্য নারীর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে রক্তাদি মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। অর্থাৎ নারীগণের অন্যান্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে তাঁহাদের মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর লোকদিগের মত যে কত দূর সমীচীন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই যে স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করিতেছেন, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে হইবে। তবে কি প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে ইহা লইয়া এক এক জন এক এক প্রকার মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন প্রাচ্য ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হউক, কেহ বলেন পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষা প্রদান করা হউক। আবার কেহ বলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে শিক্ষা দান করা হউক। পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে পূর্ব্বে আমাদের দেশে মহিলাগণের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। সেই জন্য আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে বর্ত্তমান সভ্যতার শীর্ষস্থান পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা উচিত। আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ের বিষয়ীভূত না হইলেও আমরা এস্থলে উদাহরণ-স্বরূপ দেখাইব যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা ছিল।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা।

আমাদের দেশে যে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক-দিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করা হইত,

* সুকুমার সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

তাহার প্রমাণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন ভারত মহিলাগণ যে গণিত, দর্শন, সাহিত্য, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। লীলাবতী, গার্গী, দেবাহুতি, মদালসা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণ প্রাচীন কালে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বেদের অনেক মন্ত্র ঋষিপত্নীগণের প্রণীত। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী পুত্রবৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গর্গমুনির কন্যা গার্গী (মতান্তরে পত্নী) যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় যশোভাজন হইয়াছিলেন। জনকের রাজসভায় তাঁহার বিচার-পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীর জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় আছে। তাঁহার প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর হিন্দু-মহিলার জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষা ছিল, কিন্তু তাহার প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে আভাস পাওয়া যায় যে, স্ব স্ব গৃহেই মহিলাদিগকে শিক্ষা প্রদত্ত হইত।

বৌদ্ধ যুগে স্ত্রীশিক্ষা।

ইহার পর বৌদ্ধ যুগেও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। তবে পৌরাণিক যুগ হইতে আদর্শ কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের হইয়াছিল। যাহা হউক, কি প্রাচীন যুগ, কি বৌদ্ধযুগ—এই উভয় যুগেই শিক্ষার মূল বিষয় ছিল ধর্ম্ম-শিক্ষা। প্রাচীন বিদুষীদিগের কাহিনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—কেহ পতিসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, কেহ সন্তানপালনের উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কেহ ভগবদ্ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন, কেহ বা পাণ্ডিত্যালোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। মূলতঃ মহিলাদিগের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থায় ভারত যে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চিরকাল সকলকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। গৌতম-বুদ্ধের জীবনচরিত আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, মহিলাগণ তাঁহার সদুপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক জ্ঞানগরিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী বলেন যে, ভারতের স্ত্রীলোকগণ কখন শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, হয় তাঁহারা প্রাচীন-ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা সত্যকে লুক্কায়িত রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

মুসলমান যুগে স্ত্রীশিক্ষা।

বৌদ্ধযুগের পর মুসলমান যুগের আরম্ভ। মুসলমানেরা সাধারণতঃ জ্ঞানান্বেষী ছিলেন না। তাঁহারা হিন্দুদিগের পুস্তকালয় প্রভৃতি পাইলেই অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেন। তাঁহাদিগের সময়ে অবরোধ-প্রথার অত্যধিক প্রচলন হইয়াছিল।

আইন-ই-আকবরী নামক প্রসিদ্ধ

গ্রন্থে দেখা যায় যে, বাদসাহের অন্তঃপুরে শিক্ষার প্রচলন ছিল। জাহানারা, রোষেনারা প্রভৃতি অল্প বিস্তর শিক্ষিতা ছিলেন। অবরুদ্ধ থাকিলে শিক্ষা কিছুতেই প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য তাৎকালিক মহিলাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইত না, হইলেও তাহা অনুল্লেখযোগ্য।

মুসলমান রাজত্বের শেষাবস্থা।

ইহার পরে ক্রমে ক্রমেই স্ত্রীশিক্ষার অবনতি হইতে লাগিল। অবশ্য এ অবনতির মূলে যে কিছু কুসংস্কার ছিল না তাহা নহে। এই যুগেও যে দুই চারিজন শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহা নহে; তবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে দুই চারি জনের শিক্ষা - শিক্ষাই নহে। এরূপ শিক্ষা জাতীয় উন্নতির কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য করে না। যে শিক্ষায় ভাব-প্রবণতা হয়, যে শিক্ষা দ্বারা হৃদয় উন্নত হয়, তাহাই শিক্ষা।

ইংরাজাধিকার।

মুসলমানদিগের অধঃপতনের পরে ইংরাজাধিকার। ইংরাজাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আবার স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের চেষ্টা আরম্ভ হয়। এ চেষ্টার মূলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট। অবশ্য ইহার উদ্যোগী অনেক মহাত্মাই ছিলেন। ডফ্ সাহেব, রাজা রামমোহন রায়, রাম গোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, বেথুন সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি। তাঁহাদিগের উদ্যম, চেষ্টা ও উৎসাহের ফলে দেশে আবার স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ তৈল পাইয়া যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, অথবা স্তিমিতপ্রায় অগ্নি ইন্ধন পাইয়া যেরূপ লোলজিহ্বা বিস্তার করে, সেইরূপ মৃতপ্রায় স্ত্রীশিক্ষা আবার উঠিয়া বসিল। তাহার শরীরে উৎসাহ-রক্ত প্রবাহিত হইয়া যেন তাড়িতের ন্যায় কার্য্য করিল। দেশের নানা স্থানে নিম্ন ও উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

বর্ত্তমানে বঙ্গীয় মহিলাসমাজের শিক্ষা ও তাহার সমালোচনা।

বর্ত্তমান সময়ের মহিলাসমাজ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শিক্ষিতা মহিলা; শিক্ষিতা মহিলা বলিলে বুঝিতে হইবে, যাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ অর্দ্ধ-শিক্ষিতা; অর্দ্ধশিক্ষিতা বলিলে যে সকল বালিকা স্কুলে সাধারণতঃ পাঠ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত বলিয়া প্রায় তের বা চৌদ্দ বৎসরেই বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের স্কুলের পাঠ বন্ধ হইয়া যায়, শ্বশুরালয়ে সাধারণতঃ পাঠের সুযোগ হয় না। তৃতীয়তঃ অশিক্ষিতা; ইহা ভদ্র ও অভদ্র, ধনী ও নির্ধন সকল গৃহেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সকলেই অশিক্ষিতা। ভদ্র গৃহের মধ্যে প্রায়শঃ গ্রাম্য বালিকারাই অশিক্ষিতা হইয়া থাকে। ভদ্র-গৃহে অশিক্ষিতার অবস্থানের প্রধান কারণ, গ্রামে শিক্ষাপ্রদানের অসুবিধা। অনেক

কোন কোন গৃহে অভিভাবকগণের অবহেলাও অন্যতম কারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা উচ্চশিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতাগণের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা-প্রণালীর যে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে এই শিক্ষা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা, তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে পারা যায় না। অবশ্য বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীমতে শিক্ষিতা হইয়া অনেক বঙ্গের গৌরবাস্পদা বিদুষী মহিলা প্রতি বৎসরই এম্, এ, ও বি, এ, প্রভৃতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা হইতেছেন, কিন্তু তবুও বলিব এ শিক্ষা আদর্শ-শিক্ষা নহে। এক দিক দিয়া দেখিলে এই শিক্ষায় কতক পরিমাণে উপকার হইতেছে, আবার অপর দিক দিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে অপকারেরও সম্ভাবনা আছে।

(১) বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষার অনুরূপ। এই শিক্ষায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক একই ভাবে শিক্ষিত হয়। এই শিক্ষার অনেক গুণ থাকিলেও ইহা দ্বারা রমণীসুলভ কোমল গুণগুলি হইতে বালিকাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদিগের মতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষা হইতে বিভিন্ন প্রকারের হওয়া উচিত।

(২) বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী পাশ্চাত্য-রীতি-সম্মত। এক্ষণে বিবেচ্য যে, আমাদিগের দেশে নারীগণকে ঠিক পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না? অবশ্য পাশ্চাত্য-ভাবসম্মত শিক্ষার ঔচিত্য ও অনৌচিত্য সম্বন্ধে অনেকেরই মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা। তথাপি আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা আমাদিগের মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগের মতে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হওয়া উচিত নহে। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায়, জলবায়ুর তারতম্যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনেক প্রভেদ। অতএব পাশ্চাত্যের যাহা আদর্শ, প্রাচ্যেরও ঠিক সেই আদর্শ হওয়া সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশে বেলা দশম ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যের আদর্শে আমাদিগের দেশেও তাহাই হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশ শীতপ্রধান, প্রাচ্যদেশ গ্রীষ্ম-প্রধান। পাশ্চাত্য দেশে প্রাতঃ[illegible] এত অধিক পরিমাণে শৈত্যানুভব হয় যে, তখন কেহ বড় অধিক কার্য্য করিতে পারে না। শীতকালে অনেক সময় বরফ ও বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণ গগনমার্গে সূর্য্য উদিত হইতে দেখিলে অত্যধিক আনন্দিত হয়। আমাদিগের দেশের বালক বালিকাগণ কোন আশ্চর্য্য পদার্থের নাম শুনিলে তাহা দেখিবার জন্য যেরূপ কৌতূহলী হইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ "সূর্য্য উঠিয়াছে" এই কথা শ্রবণ করিলেই

আকাশের দিকে, হর্ষোৎফুল্ল, অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চাহে। গরম না হইলে তদ্দেশ-বাসিগণ জীবিত থাকিতে পারে না, সেই জন্য তাহারা গরম ভালবাসে। সেই জন্য তাহারা গরম বস্ত্র পরিধান করে, উত্তাপ জনক খাদ্য আহার করে। এমন কি তাহাদের ভাষাও তেজোময়। সে দেশে ভাল ভাবে অভ্যর্থনা করিলে বলে Warm Reception, তাঁহারা আপনাদিগের দেশের স্বাস্থ্যনীতির যাহা অনুকূল তাহাই করেন। কিন্তু আমাদিগের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে প্রাতঃ-কালে ও বৈকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বের মুনি-ঋষিগণ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তক্ষশিলা নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্যও পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে হইত। সেই সময়ের অধ্যাপনার কথা মনে করিলেও আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমাদিগের দেশে প্রাতঃকালে ও বৈকালে বায়ু শীতল থাকে, সেই জন্য মস্তিষ্কও শীতল থাকে। এই সময় গুরু ও শিষ্য উভয়েরই মন প্রফুল্ল থাকে। অতএব অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উভয়ই ভাল হয়। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত আছে যে, মধ্যাহ্নসময়ে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিবে, কায়িক অথবা মানসিক কোন প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য করিবে না। প্রাতঃকালে ও বৈকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। বাস্তবিক এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মধ্যাহ্নসময়ে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ত্রাহি ত্রাহি রব করিতে হয়, সে সময়ে কিছুতেই অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হইতে পারে না। আমাদিগের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে হইলে ভাষার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে, যেহেতু যে জাতি যে প্রকৃতির, সেই জাতির ভাষাও সেই প্রকৃতির। আমাদিগের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—অতিশয় ঠাণ্ডা ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শ্রুতিমধুর, অল্লায়াসে পাঠ করা যায় এবং ইহাতে স্থায়ী সৌম্যভাব বিরাজমান। বাঙ্গালী সাধারণতঃ শীতলতা-প্রয়াসী অতএব আমাদিগের দেশে মধ্যাহ্নকালে বিদ্যা-লয়ের কার্য্য হওয়া উচিত নহে। প্রাতঃ-কালে ও বৈকালেই আমাদিগের দেশে বিদ্যালয়ের কার্য্য হওয়া উচিত—ইহাই আমাদিগের স্বাস্থ্যনীতির অনুকূল। পাশ্চাত্যদেশে শরীর গরম রাখিবার জন্য লোকে উষ্ণবীর্য্য মদ্য পান করে, আমাদিগের দেশে শরীর শীতল করিবার জন্য ডাব, সরবৎ প্রভৃতি পান করে। অতএব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভেদ অনেক। আমাদিগের প্রাচ্য-শিক্ষা শান্ত-রসের আধার, আর পাশ্চাত্যের শিক্ষা তেজস্কর রুদ্ররসের আধার। আমা-দিগের প্রাচ্যশিক্ষা চন্দ্রালোকের ন্যায় স্নিগ্ধ, আর পাশ্চাত্যের শিক্ষা নিদাঘের খররবিকর সদৃশ।

৩। ধর্ম্মশিক্ষা।

আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা

ধর্ম্মোপদেশশূন্য। সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, নাই কেবল আমাদিগের—বাঙ্গালী জাতির। ধর্ম্মশিক্ষার অভাব আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষায় বাঙ্গালার বালকবালিকাগণ ধর্ম্মে আস্থা-শূন্য হইতেছে ও নীতি-বাক্যের অনুসরণ করিতেছে না। খ্রীশ্চানদিগের বাইবেল পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, মুসলমানদিগের কোরান পড়াইবার ব্যবস্থা আছে,—নাই কেবল হিন্দুর—বাঙ্গালীর। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা শিক্ষাই নহে, সে শিক্ষা অধঃপতনের মূল। ভারতবাসিগণ, তথা হিন্দুগণ, পূর্ব্বে বরাবরই ধর্ম্ম প্রাণ ছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বলিয়াছিলেন—"The Indians are distinguished by their straight-forwardness and honesty of their character."

চীন-দূত সাংখাই বলিতেছেন—"The Indians are straight forward and honest."

ফ্রায়ার অড়ডেনাস বলিয়াছেন—"The people of India are true in speech and eminent in justice."

ইদ্রিশি বলিয়াছেন—"The Indians are naturally inclined to justice, and never depart from it in their actions. Their good faith, honesty and fidelity to their engagements are well known, and they are so famous for these qualities that people flock to their country from every side. (Elliot's History of India Vol. 1. P. 88.)

আরও কত শত পাশ্চাত্য মনীষী ভারত-বাসিগণের ধর্ম্মপ্রাণতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাহুল্য বোধে আর উল্লেখ করিলাম না। যাহা হউক যাহাতে আমা-দিগের দেশে ধর্ম্মশিক্ষার পুনঃ প্রচলন হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়।

নদী সম্মুখস্থ দশাশ্বমেধ ঘাট।

ভেলুপুরার পরই অনেক ঘাটরাজী এবং সুবৃহৎ হর্ম্ম্যাবলী আমাদিগের নয়ন-পথে পতিত হয়। বারাণসী ধামের অনেক সুপ্রসিদ্ধ সুরম্য অট্টালিকা এইখানেই বিরাজমান। প্রথম ঘাটটী কারুইনিবাসী পেশোয়াবংশাবতংস অমৃত রাওয়ের। ইহাতে সত্র থাকাতে ইহার অন্য একটী নাম সত্রঘাট। ইহারই সংলগ্নীভূত মুনেশ্বর ঘাট, গঙ্গামহল ঘাট, খোরী ঘাট এবং চৌসথী ঘাট। বাঙ্গালী টোলায় অবস্থিত

চৌসথী দেবীর সুবৃহৎ মন্দিরের নামে শেষোক্ত ঘাটটীর নামকরণ হইয়াছে। অতঃপর পাণ্ডে-ঘাট, রাণাঘাট এবং মুন্সিঘাট। শেষোক্ত ঘাটটি প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইয়ের রাজমিস্ত্রী মুন্সি শ্রীধর দ্বারা নির্ম্মিত। অবশ্যই বলিতে হইবে যে, অহল্যাবাই বারাণসীধামের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য যে প্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন সেরূপ অন্য কেহ পান নাই। অতঃপর শীতলা ঘাটের উচ্চমঞ্চ-সংলগ্ন দশাশ্বমেধ ঘাট। এই স্থান হইতে দুরারোহ সোপানাবলী নগরমধ্যগত বড় রাস্তায় যাইয়া মিলিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানের বড়ই ধূম, বিশেষতঃ গ্রহণের সময়। দশাশ্বমেধ ঘাটটী পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। অপর চারিটি তীর্থের নাম :(১) অসিসঙ্গম (২) মণিকর্ণিকা (৩) পঞ্চ-গঙ্গা এবং (৪) বরুনা-সঙ্গম। তীর্থযাত্রিগণ প্রথমে অসি-সঙ্গম অথবা অসিঘাটে আগমন করিয়া পুণ্যকার্য্যাদি করেন, পরে দশাশ্বমেধ ঘাটে গমন করিয়া থাকেন। এখান হইতে মণিকর্ণিকায় সমাগত হইয়া স্নান-কার্য্য সমাপন করেন ও সর্ব্বশেষে পঞ্চগঙ্গা এবং বরুনাসঙ্গমে প্রয়াণ করেন। উল্লিখিত স্থান-পঞ্চক পঞ্চতীর্থ নামে খ্যাত। দশাশ্বমেধ সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, একদিন মহাদেব গৌরীর সহিত মন্দরাচলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বারাণসী ক্ষেত্রের কোন সংবাদ না পাওয়াতে মহাদেবের মন বিচলিত হইল। তখন বারাণসী ধাম রাজা দিবোদাসের অধীনে ছিল। তিনি দেবগণকে স্বীয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া বেনারস নগরীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদিও মহাদেব বেনারসের সংবাদের জন্য অনেক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তথাপি কেহই সংবাদ লইয়া প্রত্যাগত হয় নাই। সকলেই বেনারসের শোভা-সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। অমনি ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন মহাদেব ব্রহ্মাকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি বেনারসে যাইয়া রাজা দিবোদাসকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার উপায় দেখ। ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বেনারস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীর রমণীয়তা দেখিয়া ব্রহ্মাও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি মন্দির, বিপণী, ঘাট প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিলেন, কিছুই বাদ রহিল না। পরিশেষে তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজসন্নিধানে গমন করিলেন। রাজার নিকটে ব্রাহ্মণের সৎকারের কিছু ত্রুটি হইল না। ছদ্মবেশী ব্রহ্মা কহিলেন, "আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমি কিছুই লইব না।" উভয়ের বাক্যালাপের সময় ব্রহ্মা চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি কোনরূপে রাজাকে সামান্য পাপ কার্য্য করাইতে পারেন, তবে তাঁহার

রাজ্যচ্যুতি সম্ভব হইতে পারে, নতুবা নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! আমি একটি যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি আপনি কিছু দিতে উৎসুক হন, তবে আমাকে যজ্ঞসামগ্রী দিন।' রাজাও প্রতিশ্রুত হইলেন। ব্রহ্মা গঙ্গাতটে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ধারণা এই ছিল যে, রাজা যজ্ঞসামগ্রী দিতে কিছু না কিছু ভুল করিবেন, আর সেই পাপে তাঁহার রাজ্যচ্যুতি সঙ্ঘটিত হইবে। যজ্ঞসামগ্রীও অদ্ভুত, যথা ২৭ কূপের জল, ২৭ বৃক্ষের পত্র এবং অন্যান্য বস্তুও এই প্রকার ২৭গুণ। রাজা ছদ্মবেশী ব্রহ্মাকে কহিলেন 'আপনি এক যজ্ঞের কামনা করিয়াছেন, আমি আপনাকে দশ যজ্ঞের সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেছি।' ব্রহ্মাও তদ্বাক্যশ্রবণে পরিতুষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই যজ্ঞের সম্ভার আসিল—কোন বিষয়ের ত্রুটি রহিল না। ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যজ্ঞে দশ অশ্বের আহুতি প্রদত্ত হয়। তদবধি এই স্থানটী দশাশ্বমেধঘাট নামে খ্যাত। ব্রহ্মা এইখানে দুইটী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। তন্মধ্যে একটি মহাদেবের—ইহা দশাশ্বমেধেশ্বর নামে খ্যাত এবং অপরটী ব্রহ্মেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম মূর্ত্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত এবং অপর মূর্ত্তি হইতে বৃহৎ। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, দশাশ্বমেধেশ্বরের পূজা করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, পূজকের আত্মা স্বর্গে গিয়া শিবসকাশে বাস করে। ব্রহ্মেশ্বরের পূজায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে দশশ্বামেধ ঘাটে এবং নিকটবর্ত্তী রুদ্ররসনামক সরোবরে বহু ব্যক্তি স্নান করিয়া থাকে। স্নান এবং পূজার ধূম ১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

দশাশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, রাজাকে কোন প্রকার পাপ অর্শিল না। এখন তিনি বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। মহাদেবের নিকটে কি করিয়াই বা ফিরিবেন। এই চিন্তাই তাঁহার বলবতী হইল। এদিকে নগরের রমণীয়তাও তাঁহার মন আকৃষ্ট করিল। ফলে এই হইল যে, ব্রহ্মা কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

দশাশ্বমেধ ঘাটের পরই আর একটী প্রসিদ্ধ ঘাট আছে, উহা মানমন্দির ঘাট নামে খ্যাত। ১৬৯৩ খৃঃ জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এই স্থানটী প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত রাজার বংশধরগণ অধুনা সমগ্র মহল্লার মালিক। মানমন্দির নদীর উপরই বিরাজিত। কিন্তু দুঃখের মধ্যে ভগ্নদশা প্রাপ্ত। বিশেষ বিশেষ শিল্প সমন্বিত বড় বড় যন্ত্রাদি দিল্লী, মথুরা, উজ্জয়িনী এবং জয়পুর হইতে আনীত হইয়া মানমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেক যন্ত্রই এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, রাজা জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষ এবং সম্রাট আকবরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি রাজা মানসিংহ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু

অনেকের অনুমান এই যে, রাজা জয়সিংহ স্বীয় প্রসিদ্ধ জনকের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার নামে মান-মন্দিরের নামকরণ করিয়াছেন। মান মন্দিরে যে সকল যন্ত্রাদি আছে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান যন্ত্রের নাম, যথাঃ—

(১) ভিত্তিযন্ত্র—ইহা দ্বারা স্বর্য্যের নিম্নগতি এবং অক্ষ জানিতে পারা যায়।

(২) যন্ত্রসম্রাট—ইহা দ্বারা উত্তর মেরু দেখা যায়। ইহাতে একটী শঙ্কু আছে, উহা সূর্য্য-ঘটিকার কার্য্য করিয়া থাকে।

(৩) সূর্য্যঘটিকার নিকট একটী ক্ষুদ্র ভিত্তিযন্ত্র অবস্থিত।

(৪) ক্ষুদ্র ভিত্তিযন্ত্রের পূর্ব্ব দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বিষুবরেখা বৃত্ত আছে।

(৫) পূর্ব্বদিকে আর একটী ক্ষুদ্র সূর্য্য-ঘড়ি অবস্থিত।

(৬) উক্ত সূর্য্যঘড়ির সন্নিকটে চক্রযন্ত্র নামে একটী লৌহনির্ম্মিত চক্র দুইটী দেওয়ালের মধ্যে ঘুরিতেছে, তদ্দ্বারা উত্তর মেরু দেখা যায়। ইহা দ্বারা সমগ্র গ্রহ উপগ্রহের নিম্নতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। যন্ত্রটীর কতকগুলি অঙ্গ নাই।

(৭) ইহার পূর্ব্ব দিকে একটী দিগংশ যন্ত্র আছে।

মানমন্দিরের অনতিদূরে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত নেপালী-মন্দির অবস্থিত। ইহা নেপালের রাজবংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। অতঃপর মীরঘাট। ইহার সোপানাবলী অত্যন্ত অপ্রশস্ত। বলবন্ত সিংহের পূর্ব্বে মীর রুস্তম আলী নামে জনৈক শাসনকর্ত্তা দ্বারা এই ঘাট নির্ম্মিত হয়। ঘাটের নিকটস্থ একটী সৌধে নবাব বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর হইতে তাঁহার সম্পত্তিটী মনসারামকে প্রদত্ত হইয়াছে।

মীরঘাটের অনতিদূরে দিবোদাসেশ্বরের মন্দির বিরাজিত। ইহাতে যে মূর্ত্তি আছে তাহা মহাদেবের। কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা বিগ্রহটী গঠিত। মন্দিরের ভিতর অন্যান্য মূর্ত্তিও আছে, তন্মধ্যে বিশবাহুক একটি। এই মূর্ত্তিটীর কুড়িটী হাত। মন্দিরের পুরোভাগে একটী দীপ আছে। সায়ংকালে এই দীপটী প্রজ্বলিত করা হয়। কার্ত্তিক মাসে মীরঘাটে অনর্ক-চতুর্দ্দশীর মেলা হয়। এই দিনে বীর-চূড়ামণি হনুমানের জন্ম হইয়াছিল। পর দিবস বেলা তিনটার সময় হিন্দুগণ সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ জলে স্নান করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, এই স্নান দ্বারা পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা অনাময় থাকিবেন। সূর্য্য উদিত হইলে গরম পোষাক পরিধান করিয়া হিন্দুগণ হনুমানজীর মন্দিরে গমন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ চৌক।

চৌকমহল্লায় উপর্য্যুপরি অনেক ঘাট আছে। প্রথমটীর নাম ওমরাওগীর বোয়ালী। ওমরাওগীর নামে জনৈক গোঁসাই একটী কূপ খনন করেন, তজ্জন্য তাঁহার নামেই উল্লিখিত ঘাটের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। অতঃপর জলসইন।

এখানে মৃত ব্যক্তির শবদাহ হইয়া থাকে। স্থানটী মিউনিসিপালিটীর হস্তে আছে। হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করেন। ইহার পর মণিকর্ণিকার ঘাট। তীর্থপঞ্চকের মধ্যে ইহার স্থান তৃতীয়। তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে কেহই এই স্থানটী দেখিতে ভুলেন না। সহস্র সহস্র যাত্রী প্রতি বৎসর এখানে আগমন করেন। প্রবাদ এই যে, মণিকর্ণিকায় স্নান করিলে সারা জীবনের পাপ ক্ষণমাত্রেই বিদূরিত হয়। বলা আবশ্যক যে, পাপক্ষয় করিবার প্রলোভনে সকলেই এই স্থানে স্নান করেন। এতদ্ধেতু কূপোদকটী পুতিগন্ধ-বিশিষ্ট। কিন্তু তাহাতে কে ভ্রূক্ষেপ করে? যখন ভারতের সর্ব্বস্থানাপেক্ষা এই স্থানের স্নানে পাপক্ষয় ধ্রুব, তখন দুর্গন্ধে কি করিবে? মণিকর্ণিকা সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা এই কূপের সৃষ্টি করেন এবং স্বীয় ঘর্ম্ম দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। এই জন্য ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী। অনন্তর বিষ্ণু উত্তর দিকে যাইয়া যোগে রত থাকেন। ইতোমধ্যে মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কূপের মধ্যে কোটী সূর্য্যের প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আনন্দবিহ্বল মহাদেব বিষ্ণুকে বর মাগিবার জন্য আদেশ করিলে বিষ্ণু এই বর চাহিলেন যে, আপনাকে আমার সহিত বাস করিতে হইবে। তখন মহাদেব বলিলেন 'তথাস্তু'। এই বরদান করিবার সময় মহাদেব এত উৎফুল্ল হইলেন যে, তাঁহার শরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল, এবং অমনি তাঁহার কর্ণ হইতে কুণ্ডল খসিয়া কূপে পতিত হইল। তদবধি এই কূপ মণিকর্ণিকা নামে খ্যাত। ইহার অন্য নাম "মুক্তিক্ষেত্র" এবং "পূর্ণশুভকরণ"।

কাশীখণ্ডে মণিকর্ণিকা সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে তাহারই আমি উল্লেখ করিলাম। এখন লোকপ্রবাদ সম্বন্ধে লিখিতেছি। এক দিন হরপার্ব্বতী কূপের সন্নিকটে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ কূপে পার্ব্বতীর কর্ণাভরণ পতিত হইল। তদবধি মহাদেব স্থানটীকে মণিকর্ণিকা আখ্যা দিলেন। এখানে স্নান করিলে লোকে সম্পূর্ণরূপে তরিয়া যায়। কূপ এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহাঁর পূজা করিলে মৃত্যুকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে ইনি তারক ব্রহ্ম মন্ত্র বলিয়া দেন, তাহার প্রভাবে লোকে ভবযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পায়। তারকেশ্বর একটি বারি-পাত্র মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং নয়নের অগোচর। বর্ষায় নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া মন্দিরকে নিমজ্জিত করে বলিয়া মন্দিরটী অনেক হানি সহ্য করিতেছে।

মণিকর্ণিকার ঘাটের একটি সোপানো-পরি বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা "চরণ পাদুকা" নামে খ্যাত। প্রবাদ এই যে, বিষ্ণু এই স্থানে মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে অনেক

লোক এখানে সমাগত হইয়া পূজা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, তাহাতে তাহাদিগের মোক্ষ হইবে। ঘাটের উপরি ভাগে লোকপূজিত সিদ্ধ বিনায়ক বা গণেশ দেবের মন্দির। মূর্ত্তিটী লাল রংএ রঞ্জিত। ইহাঁর তিনটী নেত্র, হস্তীর ন্যায় শুঁড়, গলে রৌপ্যহার এবং ইন্দুর ইহাঁর বাহন। মন্দিরের দুই কোণে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি অবস্থিত, তন্মধ্যে একটীর নাম সিদ্ধি এবং অপরটীর নাম বুদ্ধি। মন্দিরের নিকট আমেঠীর রাজ-নির্ম্মিত আর একটি সুন্দর মন্দির আছে। মণিকর্ণিকার নীচে ভোনসলাঘাট। ঘাটটী বড়ই জমকাল। এখানে নাগপুরের রাজাদিগের সৌধরাজী বিরাজিত। অনন্তর গোয়ালিয়রের রায়জ বাই নির্ম্মিত হর্ম্মারাজী নিবেশিত অসম্পূর্ণ সিন্ধিয়া ঘাট নয়নপথে পতিত হয়। রায়জ বাইয়ের মানস এই ছিল যে, এই স্থানটীকে সমগ্র বারাণসী ধামাপেক্ষা মনোহর করিয়া প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভিত্তি সুদৃঢ় না হওয়াতে মন্দিরের উচ্চ চূড়াগুলি বসিয়া গিয়াছে। এখন ইহা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত—চূড়া এবং সোপানাবলী আমূলতঃ ফাটিয়া গিয়াছে। প্রবাদ এই যে, যখন মন্দির নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন নদীতীর হইতে একটী ধারা আসিয়া কারিকরগণের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। উক্ত ধারা কোথা হইতে আসিতেছে জানিবার জন্য একটী গর্ত্ত খোদিত হয়। সেই গর্ত্তে একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির সন্দর্শন পাওয়া যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তিটী রাম কর্ত্তৃক সীতার উদ্ধার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে বারাণসীধামে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এবং উহা এখন বিজাতীয়গণের হস্তগত হইয়াছে, তখন তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই মহল্লার অন্যান্য ঘাটের নাম সঙ্কটাঘাট, কৌশল্যা ঘাট, গণপতি অথবা রঙ্গেশ্বর ঘাট। সঙ্কটাঘাটে সঙ্কটা দেবীর মন্দির আছে। ইহাতে একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে এবং ইহার মধ্যে অনেক মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সঙ্কটাঘাটের সোপানোপরি মহাবীরজীর একটী বড় প্রতিমূর্ত্তি আছে। মহাবীর মহাদেবের অবতার এবং রামচন্দ্রের এক জন সেনানায়ক।

(ক্রমশঃ)

শিখগ্রন্থাবলী—সুখমণি সাহিব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৭ শ্লোক।

অগম অগাধ পারব্রহ্ম সোয়।
যো যো কহৈ সো মুকতা হোয়
শুন মিতা নানক বিনবন্তা।

সাধ জানাকি অচরজ কথা ॥
সেই পরব্রহ্ম অগম্য ও অপার।
যে তাঁহার নাম করে সেই মুক্ত হয়।
নানক বিনয়ের সহিত বলিতেছেন, হে মিত্র.
সাধু জনের আশ্চর্য্য চরিত্র শ্রবণ কর ॥

অষ্টপদী।

সাধ কৈ সংগি মুখ উজল হোত।
সাধ সংগি মল সগলী ধোত।
সাধ কৈ সংগি মিটৈ অভিমান।
সাধ কৈ সংগি প্রগটৈ সুজ্ঞান।
সাধ কৈ সংগি বুঝৈ প্রভু নেরা।
সাধ সংগি সভ হোত নিবেরা।
সাধ কৈ সংগি পায় নাম রতন।
সাধ কৈ সংগি এক উপর যতন।
সাধ কী মহিমা বরনৈ কউন প্রাণী।
নানক সাধ কী শোভা প্রভ মাহী সমানী॥১
সাধুসঙ্গে মুখ উজ্জ্বল হয়।
সাধুসঙ্গে সকল মালিন্য ধৌত হয়ে যায়।
সাধুসঙ্গে মনের অভিমান দূর হয়।
সাধুসঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয়।
সাধুসঙ্গে প্রভুকে নিকটে মনে হয়।
সাধুসঙ্গে সকল নিষ্পত্তি হইয়া যায়।
সাধুসঙ্গে নামরত্ন লাভ হয়।
সাধুসঙ্গে সেই একের উপর যত্ন হয়।
সাধুর মহিমা কোন জীব বর্ণনা করিতে পারে না।
নানক বলিতেছেন, সাধুর শোভা সেই ভগবানের শোভার সহিত মিলিত ॥১॥
সাধ কৈ সংগি অগোচর মিলৈ।
সাধ কৈ সংগি সদা পরফুলৈ।
সাধ কৈ সংগি আবহি বসি পংচা।
সাধ সংগি অমৃত রস ভুংচা।
সাধ সংগি হোয় সভকী রেণ।
সাধ কৈ সংগি মনোহরি বৈন।
সাধ কৈ সংগি ন কতহু ধাবৈ।
সাধ সংগি অসথিত মন পাবৈ।
সাধ কৈ সংগি মায়া তে ভিংন।
সাধ সংগি নানক প্রভ সুপ্রসংন ॥২॥
সাধুসঙ্গে অগোচরকে পাওয়া যায়।
সাধুসঙ্গে মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।
সাধুসঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় বশে আসে।
সাধুসঙ্গে অমৃত রস ভোগ হয়।
সাধুসঙ্গে মানুষ সকলের রেণু অর্থাৎ বিনয়ী হয়।
সাধুসঙ্গে বাক্য সুমধুর হয়।
সাধুসঙ্গে মন এদিক ওদিক ধাবমান হয় না।
সাধুসঙ্গে মন স্থির হয়।
সাধুসঙ্গে মায়া কাটিয়া যায়।
নানক বলিতেছেন সাধুসঙ্গ করিলে প্রভু প্রসন্ন হন ॥২॥
সাধু সংগি দুসমন সভ মিত।
সাধুকে সংগি মহা পুণীত।
সাধ সংগি কিস সিউ নহী বৈর।
সাধ কৈ সংগি ন বীগা পৈর।
সাধ কৈ সংগি নাহি কো মংদা।
সাধ সংগি জানৈ পরমানন্দা।
সাধ কৈ সংগি নাহী হউ তাপ।
সাধ কৈ সংগি তজৈ সভ আপ।
আপে জানৈ সাধ বড়াই।
নানক সাধ প্রভু বণিয়াই ॥৩॥

সাধুসঙ্গের গুণে শত্রু মিত্র হয়।
সাধুসঙ্গে মানুষ পবিত্র হয়।
সাধুসঙ্গের গুণে কাহারও সহিত বৈরিতা থাকে না।
সাধুসঙ্গের গুণে পদস্খলন হয় না।
সাধুসঙ্গে কোন অভাব থাকে না।
সাধুসঙ্গে মানুষ সেই পরমানন্দ পুরুষকে জানিতে পারে।
সাধুসঙ্গের গুণে অহঙ্কারের তাপ থাকে না।
সাধুসঙ্গে অহমিকা চলিয়া যায়।
হরি আপনিই সাধুর মহত্ব জানেন।
নানক বলিতেছেন, সাধুতে এবং প্রভুতে এক যোগ ॥৩॥

সাধ কৈ সংগি ন কবহুঁ ধাবে।
সাধ কৈ সংগি সদা সুখ পাবে।
সাধ সংগি বস্তু অগোচর যোহৈ।
সাধ কৈ সংগি অজরু সহৈ।
সাধ কৈ সংগি বসৈ থান উচৈ।
সাধ কৈ সংগি মহলি পহুঁচৈ।
সাধ কৈ সংগি দৃঢ়ৈ সভ ধর্ম্ম।
সাধ কৈ সংগি কেবল পারব্রহ্ম।
সাধ কৈ সংগি পায়ে নাম নিধান।
নানক সাধু কৈ কুর্বান ॥৪

সাধুসঙ্গে কখনও স্থানভ্রষ্ট হইতে হয় না।
সাধুসঙ্গে সদাই সুখ।
সাধুসঙ্গে অগোচর বস্তু পাওয়া যায়।
সাধুসঙ্গে রিপুর বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হয়।
সাধুসঙ্গে মানুষ উচ্চ স্থান লাভ করে।
সাধুসঙ্গে ভগবানের গৃহে যাইতে পারে।
সাধুসঙ্গে ধর্ম্ম দৃঢ় হয়।
সাধুসঙ্গে সকল বস্তুতে পরব্রহ্মের সত্তা অনুভব হয়।
সাধু সঙ্গে মানুষ নাম ধন প্রাপ্ত হয়।
নানক সর্ব্বদা সাধুকে বলিহারি যান ॥৪

সাধ কৈ সংগি সভ কুল উদ্ধারৈ।
সাধ সংগি সাজন মীত কুটুংব নিস্তারৈ।
সাধু কৈ সংগি সো ধন পাবৈ।
যিসুধনতে সভকো বরসাবৈ।
সাধ সংগি ধর্ম্মরাই করে সেবা।
সাধ কৈ সংগি শোভা সুরদেবা।
সাধু কৈ সংগি পাপ পলাইন।
সাধ সংগি অমৃত গুণ গাইন।
সাধ কৈ সংগি সর্ব্ব থান গম্মি।
নানক সাধকৈ সংগি সফল জনমি ॥৫

সাধুসঙ্গলাভে সমস্ত কুল উদ্ধার হয়।
সাধুসঙ্গ যে করে তার স্বজন, মিত্র, কুটুম্ব, সকলে মুক্ত হয়।
সাধুসঙ্গে সেই পরম ধন পাওয়া যায়,
যে ধন লইয়া সাধক সকলের উপর বর্ষণ করেন।
সাধুসঙ্গ হইলে ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ যম সেবা করে।
সাধুসঙ্গে সুর ও দেবতার শোভা লাভ হয়।
সাধুসঙ্গে পাপ পলায়ন করে।
সাধুসঙ্গে অমৃতের গুণ গান করে।
সাধুসঙ্গে সকল স্থানে যাওয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, সাধুসঙ্গলাভে জন্ম সফল হয় ॥৫

সাধ কৈ সংগি নহি কছু ঘাল।

দর্শন ভেট হোত নিহাল।
সাধ কৈ সংগি কলুষত হরৈ।
সাধ কৈ সংগি নরক পর হরৈ।
সাধ কৈ সংগি ইহা উহা সুহেলা।
সাধ সংগি বিছুরত হরি মেলা।
যো ইচ্ছে সোই ফল পাবৈ।
সাধ কৈ সংগি না বিরথা যাবৈ।
পার ব্রহ্ম সাধ রিদ বসৈ।
নানক উধরৈ সাধ শুন রসৈ॥ ৬
সাধুসঙ্গে কোন বিপদ নাই।
সাধু দর্শন ও সঙ্গ লাভে মনুষ পবিত্র হয়।
সাধুসঙ্গে পাপ দূর হয়।
সাধুসঙ্গ লাভ হইলে নরকে যাইতে হয় না।
সাধুসঙ্গে ইহলোক ও পরলোক সুখকর হয়
সাধুসঙ্গ ঘটিলে মানুষ হরিকে হারাইলেও আবার পায়।
সাধুসঙ্গের গুণে মানুষ যা ইচ্ছা করে সেই ফলই পায়।
সাধুসঙ্গ কখনও বৃথা যায় না।
পরব্রহ্ম সাধুর হৃদয়ে বাস করেন।
নানক বলিতেছেন, সাধুসঙ্গে জীবন সার্থক হয়॥ ৬
সাধ কৈ সংগি শুনউ হরি নাউ।
সাধ সংগি হরি কৈ গুণ গাউ।
সাধ কৈ সংগি ন মনতে বিসরৈ।
সাধ সংগি সরপর নিসতরৈ।
সাধ কৈ সংগি লগৈ প্রভু মীঠা।
সাধু কৈ সংগি ঘট ঘট ডীঠা।
সাধ সংগি ভএ আজ্ঞাকারী।
সাধ সংগি গতি ভাই হমারী।
সাধ কৈ সংগি মিটৈ সভরোগ।
নানক সাধ ভেটে সংযোগ॥ ৭
সাধুসঙ্গে হরিনাম শ্রবণ কর।
সাধুসঙ্গে হরিগুণ গান কর।
সাধুসঙ্গে মন হইতে প্রভুর বিস্মরণ হয় না।
সাধুসঙ্গে অবশেষে তুমি উদ্ধার হও।
সাধুসঙ্গে প্রভুকে মিষ্ট লাগে।
সাধুসঙ্গে সর্ব্বঘটে প্রভুর দর্শন হয়।
সাধুসঙ্গে প্রভুর আজ্ঞাকারী হয়।
সাধুসঙ্গে আমাদের সুগতি হয়।
সাধুসঙ্গে সকল রোগ দূর হয়।
নানক বলিতেছেন, সাধুর দর্শন সংযোগে হয়॥ ৭
সাধকি মহিমা বেদন জানহি।
যেতা শুনহি তেতা বখিয়ানহি।
সাধকি উপমা তিহু গুণতে দূরি।
সাধকি উপমা রহি ভরপুর।
সাধকি শোভা কা নাহি অন্ত।
সাধকি শোভা সদা বে অন্ত।
সাধকি শোভা উচতে উচী।
সাধকি শোভা মূচতে মূচী।
সাধকি শোভা সাধ বনিয়াই।
নানক সাধ প্রভ ভেদ ন ভাই॥ ৮
সাধুর মহিমা বেদ জানে না।
যতটুকু শুনিয়াছে, ততটুকু ব্যাখ্যা করে।
সাধুর স্বভাব ত্রিগুণের অতীত।
সাধুর মহিমা সর্ব্বদাই পূর্ণ।
সাধুর শোভার অন্ত নাই।
সাধুর শোভা অনন্ত।

সাধুর শোভা উচ্চ হইতেও উচ্চ।
সাধুর শোভা বৃহৎ হইতেও বৃহৎ।
সাধুর শোভা সাধুতেই সাজে।
নানক বলিতেছেন, হে ভ্রাতঃ, সাধুতে ও প্রভুতে ভেদ নাই॥ ৮

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

(ক্রমশঃ)

ভুত না মানুষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

একি চণ্ডদেবের চাতুরী, না শত্রুর সতর্কতা।

বিগত রজনীর ক্ষীণালোকের শেষ-রশ্মিটুকু দেখিতে দেখিতে, নন্দক চণ্ডদেবের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সজাগ প্রহরী সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। নন্দক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই বহির্ভ্রমণে উদ্যত বেশভূষায় সজ্জিত একজন মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নন্দকের চণ্ডদেবের নিকটেই কাজ ছিল, সর্ব্বাগ্রে তিনি চণ্ডদেবের নিকটেই গমন করিতেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একটি অদ্ভুত রকমের পুরুষমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকটেই গমন করিলেন। দর্শনমাত্রই তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। এ ব্যক্তি আর কেহই নহে, তাঁহার গর্ভধারিণী মাতা। ইনি পুরুষ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহির্গমনে উদ্যতা হইয়াছিলেন। নন্দককে দর্শনমাত্রই 'চন্দনী কোথায়, চন্দনী কোথায়' বলিয়া তিনি অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নন্দক বিস্ময় সহকারে কহিলেন, 'সেকি! আমি ত অগ্রজাকে গৃহেই দেখিয়া গিয়াছি। ইহার মধ্যে তিনি কোথায় গেলেন?'

"যায়নি, নিজে কোথাও যায়নি, কে জানি না তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—বোধ হয় চণ্ডদেবই হইবে।"—বলিয়া চন্দনীর মাতা নন্দকের হস্তধারণপূর্ব্বক অন্তঃপুরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা চন্দনীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রজনীর অন্ধকারমুক্ত প্রভাত বালারুণদ্বারা বিভূষিত হন নাই। নন্দক দেখিলেন চন্দনীর শয্যার পার্শ্বে বহুলোকের পদচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। চন্দনী নিশাকালে লেখা পড়া করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার শয্যোপরি কলম, কাগজ ও কালি থাকিত এবং ক্ষুদ্র একটি মৃণ্ময় দীপাধারে প্রদীপ রক্ষিত হইত। কার্য্যান্তে তিনি সেগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া শয়ন করিতেন। কিন্তু অদ্য তাহা লণ্ডভণ্ড হইয়া পতিত

রহিয়াছে। দীপাধার ভগ্ন হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ী যাইতেছে। নন্দক সে সব বিশেষরূপে দেখিলেন। তৎপরে জননীকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া চণ্ডদেবের শয়নকক্ষে গমন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চণ্ডদেবও গৃহে নাই এবং সে গৃহেও বহু লোকের গমনাগমনের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি জননীর নিকটে সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। জননী কহিলেন, "সে কি! চণ্ডদেবকে আবার কে বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছে? সেইত কত জনকে বান্ধিয়া লইয়া যায়। চন্দনীকে একবার হত্যা করিতে পারে নাই, এই বারই হত্যা করিবে। আমি চন্দনীকে উদ্ধার করিতে যাই" এই বলিয়া তিনি গমনোদ্যোতা হইলেন।

নন্দক কহিলেন, 'তিষ্ঠ জননি! আমি আসিতেছি।'

নন্দকের মাতা কহিলেন, নন্দক! তুমি তোমার অন্ধ বিশ্বাস লইয়া গৃহে থাক, আমি কন্যাকে উদ্ধার করিতে যাই, বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা।

নন্দক কহিলেন—তোমার কি বিশ্বাস যে, চণ্ডদেব চন্দনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে?

নন্দকের মাতা—হাঁ, চণ্ডদেবেরই এই কর্ম্ম।

নন্দক। তবে চণ্ডদেবকে কে লইয়া গিয়াছে তোমার বিশ্বাস?

মাতা। কেহই লইয়া যায় নাই। সে নিজেই লুক্কায়িত হইয়াছে।

নন্দক কহিলেন, 'এই কি তোমার বিশ্বাস?' নন্দকের মাতা দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন 'হাঁ।'

নন্দক—কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য প্রকার।

নন্দকের মাতা কহিলেন, 'কি প্রকার?'

নন্দক কহিলেন, "আমি সে সব কথা তোমার নিকট যথাযথ বর্ণনা না করিলেও কিছু কিছু বলিব।"

মাতা। বল।

নন্দক। আমি এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে জানিতে পারিতেছি যে, আমাদের বিপক্ষের লোক রাজপুতানায় আছে।

মাতা। ইতিপূর্ব্বে চণ্ডদেব নিজ মুখেই "রাজ" বলিয়া এ কথার কতকটা আভাস দিয়াছিল।

নন্দক। সে দিন চণ্ডদেবের মুখে 'রাজ' শুনিয়া, রাজপুতনা বলিয়াই তুমি স্থির করিয়াছিলে, কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস তিনি রাজপুতানা না বলিয়া ঈশ্বর রাজরাজেশ্বর বলিতে যাইতেছিলেন, কারণ চণ্ডদেব বিপৎকালে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং ঈশ্বরের নাম স্মরণ করেন।

আমি রাজপুতনায় চলিয়া গেলে আমার অগ্রজার বিষয়ে যদি কিছু ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তবে অগ্রে তাহাই আমার নিকট বর্ণনা কর।

মাতা। তুমি চলিয়া গেলে আমি চণ্ডদেবকে পরাজয় করিবার মানসে চন্দনীকে

সুমোহন বেশে সজ্জিত করিয়া প্রেম ভিক্ষা করিবার জন্য চণ্ডদেবের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম চন্দনী যদি চণ্ডদেবকে বশীভূত করিতে পারে, তবে চণ্ডদেবের মনের কথাগুলিও টানিয়া বাহির করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না, চন্দনী শত শত চেষ্টাতেও ধূর্ত্ত পাষণ্ডকে বশীভূত বা বিচলিত করিতে পারিল না। বরং তাহার মনের স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটিল।

নন্দক। সে কি রকম?

মাতা। চণ্ডদেবের উপরে যে তাহার একটা মন্দ বিশ্বাস ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সে অসাধু চণ্ডদেবের ভণ্ড জিতেন্দ্রিয়তায় বিশ্বাস করিয়া আপনার মনের পূর্ব্ব বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

মাতার কথা শুনিয়া নন্দক মৌনাবলম্বন করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। মাতা কহিলেন, 'কি চিন্তা করিতেছ?'

নন্দক। চন্দনী সাধু চণ্ডদেবকে অসাধু বলিয়া জানিতেন, ইহাতে অসাধু চণ্ডদেব অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনের ভাবান্তর হওয়ায় অর্থাৎ চণ্ডদেব সাধু, অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা এই কুকর্ম্ম সাধিত হইতেছে, এ কথা বিপক্ষ পক্ষের লোকদিগের পক্ষে বড় নিরাপদের কথা নহে। আমিও চণ্ডদেবকে সাধু বলিয়াই জানি। এখন ভ্রাতা, ভগ্নী মিলিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারিব এই আশঙ্কায় তাহারা আমার সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বেই চন্দনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, এই এখন আমার বিশ্বাস। আমার মনের আর একটি ধারণা আছে, তাহাও আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

'শুনিয়াছি চণ্ডদেব প্রথমে আমার ভগিনীর নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করে এবং তাহাকে নিরাশ করায় তিনি চণ্ডদেবকর্তৃক ধর্ম্মহীনা হন। এই ব্যাপারে বুঝিতে পারা যায় যে, চণ্ডদেব আমার ভগিনীর প্রণয়াসক্ত ছিল; কিন্তু আমার ভগিনী তাহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিতেন না, বরং ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। এই ঘটনা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ভগিনীর অনিষ্টকারী চণ্ডদেব এ চণ্ডদেব নহে। অন্য কোন ব্যক্তি এই চণ্ডদেবের অনিষ্ট করিবার জন্য চণ্ডদেব সাজিয়াছে এবং সে যাহাকে ভাল বাসে সেই চন্দনীই যে এখন সাধুপ্রকৃতি চণ্ডদেবের প্রণয়াসক্ত হইলেন, ইহা তাহার সহ্য হইল না। এই জন্যই সে চণ্ডদেবের গৃহ হইতে ভগিনীকে পৃথক্ স্থানে লইয়া গেল।

এখন দেখিতে হইতেছে যে, সাধু চণ্ডদেবকে অসাধু চণ্ডদেব কেন সরাইল। যাহারা জালিয়াতী ব্যাপারে অথবা বদমাইসি ও দস্যুতাতে লিপ্ত থাকে, তাহাদের এবং যাহারা তাহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করে তাহাদের প্রেরিত চর সন্দেহজনক সমস্ত স্থানেই লুক্কায়িত

থাকে, এরূপ না করিলে কাজের সুবিধা করিয়া উঠা যায় না। এই দেখ না, আমার গুপ্তচরও সন্দেহমূলক স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, অসাধু চণ্ডদেবের গুপ্তচরও আমাদের সংবাদ জানিবার জন্য স্থানে স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পুরমণ্ডলে এমন কি ভৃত্যবেশে আমাদের এই বাটীর মধ্যেও তাহারা বাস করিতেছে। আমরা সকলে যেমন চণ্ডদেবের বাড়ীতে পাহারা দিতেছি, তাহারাও তদ্রূপ আমাদিগকে পাহারা দিতেছে, আমরা কি করি কোথায় যাই তাহা জানিবার জন্য। আমি যে চণ্ডদেবের ঘরে থাকিয়া চণ্ডদেবের কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। চণ্ডদেবের নিকটে এমন একটি জিনিষ ছিল যে, তাহা প্রাপ্ত হইলে বিপক্ষদের তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে। এ কথা কিন্তু চণ্ডদেবও জ্ঞাত ছিল না। চণ্ডদেবের পিতা চণ্ডদেবের অজ্ঞাতে চণ্ডদেবের নিকট এই জিনিষটি রাখিয়া গিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল এবং আমাকে চণ্ডদেবের গৃহে অনুসন্ধান করিতে দেখিয়া, পাছে আমি সেই জিনিষটি প্রাপ্ত হই—এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। আমি যখন সেই জিনিষটি প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডদেবের নিকট লইয়া আসি, তখন আমাদের ভৃত্যবেশী অসাধু চণ্ডদেবের চর তাহা জানিতে পারে, এবং আমি যে সেই মুহূর্ত্তে পুরমণ্ডল ত্যাগ করিয়া রাজপুতানায় গমন করিতেছিলাম, তাহাও তাহারা জানিতে পারে। রাজপুতানার উপরে ইতঃপূর্ব্বে আমার কোনও সন্দেহ হয় নাই। তজ্জন্যই আমি রাজপুতানায় যাই নাই এবং তথায় কোন গুপ্তচরও প্রেরণ করি নাই। উক্ত জিনিষটি লইয়া রাজপুতানায় যাইতেছি দেখিয়া বিপক্ষেরা বেশ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের ধৃত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

অসাধু চণ্ডদেব সাধু চণ্ডদেব সাজিয়া রাজপুতানার মধ্যে চণ্ডদেবের ভদ্রাসন বাটীতে বেশ একটা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। সকলেই মনে করিতেছে সেই চণ্ডদেবই এই। কিন্তু চণ্ডদেব যে কোথায় তাহা রাজপুতানাবাসীরা জানে না। অসাধু চণ্ডদেবের লোকজনেরা চণ্ডদেব পুরমণ্ডলে আছে, এই কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেছে। চণ্ডদেবের রাজপুতানার বাড়ীতে অনেক লোক। তাহারা সকলেই বলে তাহারা চণ্ডদেবের লোক। অসাধু চণ্ডদেব চৈতন্যদেব নামক এক ব্যক্তির দ্বারা সাধু চণ্ডদেবের গৃহ মেরামত করাইয়া লইয়াছে এবং নিজে লুক্কায়িত থাকিয়া আপন অনুচরবর্গের দ্বারা চৈতন্যদেবকে জানাইয়াছিল যে, চণ্ডদেব পুরমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার টাকা চুকাইয়া দিবেন। সাধু চণ্ডদেব কিন্তু ইহার ঘুণাক্ষরও অবগত ছিলেন না এবং তিনি রাজপুতানায় গিয়া চৈতন্যদেবের টাকা চুকাইয়া দিবার জন্য মোটেই প্রস্তুত

ছিলেন না। আমি রাজপুতানায় গিয়া এই কথা শুনিলাম যে, চৈতন্যদেব পুরমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক সাধু চণ্ডদেবকে তাহার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিতে বলেন, কিন্তু সাধু চণ্ডদেব বাড়ী মেরামত করেন নাই, বলিয়া টাকা দিতে অস্বীকার করেন। তৎপর চৈতন্যদেব আদালতের ভয় দেখাইলে তিনি এই টাকা দিতে বাধ্য হন।

এ কথা আমি পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারি নাই। কি জানি কি ভাবিয়া চণ্ডদেব এ কথা আমাকে জানান নাই। আমি জানিতে পারিলে অনেক দিন পূর্ব্বেই এই উপস্থিত কার্য্যের একটা না একটা কূল কিনারা করিতে পারিতাম। সে যাহা হউক, আমাকে রাজপুতানায় যাইতে দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, চৈতন্যদেব যে চণ্ডদেবের নিকট হইতে টাকা লইয়া গিয়াছেন, এ কথা আমার নিকট অপ্রকাশ থাকিবে না এবং এই কথার সত্যসত্য নির্দ্ধারণের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব আমি পুরমণ্ডলে চণ্ডদেবের নিকট ফিরিয়া আসিব।

স্বয়ং চণ্ডদেবকে রাজপুতানায় না লইয়া গেলে আমি একা কখনও রাজপুতানার কোন কার্য্যই নিষ্পত্তি করিয়া উঠিতে পারিব না, কারণ সাধু চণ্ডদেবের অনুপস্থিতিতে অসাধু চণ্ডদেবের অনুচরবর্গই 'আমরা চণ্ডদেবের চর' বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। চণ্ডদেবকে দেখিতে না পাইয়া রাজপুতানাবাসীরাও ঐ কথা প্রত্যয় করিতেছে। এই স্থলে যদি সাধু চণ্ডদেবকে লইয়া রাজপুতানায় উপস্থিত হইতে পারি, তবে অসাধু চণ্ডদেবের অনুচরবর্গের বলবিক্রম সমস্তই ভাসিয়া যাইবে। চণ্ডদেব আপনার গৃহে যাইয়া যখন অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে বিতাড়িত করিবেন, তখন অসাধু চণ্ডদেব আর এরূপে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না। পুরমণ্ডলে চণ্ডদেবের গৃহে আমার যেমন প্রভুত্ব রাজপুতনায় চণ্ডদেব ব্যতিরেকে অসাধু চণ্ডদেবের অনুচরবর্গপূর্ণ চণ্ডদেবের গৃহে আমার সেইরূপ প্রভুত্ব আছে কি? সে বাড়ীতে কি তাহারা আমাকে ঢুকিতে দিবে? বা কোন স্থানে অনুসন্ধান করিতে দিবে? আমি জোর করিয়া প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহারাও আমাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু চণ্ডদেবকে লইয়া যদি সেইখানে উপস্থিত হইতে পারি, তবে তাহাদের প্রভুত্ব কোথায় থাকিবে? চণ্ডদেবের গৃহে আমারই প্রভুত্ব অধিক হইবে। হয়ত সেই গৃহের কোন না কোনও স্থানে আমাদের বাঞ্ছিত নিধিগুলি কারারুদ্ধা রহিয়াছেন, আমি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিব। অতএব আমি যে অতি শীঘ্রই পুরমণ্ডলে চণ্ডদেবের নিকটে ফিরিয়া আসিব, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল এবং যাহাতে আমার চণ্ডদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহাও করিল—চণ্ডদেবকে লুকায়িত করিল। এখন যদি চিরকালের

মত চণ্ডদেবকে না পাই, তবে চিরকালের মত অসাধু চণ্ডদেব প্রকৃত চণ্ডদেব হইয়া রাজপুতানায় ও পুরমণ্ডলে প্রভুত্ব করিবে। চিরকালের মত প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীও অন্তর্হিতা রহিবেন। কারণ আমার বিশ্বাস, রাজপুতানার সেই বাড়ীর মধ্যেই তাহারা রহিয়াছেন—এমন গুপ্ত স্থানে রহিয়াছেন যে, সেই বাড়ীতে কিছুকাল বসবাস না করিলে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য। চণ্ডদেব ব্যতীত ঐ গৃহে আমি কোন দিনই একা বাস করিতে পারিব না। তবে ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন-ভাবে সেখানে গিয়া বাস করিতে পারি। কিন্তু সে সময়সাপেক্ষ এবং বিপজ্জনক। অতএব এই সময় চণ্ডদেবকে পাওয়া আমার নিতান্ত আবশ্যক। তাহাদেরও নিতান্ত প্রয়োজন যে, চণ্ডদেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হয় এবং তজ্জন্যই নির্দ্দোষ চণ্ডদেবের এই দশা। এক্ষণে চণ্ডদেবকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমার প্রধান কাজ।' এই কথা বলিয়া নন্দক নীরব হইলেন।

নন্দককে নীরব হইতে দেখিয়া নন্দকের মাতা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, 'ওরে ভীরু কাপুরুষ নন্দক! তুই চণ্ডদেবের তোষামদ করিয়াই জীবন কাটাইবি দেখিতেছি। তোর মত নির্ব্বোধ ভীরু লোক আমি পৃথিবীতে কুত্রাপি দর্শন করি নাই। তুই স্তব কর, লোকে যেমন ঈশ্বরকে স্তব করে সেইরূপ তুই চণ্ডদেবকে স্তব কর,—এই বলিয়া তিনি একটু দূরে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া ভঙ্গি-সহকারে বলিতে লাগিলেন,"এইরূপে স্তব কর্ 'হে চণ্ডদেব তুমিই ধাতা, তুমিই বিধাতা, তুমিই নির্গুণ, তুমিই সগুণ, গুণময় ও গুণাতীত ইত্যাদি।'

নন্দক জননীর ভাবভঙ্গি দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এত কথার দ্বারাও যে তিনি মাতার মন বিচলিত করিতে পারি-লেন না, ইহাতে মাতার উপর তাঁহার একটু অভিমানের ভাবও আসিল। তিনি কহিলেন, 'মা চুপ কর, অত জোরে কথা কহিও না, বুঝিতে পারিতেছি না, বিপক্ষের কোন লোক আমাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেছে কি না।'

মাতা। তুই চণ্ডদেবকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিস্, কিন্তু আমি সেজন্য একটুকুও ব্যাকুল হই নাই।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

সাহানা—শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা। সাহানায় একটী ক্ষুদ্র বালিকার আট বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়সের সকল রচনা (পদ্য এবং গদ্য) প্রকাশিত হইয়াছে। বালিকার লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি প্রায় সমস্তই মধুর হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়সে বালিকা যে একজন সুকবি হইতে পারিবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

বামারচনা।

হিমানীর বিদায়-প্রার্থনা।

বসুধা গো স্নেহময়ি! বহুদিন প্রায়
কুয়াসা, হিমানী মোরা এসেছি হেথায়,
কি এক ঘুমের ঘোরে,
রেখেছে বিভোর করে,
সহসা জাগিয়া দেখি প্রকৃতি-বালায়
ধীরে ধীরে সুসজ্জিতা মণিমুকুতায়।
মধুর সমীরভরে
কোকিল কুজন করে,
বাহিরে বসন্ত বুঝি আসিছে ত্বরায়,
দেগো মা বসুধে! এবে মোদের বিদায়।
সহসা কিসের তরে
পরাণ কেমন করে,
আজ বুঝি খুলে ওই স্বরগদুয়ার
ডাকিছেন সকাতরে দেবতা আমার।
হেথায় থাকিতে, ধরা!
পারি নাগো আর মোরা,
আসিয়াছে নববধূ কুয়াসা সুন্দরী
অবনতা লজ্জাশীলা দিবাবিভাবরী।
সেও ত মা পরাধীনা,
অবলা কাঙ্গাল দীনা,
ছাড়িয়া অমরপুর এ মর ধরায়
আসিয়াছে বহুদিন হল গত প্রায়।
হেথাও মোদের তরে,
প্রকৃতি বিষাদ করে,
ফুলেরা ফুটেনা যেন মেলিয়া নয়ন,
তাদের মরমতলে কি যেন বেদন।
যতনে ভরিয়া ডালা,
বিটপী গাঁথে না মালা,
বহে না কো মৃদু মন্দ মলয় পবন
মক্ষিকা করে না সুখে মধু আহরণ।
আজিও রয়েছে ভবে,
মোদের কুহকে সবে,
জাগিয়া উঠিবে পুনঃ বসন্তের বায়,
আমি না থাকিলে মাগো কিবা আসে যায়।
সম্মুখে বসন্ত আসি,

ঢালিবে অমৃতরাশি,
ফুটিবে কুসুমচয় সোণার লতায়,
সবারি পরাণে ব'বে ত্রিদিবের বায়।
তুমিও মা বসুন্ধরা,
থাকিবে অমিয়াভরা,
দুঃখিনী হিমানী আমি বিষাদপ্রতিমা
জানাব এ অশ্রুনীরে তোমার মহিমা।
স্নেহময়ী তুমি হায়,
আপনার স্নেহছায়
রাখিয়াছ সযতনে তুমি গো জননী,
আবার তোমারি বুকে ফিরিবে হিমানী।
আমাদের সুরপুর,
হেথা হতে বহুদূর,
চল যাই কুয়াসা গো স্বরগের বালা,
জুড়াক বসন্ত আসি তাপিতের জ্বালা।
মোরা চলে যাই ঘরে,
পুনঃ সে আসিব ফিরে,
নমো নমো বসুমতি! পড়ি তব পায়,
বৎসরের তরে মাগো হইনু বিদায়।

শ্রীমনোরমা রায়।

শশী ও তারা।

জোছনায় ভেসে গেছে নিখিল আকাশ
নিবিয়া গিয়াছে সব তারকার হাসি,
একাকী একটি তারা আর শশধর
পরকাশি যে যাহার মুক্ত রূপরাশি
চেয়ে আছে পরস্পর কত ভালবাসি।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

ছায়া-তরু।

দেখিলাম ভাল ক'রে সংসার খুঁজিয়া,
নাইরে এমন কেহ,
মধুর শীতল স্নেহ
বিতরি, জুড়ায় বুক, বেদনা বুঝিয়া।
সংসার আতপে জ্বলে,
আসি ছায়া-তরু-তলে
বসিলেই, জুড়াইত, শরীর অন্তর,
থাকুক সংসার-তাপ হাজার প্রখর।

২

সেই ছায়া-তরু হ'তে, নির্ম্মম সংসার
সরাইল অবিচারে,
বুঝিয়া দেখিল নারে,
ফুরাইল জীবনের বাসনা এবার।
বেদনা বিষম কত,
যদি দেখাবার হ'ত,
নিদয় জগতে আজি হৃদয় খুলিয়া—
দেখাতাম, বুঝিবে না, কি ফল বলিয়া?

৩

জুড়াবে কি প্রাণ পুনঃ চরণ-ছায়ায়?
ভ্রমি রৌদ্রে, হিমে শীতে,
অতি বৃষ্টি-জলে তিতে,

করিব রে মুষ্টি-ভিক্ষা, দর্শন-আশায়।
চাহি না যক্ষের ধন,
চাহি না নন্দন-বন,
চাহি না গো চন্দ্রলোকে,করিবারে বাস।
শুধু এক দিন দেখা, পূরিবে না আশ ?

৪

অবনী অমরাবতী যে সঙ্গে থাকিয়া,
স্বপন ব্যতীত তাঁরে,
আর কি দেখিব নারে,
খালি কি সে মূর্ত্তি, মনে রাখিব
আঁকিয়া ?
যাঁর সহবাসে থাকি,
যাতনা আড়ালে রাখি,
সে শান্তিদায়িনী মূর্ত্তি, দেখিব না আর,
ঔষধ লাগে না রোগে দরশনে যাঁর ?

৫

কি যে সেই শুভযোগ, প্রাণস্নিগ্ধকর,
মধুর দর্শনসুখ,
পবিত্রতা-মাখা মুখ,
অপূর্ব্ব সে দেবীমূর্ত্তি, কত যে সুন্দর।
সমস্ত সংসার দিলে,
তার না সমান মিলে,
মধুর পরশ-সুখ, উপমা যে নাই।
পারিজাত পরশন—কি তুলনা চাই!!

৬

হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, কোথারে আমার,
থাকিলে যাঁহার কাছে,
জগৎ-অস্তিত্ব আছে—
ভুলে যাই (ভুলে যাই) আপনারে
দরশনে যাঁর।
না জানি কি রস পিয়ে,
হৃদয়ের আঁখি দিয়ে
দেখেছি তাহাকে যেগো, কি কহিব আর,
প্রাণের ঘুমন্ত ঘোর কি নেশা যে তার॥

৭

কুবেরের ধনরাশি, ত্রিদিব-আলয়,
বারেক দর্শনে যে রে,
বিনিময় করিতে রে,
চাহেনা, চাহেনা কভু লভিতে হৃদয়।
সংসার পরাণ ঢালি,
যদি ভাল বাসে খালি,
তথাপি গো সে প্রেমের বিন্দু পরিমাণ—
পারেনা জগৎ কভু করিতে প্রদান॥

৮

বেঁধেছে হৃদয় যেই করুণা বিতরি,
যাঁহার চরণ-ছায়,
জীবন জুড়ায়ে যায়,
ভুলি গো সকল জ্বালা, আপনা পাসরি ;
দুঃখ ঘৃণা অভিমান,
ভুলিয়ে এ ছার প্রাণ,
ভুলি গো মরণ—সাধ, দর্শন-আশায়,
ভুলি এ অনল রাশি, ভাবিয়া তাহায়॥

শ্রীহরিমতি দেবী
যাজপুর

আমি।

যত সুর যত রঙ্গে বাজে যেই স্থানে,
সকল ঝঙ্কার যেগো আমার পরাণে।
আমি যেন বার্থ আণে সভামধ্যে আছি,
সবি যেন সুগোপনে মোর কাছাকাছি।
অব্যক্ত আমার ভাষা সবামধ্যে পাই,—
আমাতে সকলি আছে খুঁজিলে হারাই।
আমাতে সকলি আছে আমি ও সকলে,
এও যে রহস্য বড় বুঝায় কৌশলে।

প্রবোধ।

ওরে অভিমানি মন! কেন তোর এত অভিমান?
সংসারে থাকিয়া লোকে সহিতেছে কত অপমান।
কভু সম্মিলন সহে, কখনো বিরহে দহে,
কভু সুখ, কভু দুঃখ, বিধাতার এ চির বিধান,
কেন তোর অকারণে বল্ তবে অভিমান?
হা অবোধ! যে নিয়ম প্রচলিত পৃথিবীতে,
তুই কি নূতন এলি নূতন জগৎ হতে?
অলঙ্ঘ্য নিয়ম-বলে, যে জগৎ নিত্য চলে,
তুই কি তাহার গতি পারিবিরে ফিরাইতে?
হা অবোধ! চিরই যে এনিয়ম পৃথিবীতে।
কেন মিছে অভিমানে হোস্ তুই জ্ঞানহারা?
কেন মিছা অভিমানে ঢালিস নয়নধারা?
তোর ও নয়নজল, কার কি করিবে বল্?
গলাতে নারিবে কারো হৃদয় পাষাণ-পারা,
তবে কেন অভিমানে হোস্ তুই জ্ঞানহারা?
মুছে ফেল অভিমান, মুছে ফেল ওরে মন!
ভুলে যা আপন ব্যথা পরদুঃখে দে'রে মন।
সংসারেতে কত লোকে, কাঁদিছে রে দুঃখে শোকে,
ঘুচাতে তাদের ব্যথা কর তুই প্রাণপণ,
মন হতে অভিমান মুছে ফেল ওরে মন।
ক্ষুদ্র অভাবেতে তুই ভুলে যাস দেবতার
কত দয়া তোর পরে, ভাবিসনে একবার,
চেয়ে দেখ্ চারি ধারে দেশ ভাসে হাহাকারে
নিজ দুঃখ ভুলি মুছা তাদের নয়নধার,
বুঝিবিরে তোর পরে কত দয়া দেবতার।

শ্রীমতী অনুপমা।

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 619. March, 1915.

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। "

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৯ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩২১। মার্চ্চ, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪—শান্তম্।

১। এত বেগে পৃথিবী ঘোরে যে, আমরা তাহার বুকের উপর থেকেও তাহার বাষ্পও জানি না। অনন্ত কোটী জীবের আহারদানে তিনি অনিমেষ ব্যস্ত, কিন্তু কুত্রাপি তাহার বিন্দু-বিসর্গও দেখা যায় না।

২। তাঁহারই শক্তি অলক্ষিত ভাবে আমাদের মধ্যে থাকিয়া জগৎ-পালনের কার্য্য করে, আমরা মনে করি সে আমরাই করি। এত আত্মগোপনকারী তিনি, এবং আত্মগৌরব-প্রচারে উন্মত্ত আমি।

৩। নিদারুণ গ্রীষ্ম হতে বাঁচিবার জন্য, মানুষ রাজপথে জল ছিটায়, ফোয়ারা করে, খসখসের টাটে জল দেয়। কিন্তু এই সকল বাহ্য আয়োজনেও আশানুরূপ ফল হয় না। অন্য দিকে এই ক্লেশ দূর করিবার জন্য সেই আত্মগোপনকারীর কৌশল কেমন অদ্ভুত। অদৃশ্যভাবে বাষ্পকণা সংগ্রহ করিয়া, তিনি মেঘের সঞ্চার করেন, এবং যখন অজস্রধারে বারিবর্ষণ হয়, তখন পৃথিবীর সর্ব্বতাপ দূর হয়, এবং স্নিগ্ধ বায়ুতে আকাশ পর্য্যন্ত সুশীতল হয়। নিগূঢ় ভাবের এমন কৌশল।

৫—শিবম্।

১। উত্তাপে যখন পৃথিবীর বুক ফেটে যায়, বৃক্ষ লতা মর মর হয়, তখন কাল মেঘে আকাশের মুখ অত্যন্ত রাগপূর্ণ দেখায়। ভয়ঙ্কর বজ্রনাদে প্রাণ চমকিয়া উঠে,

তাহা দেখে তোমার কোপভাব মনে হয়। আবার বজ্রপাতে কত সময়ে গাছ পালা ভেঙ্গে যায়, পুড়ে যায়, কিন্তু ক্ষণপরেই অবিরাম জলধারায় সে সব তাপ দূর হয়, সবই সরস হয়। তাই বলি—"তোমার রাগে রাঙ্গা চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেম সাগর।"

২। প্রসবের অসহ্য যন্ত্রণা সন্তানের চাঁদমুখের নকীব। ইহাও মঙ্গলের দূত।

৩। অসহ্য রোগ যাতনা, দুঃসহ শোক ও বার্দ্ধক্যের অসহায় অবস্থায় উদ্ধারের উপায় যে মৃত্যু তাহাও কত মঙ্গলের হেতু।

৬—অদ্বৈতম্।

১। সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর অব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধ। তাই শীতে আধমরা হয়ে, জলে ডুবে, অগ্নিতে পুড়েও সে মুখ অন্য দিকে ফিরায় না। তারই উপর তার সম্পূর্ণ নির্ভর বলে আবার তার বুকে বসন্ত-সমাগমে কতই সুখের আয়োজন হয়।

২। এখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, অমনি আঁধার, বিষাদ ও ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু অন্য স্থানে সুপ্রভাত হয়, অরুণ-ভাতি প্রকাশ পায়, প্রাতে পক্ষী আনন্দ-রবে উন্মত্ত হয়, জগতে নবজীবনের স্রোত বহিয়া যায়। উদয় ও অস্তে, চিরদিনই সে, সেই একই আকাশের —একই পৃথিবীর পানে চায়।

৩। সকল মূল্যেরই মূলাধার এক। এই একেরই দ্বারা সর্ব্ব রাশির উৎপত্তি। যে শূন্যের কোন মূল্যই নাই, এই একের পশ্চাতে তার মূল্য দশ গুণ, শতগুণ ইত্যাদি। নির্গুণ মানুষ সেই একের পশ্চাতে আসিলে এইরূপে অসীম পরিমাণে তাহার গুণ ও মূল্য বাড়িয়া যায়। আবার একের ঠিক কাছ থেকে যে শূন্য যত দূরে, তার মূল্য ততই বেশী হয়।

৭—শুদ্ধম্

১। নিষ্পাপ হয়ে শিশু জগতে আসে। সে ছলনা, কপটতা জানে না। অশুদ্ধ নরনারীর নিকট সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের একটু আভাস দিবার জন্য শিশু জন্মে। সে স্বর্গের সুসমাচার-বাহী দেবদূত।

২। অক্ষম শিশু আপনার মলমূত্রে আপনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অন্যের ঘৃণা হতে পারে, কিন্তু মায়ের পক্ষে তা অসম্ভব, তিনি ধুয়ে পুঁছে তাহাকে কোলে তুলে লন। এ সব কেবল দুর্ব্বল মানবের ও

পতিতপাবনী বিশ্বজননীর সম্বন্ধ বুঝাবার জন্য। শিশুর এই দৃশ্য তাঁহারই অভয় বাণী।

৩। মা ভাল কাপড় চোপড় পরাইয়া সন্তানকে স্কুলে পাঠান. সে কালি-ধূলা মেখে, কাপড় ছিঁড়ে আসে মা জল দিয়ে, গামছা দিয়ে সব ধুয়ে দেন। আঁচল দিয়ে তাহার গা পুছান, এবং সময়ে সময়ে একটু ভর্ৎসনাও করেন। ইহাই পাপীর ভরসা। মা স্বহস্তে তাহার পাপ-কালি ধূলা ধুয়ে দেন।

বারানসীতত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ কোতয়ালী।

কোতয়ালী-মহল্লার প্রথমেই রামঘাট। এখানে সোপানোপরি একটি মন্দির আছে, তাহাতে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও চক্ষু, কাহারও বা বদন বৃহৎ এবং কেহ কেহ হস্তপদহীন। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে কুৎসিত। এই দেবমূর্ত্তিগুলির পরিধানে সোনালি রঙ্গের বস্ত্র। চৈত্রমাসে রামনবমীর সময় এই ঘাটে বহু লোক স্নান করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই ঘাটে স্নান করিয়া রামচন্দ্রের পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানে বদমায়েসেরা ভদ্রমহিলাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকে। সুতরাং হিন্দু-মহিলাগণ এখানে আসিয়া সাবধানে থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঘাট আছে, যথা মঙ্গলা, গৌরী এবং দলপত ঘাট। ইহার পরেই পঞ্চগঙ্গা ঘাট। এই ঘাটটী পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুগণ এই ঘাটকে পবিত্র বলিয়া ভক্তি করেন, কারণ তাহা-দিগের বিশ্বাস এই যে, এই স্থানে গঙ্গার সহিত অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীচতুষ্টয় যথা—ধূতপাপ, করীণনদী, জরনা নদ এবং সরস্বতী—আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রবাদ এই যে ধোরতপাপ নামে এক কুমারী ছিলেন। তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া স্বীয় ভাবী পতিকে সর্ম্মনদে পরিণত করেন। তাঁহার স্বামীও প্রতিহিংসালোলুপ হইয়া তাঁহাকে এক পাহাড়ে পরিবর্ত্তিত করেন। পরন্তু কুমারীর পিতা বেদাস্থর কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় কন্যাকে চন্দ্রকান্ত নামক প্রস্তরবিশেষে পরিণত করেন। চন্দ্র-কিরণে চন্দ্রকান্তর প্রস্তর বিগলিত হইয়া নদীতে পরিণত হয়। এই নদী ধর্ম্ম-পত্নী। কিরণ নদী সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, সূর্য্যদেব যখন মঙ্গলগৌরীর পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া নদীতে পরিণত হয়। এই নদীই কিরণ নদী নামে খ্যাত। ঘাটটী প্রশস্ত এবং

তাহার মধ্যে যে সকল গম্বুজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটী এক একটী দেবালয়। ঘাটের উপরে লক্ষ্মণবালা নামে একটী বৃহৎ অট্টালিকা আছে। এখানে ভক্তবৃন্দ সমাগত হইয়া মালা জপ করেন। গীতবাদ্যও বাদ যায় না। ঘাটের নিম্নদেশে কল্লোলিনীর কলনাদ এবং উপরে মনোমুগ্ধকারী তানলয়-সমন্বিত সঙ্গীত কর্ণকুহরে পীযূষ বর্ষণ করিয়া থাকে। মন্দিরের ভিতর ত্রিমূর্ত্তি এক সারে বিরাজিত। মধ্যস্থিত মূর্ত্তির নীল পরিচ্ছদ, মস্তকে নীল বর্ণের পাকড়ি, এবং গলদেশে মালা দোদুল্যমান। ইঁহার বাম দিকে গিল্টি করা একটি চক্র দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাতে নাক, কান, মুখ এবং চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি চক্র আছে, তাহা চন্দ্রদেবের প্রতিনিধি। মূর্ত্তির সমক্ষে একটি দীপ জ্বলিয়া থাকে। ভক্তগণ এখানে সমাগত হইয়া পূজা করিয়া থাকেন। ঘাটের উত্তরপূর্ব্ব দিকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একটি মসজিদ আছে, তাহা অধুনা মাধোদাসের দেওয়া নামে খ্যাত। মসজিদটীর অত্যন্ত পাকা গাঁথুনি। ইহাতে শিল্পকার্য্যের কারিকুরি না থাকিলেও উপরিভাগটী দেখিবার বস্তু। ইহার চূড়া ১৪২ ফিট উচ্চে অবস্থিত। প্রথমে উহা আরও ৫০ ফিট উচ্চ ছিল, পরন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কায় প্রিন্সেপ্ সাহেব তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলান। এখনও উহা ১৪ ইঞ্চি হেলিয়া আছে। এই মসজিদে মুসলমানগণ কম যান। ঔরঙ্গজেবের নিযুক্ত মোল্লার জনৈক বংশধর এই মসজিদের মালিক। মসজিদের সংস্কার ইংরাজরাজই করিয়া থাকেন এবং ইহার ব্যয় সরবরাহের জন্য পুরাকাল হইতে একটি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের পরই প্রসিদ্ধিহীন লাল সাঁওলা ঘাট, লাল ঘাট এবং গাইঘাট।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ আদমপুরা।

প্রথমে যে শত মহল্লার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পরই নদীর সমক্ষে যে অবশিষ্ট অংশ আমাদিগের নয়নপথে পতিত হয়, তাহার নাম আদমপুরা। ইহা পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ঘাটের সংখ্যা কম এবং তাহাদিগের প্রসিদ্ধিও নাই। প্রথমেই মহারাষ্ট্রীয়-রাজকুমারী বালা বাইয়ের ঘাট এবং ইহার অনতিদূরে ত্রিলোচন ঘাট। শেষোক্ত ঘাটটীতে ত্রিলোচন-দেবের মন্দির অবস্থিত। এই হেতুই ঘাটের নাম ত্রিলোচন ঘাট হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাজকুমারী নাথুবালা। প্রবাদ এই যে, যখন মহাদেব ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন বিষ্ণু সহস্র প্রকারের ফুল লইয়া আসিয়া তাঁহার পূজা করিতেন। একদা বিষ্ণু পূজার জন্য ফুল লইয়া আসিয়া রাখিয়াছেন, দৈবযোগে তাঁহার দৃষ্টি কোন বস্তুর উপর আকৃষ্ট হইল। এই অবকাশে মহাদেব

একটি ফুল হরণ করিয়া লইলেন। বিষ্ণু পুনরায় পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে লাগিলেন এবং গণিয়া গণিয়া ফুল অর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই দেখিলেন যে তাঁহার একটি ফুল কমিতেছে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি নিজের একটি লোচন উৎপাটিত করিয়া অর্পণ করিলেন। অমনি মহাদেবের মূর্ত্তিতে চক্ষুটী লাগিয়া গেল। তখন মহাদেব ঘটনা-স্রোত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার ত্রিনেত্র হইল। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, শিবলিঙ্গ সপ্তপাতাল প্রদক্ষিণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থিত হইল। গৌরী মহাদেবের অন্বেষণে ফিরিতেছিলেন। মহাদেব স্বীয় তৃতীয় চক্ষুদ্বারা গৌরীকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, উক্ত মন্দিরের নিকট গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছে। অধিকন্তু সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর এবং নর্ম্মদেশ্বর—এই তিনটি দেবতা এখানে অবস্থিতি করেন। প্রথম মূর্ত্তিদ্বয় এখানে অবস্থিত, পরন্তু শেষোক্ত দেবতার মন্দির কিছু দূরে। বৈশাখ মাসে যে ব্যক্তি ত্রিলোচন দেবের মন্দিরে একদিন দিবারাত্র পূজা করে, সে মুক্ত হইয়া যায়। দেওয়ালে গদাকৃতি একটি দেবতা বিরাজ করিতেছেন, তিনি উচ্চে তিন ফিট এবং তাঁহার ব্যাস এক ফুট। ইনি কোটী লিঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত। দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাঁহার নীচে হনুমানের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই গণেশ এবং শীতলার মূর্ত্তি দেওয়ালে সংলগ্ন রহিয়াছে। দক্ষিণে বারাণসী নামে একটি দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাণা বনার ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা। গণেশ এবং সূর্য্যদেবেরও মূর্ত্তি এখানে আছে, পরন্তু ইহাঁদিগের বিগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ত্রিলোচনের মন্দিরের ছাত আটটী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। মন্দিরটী ছবি দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরের দ্বারের বিপরীত দিকে শ্বেতপ্রস্তরের একটী সাঁড় শুইয়া আছে। উপরে দুইটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পূজান্তে লোকেরা এই ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। মন্দিরে গণেশদেবের মূর্ত্তি শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত। নারায়ণ এবং লক্ষ্মী-দেবীর মূর্ত্তিও সেখানে বিরাজমান। মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গেশ্বর এবং পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে, ইহাদিগের সমক্ষে দীপ প্রজ্জলিত থাকে।

ত্রিলোচনঘাটের অপর একটি নাম পিলপিলা তীর্থ। জলনিমজ্জিত দুইটি গম্বুজের মধ্যে লোকে স্নান করিয়া থাকে। এই ঘাটই শেষ ঘাট বলিয়া পরিগণিত। এতদতিরিক্ত মধুনাট, তিলিয়া নালা ঘাট এবং প্রহ্লাদ ঘাট নামে তিনটি ঘাট আছে, পরন্তু তথায় লোকসমাগম অত্যন্ত অল্প।

গাইঘাটের সন্নিকটে নির্ব্বদেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরটী শিল্পকার্য্য-বিহীন।

দ্বিতীয় মন্দিরটীর নাম আদি মহাদেব। এখানে ব্যাসমঞ্চ আছে, কথকতাও হইয়া থাকে। এখানে পার্ব্বতীশ্বরীর একটী মূর্ত্তি বিরাজমান। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, গোরজীনামক জনৈক ব্রাহ্মণ পার্ব্বতীশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় কাশীখণ্ড পাঠ করিয়া লুপ্ত-দেবদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

ডফরিণ সেতুর নিকটে রাজঘাট। কিন্তু এ ঘাটটী স্নানের জন্য নহে। উক্ত সেতুনির্ম্মাণের পূর্ব্বে নৌকারোহিগণকে এই স্থানে নামিতে হইত। এই স্থানে যে ডাকবাঙ্গালা দেখা যায়, তাহা চুঙ্গি অফিস্ ছিল। এই স্থানে নৌকারোহিগণকে মাসুল দিতে হইত। সেতুর উচ্চ তটে রাজা বনারের নির্ম্মিত বহু পুরাতন রাজঘাটগড় আছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইহা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ইহাতে সেনা থাকিত না। ইহার পরের তটটী গঙ্গা এবং বরুণা সঙ্গমের সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ভগ্ন অট্টালিকা অবস্থিত। বরুণাসঙ্গম অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। এখানেও একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। স্নানের নিমিত্ত যে স্থানপঞ্চক আছে, তন্মধ্যে ইহাই অন্তিম স্থান এবং পঞ্চকোশী তীর্থের একটি অংশ মাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মহিলাসমাজের শিক্ষা— তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪) বিলাসিতা—আমরা পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণের গুণগুলি অনুকরণ করিতে পারি আর না পারি, অন্যান্য বিষয়ে অনায়াসেই তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া থাকি। আমরা এরূপ ভাবে অনুকরণ করি যে, সেগুলি আর সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

আমাদিগের ভারত পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রবণতার

* এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে পাঠকগণের মতামত এবং যে যে বিষয়ের সহিত তাঁহাদের মতের মিল না হয় তাহার প্রতিবাদ পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

আধারভূত ছিল। আর্য্য রমণীগণ ঐহিক সুখের জন্য, বাহ্যিক পারিপাট্যের জন্য এবং বেশ ভূষার জন্য লালায়িত ছিলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য-সভ্যতালোক-প্রাপ্ত বঙ্গ-রমণীগণ বিলাসিতার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাদিগের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিলাসিতাই দেশের অবনতির মূল। বিলাসিতার দ্বারা দেশ-বাসিগণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বিলাসিতা হইতেই ক্রমে ক্রমে আলস্যের উদ্ভব হয়। ইহা দেশের উন্নতির কণ্টকস্বরূপ। কেহ হয়ত বলিবেন যে, পাশ্চাত্যদেশীয়গণত বিলাসী, তবে তাহারা এত উন্নত কেন? ইহার উত্তর—পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ যে পরিমাণে বিলাসী, তাহারা ততোধিক পরিমাণে কর্ম্মপ্রবণ। আমরাও যদি তাহাদিগের ন্যায় কর্ম্মপ্রবণ হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের ন্যায় উন্নত হইতে পারিব। কিন্তু কর্ম্ম প্রবণতারদিকে আমরা অন্ধ, অনুচিকীর্ষু বাঙ্গালীর সে দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা দোষ গুণ বিচার না করিয়া কেবল অনুকরণই করে। যাহা হউক, আমাদিগের বিলাসিতা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

(৫) গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ও আলস্য—বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলা গৃহকর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেন গৃহ-কর্ম্মগুলিকে অতি নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বকার লোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন—"দ্রৌপদীর ন্যায় রন্ধন কার্য্যে পারদর্শিনী হও।" এখন যদি কেহ ঐ আশীর্ব্বাদ করে, তাহা হইলে, লোকে তাহাকে "Old fool" বলিবে। এক্ষণে প্রায় অনেক বাটীতেই পাচক ব্রাহ্মণ আছে। যদি কোন বিশেষ কারণে, ঐ পাচক ব্রাহ্মণ একদিন অনুপস্থিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতা মহিলার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পতিত হয়।

মনু বলিয়াছেন—

"সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥"

ইহার অর্থ—স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রকাশ করিবেন। তাঁহারা গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন ও পরিমিত-ব্যয়শীল হইবেন।

মনু গৃহকর্ম্ম হৃষ্টান্তঃকরণে করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু গৃহকর্ম্মের নাম শ্রবণেই এখন অনেক রমণীর হৃদয়ে বিষাদের আবির্ভাব হয়। আর বিলাসিনী হইলে কিছুতেই মিতব্যয়শীল হওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ মহিলার কার্য্যের মধ্যে দেখা যায়, ইজি চেয়ারে অথবা সোফাতে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় নভেল-নাটক পাঠ করা, কিম্বা উল লইয়া বয়ন করা। কাহারও বা অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনায় ঘন ঘন হিষ্টিরিক্ ফিট্ হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান কালের মহিলাগণ কোন প্রকার ব্যায়াম করেন না বলিয়া তাঁহাদিগের এই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে। ফুট্ বল্, ব্যাট্ বল্, টেনিস্, হকি, পোলো,

প্রভৃতি ক্রীড়া অথবা ডাম্বেল-ভাঁজা ভিন্ন যে ব্যায়াম হয় না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের গৃহকর্ম্মগুলি করিলেই যথেষ্ট ব্যায়াম করা হয় এবং এইরূপ ব্যায়ামই স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপযুক্ত।

(৬) আদর্শ—আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কালের কোন মহিলা যদি পরোপকারব্রতধারিণী হন, তাহা হইলে তিনি কুমারী নাইটাঙ্গেলকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবেন কেন? আমাদিগের পুরাণ-ইতিহাসে কি কোন আদর্শ চিত্র অঙ্কিত নাই? আদর্শস্থানীয় করিতে হইলে, আমাদিগের দেশের স্বদেশপ্রাণা পরদুঃখমোচন চেষ্টিতা, কোন প্রাচীন কালের রমণীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে,—পাশ্চাত্য দেশের নহে। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শকে শত চেষ্টা করিলেও আমরা আমাদের করিয়া লইতে পারিব না। আমাদিগের আদর্শ আমাদিগেরই উপযুক্ত।

আমরা এতক্ষণ কেবল বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালীর দোষই আলোচনা করিলাম। বর্ত্তমান-স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর গুণ যে কিছুই নাই, তাহা নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে দেশে যে পরিমাণে অশিক্ষিতা রমণী ছিলেন, এক্ষণে আর তত নাই,—ইহাই আমাদের পরম আনন্দের বিষয়। তবে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার সহিত বর্ত্তমান পুরুষদিগের শিক্ষার বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। স্ত্রীলোকেরা প্রায় পুরুষদিগের ন্যায়ই শিক্ষিতা হইতেছেন। এইজন্য তাঁহারা পুরুষদিগের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গিনী হইতে পারেন। ইহাও একপক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। বর্ত্তমান-শিক্ষাপ্রণালী যে উচ্চাঙ্গের, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে আমাদের মতে যাহা যাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

আদর্শ শিক্ষা ও তাহার বিস্তারের উপায়।

এক্ষণে দেখা প্রয়োজন যে, কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে তাহা "আদর্শ শিক্ষা" বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অবশ্য এক এক দেশের, এক এক ধর্ম্মাবলম্বীর, এক এক সমাজের আদর্শ এক এক প্রকার। মূলতঃ সকলেরই এক উদ্দেশ্য। তবে আমাদের বঙ্গদেশের প্রণালী বঙ্গের ন্যায়ই হওয়া উচিত। বঙ্গের আদর্শ একমাত্র বঙ্গই হওয়া উচিত। যে শিক্ষা দ্বারা জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মজীবন ও গার্হস্থ্য-জীবন সুচারুরূপে গঠিত হইতে পারে, সুখের হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত আদর্শ-শিক্ষা।

১। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন—প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী করিয়া স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যত অর্থব্যয় হয়, আমাদিগের ভারতে তদ্রূপ অর্থব্যয় হয় না। সম্প্রতি বরোদার গায়োকবার নিয়ম

করিয়াছেন যে,১৫ জন পাঠার্থী বালক বা বালিকা একটী গ্রামে থাকিলেই তথায় একটী স্কুল খুলিতে পারিবে। তাহার অধিকাংশ ব্যয়ভারও গায়োকবার স্বয়ং বহন করিবেন। আমাদিগের দেশে যদি ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অচিরে প্রভূত মঙ্গল হইবে। আমাদিগের মতে বিনা বেতনে সাধারণ লোকের পুত্র কন্যাকে বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য, এবং বৎসরান্তে উৎসাহ-প্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে পুস্তক ও নানাবিধ দ্রব্যাদি পারিতোষিক প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এক গ্রামের অধিবাসিনীগণ শিক্ষিত হইবেন, আর অপরগ্রামবাসিনীগণ অশিক্ষিত থাকিবেন,ইহা হইতেই পারে না। বিদ্যালয়গুলি আকারে ছোট হয়, তাহাতে কিছু দোষ নাই, কিন্তু সংখ্যায় অত্যধিক হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে যদি কোনও গ্রামের অধিবাসিগণ সমবেত-চেষ্টার দ্বারা একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নানা কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

যাহা হউক,প্রত্যেক নগরে এক একটি করিয়া বড় বিদ্যালয় থাকিবে। জেলা বড় হইলে, প্রত্যেক দশ বারটি গ্রাম লইয়া এক একটি বড় বিদ্যালয় গঠিত হইবে। এ গুলির উপর ইউনিভার্সিটি বা শাখা ইউনিভার্সিটী থাকিবে।

হিন্দু সমাজের অনেকে বালিকাদিগকে বা গৃহিণীদিগকে স্কুলে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন না বা তাঁহাদিগকে পাঠাইবার সুযোগ হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রেও শিক্ষা প্রচার করা আবশ্যক, এইজন্য অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। অর্থাৎ অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সুবিধামত তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়া পড়াইয়া আসা এবং পরীক্ষা লওয়া। বিশেষ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমরা কি বিদ্যালয়ে, কি অন্তঃপুরে শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর উপযোগিতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করি।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আবশ্যক দ্রব্যগুলিও রাখিতে হইবে। একটী নিত্য-আবশ্যক পুস্তকালয় প্রত্যেক স্কুলে রাখিতে হইবে। আর বরোদার গায়োকবার যেরূপ লাইব্রেরীর প্রচলন করিয়াছেন, সেইরূপ করিতে পারিলে অত্যন্ত উপকার হয়। তিনি চক্রযুক্ত দুই তিন শত গাড়ি প্রস্তুত করাইয়া, তাহাদের প্রত্যেকটী পাঁচ শত করিয়া উৎকৃষ্ট পুস্তকে পরিপূর্ণ করাইয়াছেন। প্রত্যেক গাড়িতেই পৃথক পৃথক পুস্তক। অর্থাৎ এক গাড়িতে যে পুস্তক আছে, অন্য গাড়িতে তাহা নাই। একখানি গাড়ি একটি গ্রামে আইসে এবং সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে। সেই গ্রামবাসীদিগের সেই পুস্তকগুলি পাঠ করা হইয়া যাইলে অপর গ্রামে সেই গাড়ী চলিয়া যায়। আবার নূতন গাড়ী সেই গ্রামে আইসে। এইরূপে সমগ্র দেশে বিদ্যার প্রচার হয়

২। পাঠের সময়—

সাধারণতঃ প্রাতে ও বৈকালে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে। প্রাতঃকালে বালিকারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বিদ্যালয়ে যাইবে। ৬৷৹ ঘটিকা হইতে দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ অভ্যাস করিবে। তাহার পর গৃহে গমন করিয়া স্নানাহার করিবে। আহারের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পূর্ব্বদিন শিক্ষয়িত্রী যে হস্তলিপি, চিত্র ও সীবন-কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন করিবে। আবার চারি ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ে গমন করিয়া ছয় ঘটিকার সময়ে বাটীতে ফিরিয়া আসিবে। প্রয়োজন হইলে রাত্রিতে ম্যাজিক-লণ্ঠন দ্বারা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। অথবা গল্পচ্ছলে বালিকাগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৩। বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়—

কাব্যাদি সহিত।

বঙ্গভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।

সংস্কৃত-ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।

ইংরাজী ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।

বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

,, ,, ,, ভূগোল।

,, ,, প্রত্যেক মহাদেশের পৃথক পৃথক ইতিহাস।

,, প্রত্যেক মহাদেশের পৃথক পৃথক ভূগোল।

সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর ইতিহাস।

বঙ্গভাষায় সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর ভূগোল।

সংক্ষিপ্ত

বিজ্ঞান (যত প্রকার আছে)।
দর্শন (দেশীয় ও বিদেশীয়)।
চিকিৎসা শাস্ত্র (দেশীয় ও বিদেশীয়)।

অঙ্ক শাস্ত্র—ব্যবসায় ও বাণিজ্য—রাজনীতি—অর্থনীতি—ধর্ম্মনীতি—সমাজনীতি—প্রত্ন-তত্ত্ব—ভাষা-তত্ত্ব—ভূতত্ত্ব—খগোল প্রভৃতি—ইঞ্জিনিয়ারিং—চিত্র শিল্প—কারুকার্য্য—সঙ্গীত—রন্ধন-প্রণালী—গৃহকার্য্য প্রভৃতি।

৪। পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন—

শিক্ষা সম্বন্ধে সকল বিষয়েই গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ লওয়া উচিত, তবে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা থাকাও প্রার্থনীয়। বর্ত্তমান সময়ে পাঠ্য-নির্ব্বাচক-সমিতি-কর্ত্তৃক যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহা যথাযথ হয় না। দেশের স্বনামখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লেখাইয়া লওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের একখানি প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়ন হইল না। অনেক সময় ইতিহাসে সত্য ঘটনা অপ্রকাশিত থাকে। আমাদিগের মতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব এরূপ ভাবে অপ্রকাশিত রাখা উচিত নহে।

৫। আলোচনা—(শিক্ষণীয় বিষয়-সম্বন্ধে)

অধিকাংশ পুস্তকই আমাদিগের মাতৃভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজন, যেহেতু বিষয়-সমূহ যতই গুরুতর ও জটিল

হউক না কেন, মাতৃভাষায় লিখিত হইলে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, আর সাধারণ লোকেও নানা বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে। প্রথমতঃ আমাদিগের মাতৃভাষা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক, তাহার পর প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজী-ভাষা সকলেরই শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়, যেহেতু ইংরাজী ভাষা রাজকীয় ভাষা এবং ভারতের নানা প্রদেশেও এই ভাষার বিস্তৃতি হইয়াছে। কেবল ভারত কেন, পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই ভাষা প্রচলিত। এক কথায় বলিতে গেলে ইংরাজী ভাষাকে সর্ব্বজনীন ভাষা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সর্ব্বসাধারণেরই ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ও অনর্গল কথোপকথন করিতে পারা উচিত। ইতিহাস পাঠ করা আমাদিগের অতীব প্রয়োজনীয়, যেহেতু প্রাচীন ইতিহাস পাঠে, আমাদিগের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ হয়—তাহাতে আমাদিগের হৃদয় সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। বৈদেশিক-ইতিহাস পাঠেরও প্রয়োজন আছে, কারণ সেই সকল দেশ কিরূপে উন্নতি ও অবনতির ঘাত প্রতিঘাতে স্থির থাকিয়া এইরূপ সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে তাহা জানিবার ও ভাবিবার বিষয়। বিজ্ঞান আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ভিন্ন দেশের উন্নতি সম্ভবে না। পাশ্চাত্য-দেশের এত উন্নতির অন্যতম কারণ—বিজ্ঞানের অদম্য পুরুষানুক্রমিক অনুশীলন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নিত্য নব নব বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিতেছেন। আমাদিগের দেশের প্রতিপল্লীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার (laboratory) স্থাপিত হউক, তাহা হইলে আমাদিগের দেশবাসিগণও অনাবিষ্কৃত প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহ নিত্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও সকলের অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা উচিত। অন্ততঃ স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি সকলেরই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থনীতি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যনীতি বিশেষভাবে অনুশীলনযোগ্য। সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি অতি সরলভাবে বক্তৃতাচ্ছলে শিক্ষা দিলে মন্দ হয় না। ইঞ্জিনীয়রিং সকলেরই অল্প বিস্তর জানা আবশ্যক। রন্ধনপ্রণালী ও গৃহকার্য্য এমন কি "খুটীনাটী" কার্য্য পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভারত পূর্ব্বে শিল্পগৌরবে গৌরবান্বিত ছিল, অদ্য তাহা বিলুপ্তপ্রায়, সেই জন্য সকলেরই কিছু কিছু শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। সঙ্গীতশাস্ত্রও কিছু অনুশীলন করা প্রয়োজন। সঙ্গীতের আলোচনায় মন প্রফুল্ল হয়। এই সমস্ত বিষয়ে যাহাতে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।

মহিলাগণের দয়া, মায়া, ভালবাসা

ইত্যাদি পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। আমরা মহিলাদিগকে পুরুষদিগের ন্যায় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি না। যাহাতে তাঁহাদিগের দয়া, সহিষ্ণুতা, ও কোমলতা প্রভৃতি গুণগুলি সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয়, তাহার চেষ্টা করা ও তাঁহাদিগকে সেই প্রকার শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। মহিলাগণের প্রকৃতি যেমন পুরুষ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ তাঁহাদিগের শিক্ষাও বিভিন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পুরুষজাতিকে পুরুষপ্রকৃতির শিক্ষা ও নারীজাতিকে নারী-স্বভাবোপযোগিনী শিক্ষা দান করাই জনসমাজের মঙ্গলের উপায়। ইহার অন্যথা করিলে সমাজ ও দেশের বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। মহিলাগণ পুরুষপ্রকৃতি লাভ করিয়া লজ্জা, মধুরতা, সৌকুমার্য্য ও বিনয় প্রভৃতি গুণে ক্রমেই হীন হইয়া পড়িবেন। আমাদিগের মতে মহিলাগণকে বিভিন্ন প্রণালীর শিক্ষা প্রদান করা নিতান্তই আবশ্যক। তবে এরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিবে। রমণী-সুলভ সরলতা ইত্যাদির সহিত পুরুষের ন্যায় অন্যায় বিচার ইত্যাদি মিলিলে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। সাধারণের উপকার হয়, সর্ব্বদা এরূপ শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য, যথা :—রন্ধন, সীবন, গৃহকার্য্য ইত্যাদি।

পূর্ব্বে আমরা বিদ্যাশিক্ষার সময় ও বিদ্যালয়ের গঠন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা কোন কোন স্থলে কার্য্যতঃ হইয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারা যায় যে, বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" ও হরিদ্বারের "গুরুকুল সমাজ" অনেকটা এই প্রণালীতে শিক্ষা-দান করিতেছেন। এই সকল বিদ্যালয়ই অনেকটা আদর্শ বিদ্যালয় বলিয়া কথিত হইতে পারে। সরস্বতীর অবতার স্বরূপা শ্রীমতী সরলা দেবী যে, সমগ্র ভারতের জন্য স্ত্রী-শিক্ষামণ্ডল স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মতের অনুকূল, তবে তাহা একেবারে ত্রুটি-বিচ্যুতি-পরিশূন্য নহে। তিনি যদি উহা হিন্দুদিগের উপযোগী করিয়া, ধর্ম্মশিক্ষার সহিত ঐ শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে সমগ্র দেশ-বাসীর মঙ্গল হইবে ও তাঁহার শিক্ষাসংঘ সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে।

পূর্ব্বকার অনেক লোকেই ধর্ম্মের জন্য বিদ্যালয়, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্য করিতেন। গভর্ণ-মেণ্টের সাহায্য ভিন্নও অনেক ধনবান্ ব্যক্তির সাহায্যে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। এক্ষণে সেই প্রকার সাত্ত্বিক দান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তবে অধুনা দান-বীর স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত মহাশয় ও দাতাকর্ণ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় যে মহৎ আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ধনবান্ ব্যক্তির অনুকরণযোগ্য। ধনবান্ ব্যক্তিগণ যদি বিলাসিতার ব্যয় কমাইয়া দেশহিতকর ধর্ম্মকার্য্যের সাহায্য করেন, তা হইলে আবার দেশে

সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবে।

প্রাচ্যকেও পাশ্চাত্য হইতে পাশ্চাত্যের গুণগুলি নিজের করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু প্রাচ্য-আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। যে দেশে বেদ, উপনিষদ্, দর্শন প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থগুলির উৎপত্তি, যে দেশে লীলাবতী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় আদর্শমহিলা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের আদর্শ অন্য স্থান হইতে লইবার তত প্রয়োজন নাই।

শ্রীগিরিজা প্রসন্ন সেন,
'গঙ্গাপ্রসাদ নিকেতন,' কুমার টুলী,
কলিকাতা।

চিরকুমারীর ব্রত।

প্রশান্ত ধরণী'পর   ঢল ঢল শশধর,
অতুলন শোভা কিবা নিখিল ভুবনে,
প্রকৃতি-সুন্দরী হায়! ছড়ায় মাধুরী তায়,
নদী গিরি লোকালয় বন উপবনে।

রজত-জোছনাময়ী,রজনী কি শোভাময়ী,
মৃদু মন্দ সমীরণ বিপিনে গাহিছে,
কুসুম ঘরের মেয়ে,   উঁকি মেরে দেখ চেয়ে,
চন্দ্রমা সোহাগ ভরে কারে যে ডাকিছে!

৩

কভু ভাবে ডাকে তারে, উর্দ্ধমুখে চেয়ে তাঁরে,
থাকে যেন মানভরে একাকী বিরলে,
পরান রহস্য করে,   তায় যেন তুলে ধরে,
অভিমানে ম্রিয়মাণ হয় সেই কালে।

এ হেন সময়ে হায়! কে গো ওই ধীরে যায়,
সরলা কামিনী এক কাহার উদ্দেশে,
বিধুমুখী এলোকেশী, ছড়ায়ে লাবণ্যরাশি,
সরসীর তীরে গিয়ে বসে অবশেষে।

চিবুকে কনক ছটা, আহা কি রূপের ঘটা,
স্বরগের ফুল যেন ফুটেছে কাননে,
সে অধর বিকসিত,   প্রাণ মন পুলকিত,
গাইবে প্রেমের গীতি এ হেন বিজনে।

৬

নিশাচর ডাকে দূরে, প্রতিধ্বনি আসে ঘুরে,
নীরব মাধুরী কত প্রকৃতির মাঝে,
বসেছে একান্তে নারী,নাহি কেহ বিঘ্নকারী,
গভীর সে নিশীথিনী সম্মুখে বিরাজে।

৭

অনন্তের ছায়া-প্রায়, কৌমুদীর প্রতিচ্ছায়,
করিছে মধুর গীত অচ্ছোদ-সলিল,

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণের মতামত এবং যে বিষয়ের সহিত তাঁহাদের মতের মিল না হয় তাহার প্রতিবাদ পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

মধুরে মধুরে কিবা, ফুটেছে অতুল বিভা,
আনন্দেতে ভরপুর এ বিশ্ব নিখিল।

৮

হইয়াছে প্রস্ফুটিত, কুসুমেরা সুবাসিত,
সুগন্ধ ছড়ায়ে দিক করে আমোদিত,
বলয়-শোভিত-কর, যুক্ত রহে নিরন্তর,
বিস্ময়ে পুলকে প্রাণ হয় উচ্ছ্বসিত।

৯

প্রেমে বিকশিত মুখ,নাহি পাপ নাহি দুঃখ,
নিষ্কলঙ্ক মুখখানি সদা ফুটে রয়,
অপূর্ব্ব জ্যোতির মাঝে, নিরুপম রূপ রাজে
কোন শোভা এর কাছে সমতুল নয়!

১০

চন্দ্রমা সে বিধুমুখে, চুমিয়া মনের সুখে
অনিমেষে চায় তার সেই দিব্যধামে,
বিম্বাধরে উঠে স্বর, 'প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর'!
নয়নে স্ফুলিঙ্গ তার সে অমৃত নামে।

১১

সহসা কুসুমরাণী, শুনিল তাহার বাণী,
মধুর কাতরধ্বনি পশিল হৃদয়ে
কিন্তু রে সামর্থ্য নাই, যাইবার নাহি ঠাঁই,
শূন্য'পরে সমীরণ নাচে তা'রে লয়ে।

১২

দিগ্বিদিক শুভ্রকায়, অনন্তে মিশিয়া যায়,
বিজলি চমকে কিবা প্রেমের পরশে,
জল স্থল নাহি শূন্য, প্রেমে সব পরিপূর্ণ,
জাগিল তাহার প্রাণ নবীন হরষে।

১৩

বসন-অঞ্চল ফেলি, প্রভঞ্জন করে কেলি,
সারি সারি বৃক্ষগুলি হয়ে সচেতন,
আজ তারে ভালবেসে, কতই মধুর হেসে,
আপনার জন বলে করে সম্ভাষণ।

১৪

কত মিষ্ট কথা কয়,প্রাণে প্রাণে কি বে লয়,
দেখে প্রেম-সূত্রে বাঁধা নিখিল ভুবন,
ধরে সেই সূত্রটিরে, নামে ধনী ধীরে ধীরে,
চিদানন্দ স্বরূপেতে হইতে মগন।

১৫

প্রাণ মাঝে প্রাণেশ্বর, প্রকাশিয়ে অনন্তর
কতই মধুর প্রীতি করেন বর্ষণ,
পরাণ পাগলপারা, দুনয়নে বহে ধারা,
প্রিয়তম সনে এই মধুর মিলন।

১৬

কণ্ঠে ধ্বনি "প্রাণেশ্বর,"রোমাঞ্চিত কলেবর
কুসুম জানিল বর এসেছে তাহার,
চির কুমারীর ব্রত, চিদানন্দ ধ্যানে রত,
হৃদয়ে বিকাশি উঠে আনন্দ অপার।

শ্রীমান সুকান্তি লিখিত দৈনিক লিপি।

১৬ই অগ্রহায়ণ। ১লা ডিসেম্বর।
জগদীশ! আজ প্রাণমন এত চঞ্চল হইল কেন বুঝি না। ঝটিকা-বিক্ষুরিত তরঙ্গরাশির ন্যায় মনে এক অভাবনীয়

চঞ্চলতা আসিয়াছে। তাই আজ তোমার চরণপ্রান্তে শান্তিলাভের জন্য উপস্থিত। দয়াময় এ পাপ পরাণে তোমার করুণা বারি সিঞ্চন কর। হৃদয়ের মলিনতা দূর হউক, চাঞ্চল্য বিদূরিত হউক। তোমার চিন্তনে যেন জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তুমি যে দয়ার সাগর, পতিত-পাবন প্রভু, তোমার কাছে যে আসে সে তো কখনও শূন্য হৃদয়ে ফেরে না। তোমার শান্ত মধুর ভাব একবার হৃদয়ে ঢুকিতে পারিলে ত আর সংসারে কোন কষ্ট নাই, বিবাদ নাই। তুমি তখন জীবনের চালক হইয়া সুপথে তোমার দিকে চালাইয়া লও। ধন্য সে জীবন মানব-নামের সার্থকতা ত তাহারই জীবনে। সেই তোমাকে পাইয়াছে। সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া মন সর্ব্বদা তোমা হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই আমরা এত কষ্ট পাই, জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া শান্তির আশে কুপথে আকৃষ্ট হইয়া শেষে অনুতাপ করি। তখন আবার মনে তোমাকে পাইবার জন্য আকুল পিপাসা উপস্থিত হয়। তখন বুঝিতে পারি তুমিই একমাত্র শান্তির প্রস্রবণ। দয়াময়, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক বিকশিত কর। তোমার মহিমা যেন হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তোমার চিন্তায় প্রত্যহ একবার নির্জ্জনে বসিতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক প্রভু! ওঁ।

হাজরা লেন, কলিকাতা।

১৩১৯। ১৭ই অগ্রহায়ণ—২·১২·১২।

পরমপিতা পরমেশ, তোমার চিন্তনে কত শান্তি কত সুখ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন মনে হয় আমার পিছনে তোমার ন্যায় অসীমশক্তি কার্য্য করিতেছে, তখন মনে কত আশার সঞ্চার হয়। মনে হয় তবে আমার ভয় কি চিন্তা কি? কিন্তু তোমার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই, পৃথিবীর বাহ্যিক প্রলোভনে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, তখন আবার তোমার কথা সত্যই মনে উদয় হয়—তখন মনে হয় এবার বুঝি আমায় দয়া করিবে না। এবার বুঝি তুমি ক্ষমা করিবে না। দয়াময়! কিন্তু তোমার স্নেহ, করুণা তখনও হারাই না। কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিলে, হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তুমি কেমন শান্ত মূর্ত্তিতে আসিয়া দয়া দাও। তোমার করুণা কি অসীম! তোমার দয়ার শেষ নাই প্রভু। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার এই অকৃতি সন্তান তোমার নিকট প্রাণ খুলে হৃদয়ের বেদনা জানাইতে পারে ও তোমার মহিমায় হৃদয়ের বেদনা উপলব্ধি করিতে পারে। এই কর প্রভু! যেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

১৩১৯। ১৮ই অগ্রহায়ণ। ৩রা ডিসেম্বর। ১২।

দয়াময়, আজ যে আবার পথভ্রষ্ট হ'য়ে তোমা হইতে অনেক দূরে এসে পড়েছি, কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে অন্যভাবে দিনপাত করিতেছি। তুমি যে অমূল্যধন সঙ্গে দিয়াছিলে তাও হারায়ে ফেলিছি। প্রভু!

চারিদিক যেন শূন্য বোধ হইতেছে। তাও তোমার করুণাকণা! হৃদয়ে আবার আশাবহ্নি প্রজ্বলিত কর। এ শুষ্ক প্রাণে এক বিন্দু প্রেমবারি সিঞ্চন কর। জ্ঞান পিপাসা হৃদয়ে জাগাইয়া দাও প্রভু! আশীর্ব্বাদ কর যেন এবার হতে আর তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হই। পাগলের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া এবার তোমার দ্বারে উপস্থিত প্রভু! কেবল ধাক্কা খাইলাম লাঞ্ছিত হইলাম, আর কেহ ত প্রাণের আশা মিটাইতে পারিল না. ভাল মুখে একটা কথা কহিল না। তোমার ন্যায় পাপীর বন্ধু আর কে আছে? শূন্য হৃদয়ে পৃথিবীর এক কোণে পড়িয়াছিলাম। সংসারের দুঃখ কষ্ট দেখে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়া ষড়রিপুর বশ হইয়াছিলাম। কখনও ভাবিতাম এই বুঝি শান্তি পাইলাম, আবার ধাক্কা খাইয়া মোহ ভাঙ্গিত। যে যখন যে দিকে চালাইত, সেই দিকেই যাইতাম। হায়! আমি কি মূর্খ, আমি কি অধম, তোমার কথা একবারও মনে পড়ে নাই। কি মোহে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল যে তোমার আহ্বানও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। এবার তোমায় চিনিয়াছি প্রভু! তুমি যে দয়াময়, পাপীর সম্বল তাহা বেশ বুঝিয়াছি। যদি দয়া করিয়া সুমতি দিয়াছ তবে মাঝে মাঝে লুকায়ে থাক কেন, প্রভু! আমার হৃদয় যে বড় দুর্ব্বল। তোমাকে না দেখিলেই আবার ছয় জনায় মিলে আমায় কুপথে টানিবে। তুমি প্রহরীর মত থাকিয়া আমায় রক্ষা কর প্রভু!

২১শে অগ্রহায়ণ। ৬ই ডিসেম্বর। ১২

পরম পিতা পরমেশ, তোমার এ অধম সন্তানে কি কৃপা করিবে না প্রভু! তোমার করুণায় বাঁচিয়া আছি সত্য, কিন্তু তোমায় বুঝিতে পারি কই? মৎস্য যেমন জলে থাকে, জল ভিন্ন বাঁচিতে পারে না, আমরাও তেমনি তোমার ভিতরে রহিয়াছি, তোমা ভিন্ন আমরাও নিশ্চল নিস্পন্দ হই। কিন্তু প্রভু! সেই জীবনের জীবনকে বুঝিতে পারিব না, একি কম আক্ষেপের কথা। তুমি আমাকে রক্ষা করিতেছ, আর আমি তোমার কথা ভুলিয়া আছি! দয়াময়, আর কতকাল লুকায়ে থাকিয়া কষ্ট দিবে? তোমায় পাইবার জন্য মানবের মনে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা দিয়াছ, মানবকে বুঝিতে দিয়াছ যে তুমিই তাহার প্রাণ, তবে সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখ কেন প্রভু! জগতের পিতা তুমি, তোমার রাজ্যের কেমন শৃঙ্খলতা, সেখানে কেমন শান্তি বিরাজ করিতেছে। মানবকে স্বাধীনতা দিয়ে পাঠাইয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার সাহায্য ব্যতীত কাহারও একপাও নড়িবার যো নাই। তোমাকে না বুঝিলে সংসার মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক,নীরস বলিয়া বোধ হয়। তোমাকে না বুঝিলে সংসারের সুখ কি তাহা বুঝা যায় না, মানবজীবনের কর্ত্তব্য স্থির করা যায় না। তবে কেন প্রভু!

লুকায়ে থাক? তোমার মহিমা সীমাবদ্ধ মানবহৃদয়ে প্রকাশিত কর প্রভু। তুমি অসীম বলিয়া ক্ষুদ্র মানব তোমাকে কি ধারণা করিতে পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। তুমি ত দয়াল, দয়াসাগর, অসীম-শক্তি-সম্পন্ন। তুমি মানবের নিকট শান্ত, সরল ভাবে ধরা দাও, হৃদয়ে তোমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে ক্ষমতা দাও। ন্যায় অন্যায় বুঝিতে দাও। সংসারে তুমিই আমাদের ধ্রুবতারা ও তুমিই আমাদের চালক। তোমাকে বুঝিতে না পারিয়াই ত বিপথে চলিয়াছিলাম। অমনি মৃত্যু এসে তোমার প্রদত্ত সে অমূল্য ধন কাড়িয়া লইয়াছে। তাই ত পথহারা হ'য়ে তোমায় খুঁজিতেছি। অকৃতী সন্তানকে দেখা দাও প্রভু! তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস দাও, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন অবিশ্বাস প্রাণে আসে না। তুমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তোমার প্রতি যেন অবিশ্বাস আসে না। পৃথিবীতে যখনই যে দিকে তাকাই, তখনই তোমার অসীম শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হই। প্রভাতের বালসূর্য্যের কিরণচ্ছটায়, অমানিশার নক্ষত্রের ভিতর, পূর্ণিমার স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নায় তোমারই মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। তোমাকে অবিশ্বাস করিবার ত কোন কারণ নাই। তবে কেন মাঝে মাঝে তোমায় ভুলে যাই? কেন তোমার মহিমায় বিশ্বাস হয় না? দয়াময়, সে দিন টাইটানিক-নামক জাহাজ তোমার ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তমধ্যে জলমগ্ন হইল। মানবের ক্ষমতা যে তোমার নিকট বিন্দু হইতে বিন্দু তাহাই তুমি প্রমাণ করিলে। মানবের শক্তি কি ক্ষুদ্র! তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমার আদেশে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, তবে আমায় চালাও না কেন প্রভু? আমি ত যেমন তেমনই রহিয়াছি? এক পদও জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারি নাই। প্রতিপদে কত বাধা, কত কষ্ট! তোমার সাহায্য ভিন্ন কেমন করে এ দুস্তর সাগর পার হইব প্রভু? দাও, দয়াময়, তোমাতে অটল বিশ্বাস। তোমার কর্তৃত্বে যেন সর্ব্বদা থাকিতে পারি। হৃদয়ে আশা ও বল দাও, কর্ত্তব্যবুদ্ধি দাও। নৈরাশ্য আসিয়া মাঝে মাঝে কর্ত্তব্যচ্যুত করে না যেন। তোমার শক্তির কথা মনে রাখিয়া তোমাকে স্মরণ করিয়া যেন প্রত্যেক কার্য্যে রত হইতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১৩১৯। ২২শে অগ্রহায়ণ। ৭ই ডিসেম্বর। ১২।

জগৎপিতা জগদীশ, মানবকে তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব করিলে; বিবেক, বুদ্ধি, মন দিয়া গঠন করিলে; তবুও মানব তোমায় বুঝিতে পারে না কেন প্রভু? প্রত্যেক মানবকে এক একটী মনোরাজ্য দিয়াছ, শাসন করিবার জন্য বিবেক দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ। কিন্তু আমরা রাজ্য পালন না করিয়া দুষ্ট প্রজা কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছি, তোমাকে যে আমাদের রাজা বলিয়া আর মানিতে চাই

নাই! এখন তোমার সাহায্য ভিন্ন ত আর এ প্রকৃতিকে দমন করিতে পারিতেছি না। তুমি বল দাও, শক্তি দাও। তুমি হাতে ধরে টেনে উঠাও প্রভু। তুমি কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে পৃথিবীতে সুধা কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলে, সঙ্গে কত প্রহরী দিয়াছিলে, অমূল্য ধন দিয়াছিলে, আমি অবিবেক বশতঃ সব হারাইয়া বসিলাম। জ্ঞান পাইয়া জ্ঞান হারাইলাম! তোমার আলো পাইয়াও আবার অন্ধকারে ডুবিলাম। যে তোমার আদেশ পালন করিয়া চলিয়াছে, তাহার নিকট পৃথিবী কেমন সুন্দর,কেমন শান্তির স্থান। তুমি মানবকে যে অসীম শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছ, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে দাও। বিবেক-বুদ্ধির বলে মানব কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তুমি যাহার অভিভাবক, তাহার ত কিছুই অসাধ্য নাই। তোমার শক্তির যে এক বিন্দু হৃদয়ে দিয়াছ, তাহারই প্রভাবে মানব আজ শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে সক্ষম। তুমি যেমন মানব-হৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনা দিয়াছ,তেমনি সে সব পূর্ণ করিবার শক্তিও ত দিয়াছ। কি মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছি যে, সে শক্তি হৃদয়ে অনুভব করি না। দয়াময়, তুমি হৃদয়ে সেই শক্তির বিকাশ কর, যেন তাহার প্রভাবে মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। তবেই ত প্রভু, তোমায় ভাল করিয়া চিনিতে পারিব। কতকাল আর ঘুমঘোরে অচেতন থাকিব। দয়া কর প্রভু, এ জীবনে আবার ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত কর। হৃদয়ের কালিমা দূর হউক। সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় যেন হুঙ্কার ছাড়িয়া তোমার আদেশ পালনে রত হই। সত্যকে আশ্রয় করিয়া তোমার করুণায় যেন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি এই কর প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

৺ সুকান্তির মৃত্যু উপলক্ষে

সুকান্তি আমার পরম আত্মীয়। ইহাঁর অভাবে আমরা নিতান্ত সহায়হীন ও কাতর হইয়া পড়িয়াছি। ইহাঁর পিতা-মাতার কথাত লিখিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা অসাধ্য।

ইহাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র সেন। ইহাঁর পিতা সুশীল, সুবোধ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কিন্তু সুকান্তির ন্যায় উৎসাহশীল, উদার, সরল ও ধার্ম্মিক পুত্রের অকাল মৃত্যু তাঁহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া ফেলিয়াছে।

সুকান্তি শ্রীমতী রাখালদাসীনাম্নী একটি নিষ্ঠাবতী রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাখালদাসী পুত্রের অভাবে অনাহার-ব্রত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়া-

ছেন। সমস্ত রজনীর মধ্যেও তিনি নিদ্রা যান না, কেবল মধুর স্বরে হরিনাম গান করিয়া থাকেন।

পিতামাতার উপযুক্ত পুত্র ৺সুকান্তির ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ না করিয়া তিনি কোনও কাজেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার নিজ হস্ত-লিখিত দৈনিক ডায়েরীতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২৯৯ সনের ২২শে আষাঢ় মঙ্গলবার ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩২০ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ রবিবারে কালীঘাটে ৬নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেনে বেলা ৪টার সময় সান্নিপাতিক জ্বরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি St. Xavier Collegeএ B. Sc. (fourth year) পড়িতেন। একদিন Test পরীক্ষা দিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ইহঁর অভাবে পৃথিবী একটি সুসন্তান হারাইয়াছেন। এমন মিষ্টভাষী, পরোপকারী, উৎসাহশীল ও ধর্ম্মভীরু সন্তানের অভাবে দেশও মহাক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

কবিতার প্রাণ

কবিতা কি প্রাণশূন্য! সত্য বটে, আজকালিকার অনেক কবিতার ভাষা আছে, ছন্দ আছে, উপমার ঘটা আছে ও অনুপ্রাসেরও ছটা আছে, কিন্তু নাই কেবল ভাব, নাই কেবল প্রাণ! তাই সেগুলিকে কবিতা না বলিয়া অন্য কিছু বলিলে, বোধ করি ক্ষতি, হয় না। কিন্তু শুনিয়াছি যে, কয়েকটী কবিতা ও একখানি উপন্যাস আমেরিকায় প্রচলিত জঘন্য দাস বিক্রয়-ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল। যদি এই উক্তির ঐতিহাসিকতা ও সারবত্তা মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে অস্বীকার করা যায় না যে, কবিতার প্রাণ আছে। বস্তুতঃ বিবিধ ছন্দোবদ্ধ সুললিত শব্দপিণ্ডময় কবিতাগুলির শব্দালঙ্কারের ঘটা ও উপমার ছটা থাকিলেও তাহাদিগকে "কবিতা" এই আখ্যা প্রদান করিলে প্রকৃত কবিতার অবমাননা করা হয়। যে কবিতার ভাব আছে, ভাবের পরিস্ফুটনা আছে, এমন কি যে কবিতায় ভাব ও ভাষা ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত অর্থাৎ যে কবিতার ভাষা ও ছন্দ তাহার প্রত্যেক ভাবকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে স্ফুটতর করিয়া তুলিতেছে, সে কবিতা যে প্রাণহীন তাহা কেমন করিয়া বলি! কাউপারের "Jhon Gilpin" কবিতাটী কোনও নিপুণ আবৃত্তিকারক দ্বারা কোন সভাস্থলে আবৃত্তি করা হইলে সভাকক্ষটি সুনির্মল হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে! কোলরিজের "Ancient Mariner" পাঠ

করিলে হৃদয় যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। Shelley র "Skylark" কবিতাটী পাঠ করিলে হৃদয় যেন উধাও হইয়া কোন এক দূর দূরতর স্বপ্নরাজ্যে উড়িয়া যায়! Campbell এর "Ye Mariners of England" কবিতাটী হৃদয়দেশ স্বজাতি-গৌরবে ও স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। নবীন বাবুর শান্তিরসাত্মক কবিতাগুলি অবসাদপূর্ণ ও দুঃখক্লিষ্ট প্রাণে যখন আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করি, তখন আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে! অমরকবি মধুসূদনের অমরকাব্য "মেঘনাদ বধে" প্রমীলার চিতাধিরোহণ-সময়ে শোকাকুল রাবণের বিলাপোক্তি মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া অজ্ঞাতসারে নেত্রযুগল অশ্রু-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে!

ঐ সকল ভাবপ্রাণ কবিতার যখন একটা ক্রিয়া (action) আছে, উহারা যখন ইচ্ছা করিলেই ক্ষণকালের মধ্যে আমাদের প্রসুপ্ত ভাবতন্ত্রীগুলিকে কোন এক অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শে জাগাইয়া দিতে পারে, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কবিতাগুলি প্রাণময়ী ও সজীব। কবি যে কোন ভাব লইয়াই আলোচনা করুন না কেন, তাঁহার কবিতায় সেই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকা আবশ্যক।

যখন শব্দমাত্রেই কোন একটী ভাবের সংবাহক ও প্রতিমূর্ত্তি এবং সেই শব্দগুলি যখন প্রত্যেক কবিতায় বাক্যাকারে গ্রথিত, তখন সকল কবিতাই যে ভাবময়, এমন প্রশ্নও কেহ কেহ তুলিতে পারেন। কথাটা তাহা হইলে একটু সবিস্তারে বুঝা আবশ্যক। ফুলরাশি মালা নহে, ফুলগুলি সূত্রবদ্ধ করিয়া মালার মত করিয়া গাঁথিলেই তাহা ফুলমালা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার এক বক্তৃতায় যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, কতকগুলি বেল ফুলের সহিত যদি কতকগুলি জুঁই ফুল মিশাইয়া মালা গাঁথা হয়, এবং লোককে বলা হয় যে, উহা কেবল বেল ফুলের মালা, তাহা হইলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? পুনশ্চ বর-সজ্জার (ফুলশয্যার) নিমিত্ত ফুলের মালা আবশ্যক, যদি তৎপরিবর্ত্তে বরের গলে পুঁতির মালা পরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি প্রথামত কার্য্য করা হইবে? যেমনই শ্রুতিকটুই হউক, আর সুললিতই হউক, শব্দের সমষ্টি বা যোজনা মাত্রই বাক্য নহে। বাক্যরচনার একটা নিয়ম বা প্রণালী আছে। অপিচ সময়ে সময়ে রচয়িতার অক্ষমতা-নিবন্ধন কবিতায় হয়ত এমন পরস্পর-বিরুদ্ধাত্মক ভাব প্রকাশ ও ভাষার ব্যবহার করা হয় যে, তাহাদের যৌগিক সম্মিলনে বস্তুতঃ কোনও মৌলিক রসেরই উদ্দীপনা হয় না! ভাব ও ভাষার সুন্দররূপে একত্র সমাবেশ না থাকিলে কবিতামালা গ্রথিত হইতে পারে না। কবি যে ভাবের অভিব্যক্তি করিতে চাহেন, যদি হৃদয়স্পর্শী ভাষার প্রভাবে তাঁহার কবিতায় স্বতঃই সেই ভাবের পূর্ণপ্রকাশ

পরিলক্ষিত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তাঁহার কবিতায় জীবনী শক্তি আছে, তাহা প্রাণময়ী। পরন্তু বিরুদ্ধভাবাত্মক ভাষা বা ভঙ্গির ব্যবহার শূন্য হইয়াও কোনও কবিতায় যদি অভিপ্রেত ভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি না থাকে, তবে তাহা প্রাণহীন!

শ্রীদীনেশচন্দ্র দাস।

ভূত না মানুষ।

আমি ব্যাকুল হইয়াছি আমার কন্যার জন্য। একবার সে তাহাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছিল, এবার দেখিতেছি সত্য সত্যই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

নন্দক কহিলেন "মা, তুমি আমার ভগিনীর জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল হইও না। যে তাহাকে লইয়া গিয়াছে, সে কখনও তাহার অনিষ্ট সাধন করিবে না, কারণ সে তাহাকে ভালবাসে। তোমাদের বিশ্বাস যে, সে একবার তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত বলিয়া সবল হস্তে মারিতে পারে নাই। সেই জন্যই তুমি তাহাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলে। এখনও সে তাহাকে মারিতে পারিবে না, বরং আদরের সহিত পালন করিবে। চল, এখন আমরা তাহাদের উদ্দেশে বহির্গত হই। দেবদত্ত কেমন আছেন?" নন্দকের মাতা নন্দকের কথায় অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, অতএব রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, "তুমি রাজপুতানাভিমুখে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলে, আমার অনুমত্যানুসারে সে তোমার অনুসরণ করিয়াছিল। তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফিরিয়া আসিবার কথাও ছিল, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া আমি চিন্তিত হইতেছি—সেও কি তবে শত্রু-হস্তে নিপতিত হইল?"

"অসম্ভব কি! চল এখন চল, আর বিলম্বে দরকার নাই" এই বলিয়া নন্দক বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে সতর্ক ভাবে বাটী রক্ষা করিতে কহিয়া নিজে মাতার সহিত বহির্গত হইলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। নন্দকের আগমনের পর এই ২০ মিনিট অতীত হইল। তথায় তাহারা উক্ত কুসুমিত বনের মধ্য দিয়াই রওনা হইল। এই বনের মধ্যে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে একবার দেবদত্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে যাহাহউক, দেবদত্তের ভাগ্য নন্দককে সেই পথ দিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল। নন্দক জননীকে আপন পৃষ্ঠ-দেশে উপবেশন করাইয়া বিদ্যুদ্বেগে সাত্যকীকে ছুটাইয়া দিলেন। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই বহু লোকের ও অশ্বের পদচিহ্ন তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ও তাঁহার মাতা অত্যন্ত পুলকিত ও

পুলকিতা হইলেন। ঘোড়া নিয়মিতরূপে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। অশ্ব ও অশ্বারোহীর বিরাম বিশ্রাম রহিল না। যে স্থানে গিয়া দেবদত্ত বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যথাকালে গিয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তামগ্ন রহিলেন। দেখিলেন, সেটা মানুষের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানই বটে। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সুদূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি সাত্যকীকে একখানি কাল বর্ণের প্রস্তরের পার্শ্বে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া মাতার সঙ্গে বনপথে প্রবেশপূর্ব্বক হাঁমাগুড়ি দিয়া সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নন্দক বিজ্ঞতা সহকারে বুঝিতে পারিলেন যে,জনকতক লোক দেবদত্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন তাহারা পূর্ব্ববৎ হাঁমাগুড়ি দিতে দিতেই যথাসম্ভব শীঘ্র করিয়া গিয়া আপনাদের অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং প্রায় শত হস্ত দূরে থাকিয়া যথাসম্ভব সতর্ক হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই সব মনুষ্য বাহকেরা দেবদত্তকে একখানি নৌকাতে আরোহণ করাইল এবং নৌকা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে লইয়া যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে নৌকা চালাইয়া দিল। নন্দকও বনের মধ্য দিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। তিন ঘণ্টা কাল ছুটা ছুটীর পর নৌকা তীরবর্ত্তী হইল। নৌকার ভিতরেই শিবিকা ছিল। নৌকা চালকেরা শিবিকা-বাহক হইয়া দেবদত্তকে লইয়া ছুটিয়া চলিল। নন্দক সাত্যকীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। নন্দক ও নন্দকের মাতা অন্ধকারে লতা-পত্রের মধ্যে এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে চলিতেছিলেন যে, বিপক্ষেরা পশ্চাৎ দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়াও তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। শিবিকার বাহকস্বরূপ আট জন লোক ছিল। আরও দুইজন লোক শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন, পরক্ষণেই অপর জন, নন্দকের বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নন্দক যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে লতা-পল্লব দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিবিকার দুই দিকে ডাণ্ডা থাকে। বাহকেরা ঐ ডাণ্ডা স্কন্ধে করিয়া শিবিকা বহন করিয়া লইয়া যায়। নন্দক একজন বাহকের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক এমনি সজোরে আকর্ষণ করিলেন যে, সে ভূমিতলে পড়িয়া জ্ঞানহীন হইল। তাহার মৃদু পতন শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইল না। তারপর তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও ঐ দশা প্রাপ্ত করাইলেন। তখন বিপক্ষদের

চৈতন্যোদয় হইল। অন্ধকারে কোন দিকে দৃষ্টি চলে না। তথাপি তাহারা বুঝিতে পারিল যে, শত্রু তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছে। তাহারা চারিজন লোক হারাইয়াছে, কারণ তাহারা তাহাদের কোন সাড়া শব্দই পাইতেছিল না। নন্দক তখন আপনার গুপ্ত লণ্ঠন প্রজ্বলিত করিয়া আপনার মুখের নিকট ধারণ করিলেন। তৎকালে বাহকেরা শিবিকা ভূমিতলে না নামাইলেও চলিতেছিল না, স্তব্ধভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতেছিল। নন্দক তখন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আমার পরিচিত থাক, তবে দেখ আমি কে। মিথ্যা কথা নহে, ভাল করিয়া দেখ—আমি নন্দক, যাহার তরবারীর আঘাতে প্রচণ্ড পর্ব্বতও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এই বলিয়া নন্দক, লণ্ঠন জননীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক, শত্রুগুলীকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ধারণপূর্ব্বক বামহস্তে তরবারী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বাহকদের মধ্যে দুইজন ছিল তাহারা শিবিকা ভূমিতলে রাখিয়া নন্দককে আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু কেহ তরবারীর আঘাতে হত হইল, কেহ বন্দুকের আঘাতে ভীষণরূপে আহত হইল, কেহ পলাইয়া গেল, তখন নন্দক শিবিকা হইতে দেবদত্তকে বাহির করিয়া জননীর সাহায্যে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারা একটি নিরাপদ স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল, তিনি বনপথ ত্যাগ করিয়া একটি খোলা মাঠে আসিলেন এবং দেবদত্তকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া তাহার মস্তক আপন কোলে ধারণ করিয়া রহিলেন। তাহার মাতা দেবদত্তের এই দশা অবলোকনপূর্ব্বক শোকে একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং পুরুষবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় সেই বাৎসল্যময়ী রমণীর বেশ পরিধানপূর্ব্বক দেবদত্তের নিকট উপবেশন করিয়া তাহার চোকে, মুখে ফুৎকার দিতে লাগিলেন এবং নানারূপ গাছ গাছড়া হস্তে পেষণ করিয়া কখনও দেবদত্তের নাসিকারন্ধ্রে, কখনও ব্রহ্মরন্ধ্রে, কখনও নাভিদেশে, কখনও পদতলে, লেপন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দেবদত্তের চৈতন্যের সঞ্চার হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন নন্দক তাহার মস্তক ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক স্থির ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আর নন্দকের মাতা তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাহার পরিচর্য্যায় রত রহিয়াছেন। দেবদত্তকে চক্ষু উন্মিলন করিতে দেখিয়া নন্দক ও নন্দকের মাতা যুগবৎ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। (ক্রমশঃ)

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

৺ গোপালকৃষ্ণ গোখেল

ভারতমাতার সুসন্তান, দেশগৌরব, কর্ম্মবীর গোপালকৃষ্ণ গোখেল ৭ই ফাল্গুন রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় ৪৯ বৎসর মাত্র বয়সে দুইটী অবিবাহিতা শিক্ষিতা কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই দেশহিতব্রত মহাত্মার তিরোভাবে সমগ্র দেশবাসী শোকাকুল হইয়াছেন। গোখেলের অকাল মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, ভারতের সে ক্ষতি কতকালে পূর্ণ হইবে তাহা জানি না।

প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই কর্ম্মবীর মহারাষ্ট্রতনয়ের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখেল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশের কোলহারপুর নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া অতি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বি, এ, উপাধি লাভ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে পুনা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে শিক্ষকরূপে প্রবেশ করেন। এই স্কুলটী তিলক প্রভৃতি কয়েকজন মহারাষ্ট্র-দেশ সেবক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন। এই স্কুল বর্ত্তমান সময়ে ফারগুসন কলেজে পরিণত হইয়াছে। গোখেল মাসিক ৭০ টাকা বেতনে এই স্কুলে অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করেন। কলেজে শিক্ষকতা করিয়া যে কিছু সময় পাইতেন, তাহা অর্থশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক সমস্ত অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। দেশের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের বীজ এই স্থানেই রোপিত হয়। এই সময় মহামতি গোবিন্দ রাণাডের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি রীতিমত রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতীয় মহাসমিতির পুণা অধিবেশনের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য 'ওয়েরলি' কমিশন স্থাপিত হয়। এই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য মিঃ ওয়াচার সহিত গোখেল বিলাত গমন করেন। এই কমিশনের সমক্ষে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশিত হইলে, সকলেই তাঁহার সারগর্ভ-যুক্তি ও দেশের আর্থিক অবস্থার যথাযথ বিবরণ পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হয়েন। সুতরাং ১৯০২ খৃঃ অব্দে ১৮ বৎসর ফারগুসন কলেজে কার্য্য করিয়া ৪০৲ টাকা মাত্র পেন্সন পাইয়া কার্য্য ত্যাগ করেন। এই সময় হইতে গোখেলের প্রকৃত দেশ-সেবা আরম্ভ হইল।

গোখেল সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অনেক মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ ভারতীয় শ্রমজীবীদিগের দুঃখ-ক্লেশ অবসানের জন্য ভারত-

গবর্ণমেণ্ট ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইয়া বুয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকার-প্রার্থী ও তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে সফলকাম হয়েন। গোখেলের শেষ কীর্ত্তি—সমগ্র ভারতে বাধ্যতামূলক-শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি Public Service Commission-এর সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কমিসনের ফলে যাহাতে ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন; কিন্তু সে পরিশ্রম শেষ হইতে না হইতেই তিনি অকালে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার অনন্ত উন্নতি ও শান্তি বিধান করুন।

মার্কিণ ও বঙ্গ মহিলা

বঙ্গদেশের নারীদের ন্যায় মার্কিন-দেশীয় নারীগণের মধ্যে সরলতা, পবিত্রতা, ঈশ্বরপরায়ণতা প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে, স্ত্রীস্বাধীনতার মহা-কেন্দ্রে, আজীবন-মুক্ত, মার্কিন-মহিলাগণ বঙ্গরমণীর ন্যায় নারীর বিশিষ্ট ধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হন, ইহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যের বিষয়। সে দেশের বিদ্যাশিক্ষা, সামাজিক নিয়ম এবং উন্নত ভাব যে ইহার অন্যতম কারণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গ ও মার্কিন মহিলাদের মধ্যে যে প্রকৃতিগত ও দেশাচারগত বিভিন্নতা আছে তাহাও স্বীকার করা যায়। তথাপি এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে যে সমতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নারীগণের বশিষ্ট গুণ, এবং তাহা চিরদিনই সমগ্র জগতে অনন্ত ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। নারীর ধর্ম্ম যে সকল-দেশীয় নারীগণ পালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বঙ্গদেশীয় ও মার্কিন-দেশীয় রমণীগণের বিভিন্নতা ও সমতা প্রদর্শন করিব ও কি উপায়ে উভয়ে উভয়ের সমকক্ষ হইতে পারেন, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষা।

শিক্ষা সাধারণ অর্থে অনেক প্রকার। ইহার মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষা, সামাজিক-শিক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষা, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-শিক্ষা প্রভৃতি অনেক বিষয় রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা বিদ্যাশিক্ষার বিষয় আলোচনা করিব। মার্কিনদেশে প্রত্যেক পিতা-মাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে মার্কিনদেশীয় পিতা-মাতা সেই কন্যাকে কি ভাবে প্রতিপালন করিবেন, কি শিক্ষা দিবেন, কি ভাব পোষণ করিতে দিবেন, তাহার

একটী নক্সা করিয়া লন এবং কন্যার বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাঁহাদের কল্পিত চিত্র বা আদর্শ তাহার সম্মুখে রাখেন ও তাহাকে সেই আদর্শানুযায়ী চলিতে হয়। অবশ্য এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে পিতা-মাতার মধ্যে অনেক আলোচনা হয় ও অনেক সময়ে এই আদর্শের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। যখন পিতা মাতা উপলব্ধি করেন যে, কন্যার কোন বিশিষ্ট ভাবের সহিত আদর্শের সমন্বয় হইতেছে না,তখনই এইরূপ করিতে হয়। জ্ঞান-বিকাশের সহিত কন্যাকে এই আদর্শ মানিয়া চলিতে হয় ও ভবিষ্যতে তিনি একজন আদর্শস্থানীয়া হইতে সক্ষম হন। অনেকে এই ভাবের পোষকতা করিতে অক্ষম হইবেন, কারণ তাঁহারা ভাবিবেন যে, ইহাতে কন্যার বাল্যকাল হইতে স্বাধীনভাবে কার্য্যকরণের প্রশ্রয় না দিয়া তাহা খর্ব্ব করা হয়,কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এই আদর্শ চিত্রে উহার সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করা হইয়াছে। অধিকন্তু, উহা সুশিক্ষিত পিতামাতার বুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা সংযত হইয়াছে, কারণ এরূপ না হইলে পরে স্বেচ্ছাচারিতা আনীত হয়। মার্কিণদেশের পিতা-মাতারা যে কেবল এই পন্থাবলম্বী তাহা নহে, এমন কি সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ঐ ভাবকে উৎসাহ দিয়া থাকে ও তাহাদের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলিও তাহার পোষকতা করিয়া থাকে। যে শিক্ষা কেবল কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে দেয় ও সম্যক উপলব্ধি করিয়া জীবনের দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সাহায্য না করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে। মার্কিণ-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুইটী বিশেষত্ব আছে, যথা—Co educational অর্থাৎ যাহাতে পুরুষ ও নারী একত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ও Practical অর্থাৎ তাহারা কার্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ যাহা চলিত কথায় বলে 'পুথিগত বিদ্যা' তাহা নহে। আমাদের দেশের শিক্ষার সহিত মার্কিণদেশের শিক্ষার অনেক বিভিন্নতা আছে। সেখানে নারীদের যাহা সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়গুলি বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, যথা child-nature,millinery (টুপি জরী প্রভৃতি পরিচ্ছদের কাজ),domestic science (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), laundry (কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রির কাজ), cooking, hygiene (স্বাস্থ্য বিজ্ঞান)—অর্থাৎ যাহা শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাঁহারা সুগৃহিণী হইতে পারেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেই সকল শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এই সকল বিষয়ে নিয়মিত পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। এগুলি compulsory subjects বলিলেও চলে। এই বিষয়গুলিতে কৃতকার্য্য হইলে অন্যান্য বিষয় যথা—ইংরাজি,ইতিহাস, গণিত,দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি elective (নৈর্ব্বাচিক ভাবে) শিক্ষা করিতে পারেন।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় co-educationalত নহেই, অথচ মার্কিণ

বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলিকে compulsory subjects বলিয়া গণ্য করেন, সেগুলিও এদেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। যে সকল পিতামাতা কন্যাগণকে সুগৃহিণী করিবার জন্য এই সকল শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় বোধ করেন তাঁহারাই নিজের গৃহে অথবা অন্য কোন স্থানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা করেন, সুতরাং বঙ্গমহিলাগণ এ সকল বিষয়ে মার্কিণ মহিলাদের সমকক্ষ হইতে পারেন না। তাহার কারণ পিতামাতার ঐ সকল বিষয়ে অনুৎসাহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাবিস্তারের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে অবহেলা। কিন্তু আমরা সকলেই স্বীকার করিব যে,বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশের নারীগণকে সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ ও উপযুক্ত হইতে দিতেছে না। পুরুষের সহিত যখন নারীর প্রকৃতিগত বিভিন্নতা রহিয়াছে,তখন শিক্ষাপ্রণালীরও কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতার আবশ্যক, নচেৎ নারীগণের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে ও তাঁহাদের ভবিষ্যতে সুগৃহিণী না হইবারও আশঙ্কা থাকিবে। তাহার পর মার্কিণ দেশে সকল নারীই সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্পসংখ্যক নারীই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও খৃষ্টীয়ান্ সমাজ এ বিষয়ে উৎসাহী ও উদার। হিন্দুসমাজের ঘোর কুসংস্কারের মধ্যে নারীগণের শিক্ষালাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। হিন্দুসমাজের পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য এই যে, তাঁহাদের কন্যা যেন সুগৃহিণী বলিয়া শ্বশুরালয়ে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহারা অতি সামান্য বিদ্যাই লাভ করেন, তবে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে সুনিপুণ হন এক দিকে যেমন তাঁহাদের লাভ,অন্য দিকে তাঁহাদের মধ্যে অনেক অভাব দৃষ্ট হয়। প্রকৃত শিক্ষা,অর্থাৎ যে শিক্ষা বিদ্যা ও সাংসারিক জ্ঞান সমান ভাবে অর্জ্জন করিতে সাহায্য করে, উক্ত তিন সমাজের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। এইটী আমাদের একটী বিশেষ অভাব বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে, ও যতদিন এ অভাব মোচন না হইবে, ততদিন আমাদের দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত হইয়া রহিবে।

শিক্ষা যেমন নরনারীকে উন্নত ও উদার করে, সেইরূপ কোন কোন স্থানে আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারী করে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা এরূপ করে না। বিদ্যার অহঙ্কার একটী ভীষণ জিনিষ, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও ইহা বর্জ্জন করিতে অক্ষম হন। কিন্তু মার্কিণ মহিলাগণের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হন না,—তাঁহাদের গৌরবান্বিত মস্তক, বিনয় ও নম্রতা দেখিতে অতীব মনোহর। নারীর মধ্যে অহঙ্কাররূপ কীট প্রবেশ করিলে তাঁহাদের রমণীয়তা অন্তর্হিত হয়। মার্কিণ-

মহিলাগণ যে অহঙ্কারী হইতে পারেন না, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ এই যে, সে দেশে বহুসংখ্যক উপাধিধারি-মহিলা রহিয়াছেন, এই হেতু কেহই অহঙ্কারে স্ফীত হইতে সাহস পান না। আমাদের দেশেও যখন সকল নারী উপাধি প্রাপ্ত হইবেন, তখন এই অহঙ্কার-রূপ কীট—যাহা এখন কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা আর তাঁহাদের কমনীয়তা নষ্ট করিতে পারিবে না। উচ্চশিক্ষার একটী বিশেষ গুণ এই যে, নারীগণ তদ্দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারেন। আত্ম-নির্ভর নরনারী উভয়ের একটী শ্রেষ্ঠ গুণ, এই আত্মনির্ভরতা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। সে কারণ বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষা ভিন্ন বঙ্গদেশের উন্নতি কল্পনা করা বৃথা। এই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া মার্কিণ মহিলাগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কুমারী-অবস্থায় বা যখন বিবাহিতা হন, তখনও তাঁহারা অধ্যাপকের, শিক্ষয়িত্রীর, ডিমনষ্ট্রেটরের, সম্পাদকের ও যন্ত্রালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলাগণ যেরূপ পরাধীন ভাবে অবস্থান করিতেছেন, মার্কিণ মহিলাগণ তাহার বিপরীত-ভাবাপন্ন। শিক্ষিতা মাতা যেমন সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষা ও মঙ্গলোন্নতির জন্য ব্যস্ত, অশিক্ষিতা মাতা তেমন নহেন, ইহা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। অনেকে বলিতে পারেন, এই উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে না লইয়া গৃহে উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে লইলেও চলিতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ও কলেজের যে সুদৃঢ় নিয়মাবলী ও বাৎসরিক পরীক্ষা আছে তাহাই উচ্চশিক্ষার প্রধান সহায়। ইহা সর্ব্বদেশে পরীক্ষিত ও অনুকরণীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই উচ্চ-শিক্ষার জন্য প্রত্যেক নারীরই ইচ্ছা থাকা উচিত। আমেরিকার কোন্ কোন্ মহিলা উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য ব্যগ্র, তাহার অন্বেষণের ভার মিস্ কেলির উপর ছিল। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন —"আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল মহিলা দেখিতে সুশ্রী নহেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদিগকে কেহ বিবাহ করিবেন না, সে কারণ তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইচ্ছুক। ভবিষ্যতে আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া থাকাই তাঁহাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্য।" ইহা আমাদের নিকট অনেকটা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। উচ্চ-শিক্ষালাভ সম্বন্ধে সুন্দরী বা কুরূপার ভেদাভেদ নাই, উচ্চশিক্ষা সকলেরই জন্য। ইহা প্রত্যেক পুরুষ ও রমণীর ঈপ্সিত ধন।

এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য—নারীগণ কাহাদের নিকট হইতে এই শিক্ষা পাইবেন? শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট? মার্কিণদেশে ইহার ভেদাভেদ নাই, পুরুষের নিকট নারী শিক্ষালাভ করিতে-

ছেন ও নারীর নিকট পুরুষ শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং এই প্রণালীতেও শুভ-ফল দেখা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এ দেশের নারীর শিক্ষা নারীর নিকটই পাওয়া উচিত, কারণ আমাদের দেশের নারীগণ সাধারণতঃ লজ্জাশীল ও লজ্জাই নারীর ভূষণ, পুরুষের নিকট শিক্ষালাভ করিতে তাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করেন ও সকল বিষয় উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। সে কারণ শিষ্যা ও শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটে। আমাদের দেশে আজ-কাল উচ্চশিক্ষিত-মহিলার অভাব নাই। প্রতিবৎসর বঙ্গমহিলার নাম graduate-দিগের ও master of arts-দিগের listকে শোভিত করিতেছে। এই সকল মহিলার মধ্যে যে সকলেই সংসার ধর্ম্ম করেন, তাহাও নহে। অথচ করিলেও কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃ-পক্ষগণ যদি মহিলাদিগের স্কুলে কেবল শিক্ষিত মহিলাগণকে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার উৎসাহ দেওয়া হয় ও তাহার শুভ ফলও ফলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, নারীগণকে যদি জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কোমল ভাবগুলি চলিয়া যায় ও তাঁহারা পুরুষের ন্যায় কঠোরপ্রাণ হন। ইহা কোন কোন স্থলে সত্য বটে, কারণ দেখা যায় কোন কোন শিক্ষয়িত্রী ও অন্য কোন কর্ম্মক্ষেত্রের নারীগণ বহুকাল কর্ম্ম করিয়া শেষে উদ্ধত-প্রকৃতি ও নিষ্ঠুরস্বভাব হন। ঈশ্বর নারী-গণকে কোমল বৃত্তিগুলি এমন সুন্দর ভাবে দিয়াছেন যে, ঐরূপ অস্বাভাবিক বৃত্তি বিশিষ্ট নারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেকারণ নারীগণের আত্ম-নির্ভরতার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃজন করা বিধেয় নহে। শিক্ষয়িত্রীর পদ যেরূপ মাননীয়, সেইরূপ দায়িত্বপূর্ণ, এইজন্য তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। মার্কিন দেশে অনেক শিক্ষিতমহিলা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা আজীবন কুমারী থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কার্য্য করিয়া বা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, নারী-জাতির উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ দান করিয়া ত্যাগের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

বামারচনা

বসন্ত-আগমনী

দ্রুত পদে, ম্লান মুখে, কম্পিত হিয়ায়
কুয়াসা, হিমানী, ওই মাগিছে বিদায়।

মরি কি অপূর্ব্ব জ্যোতি
ছড়ায়ে রূপের ভাতি

নামিল বসন্ত ধীরে এ ভব ভবন,
ঢালিয়া মরত পুরে স্বর্গীয় কিরণ।
হে বসন্ত আনিয়াছ মৃতসঞ্জীবনী
তোমার পরশে ওই জাগিছে অবনী।
তরুণ মধুর হাসি,
আনন্দে উঠেছে ভাসি
আলোময়, দীপ্তিময়, ভরিয়াছে দেশ,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরি নব বেশ।
ললিত সৌন্দর্য্যে মরি ভুবন ভরিয়া
সোণার বসন্ত তুমি এসেছ নামিয়া।
আপনি মা বসুমতী
রাখিয়াছেন কোল পাতি,
তারি পুণ্যফলে তব আগমন ভবে
তোমাকে মাখান সেই স্বর্গীয় সৌরভে।
ফল, পুষ্প, বৃক্ষ, যত তোমার কৃপায়
ধরিয়াছে চারু কান্তি নবীন পাতায়।
কুসুমে ভরিয়া ডালা
গাঁথিয়া প্রেমের মালা
পরে ঐ নব ভূষা শ্যামল বসন,
প্রকৃতি তোমারে যেন করিছে বরণ।
মৃদু মন্দ গন্ধ লয়ে মলয় পবন
তব পদে উপহার করিছে অর্পণ।
মধুর মৃদুল বায়
কোকিলা পাপিয়া গায়
গুঞ্জরিছে মধুকর ফুলে ফুলে বসে
তোমারে আহ্বানে যেন সুমধুর ভাষে।
মধুর বসন্ত তুমি বড় সুধাময়
প্রেম-প্রীতি-ভরা তব প্রফুল্ল হৃদয়।
হেরিলে তোমারি মুখ
আনন্দে উথলে বুক
তোমার পরশে যেন আবার সংসার
আসিয়াছে নিয়ে নব শুভ সমাচার।
মরি কি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন।
নদ নদী আদি যত
নব ভাবে বিকশিত,
মৃদুল লহরী তুলি মৃদু মৃদু বায়
অমৃত উচ্ছ্বাসে মরি বিশ্ব ভেসে যায়।
চারু হাসি পরি চাঁদ শোভিছে গগন
তোমার সৌন্দর্য্যে দেখ হাসায় ভুবন,
সন্ধ্যা দেবী, উষা রাণী
তব প্রেমে সুহাসিনী
দিগন্ত উজ্জ্বল করি নবীন আভায়
মন প্রাণ ঢেলে যেন তোমাতে মিশায়।
দিবাকর উঠে যবে সোণালী ছটায়
সুবিমল হাসি নিয়ে জগত মাতায়
তোমার সুন্দরতায়
উছলি উছলি ধায়।
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা কিবা মনোহর
উঠে পড়ে কত তায় সৌন্দর্য্য লহর।
সুশোভিত করে তাই এ ভব ভবন
করিয়াছ পুলকিত মানবের মন।
তুমিই মানব-প্রাণে
নব নব সুধা-দানে
ভরিয়াছ নব ভাবে কি স্নেহ ধরায়
গড়িয়াছ ভগ্ন ধরা স্বর্গীয় শোভায়।
অথবা)
সাজাতে ফুলের মালা হাসাতে কানন
স্বরগের দেব তুমি মরতে এখন
ছাড়ি এ সৌন্দর্য্য-রাশি
নিবায়ে মধুর হাসি
চলে যাবে অবশেষে স্বরগ-ভবন

পাঠাবে পোড়াতে বিশ্ব গ্রীষ্মের তপন।
চাই না গ্রীষ্মের রবি, শরতের শশী
বসন্ত! তোমায় তাই বড় ভালবাসি,
ছাড়িয়া অমরভূমি,
ধরাতলে থাক তুমি,
মানব হৃদয়ে নিতি জাগে এ বাসনা
মধুর বসন্ত তুমি যেও না যেও না।

শ্রীমনোরমা রায়

বসন্তে

ওহে ঋতুরাজ! কেন এলে আজ,
কোথা ছিলে সঙ্গোপন?
ডেকে ডেকে পাখী ভাঙ্গিয়াছে গলা
পায় নাই তবু দরশন।
বিকশি প্রসূন গিয়াছে ঝরিয়া
নীরবেতে করি অভিমান,
গভীর নিশায় কাঁদিয়া প্রকৃতি
করে সিক্ত বিশ্ব উপাধান।
তবুও তোমার গলেনি হৃদয়,
নিরদয় তুমি কি ভীষণ,
নব বেশে সাজি নব ভাব লয়ে
কেন আজি বল আগমন?
সাধের প্রেয়সী পিকরাণী বিনে
শোন না কি কারো আবাহন?
এত ডাকাডাকি, এত অনুরোধ,
তাই কি কর হেলা অনুক্ষণ?
প্রাণ খুলি পিক ডাকিবার আগে
ফুরাবার আগে তার গান,
বিরহ স্মরিয়া মিলনের তরে
উঠিল কি কেঁদে তব প্রাণ?
তাই আজি আর নারিলে রহিতে
সফল তারি মধুর তান।
এস ঋতুরাজ! মুক্ত ভব-কোষ
তোমারে করিতে আজি দান।
তোমারে লভিয়া ভুলেছে প্রকৃতি
মরমবেদনা আজি সব,
ভুবন ভরিয়া আহা কি মাধুরী
চারি দিকে কিবা হর্ষ-রব।
কাননে কাননে ফুলরাণী আজি
প্রেমভরে করে গলাগলি,
লাজ আবরণ কারো পড়ে খসি
আধেক ঘোমটা কেহ তুলি।
মিলন বারতা মলয়-পবন
দুয়ারে দুয়ারে করে দান,
পিকরাণী-তানে মিলায়ে সুস্বর
বিহঙ্গম করে সুধা গান।
প্রকৃতির যত ঘুচেছে অভাব
তোমারে লইয়া আজি ভোর,
চির মধুময়ে মানসে জাগিয়া
কৃতজ্ঞতা অশ্রু বহে মোর।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

"প্রার্থনা"।—

ওহে প্রভু দয়াময়,
জগতের পতি,
অপার করুণা তব
আমাদের প্রতি।
মোরা অতি দীনহীন
তোমার সন্তান
অজস্র করুণা তবু
করিছ প্রদান।—
মোরা অতি অল্পমতি
পাপেতে মলিন,
কেমনে বর্ণিব তোমা,
নাহি কোন জ্ঞান।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি,
করুণা-নিধান
অনন্ত তোমার লীলা
অসীম ভুবান্।—
এ জগতে প্রলোভনে,
পড়িয়া নিয়ত
করিতেছি কত পাপ
আমরা সতত।—
আমরা যে গো তোমার
দুর্ব্বল সন্তান,
নহে তব অবিদিত
ওহে ভগবান্।

মোরা নাহি জানি ধ্যান
অথবা ভজন,
কেমনে করিব তবে
ও গুণ কীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী পিতা মাতা
বন্ধু সহচর,
না চাহিতে সব তুমি
দিয়েছ মোদের।
এই ভিক্ষা মাগি আজি
করি এ মিনতি
নিত্য সত্য ব্রতে তব
কর মোরে ব্রতী।
তব বলে মোরা যেন
হয়ে বলীয়ান্
তোমারি পবিত্র পথে
হই আগুয়ান।
তোমারি দয়াল নামে
করিয়ে নির্ভর
বাধা বিঘ্ন দূরে ফেলি
হই অগ্রসর।
এই আশীর্ব্বাদ কর
মোদের উপর
ভক্তিভরে ও চরণে
করি নমস্কার।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 620. April, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২০ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩২১। এপ্রেল, ১৯১৫। | ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

চীনদেশীয় স্ত্রীলোক।

এসিয়া-মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষের ন্যায় চীনও অতি প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে চীনের নাম পাওয়া যায়। কাব্যশাস্ত্র-পাঠে চীনদেশীয় বস্ত্রের বিষয় জানিতে পারা যায়। আমাদের প্রাচীন তন্ত্র-সকলের মধ্যে "চীনাচারক্রম" নামে একখানি তন্ত্র আছে। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বে ঐ দেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রচলন ছিল। তবে ভারতবর্ষের আচার অপেক্ষা ইহাদের আচার কিছু ভিন্ন ছিল। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারত-বর্ষ হইতে এতদ্দেশে সমাগত প্রচারক-দিগের নিকটে ঐ দেশীয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মের সার মর্ম্ম শুনিতে পায়। ৬০ খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাট্ "মাঙ্গতি" বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থসংগ্রহার্থ ভারতবর্ষে কয়েকজন লোক পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা একাদশ বৎসর এদেশে থাকিয়া পিটকাদি পুস্তক এবং বুদ্ধ-দেবের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া যান। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফাইহান্ নামে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে ভারত-বর্ষে আসিয়া চৌদ্দ বৎসর এদেশে থাকেন এবং বিস্তর বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। সেই হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক অভিজ্ঞতালাভ বহুলভাবে হইতে থাকে।

বৌদ্ধ মত এইরূপে প্রচারিত হইলেও সাকারোপাসনা এখনও পর্য্যন্ত ঐ দেশে প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের আচারের সহিত ঐ দেশের স্ত্রীপুরুষদের আচারও কিছু কিছু মিলে। চীনদেশের বিবরণ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য থাকিলেও এই প্রস্তাবে চীনদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিবরণই প্রধানভাবে এবং তৎসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও সামান্য ভাবে বলা যাইতেছে।

আমাদের দেশে যেমন সন্তান না হইলে লোকে কার্ত্তিক, ষষ্ঠী, শিব, দুর্গা, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার নিকটে মানসিক করে, চীনদেশেও ঐরূপ পুত্রকামনায় লোকে দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। ঐ সকল দেবতার মধ্যে একটী দেবতার নাম কণ্যিন্। প্রবাদ এই, উক্ত নামে একজন বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী ছিলেন, তিনি মরিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। দক্ষিণ চীনের লোকেরা বলে যে,ঐ দেশের সন্তানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনেক সহচরী আছেন। শিশু জন্মিলে তাহাকে স্নান করাইবার সময় এক সঙ্গিনী, শিশুকে হাসাইবার সময় এক সঙ্গিনী, শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় আর এক সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়।

এই দেশের নারীগণ সন্তান-কামনায় কোন কোন দেবতার নিকট জুতা মানসিক করে। প্রথমে সন্তানকামনায় ঐ দেবতাকে জুতা দিয়া পূজা দিতে হয়। সন্তান হইলে আবার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জুতা নিবেদন করিতে হয়।

চীনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পুত্রকামনায় আর এক প্রকার দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। প্রতিদিন রাত্রিতে স্ত্রী, স্বামীর বেশ ধারণ করিয়া, নিকটবর্ত্তী কূপবিশেষ তিন বার প্রদক্ষিণ করে। যদি বাটীর কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়, এইরূপ অলক্ষিত ভাবে গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে মনে করে তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

সন্তান জন্মিয়া এক মাসের হইলে তাহাকে গৃহদেবতার নিকটে লইয়া গিয়া তাহার নামকরণ করা হইয়া থাকে। ঐ নামকে দুধের নাম বলে। আমাদের দেশে যেমন ছেলেদের খুদে, দুঃখে ইত্যাদি নাম রাখা হয়,অথবা কেহ কেহ এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যার শেষে কড়ি যোগ করিয়া নাম রাখে,যথা এককড়ি,দুইকড়ি ইত্যাদি, ঐ দেশেও বালকদের ঐরূপ দীনভাব-প্রকাশক কোন নাম রাখা হয়। ঐ দেশীয়েরা মনে করে যে,ঐরূপ খারাপ নাম রাখিলে ভূতেরা তাহাদিগকে ছুঁইবে না। বালিকাদিগের নাম রাখিবার সময় প্রায় ফুলের নামে নাম রাখা হয়। বিবাহের সময় পুরুষকে আবার নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বিবাহের পর হইতে সকলে চিরজীবন তাহাকে ঐ নামে অভি-হিত করে। মরিয়া গেলে আবার আর এক নাম রাখা হয়, ঐ নামে পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণ পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে পূজাবিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

ছেলেরা যতদিন হাঁটিতে না শিখে, ততদিন তাহাদিগকে দুধ ভিন্ন আর কিছু খাইতে দেওয়া হয় না। হাঁটিতে শিখিলে অল্প অল্প করিয়া ভাত খাইতে অভ্যাস করান হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে যেমন ছেলে কোলে করা হয়, চীনদেশে ঐরূপে কোলে রাখা হয় না,সেখানে প্রায়ই পিঠে করিয়া ছেলে রাখার নিয়ম। কোন চাকর, চাকরাণী মনিবের ছেলেদিগকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যায়।

দরিদ্র-স্ত্রীলোকেরা ন্যাকড়া দিয়া ছেলেকে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া সাংসারিক কাযকর্ম্ম করে।

ছেলেরা হাঁটিতে শিখিলেই মধ্যে মধ্যে তাহাদের মাথা কামাইয়া মাথার ঠিক মধ্যস্থলে শিখা রাখিয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগের কেশবিন্যাসের রীতি চীনের এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার। কোন কোন দেশে বালিকা-দিগের চুলগুলি মস্তকের পশ্চাৎ দিকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। আবার কোন কোন প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা খোপার সহিত চুল জড়াইয়া রাখে। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদিগের চুল আলগা থাকে, বিবাহের দিন বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

বালিকাদিগের গায়ে পরিমিতসংখ্যক ভূষণ পরাইয়া দেওয়া হয়। চীনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা অত্যধিক আভরণ ব্যবহার পছন্দ করেন না। আমাদের দেশে যেমন সাচ্ছাদনালঙ্কৃতা কন্যাকে পাত্রসাৎ করিবার নিয়ম আছে, চীনদেশেও তেমনি বিবাহের সময় কন্যাদিগকে বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। চীনের কোন কোন প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা গায়ে তৈল হরিদ্রা মাখে। কেহ কেহ বা মুখে রং ও সাদা পাউডার মাখে।

চীনদেশের স্ত্রীলোকদিগের ক্ষুদ্র পদ বিশেষ প্রশংসনীয়। বালিকাদিগের বয়স যখন পাঁচ বৎসর হয়, সেই সময় হইতে তাহাদিগের পা কিসে ছোট হইবে, তাহার উদ্যোগ করা হয়। সেই উদ্যোগ হইতেই তাহাদিগের পা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। দুই পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি মাত্র সোজা রাখিয়া, অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি দুমড়াইয়া পায়ের তলার দিকে আনিয়া বাঁধিয়া দেওয়া ও নেকড়া জড়াইয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পনর দিন ত যাতনার এক-শেষ হয় এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ যাতনা থাকে। শীতকালে কম্বল প্রভৃতি ধারণে পা অত্যন্ত গরম হয়, গ্রীষ্মকালেত পা স্বভাবতঃই গরম থাকে। গরম হইলেই ক্রমশঃ যাতনা বাড়ে। বালিকারা ঐ নিদারুণ যাতনায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। ঐ দৃশ্য বড়ই ভয়ানক। কোন কোন বালিকার বা দুই একটী অঙ্গুলি খসিয়া পড়িয়া যায়।

ঐরূপ ছোট পা দিয়া তাহারা খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলে। চীনদেশীয় কবিগণ তাহাদিগের ঐরূপ পদবিক্ষেপকে হংস-গমনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা ঐরূপ খোঁড়াইয়া চলিতে কষ্টবোধ করেন। তাঁহারা দাসীর বা অন্য কাহারও স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া চলেন। চীনদেশীয় সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই ঐরূপ পা ছোট করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু দরিদ্রজাতীয় স্ত্রীলোক-দিগকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, সুতরাং তাহাদিগের ঐরূপ পা ছোট করিলে চলে না।

চীনদেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদিগের যখন বিবাহের সম্বন্ধ আইসে, তখন বর-মাতা প্রভৃতি স্ত্রীলোক প্রথমে

জিজ্ঞাসা করেন যে, মেয়েটী বুদ্ধিমতী কি না, লেখাপড়া ভাল জানে কি না, কাযকর্ম্ম ভাল জানে কি না? প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়—"পা-দুখানি খুব ছোট ত"? যদি ঘটকের নিকটে শুনে যে,পা খুব ছোট, চলনটী যেন ঠিক হংসগমনের ন্যায়, তবে কন্যার মাতার খুব প্রশংসা হয়। বিবাহের পরে নববধূর পা-দুখানি দেখিয়া যদি শাশুড়ী সন্তুষ্ট হন, তবে খুব আনন্দের সহিত বলেন যে,'বুদ্ধিমতী মায়ের মেয়ে বটে। মা বেশ যত্ন করিয়া মেয়ের পা ছোট করিয়া দিয়াছে'।

চীনদেশে অল্প বয়সেই বালক-বালিকাদিগের বিবাহ হয়। ২০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সচরাচর সন্তান জন্মিয়া থাকে। কন্যাপক্ষীয় অভিভাবককে পণ দিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে হয়। বালিকার বয়ঃক্রমানুসারে পণও কম বেশী হইয়া থাকে অর্থাৎ কন্যার বয়স কম হইলে পণ কম, এবং বয়স বেশী হইলে পণ বেশী দিতে হয়।

ঘটকেরা এদেশে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। প্রথমে ঘটক মহাশয় কন্যাপক্ষীয়দিগের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব জানাইলে কন্যার অভিভাবক যদি ঐ বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে মনঃস্থ করেন, তবে তাহা বরকর্ত্তাকে জানান। তৎপরে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকটে কিছু উপহার পাঠান। তাহার পর গণক দ্বারা বর ও কন্যার কুষ্ঠি দেখাইয়া বিবাহ হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা হয়। বিবাহ হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের বাগ্দান হয়। সম্বন্ধ স্থির হইবার পর তিন দিনের মধ্যে যদি বরের বা কন্যার গৃহে চুরী হয়, বা কোন মূল্যবান্ জিনিষ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর সে বিবাহ হইতে পারে না।

বাগ্দানের পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে না পায়, এইজন্য কন্যাকে অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না। গণকেরা বিবাহের শুভ দিন স্থির করিয়া দিলে বরপক্ষীয় নির্ব্বাচিত কতকগুলি লোক কন্যাকে আনিতে যায়। ঐ কন্যানয়নব্যাপারে ভূতেরা কোন বিঘ্ন না জন্মাইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ঐ দেশের চিরাচরিত নিয়মানুসারে দলের অগ্রগমনকারী লোক শূকরের মাংস হস্তে করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে বরপক্ষীয়গণ কন্যাকর্ত্তার ভবনে গিয়া কন্যাকে লইয়া আইসেন।

কন্যা বরকর্ত্তার বাড়ীর নিকটে পঁহুছিলে তাহাকে দোলা হইতে অবতরণ করান হয়। পরে দুইজন পুরন্ধ্রী (অর্থাৎ পতিপুত্রবতী স্ত্রী) আসিয়া কন্যাকে লইয়া যান। কন্যাকে গৃহে যাইবার সময় সমীপবর্ত্তী পাত্রস্থ অগ্নি ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়। কন্যা বরের গৃহে আসিয়া চৌকিতে উপবিষ্ট বরকে প্রণাম করে। বর তখন চৌকি হইতে উঠিয়া আসিয়া কন্যাকে চৌকির উপর লইয়া যায় এবং ঘোমটা খুলিয়া কন্যার মুখ দেখে। পরে উভয়ে চৌকিতে গিয়া বসে। বসিবার সময়

পরস্পরকে পরস্পরের কাপড় চাপিয়া বসিতে হয়। উভয়ের ঐরূপ উপবেশন বিষয়ে চীনবাসীদের ধারণা এইরূপ যে, যে যত কাপড় চাপিয়া বসিতে পারিবে, সাংসারে তাহার তত কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। এইরূপে কাপড় চাপিয়া বসার কিছুক্ষণ পরে তাহারা সমীপবর্ত্তী কক্ষে গিয়া দেব-লোকের ও পিতৃলোকের উপাসনা করে। পরে তাহারা পুনরায় আপন গৃহে আসিলে বর ভোজন করে, কন্যার সেদিন ভোজন করা নিষিদ্ধ বলিয়া কন্যা খায় না। আহার হইয়া গেলে উভয়ের হস্তে সুরা-পাত্র দেওয়া হয়। উহারা সুরা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, চিরজীবন বিশ্বস্ত ভাবে থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে।

তাহারা ঐ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হয় না। স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলে স্বামী আর দারপরিগ্রহ করিতে পারে না। কিন্তু যদি স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ীর অবাধ্য হয়, ব্যভিচারিণী, হিংস্রস্বভাবা, চৌর্য্যশীলা হয়, এবং বন্ধ্যা ও কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হয়, তবে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলেও স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।

স্বামী মরিয়া গেলে ভদ্র গৃহস্থের স্ত্রী-লোকেরা আর বিবাহিতা হন না, কিন্তু ইতর জাতির এবং দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্ব্বার স্বামী গ্রহণ করে। হিন্দুসমাজের ন্যায় চীনসমাজেও বিধবা-বিবাহ অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরলোকে পতির সহিত মিলিত হইবে, এই ধর্ম্মবিশ্বাসে ঐ দেশের অনেকে বিধবা হইয়া আত্মহত্যা করে। ঐরূপ আত্মহত্যা ঐ দেশের সমাজে প্রশংসার কার্য্য।

বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা গুরুজনের বাধ্য হইয়া দক্ষতার সহিত গৃহকার্য্য করে এবং গৃহদেবতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। গৃহস্থের বাড়ীতে অনেক দেবতা আছেন, কোন কোন দেবতা বা মঠ প্রভৃতিতেও থাকেন। চীনদেশের দেবতা অনেক। চীনদেশীয়েরা ধনকামনায় যে দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহার নাম "যুয়েন্‌তন্"। বোধ হয় আমাদের "কুবের" যেমন ধন-রক্ষক, ঐ দেশের "যুয়েন্‌তন্" তেমনি। তৎসম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বর্ণ ব্যাঘ্রে চড়িয়া একটী মুক্তা হস্তে করিয়া বেড়াইতেন। ঐ মুক্তা মাটীতে ফেলিয়া দিলে ফাটিয়া যাইত। তিনিই মরিয়া ধনাধিপতি হইয়াছেন। আর একটী দেবতা ঐশ্বর্য্যদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে যেমন ইন্দ্র, বোধ হয় ঐ দেশে ঐশ্বর্য্যদেবও তেমনি। উক্ত ঐশ্বর্য্যদেবের আবার দুইজন মন্ত্রী আছে। তাঁহাদের একের নাম ধনাগম, অপরের নাম লাভ-দাতা। ধনাগম বোধ হয় আমাদের দেশের লক্ষ্মীর ন্যায় কোন পুংদেবতা এবং লাভ-দাতা, বোধ হয়, আমাদের দেশের সিদ্ধি-দাতা গণেশের ন্যায় দেবতা হইতে পারেন। কারণ, আমাদের দেশের দোকানদারেরা যেমন গৃহমধ্যে গণেশের মূর্ত্তি রাখে ও

দুই বেলা বাতি ধূপ দেয়, চীনদেশীয় দোকানদারেরাও তেমনি লাভদাতা দেবতার নিকটে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা-কালে ধূপ ও বাতি দেয়। আমাদের দেশেও লক্ষ্মীপূজার দিনে লক্ষ্মীপূজার সহিত কুবের ও ইন্দ্রের পূজা হয়। আমাদের দেশের ন্যায় চীনবাসী স্ত্রী-পুরুষেরাও ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধিলাভের জন্য ঐ সকল দেবতাকে মানসিক করে। চীন-দেশের প্রত্যেক রন্ধনশালায় এক একটী মূর্ত্তি থাকে, তাহা প্রধানতঃ রন্ধনশালার দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিমাসে দুই বার ঐ দেবতার পূজা হয়। বৎসরান্তে ঐ দেবতার মূর্ত্তি বদলাইয়া আবার নূতন মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। পরিবারস্থ লোক-দিগের মধ্যে যিনি যে পাপ পুণ্য করুন না কেন, ঐ দেবতা তাহার হিসাব রাখেন এবং বৎসরের শেষে স্বর্গে যাইয়া পরিবারস্থ প্রত্যেক লোকের পাপপুণ্যের কথা ঈশ্বরকে জানান। এই বিশ্বাসে বৎসরের শেষ মাসে উক্ত দেবতাকে বিবিধ প্রকার মাংস, ফল, সুরা ইত্যাদি উপহার দিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। স্বর্গে গিয়া যাহাতে ভগবানের নিকটে সকলের ভাল কথা বলেন, এইজন্য যাত্রাকালে উক্ত দেবতার মুখে চিনি ঘসিয়া দেওয়া হয়। ঐ দেবতা কিসে চড়িয়া স্বর্গে যাইবেন, তাঁহার বাহনের প্রয়োজন। তদুদ্দেশ্য-সাধনার্থ চীনবাসীরা কাগজের ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা আগুনে জ্বালিয়া ঐ দেবতার উদ্দেশে উপহার দেয়। ভূত-প্রেতেরা ঐ দেবতার স্বর্গগমনে বাধা জন্মাইতে পারে, এইজন্য বাজি পোড়াইয়া তাহাদিগকে ভয় দেখান হয়। রন্ধন-শালায় এই মূর্ত্তি থাকে বলিয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা এই মূর্ত্তিকে দেখিতে পায় ও অত্যন্ত সম্মান করে।

চীনদেশের রন্ধনশালা তাম্বুর মত ও একতালা। সেখানে সকল শ্রেণীর ঘরই এইরূপ। রন্ধনগৃহ হইতে ধূম নির্গত হওয়ার জন্য গবাক্ষ আছে।

আমাদের দেশের ন্যায় চীনদেশীয় লোকেরাও ভাত খায়। ঐ দেশের উত্তরাঞ্চলে এক প্রকার শস্য জন্মে। আমাদের দেশে যাহাকে চীনা বা জনার বলে, উহা সেই ঘাস। বোধ হয়, চীনদেশ হইতে প্রথমে উহা এদেশে আনীত হইয়া-ছিল বলিয়া উহার নাম চীনা হইয়া থাকিবে। উত্তরচীনের দরিদ্র লোকেরা ঐ শস্যের অন্ন ভক্ষণ করে। এই দেশীয় লোকদিগের মধ্যে আমিষ ও নিরামিষ-ভোজী উভয় শ্রেণীর লোকই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আমীষভোজীর সংখ্যাই অধিক। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল শ্রেণীর মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্যভক্ষণের রীতি আছে। শূকর, ভেড়া, ছাগল, কুক্কুট, রাজহংস ইত্যাদির মাংস এদেশের প্রধান খাদ্য।

ঐ দেশের রীতি অনুসারে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই ছোট একখানি টেবেলে ভাত রাখিয়া খায়। টেবিলের মধ্যে কোন একটী বড় পাত্রে খুব গরম

ভাত থাকে। তাহার চারি দিক্কার ভিন্ন ভিন্ন বাটিতে মৎস্য ও মাংসের ঝোল, চর্চ্চড়ি, অম্বল ইত্যাদি রাখে। এইরূপে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া লইয়া তাহার চারি দিকে চেয়ারে, ছোট ছোট টুলে বা ঐরূপ কোন আসনে স্ত্রীলোকেরা খাইতে বসিয়া যায়। আমাদের দেশের ন্যায় ইহারা হাত দিয়া খায় না এবং ইউরোপবাসীদিগের ন্যায় চামচ দিয়া তুলিয়াও খায় না। তাহারা সজারুর কাঁটার মত কাঠের এক প্রকার কাটি দিয়া খায়। খাইবার সময় দক্ষিণ হস্তের প্রথম তিন অঙ্গুলি দিয়া ঐরূপ দুই গাছি কাটি ধরে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কাছে একখানি করিয়া বাসন ও এক জোড়া করিয়া ঐরূপ কাটি থাকে। অন্নপাত্র হইতে গরম ভাত বাসনে ঢালিয়া একটু নাড়িয়া লয়, বাসনখানি বাঁ হাতে মুখের কাছে ধরিয়া ঐ দুই গাছি কাটি দিয়া খুব শীঘ্র শীঘ্র ভাত মুখে তুলিয়া লয়। ভাত মুখে দিয়া তাহারা পৃথক্ পৃথক্ পাত্র হইতে চর্চ্চড়ি প্রভৃতিও কাটি দিয়া মুখে তুলিয়া লয়। ইহাই তাহাদের খাইবার সাধারণ নিয়ম।

চীনদেশের লোকেরা প্রায়ই শীতল জল পান করে না। জল গরম করিয়া খায়। যে যে স্থানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না, সেই সেই স্থানে গরম জল খাওয়াই ভাল। বোধ হয় চীনদেশে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না, অথবা সকল প্রকার জলই গরম করিয়া খাইলে উহার উপকারিতা জন্মে, এই জন্যই ঐরূপ নিয়ম হইয়া থাকিবে। এই দেশে চা পানের ব্যবহার খুব বেশী, পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও চা খাওয়ার রীতি আছে। আমাদের দেশের ন্যায় ইহারা দুধ দিয়া চা খায় না। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে সমস্ত দিনই গরম জল থাকে। যাহার যখন চা খাওয়ার প্রয়োজন হয়, বাটিতে কতকগুলি চায়ের পাতা দেয় ও তাহার পর তাহাতে গরম জল ঢালিয়া কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখে, তাহাতে উত্তম চা প্রস্তুত হয়। ঐ চাতে তাহারা কিছু মিশায় না, শুধু চা খায়।

এই দেশে প্রচুর পরিমাণে চা জন্মে। চীনদেশের স্ত্রীলোকেরা চুবড়ীতে করিয়া চার পাতা তুলে। ঐ পাতাগুলি প্রথমে রৌদ্রে শুকায়, পরে বড় কড়ায় ঐগুলি ভাজিয়া হাতে চট্‌কাইয়া মুড়িয়া লয়। তৎপরে বাক্সে করিয়া পারস্য, আরব, রুশ, আফগানিস্থান ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ঐগুলি চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

চীনদেশের রেশমও অতি বিখ্যাত। প্রবাদ এই,—চীনদেশের কোন সাম্রাজ্ঞী সর্ব্বপ্রথমে রেশম হইতে সূতা কাটিয়া লইয়া তাহা দিয়া কাপড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য প্রতি বৎসরের নবম মাসে ঐ রাণীর উদ্দেশে পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ দেশের রাজা কোমরে লাঙ্গল দিয়া চাষ করেন,

এবং রাণী সহচরীদিগের সহিত তুঁতের পাতা তুলেন। এইটী ঐ দেশের নিয়ম। বোধ হয়, কৃষিবিষয়ে দেশীয় স্ত্রীপুরুষ-দিগকে আদর্শ ও উৎসাহ দানের জন্য ঐ নিয়ম হইয়া থাকিবে। ঐ দেশের অনেক দরিদ্র বালক বালিকা পর্য্যন্ত রেশমের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

চীনদেশের লোকসংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক, এই জন্য জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ইহাদিগকে যথেষ্ট শ্রম করিতে হয়। পূর্ব্বকাল হইতে ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল। চীন-দেশীয় বিখ্যাত প্রাচীর তাহার এক বিশেষ নিদর্শন। এই দেশে সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ঐ দেশীয়েরা উত্তম রেশমী বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে বলিয়া প্রাচীনকাল হইতে ঐ বিষয়ে চীনের খ্যাতি আছে। চীনে মাটীর দোয়াত ও চীনে মাটীর বাসন, এ দেশের সকলেই দেখিয়াছেন। ইহারা খোদাই কার্য্য এবং চিত্ররচনাতেও বিশেষ নিপুণ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকে অনেক প্রকার শিল্পকার্য্য জানে।

ঐ দেশের ভাষা অত্যন্ত কঠিন। শুনা যায় ঐ ভাষার বর্ণমালা নাই। ২১৮ মূল শব্দ বা ধাতু আছে। ঐগুলি রূপান্তর করিলে অনেক পদ হয়। এই ভাষা কঠিন বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, এদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবহার অত্যন্ত কম। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, এক সহস্র স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন উত্তমরূপে পড়িতে ও লিখিতে পারেন।

শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম, কাব্যপুরাণতীর্থ।

বারাণসীতত্ত্ব।

সপ্তম অধ্যায়।

ভেলুপুরা মহল্লা।

নগরের দক্ষিণভাগ ভেলুপুরা নামে খ্যাত। স্থানটী মিউনিসিপালিটি-ভুক্ত। ইহার নদীসম্মুখস্থ স্থানটী ইষ্টকনির্ম্মিত এবং অবশিষ্টাংশ ফাঁকা। আবাসভূমির চতুর্দ্দিকে বিশেষরূপে চাষ হইয়া থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণাবস্থিত খজুয়া এবং নবাবগঞ্জ নামক মহল্লা ব্যতিরেকে পল্লিটীর কোন স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক নহে। এখানকার অধিবাসীরা জাতিতে হিন্দু, কিন্তু শিবালয়ের সন্নিকটে বহু-সংখ্যক মুসলমানেরও বাস। দিল্লীরাজের বংশধরগণ এবং তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ এই স্থানে বাস করেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তুলসীঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ এবং মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রায়ই বাস করেন। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে দুইটী

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে অসি শড়ক এবং পশ্চিম দিকে দুর্গাকুণ্ড বা ভেলুপুরা-রাস্তা অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত রাস্তাটী অসি ও গঙ্গাসঙ্গমের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্নিকটে বারাণসী ক্ষেত্রের Water-works এর প্রধান আড্ডা। রাস্তাটী অসি, ভদাইনি এবং শিবালয় মহল্লার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানে উকীল এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের আবাস-গৃহ এবং উদ্যান। ইহার সান্নিধ্যে হিঙ্গিয়া তালাও নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল, কিন্তু তাহা এখন বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। তালাওয়ের উত্তর দিকের রাস্তাটী ঘন আবাস ভূমির ভিতর দিয়া গিয়া সুবৃহৎ বাঙ্গালীটোলা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাম-নগরের বিপরীত দিকে ঘোরা ঘাট হইতে ভেলুপুরা রাস্তার আরম্ভ। ইহার দুই পার্শ্বে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের অট্টালিকা অবস্থিত, তন্মধ্যে মির্জ্জাপুরের অগোরী বড়হারের রাণীর প্রাসাদটী দেখিবার বস্তু। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রসিদ্ধ দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। এখানে বানরগণ দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে। যাত্রিগণ তাহাদিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করে বলিয়া তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন যে এখানে বানরের এত সেবা হইয়া থাকে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। দুর্গাকুণ্ডের সহিত বানরদিগের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। রামের মন্দির অথবা হনুমানের মন্দির হইলে বানর-সেবার কতকটা যুক্তি থাকিতে পারিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা কিছু দেখা যায় না। এখানকার মন্দিরে যে দুর্গামূর্ত্তি আছে, তাহা বাঙ্গালী রাণীর দ্বারা স্থাপিত। মূর্ত্তির শিল্প-পারিপাট্য নাই। দুর্গা মহাদেবের স্ত্রী। শাস্ত্রে ইনি শক্তিভূতা সনাতনী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মূর্ত্তির নীচে মহিষাসুর পতিত। দানবগণ যখন দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে, তখন দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেবের আদেশে দুর্গাদেবী অসুর-মর্দ্দনের ভার লয়েন। পূর্ব্বে এই স্থানটি নগণ্যের মধ্যে ছিল। আধুনিক অট্টালিকাটি সুবিখ্যাত রাণী ভবানী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহার সংলগ্ন উত্তর দিকে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে অসিঘাট-প্রস্থিত শাখা-শড়কে কুরুক্ষেত্র-তালাও নামে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। রাণী ভবানীই এই পুষ্করিণী খনন করান। জলাশয়টী চতুষ্কোণ এবং ইহার সোপানাবলী প্রস্তরনির্ম্মিত। সূর্য্যগ্রহণের সময় এখানে বহু স্নাতকের সমাগম হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র-তালাওটী ভাদিনী মহল্লায় অবস্থিত। এখানে নানকসাহি-উদাসী সম্প্রদায়ের "পঞ্চায়তি কলা" নামে একটী আখাড়া আছে। নানকরাম নামে নিজামের জনৈক কর্ম্মচারী ১৭৯০ খৃঃ অব্দে এই আখাড়াটী স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান। উক্ত আখাড়ার বহু স্থানে জমিদারী

আছে। মঠটীর বার্ষিক আয় দশ সহস্র মুদ্রা। ইহার শাখা এলাহাবাদ, হরিদ্বার, গয়া, নাসিক, উজ্জয়িনী, পাটিয়ালা এবং বৃন্দাবনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুর্গাকুণ্ডের সন্নিকটে মেলারাম আখাড়া অবস্থিত। ইহা ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক যোগীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। এলাহাবাদ, অমৃতসর, জব্বলপুর এবং পাটনায় ইহাদিগের শাখা আছে। তৃতীয় আখাড়াটির নাম কিনারাম। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জনৈক রাজপুত দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সদস্যগণ অঘোর পন্থী। হিন্দু ও মুসলমানদিগের হস্তের পাক আহার ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত। দুর্গাকুণ্ডের পশ্চিমে নবাবগঞ্জ এবং খজুয়ার বৃহৎ কাচ্চা বাজার অবস্থিত। শেষোক্তটীতে শস্য বিক্রয় হইয়া থাকে এবং রং করা বারাণসীর খেলানা এইখানেই পাওয়া যায় বলিয়া স্থানটী প্রসিদ্ধ। দুর্গাকুণ্ডের উত্তরে একটী রাস্তা ওয়াটার ওয়ার্কস্ এবং জৈন মন্দিরের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। এই মন্দিরটী পরেশনাথের জন্মস্থানের চিহ্ন। পরেশনাথ একজন তীর্থঙ্কর ছিলেন। এখান হইতে রাস্তাটী উত্তর-পশ্চিম দিকে সিগ্রা অভিমুখে Central Hindu College অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিকটে ভিঙ্গা রাজার অতিথিশালা বিদ্যমান। ভেলুপুরার শেষ সীমায় লক্ষ-নামক রাস্তা বিরাজিত। এই রাস্তাটী গোদোলিয়া চৌক হইতে "মার বাড়ী" পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভেলুপুরার মূল রাস্তা রেউড়ি গলির বিপরীতে পুলিস-ষ্টেসনের উত্তর দিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং রাজা জয় নারায়ণ নামক মিসনরী কলেজের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়।

দশাশ্বমেধ মহল্লা।

ভেলুপুরার উত্তর দিকে দশাশ্বমেধ মহল্লা। ইহার পূর্ব্ব দিকের অংশটি পাকা। দশাশ্বমেধ-ঘাটের দক্ষিণের কিয়দংশ বাঙ্গালিটোলা নামে খ্যাত। এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশ বাঙ্গালি। পশ্চিম দিকের অর্দ্ধাংশ অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এবং উত্তমোত্তম অট্টালিকা ও উদ্যান দ্বারা পূর্ণ। অধিবাসীর মধ্যে অর্দ্ধাংশ বাঙ্গালি এবং অবশিষ্ট মুসলমান, জুলাহা ও অন্যান্য হিন্দু-বর্গ। এই মহল্লার প্রধান রাস্তা দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে গোদোলিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া অসি এবং চৌক রাস্তার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে সেই রাস্তা আবার পুরতঃ অগ্রসর হইয়া ভেলুপুরার রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালিটোলা অসি-রাস্তা এবং নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। সমুদায় স্থানটী পাকা ও সত্রনিচয় দ্বারা পূর্ণ। এখানে "জঙ্গমবারী উরী" মঠ অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মানস-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে রাজা

মানসিংহের মন্দির দ্বারা বেষ্টিত। অন্যান্য মহল্লা অপেক্ষা এখানে পবিত্র স্থানের সংখ্যা অধিক। এখানকার রাম ও লক্ষণের মন্দিরটি খুবই প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের সীমার মধ্যে দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি আছে ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। দুর্ব্বাসা এবং চন্দ্র ইহাঁর ভ্রাতা। মানস-সরোবরের পূর্ব্বদিকস্থ দ্বারে দুইটি বহু পুরাতন মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে একটি বেদীর উপর দণ্ডায়মান ও অন্যটি বাটীর প্রাচীরে সংলগ্ন। প্রথম মূর্ত্তিটী বালকৃষ্ণ এবং অন্যটি চতুর্ভূজ। মানস-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। ইনি তিলভাণ্ডেশ্বর নামে খ্যাত। ইহার শরীরের বেড়টি অনূন ১৫ ফিট এবং উর্দ্ধে ইনি ৪॥ ফিট। লোকের বিশ্বাস ইনি প্রত্যহ তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হন। এই জন্যই ইহার নাম তিলভাণ্ডেশ্বর। মন্দিরটি উচ্চ চত্বরের উপর অবস্থিত। চত্বরের উপরে আরোহণ করিতে হইলে সিঁড়ি দ্বারা যাইতে হয়। প্রস্তরনির্ম্মিত একটি ষণ্ডমূর্ত্তি সম্মুখে অবস্থিত। তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের দ্বারের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠাকুর-দোয়ারা আছে, তাহাতে অনেকগুলি মূর্ত্তি আমাদের নয়নপথের পথিক হয়। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে "সামাকার্ত্তিক" নামে একটি বিগ্রহ আছে। এই নামের দেবতা বারাণসী ধামে আর নাই। পূর্ব্ব দিকে একটি বিষ্ণু-পাদপদ্ম বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত তিনটি সর্পদেবতা, মহাদেবের ত্রিমূর্ত্তি এবং গণেশের মূর্ত্তি আছে। তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে বীরভদ্রের ভগ্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি প্রকাণ্ড, কিন্তু ঔরঙ্গজেব দ্বারা চূর্ণীকৃত। অসি এবং দশাশ্বমেধ রাস্তার সঙ্গমস্থানের অট্টালিকাগুলি অতি কুৎসিৎ কিন্তু ধনাঢ্য বাঙ্গালিদিগের দ্বারা গঠিত উত্তমোত্তম অট্টালিকা দ্বারা স্থানটি ক্রমশঃ মনোরম হইতেছে। দশাশ্বমেধ রাস্তার উত্তরে এবং চৌকরাস্তা ও ঘাটের মধ্যে যে স্থান তাহা "তেহরি নীম" নামে খ্যাত। এখানকার অট্টালিকাগুলি পাক্কা। অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী ও মন্দির এই স্থানটীর শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে লহনাসিংহের বৈঠক নামক একটী সুন্দর মন্দির, পুরাতন গোঁসাই মঠ এবং কাশ্মিরের মহারাজ দ্বারা পরিচালিত একটী সুবৃহৎ সত্র উল্লেখযোগ্য। চৌক রাস্তার পশ্চিমে হওজকটরা মহল্লার একটী বাজার এবং দশাশ্বমেধের পুলিস থানা অবস্থিত। দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে আর একটি বড় বাজার আছে। এখানে মৎস্য এবং শাক-শব্জি বিক্রয় হইয়া থাকে। এই বাজারের ক্রেতৃগণ সকলেই বাঙ্গালী। বাজারে কিরূপ জনতা হয়, তাহা প্রাতঃকালে আসিয়া দেখিলে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। পশ্চিম দিকে চৌক এবং লক্ষ রাস্তার মধ্যবর্ত্তী পান-দরিয়া নামক একটি প্রধান পান বাজার

আছে। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের সন্নিকটে লক্ষ্মীকুণ্ড নামে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ৮ই ভাদ্র হইতে ৮ই আশ্বিন পার্য্যন্ত সূর্য্য-মেলা হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ মহিলাগণ উক্ত কুণ্ডে স্নান করেন এবং লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে গিয়া পূজা করিয়া থাকেন। মেলার শেষ দিনে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কুণ্ডের দক্ষিণে অসি এবং ভেলুপুরা রাস্তার মধ্যে মদন-পুরা নামক স্থান অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা বহুলাংশে তন্তুবায়। ইহারা জুলাহা নামে খ্যাত। জেইতপুরার মোওয়ালাজদিগের সহিত ইহাদিগের পার্থক্য আছে। গোদোলিয়া নামক স্থানে একটি গির্জ্জাঘর দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে "লক্ষ" রাস্তা পশ্চিমবাহিনী হইয়া মিসনরী পোখরাকে অতিক্রম করতঃ চলিয়া গিয়াছে। ইহার অনতিদূরে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের উত্তরে থিওসোফিকেল সোসাইটির কামক্ষা নামক আড্ডা অবস্থিত। উল্লিখিত রাস্তার পরেই মিউনিসিপালিটীর অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত স্থানটী উত্তমোত্তম অট্টালিকা দ্বারা পরিশোভিত।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী

(তাঁহার লিখিত ডায়েরী)

১৮৭৩।

৪৩ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৮ই মাঘ, সোমবার—সঙ্গত-সভার সাংবৎসরিক—আমরা নিজে অক্ষম হইলেও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সম্পন্ন হইয়া যায় এবং সামান্য পরিশ্রম ও চেষ্টায় কি আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছে দেখিয়া যারপর নাই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

৯ই মাঘ—ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির সঙ্গে ব্রাহ্মগণের আন্তরিক দুরবস্থা প্রত্যেক ব্রাহ্মের চিন্তার বিষয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মের স্বার্থপরতা ও সুখভোগ ত্যাগ করিয়া তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে।

১০ই মাঘ—ঈশ্বর আছেন সেই সামান্য কথা শুনিয়া অতি পাষণ্ডদিগেরও হৃদয় গলিয়া অশ্রুতে শরীর প্লাবিত হইল। কেন? স্পষ্ট যে দেখিলাম ঈশ্বর আছেন। যেখানে যাই, সেখানে 'আমি আছি।' স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। চোর ভূমিতে পড়িয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল, অশ্রুতে পথের ধূলি পরিষ্কার হইয়া, 'আমি আছি'—দেখাইল।

ঈশ্বর হৃদয় গড়িবার সময় স্বর্ণাক্ষরে তাহাতে "আমি আছি" লিখিয়া দিয়াছেন। কেউ না দেখিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রহ্ম-পতিত হইয়া কতদূর চলিয়া গেল আবার দেখিয়া ফিরিল। "আমি আছি" ঈশ্বর বলিলেন যথেষ্ট। দুঃখীর দুঃখ, শোকার্ত্তের ক্রন্দন, পাপীর পাপ, মুমূর্ষুর ভয় সকল গেল।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—দৃশ্য কি মনোহর! উন্মত্ততা আবশ্যক। লোককে বড় আকর্ষণ করে।

রাত্রি—গত বৎসরের ঘটনা সকল জীবনপটে ঈশ্বরের যে করুণা লিখিয়া দিয়া গেল পাঠ করা আবশ্যক।

১১ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—আমাদিগের ঈশ্বর সুন্দর, তাঁহার ন্যায় সুন্দর আর কোন দেবতা হইতে পারে না। ঈশ্বরের সত্য, প্রেম, পবিত্রতা—সকল গুণের সমষ্টি তাঁহার সৌন্দর্য্য। মনুষ্যেরা যতদূর পারে, তাহাদিগের দেবতাকে সুন্দর করে, কিন্তু ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য কি মনুষ্য হস্ত দ্বারা বহির্গত হইতে পারে? মনুষ্য তাঁহার সৌন্দর্য্য বিকৃত ও কলঙ্কিত না করে এই জন্য তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে সৃজন করিবার সময়ে তাহার হৃদয়-পটে আপনার সুন্দর মুখ সুন্দর হস্তে অতি সুন্দর করিয়া আঁকিয়া দিয়াছেন। সে মুখের নিকট আর সকলি কুৎসিত, তাহা দেখিলে আর কি নয়ন ফিরে? ব্রাহ্মগণ! সেই মুখের প্রতি কি দৃষ্টি পড়িয়াছে? একটি বালকের দৃষ্টি মোহিত হইয়া সে দিকে তাকাইয়া থাকিলে তাহার পিতা মাতা সকলে এক এক করিয়া সেইখানে আসিয়া পড়িবে, দেশশুদ্ধ লোক ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইবে।

ব্রাহ্মগণ! আজও দেশ-শুদ্ধ লোক কেন ব্রাহ্ম হইল না? তোমাদিগের সকলের দৃষ্টি যে তাঁহাতে আকৃষ্ট হয় নাই। তোমরা শূন্য, শুষ্ক, কল্পনা-নির্ম্মিত কুৎসিত দেবতার উপসনা কর।

ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যান কেন? তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট আপনাদের ধন, পাণ্ডিত্য, বা সাধুতা কিছু কালের জন্য বন্ধক দেন, আবার সুযোগ পাইলেই আপনাদের বন্ধকী জিনিষ খোলসা করিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের বিবেচনায় ঈশ্বরের দাম কম, তাঁদের ধনের দাম বেশী, বেশী দামের জিনিষ না হইলে বন্ধক হইবে কেন? এইরূপ ঈশ্বরের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া অনেকে কিছুদিন আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলেন, পরে নাম কাটান। হে ব্রাহ্ম! তোমার ধনের মূল্য কি এত অধিক, ঈশ্বর-ধনের মূল্য কি এত কম? দুঃখী দীন হীন ব্রাহ্ম ঈশ্বরের নিকট কিছু বন্ধক রাখেন না, তিনি আপনাকে চিরকালের জন্য বিক্রয় করেন। তিনি দেখেন ছিন্ন বস্ত্র, ভগ্ন পাত্র আমার সম্বল, দিবার কিছুই নাই, ইহা দিয়া ত্রিভুবনের অমূল্য রত্ন পাইলাম, আমি এ ধন কখনই ছাড়িতে পারিব না। আমি যাঁর হইলাম, চিরকাল তাঁরই থাকিব। কেননা, তাঁকে অধিকার করিয়া থাকিতে পারিলে অনন্তকাল সুখ

শান্তি লাভ হয়। এই জন্য যে সকল ধনী পণ্ডিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম অনেক আড়ম্বর লইয়া আসিয়াছিলেন, কেহ দুমাস, দুবছর, দশ বছরে ঈশ্বরের সহিত রোকশোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। দুঃখী ব্রাহ্ম যাবজ্জীবন পড়িয়া রহিল, তাহার দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইল। ঈশ্বর অতি সুন্দর—তাঁহার নিকট এই সমাচার শুনিয়া আরও কত ব্যক্তি লোলুপ হইয়া সেই পথে আসিতে লাগিল।

হে ব্রাহ্মগণ! ঈশ্বরকে ছাড়িও না, তিনি কি ধন চিনিলে না। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখ, আরও সৌন্দর্য্য দেখাইবেন, যে সুখ কোথাও পাইবে না, সেই সুখে চিরকাল সুখী করিবেন। অসার জীবন হইতে সার কথা বহির্গত হয় না, ইহাই সার কথা।

রাত্রি—কি উৎসাহের ব্যাপার, ব্রহ্ম-বিজয়-নিশান পৃথিবীতে যে প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহার আরও কি দৃঢ় প্রমাণ চাই? দক্ষিণ কাণারা হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কল্পিত কথা নয়, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সত্য। ব্রাহ্মসমাজ পাঁচ জন বালকের নিরর্থক ক্রীড়ার ঘর নয়—ঈশ্বরের হস্তস্থাপিত। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র অন্যের অপেক্ষা সহস্র গুণে অভ্রান্ত। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং", "সত্যমেব জয়তে" 'একমেবাদ্বিতীয়ং' চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়িলেও এ সকল সত্যের খণ্ডন হইবে না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকলকে বোধ হয় বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারেন না। প্রাণ যায় যাক, তথাপি ঈশ্বরের মুখ-বিনির্গত কথা বজ্র-ধ্বনিতে ঘোষিত হইবে।

এদেশীয় ১৯ জন দীক্ষিত হন, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ। আনন্দমোহন বসু, শিব নাথ প্রভৃতি।

চিত্র-পট।

গান।

ওগো শিল্পী ওগো কবি একি ছবি এঁকেছ?
(আমার প্রাণের বিজন কোণে একি ছবি এঁকেছ)
মুছে বিশ্বের আলোর চিত্র,
ওগো সখা ওগো মিত্র,
আমার কাল চিত্ত-পটে একি আলো মেখেছ?
রং ফলিয়ে বিনা বর্ণে,
কান্না হাসির ফুলের পর্ণে
প্রেমের স্বর্ণ-লতার কুঞ্জ সেই ফুলেতে ঢেকেছ।
জগৎ ভরা নর নারী
আঁকা আছে সারি সারি!
তাদের পায়ের স্নিগ্ধ ছায়ে আমায় এঁকে রেখেছ।

শিল্পে তোমার কি চাতুরী !
তোমার মুখের শ্রীমাধুরী
ফুটিয়ে ছবির প্রাণের ভাঁজে, পটের মাঝে
জেগেছ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শিখগ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ, বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য মনে হয় না। পাঠকপাঠিকাগণ অনুবাদের সহিত মূল পাঠ করিলে আনন্দ পাইবেন। ক্রমে শিখ ভাষারও জ্ঞান হইবে।

৮ম শ্লোক।

মন সাচা মুখ সাচা সোয়।
অবর ন পেখৈ একস বিন কোয়।
নানক এই লছন ব্রহমজ্ঞানী হোয়॥

যাঁহার মন সত্য, যাঁহার বাক্য সত্য, এবং যিনি এক ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না, নানক বলিতেছেন, এই লক্ষণেই তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া জানিবে॥

অষ্টপদী।

ব্রহমজ্ঞানী সদা নিরলেপ।
জৈসে জল মহি কমল অলেপ॥
ব্রহম জ্ঞানী সদা নিরদোষ।
জৈসে সুর সরব কউ সোখ॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ দৃষ্টি সমান।
জৈসে রাজ রংক কউ লাগৈ তুলি পবান॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ ধীরজ এক।
জিউ বসুধা কোউ খোদৈ কোউচংদন লেপ
ব্রহম জ্ঞানী কাই কৈ গুনাউ।
নানক জিউ পাবক কা সহজ সুভাউ॥১

ব্রহ্মজ্ঞানী সদাই নির্লিপ্ত,
যেমন জল মধ্যে কমল নির্লিপ্ত।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদাই দোষশূন্য,
যেমন সূর্য্য সকলকেই শুকাইয়া দেয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সম দৃষ্টি,
যেমন পবন রাজা এবং দরিদ্র উভয়েতেই বহিয়া থাকে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ধৈর্য্য এক ভাবে থাকে,
যেমন পৃথিবীকে কেহ খনন করে, কেহ কেহ বা চন্দন লেপন করে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর এই সকল গুণ স্বভাবসিদ্ধ,
নানক বলিতেছেন, যেমন অগ্নির গুণ স্বাভাবিক॥১

ব্রহম জ্ঞানী নিরমল তে নিরমলা।
জৈসে মৈল ন লাগৈ জলা॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ মন হোয় প্রগাশ।
জৈসে ধর উপর আকাশ॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ মিত্র শত্রু সমান।
ব্রহম জ্ঞানী কৈ নাহি অভিমান॥
ব্রহম জ্ঞানী উচতে উচা।

মন অপনৈ হৈ সভতে নীচা॥
ব্রহমজ্ঞানী সে জন ভয়ে।
নানক যিন প্রভু আপ করেয়॥২
ব্রহ্মজ্ঞানী নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল,
যেমন জলেতে মলা লাগে না।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তর আলোকময়,
যেমন পৃথিবীর উপর আকাশ অবস্থিত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট শত্রু মিত্র সমান।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অভিমান নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানী উচ্চ হইতেও উচ্চ,
কিন্তু তিনি আপনাকে সকলের নীচে জানেন।
ব্রহ্মজ্ঞানী সেই হইতে পারে,
নানক বলিতেছেন, যাহাকে প্রভু আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী করেন॥২
ব্রহমজ্ঞানী সগল কি রীনা।
আতম রস ব্রহমজ্ঞানী চিনা॥
ব্রহমজ্ঞানী কি সভ উপরময়া।
ব্রহমজ্ঞানী তে কছু বুরা ন ভয়া॥
ব্রহমজ্ঞানী সদা সমদরশী।
ব্রহমজ্ঞানী কি দৃষ্টি অমৃত-বরষী॥
ব্রহমজ্ঞানী বন্ধন তে মুকুতা।
ব্রহমজ্ঞানী কি নিরমল যুগতা॥
ব্রহমজ্ঞানী কা ভোজন গিয়ান।
নানক ব্রহমজ্ঞানীকা ব্রহম ধিয়ান॥৩
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের রেণু।
ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মার রহস্য চিনিয়াছেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সকলের উপর দয়া।
ব্রহ্মজ্ঞানীর দ্বারা কাহারও কিছু অনিষ্ট হয় না।
ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বদা সমদর্শী।
ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি অমৃত বর্ষণ করে।
ব্রহ্মজ্ঞানী বন্ধন হইতে মুক্ত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর যুক্তি নির্ম্মল।
ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানই আহার।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মই ধ্যান॥৩
ব্রহমজ্ঞানী এক উপর আশ।
ব্রহমজ্ঞানীকা নহি বিনাশ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ গরিবী সমাহা।
ব্রহমজ্ঞানী পর-উপকার উমাহা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাহী ধন্ধা॥
ব্রহমজ্ঞানী লে ধাবত বন্ধা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ হোয় সুভলা।
ব্রহমজ্ঞানী সুফল ফলা॥
ব্রহমজ্ঞানী সঙ্গ সগল উধার।
নানক ব্রহমজ্ঞানী জপৈ সগল সংসার॥৪
ব্রহ্মজ্ঞানীর আশা একেরই উপর।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনাশ নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনয়েতেই আনন্দ।
ব্রহ্মজ্ঞানীর পরোপকারেই সন্তোষ।
ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কর্ম্ম নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানী চঞ্চল মনকে বন্ধন করেছেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর শুভ হয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সুফল লাভ হয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত সকলের উদ্ধার হয়।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল সংসার পূজা করে॥৪
ব্রহম জ্ঞানী কৈ এৈকে রংগ।
ব্রহম জ্ঞানী কৈ বসৈ প্রভু সংগ॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ নাম অধার।
ব্রহম জ্ঞানী কৈ নাম পরবার॥

ব্রহমজ্ঞানী সদা সদ জাগত।
ব্রহমজ্ঞানী অহং-বুদ্ধি তিয়াগত॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ মন পরমানন্দ।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ ঘর সদা অনংদ॥
ব্রহম জ্ঞানী সুখ সহজ নিবাস।
নানক ব্রহমজ্ঞানী কা নহী বিনাশ॥৫
ব্রহ্মজ্ঞানীর মনের একই অবস্থা।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত ব্রহ্ম থাকেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ভগবৎ নামই আধার।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ভগবৎ নামই সঙ্গী।
ব্রহ্মজ্ঞানী সতত জাগ্রৎ।
ব্রহ্মজ্ঞানী অহং-বুদ্ধি-হীন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়ে পরমানন্দ বিরাজ করে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ঘরে সদাই আনন্দ।
ব্রহ্মজ্ঞানী সুখে ও শান্তিতে বাস করে।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনাশ নাই॥৫

ব্রহমজ্ঞানী ব্রহমকা বেতা।
ব্রহমজ্ঞানী এক সংগ হেতা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ হোয় অচিংত।
ব্রহমজ্ঞানীকা নিরমল মংত॥
ব্রহমজ্ঞানী যিস করৈ প্রভ আপ।
ব্রহমজ্ঞানী কা বড় পরতাপ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা দরশ বড়ভাগী পাইয়ে।
ব্রহমজ্ঞানী কউ বল বল যাইয়ে॥
ব্রহমজ্ঞানী কউ খোজহি মহেশুর।
নানক ব্রহমজ্ঞানী আপ পরমেশুর॥৬
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ হয়েন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সেই একের সঙ্গে প্রেম।
ব্রহ্মজ্ঞানীর চিন্তা নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানীর মত নির্ম্মল।
যাহাকে প্রভু ব্রহ্মজ্ঞানী করেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অত্যন্ত প্রতাপ।
সৌভাগ্যশালীরাই ব্রহ্মজ্ঞানীর দর্শন পায়।
ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলিহারি যাই।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুসন্ধান মহেশ্বর করেন।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীই স্বয়ং পরমেশ্বর॥৬

ব্রহমজ্ঞানী কি কিমত নাহি।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ সগল মনমাহি॥
ব্রহমজ্ঞানী কা কউন জানৈ ভেদ।
ব্রহমজ্ঞানী কউ সদা আদেশ॥
ব্রহমগিয়ানী কা কথিয়া ন যায় অধাখর।
ব্রহমগিয়ানী সরব কা ঠাকুর॥
ব্রহমগিয়ানী কি মতি কউন বখানৈ।
ব্রহমগিয়ানী কি গতি ব্রহমগিয়ানী জানৈ॥
ব্রহমগিয়ানী কা অন্ত ন পার।
নানক ব্রহমগিয়ানী কউ সদা নমস্কার॥৭
ব্রহ্মজ্ঞানীর মূল্য নির্দ্দেশ হয় না।
ব্রহ্মজ্ঞানীর মনোমধ্যে সকল বস্তু।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় কে জানিতে পারে?
ব্রহ্মজ্ঞানীকে সর্ব্বদা নমস্কার করি।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অর্দ্ধ অক্ষরও বর্ণনা করা যায় না।
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের ঈশ্বর।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় কে বলিতে পারে?
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় ব্রহ্মজ্ঞানীই জানেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্ত বা পার নাই।
নানক ব্রহ্মজ্ঞানীকে সদা নমস্কার করিতেছেন॥৭

ব্রহমজ্ঞানী সভ সৃষ্টিকা করতা।

ব্রহমজ্ঞানী সদ জীব নহি মরতা॥
ব্রহমজ্ঞানী মুকত যুগত জীয়কা দাতা।
ব্রহমজ্ঞানী পূরণ পুরুষ বিধাতা॥
ব্রহমজ্ঞানী অনাথ কা নাথ।
ব্রহমগিয়ানী কা সভ উপর হাথ॥
ব্রহমগিয়ানী কা সগল অকার।
ব্রহমগিয়ানী আপ নিরংকার॥
ব্রহমজ্ঞানী কি শোভা ব্রহমজ্ঞানী বনী।
নানক ব্রহমজ্ঞানী সবর কা ধনী॥৮
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদা জীবিত, মৃত হয়েন না।
ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষের মুক্তি ও বিবেকের দাতা।
ব্রহ্মজ্ঞানী পূর্ণ-পুরুষ বিধাতা।
ব্রহ্মজ্ঞানী অনাথের আশ্রয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর হস্ত সকলের উপর প্রসারিত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সকল সৃষ্ট-বস্তুর উপর অধিকার।
ব্রহ্মজ্ঞানীই স্বয়ং নিরহঙ্কার পুরুষ।
ব্রহ্মজ্ঞানীর শোভা ব্রহ্মজ্ঞানীতেই সাজে।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী সকল ধনে ধনী॥৮

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষ।

সে আসিয়াছিল, আবার চলিয়া গেল। নিরূপিত সময়ে সে চলিয়া গেল। আমাদের পৃথিবী তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কত যত্নে, কত মমতায় গ্রীষ্ম তাহাকে উত্তাপ দিয়াছিল, বর্ষা তাহাকে স্নান করাইয়াছিল, শরৎ তাহাকে কৌমুদী-স্রোতে ভাসাইয়াছিল, হেমন্ত তাহাকে শৈত্য মাখাইয়াছিল, শীত তাহাকে জড়-সড় করিয়াছিল, বসন্ত তাহাকে শ্যামলোচ্ছ্বাসে, মধুর বাতাসে পূজা করিয়াছিল। ফল-ফুলে তরুলতা তাহাকে প্রীতি-উপহার দিয়াছিল, বিহঙ্গকুল তাহাকে গান শুনাইয়াছিল, মানব বার মাসে "তের পার্ব্বণ" করিয়া তাহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল। যাহার যাহা ছিল, তাহার প্রীত্যর্থে তাহা সকলেই দিয়াছিল, কিন্তু তবু সে থাকিল না। সকল আদর ও যত্ন অবহেলা করিয়া, সকল আত্মীয়তা উপেক্ষা করিয়া, সে কর্ত্তব্য-পরায়ণ নিষ্ঠুর—তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইলেই চলিয়া গেল! এত আয়োজনে মমতা-ডোরে কেহ তাহাকে বাঁধিতে পারিল না! সে সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল। এ জগতে যাহারা আসে, তাহারা এমনি করিয়া চলিয়া যায়। এই চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্রালোকময় নীলাকাশ, এই ফল-ফুল-সুশোভিত তরু-লতা, এই বিহঙ্গ-কূজিত শ্যামল বনরাজী, স্বচ্ছ-সলিল-পূর্ণ নদ-নদী ও সরোবর, এই বৈচিত্র-

নয় ছয় ঋতু, এই উত্তাল-তরঙ্গ-পূর্ণ বিশাল সমুদ্র, উন্নত-শীর্ষ মহাকায় পর্ব্বত শ্রেণী এই মানবের ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, এই আশা-ভরসা-পৌরুষ, এই সম্মান গৌরব যশঃ, এই বিদ্যা বুদ্ধি সম্পদ এই জগতের শত সহস্র প্রকার বন্ধন—মানব দানবীর হরিশচন্দ্রই হউক, কর্ম্মবীর রামচন্দ্রই হউক, তেজস্বী কর্ণই হউক, যশস্বী অর্জ্জুনই হউক, সে দয়াশীলতায় শাক্যসিংহই হউক, নিষ্ঠুরতায় তৈমুরলঙ্গই হউক, সে আত্মত্যাগে যীশুখ্রীষ্টই হউক, স্বার্থপরতায় আরঙ্গজেবই হউক, সে ঐশ্বর্য্যশালিতায় গজনীর মামুদই হউক দারিদ্রে রঘু ভিখারীই হউক, মানব যাহাই কেন হউক না, নিরূপিত সময়ে এই পুরাতন বর্ষের মত সকল ছাড়িয়া তাহাকে যাইতেই হইবে। অতৃপ্ত কামনা ভোগ করিবার জন্য সে অতিরিক্ত একদিনও থাকিতে পারিবে না। কিন্তু সে যে সকল প্রিয়তর, প্রিয়তম ভোগ্য ফেলিয়া চলিয়া যাইবে—সেই অজ্ঞাত দেশে যাইবার পাথেয় সে সংগ্রহ করিতে পারে কই? আমরা সকলেই ত শুনিয়াছি, সে পাথেয়—ধর্ম্ম। হায়, তবে আমরা কেন বুঝিলাম না?—কয় দিনের জন্য আসিয়া কেন এমন করিয়া মজিলাম? কেন আপাত সুখের প্রলোভনে ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিকাশ পাইতে দিলাম না?—কেন অধর্ম্মাচরণ করিলাম?

লোকে বলিয়া থাকে,

—"ত্বয়া হৃষীকেশ!—
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

কিন্তু আমার সেই শুদ্ধ, সত্যস্বরূপ, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দেবতা কখনও কি আমাকে অধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত করিতে পারেন? তিনি যে আমাদিগকে অধর্ম্ম-পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য কত উপায় বিধান করিয়াছেন। ধর্ম্মভাব ও সাধুভাব প্রতি আমাদের স্বাভাবিক অনুরাগ, আমাদের আত্মসংযম, আমাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, আমাদের ত্যাগস্বীকার জনিত আত্মপ্রসাদ—এ সব কিসের জন্য দিয়াছিলেন? আমরা ধর্ম্মপথে থাকিব, শেষের দিনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইব বলিয়া। কিন্তু হায়, মূর্খ মানব, অপরিণামদর্শী মানব, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কারাদি রিপুগণের উত্তেজনায় সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিয়া যায়! মানব-জীবন কেবল দুঃখের বোঝা, অশান্তির বোঝা করিয়া ফেলে। কি দারুণ ভ্রান্তি!

যাহা হউক, বলিতেছিলাম, আমাদের সে পরিচিত বর্ষ চলিয়া গেল। তাহাকে কোনরূপেই আমরা রাখিতে পারিলাম না।—কাহাকেও আমরা রাখিতে পারি নাই। আমাদের কালিদাস, ভবভূতি গেলেন, আমাদের রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গেলেন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র গেলেন, আমাদের রাখালদাস ন্যায়রত্ন গেলেন, গোপালকৃষ্ণ গোখেলেও গেলেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শরৎ সুন্দরী গেলেন,

দেবী ভগবতী ও সারদা সুন্দরী গেলেন, আনন্দ বাই যোশী গেলেন, দেবী জগত্তারিণীও গেলেন, আমরা কাহাকেও রাখিতে পারিলাম না! তবু আমাদের কত স্পর্দ্ধা! শক্তি-প্রয়োগের কতই গর্ব্ব! আমাদের মত অর্ব্বাচীন আর কোনও জগতে বর্ত্তমান আছে কি?

তবে তুমি যাও। আমাদের পরিচিত প্রিয় পুরাতন বর্ষ! তবে তুমি যাও। আমাদের বর্ষব্যাপী ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের স্মৃতি লইয়া, আমাদের বর্ষব্যাপী রোগ-আরোগ্য, সুখ-দুঃখ, আশা-দুরাশা, উদ্যম জড়তা, উন্নতি অবনতির চিহ্ন বহিয়া, আমাদের সংবৎসরের পরমায়ু গ্রহণ করিয়া তুমি চিরদিনের জন্য কাল-স্রোতে ভাসিয়া যাও। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি আমাদের জীবনে যে সকল অভাব দেখিয়া গেলে আগামী বর্ষে তাহা পূর্ণ হউক, তুমি যাহা অবনতি বুঝিয়া গেলে ভগবৎকৃপায় তাহাই আগামী বর্ষে উন্নতির সোপান হউক।

লেখিকা—শ্রীমা—

শিল্প-শিক্ষা।

আজকাল সকলেই শিল্প-শিক্ষার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক। বর্ত্তমান সময়ে নানারূপ শিল্পেরও প্রচলন হইতেছে বটে, কিন্তু এক্ষণে আমাদের দেশে সূচী-শিল্পেরই অধিক প্রয়োজন। গৃহসজ্জা, পুত্রকন্যা-গণের বাটীতে পরিবার উপযোগী পরিচ্ছদ প্রভৃতি এখন প্রায় সকলেই নিজের হস্তে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক এবং অনেকে তাহাই করেন। আধুনিক সভ্যতার গুণে গৃহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য রমণীগণ নানারূপ শিল্প শিক্ষা করিয়া গৃহাদি সজ্জিত করিতেছেন। এক দিকে যেমন গৃহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, অপর দিকে নিজ নিজ শিশু-সন্তানদিগকে সভ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্যও চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে বঙ্গগৃহের গৃহলক্ষ্মীগণের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধন হইতেছে। এখন আর বৃথা গল্প ও তাসখেলা কিম্বা দিবা-নিদ্রায় তাঁহারা সময়ের অপব্যয় করিতে পারেন না।

গৃহ ও সন্তানগণের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যাঁহারা উদাসীন, তাঁহারাও অন্যের গৃহের সৌন্দর্য্য ও সন্তানগণের পরিষ্কার পরি-চ্ছন্নতা দর্শন করিয়া নিজেদের গৃহ ও সন্তানগণকে ঐ প্রকারে রাখিতে সচেষ্ট হইবেন। তাঁহাদের মনের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, এবং ইহাতে গৃহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য উভয়ই বৃদ্ধি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। শিশু-

দিগের বেনিয়ান্, ফ্রক, পাজামা ও নিজেদের সেমিজ, ক্রুশের কাজ প্রভৃতি আজকাল প্রায় সকলেই প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু জ্যাকেট প্রভৃতি কাটিতে প্রায় অনেকেই পারেন না, এজন্য অনেকেই ইহা শিখিতে ইচ্ছা করেন। আজ একটী জ্যাকেট কাটিয়া শিক্ষাভিলাষিণী পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য ইহার সহিত দেওয়া হইল, ইহাতে কিরূপে জ্যাকেট কাটিতে হয় তাহার একটি নমুনা পাইবেন।

জ্যাকেটের প্রথমে দুইটা সম্মুখ দিকের বুক কাটিতে হয়,পরে পিঠ ও তাহার পর পার্শ্বের দিক কাটিয়া লইলেই বডি হইল। হাত নিজেদের রুচি মত কাটিতে পারেন, ইহার কোনও গোল নাই, সুধু (Armhole) অর্থাৎ বগলের দিক একটু কাটিয়া লইতে হয়।

এখন ইহার মাপ কিরূপে লইতে হয় তাহা জানা আবশ্যক। একটী গজের ফিতা লইয়া যে গায়ের জ্যাকেট হইবে তাহার মাপ লইতে হইবে। প্রথমতঃ বুকের (ছাতির) চওড়া, (নমুনার ৪ চিহ্নিত স্থান হইতে সম্মুখের বুকের শেষ পর্য্যন্ত চওড়া), তৎপরে বগলের নীচে হইতে বুকের সম্মুখ পর্য্যন্ত চওড়া, পরে পিঠের চওড়া (পিঠের কাটের নমুনার ৪ চিহ্নিত স্থান হইতে সমস্ত চওড়াটা), পরে কোমরের বেড়, বুকের ২ চিহ্নিত স্থান হইতে সম্মুখের চওড়া, পিঠের ১ চিহ্নিত স্থান হইতে চওড়া, গলা ও লম্বা ঝুল যেখানে যত মাপ হইবে সেই মাপ অনুসারে কাটিলেই একটী ঠিক গায়ের মতন জ্যাকেট হইবে। ইহার সঙ্গে যে নমুনাটী দেওয়া হইল তাহা অর্দ্ধেক, (এক দিকের বুক, এক দিকের পিঠ, এক দিকের পার্শ্বের)। এইরূপ বুক পিঠ ও পার্শ্বের কাপড় ডবল করিয়া লইয়া কাটিলেই একেবারে একটী পুরা জামা কাটা হইয়া যাইবে।

যাঁহাদের গজের ফিতা দিয়া মাপিয়া করা কঠিন বোধ হইবে, তাঁহারা এই কাটটীকে কাপড়ের উপর ফেলিয়া অনায়াসে কাটিতে পারেন। যে জ্যাকেট এই মাপ হইতে ছোট হইবে তাহা ইহা হইতে একটু ছোট করিয়া, আর যেটী বড় হইবে তাহার কাপড় এই মাপ হইতে বড় করিয়া রাখিয়া কাটিলেই হইতে পারে।

জ্যাকেট সেলাই করিবার নিয়ম— প্রথম বুকের পার্শ্বের কাটের যে দিকটা ছোট (২ চিহ্নিত), সেই দিকের সঙ্গে পার্শ্বের কাটের টুকরার (২ চিহ্নিত) ছোট মুখের সঙ্গে জোড়া দিতে হইবে, পরে পিঠের কাটের যে দিকটা কোর করিয়া কাটা (১ চিহ্নিত) সেই দিকের সহিত পার্শ্বের কাটের যে দিকটা বেশী লম্বা (১ চিহ্নিত) সেই দিকের সহিত জোড়া দিতে হইবে, তৎপরে ৩ চিহ্নিত বুকের কাঁধের সহিত ৩ চিহ্নিত পিঠের কাঁধের কাটের জোড় হইবে। এইরূপে দুইটী বুক ও পিঠ দুইটী পার্শ্বের কাটের সহিত

জোড়া দিয়া দুইটী পিঠের মাঝে (দুই দিককার পিটের টুকরা) সেলাই করিয়া কাঁধ দুইটী সেলাই করিয়া পরে ৪ চিহ্নিত হাতের গর্ত্তের (Armhole) সঙ্গে হাত সেলাই করিলেই একটী সম্পূর্ণ জ্যাকেট তৈয়ারী হইল।

হাতের মাপও ঐরূপেই লইতে হইবে। আজ যে কাটটী দেওয়া হইল ইহাতে যদি শিক্ষার্থিনীগণের শিখিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে পরে অন্যান্য কাট দিবার ইচ্ছা রহিল।

৺ সুকান্তি-লিখিত দৈনিক লিপি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

২৯শে পৌষ, সোমবার।

পরম করুণাময় পিতা ! তুমি যে অসীম করুণার আধার তাহা বেশ বুঝিলাম। নতুবা এত পাপ করিয়াও কেন তোমার করুণা হ'তে বঞ্চিত হই নাই। তুমি যে পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা তা'তে আর সন্দেহ কি? হৃদয়ে যে নূতন আশা দিলে, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার করুণায় যেন তাহা অপূর্ণ থাকে না। তোমার নামে যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, তাহা যেন সর্ব্বদা প্রাণে ধ্বনিত হইতে থাকে। প্রভো ! হৃদয়ে বল দাও যেন দুর্ব্বলতাকে জয় করিতে পারি। আমি ত মানুষ, মানুষ করে যখন সৃজন করেছ, তখন মানুষের সবই ত আমাতে আছে। তবে আমি নিরাশায় পশ্চাৎপদ হই কেন? প্রভো! প্রাণে সুমতি জাগিয়ে দাও। আবার নূতন উদ্যমে যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি। তোমাকে যেন কখনই ভুলি না। তোমার অসীম ক্ষমতা যেন প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে উপলব্ধ করিতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

২৮শে চৈত্র। ১০ই এপ্রিল।

দয়াময়, আজ শরীর মন বড় দুর্ব্বল। প্রাণে তোমার শক্তি আর অনুভব করি না, স্ফূর্ত্তি পাই না, হৃদয় যেন অলসতায় ডুবিয়াছে। মনে হয় তুমি পাপী বলে আমাকে তোমার করুণা হ'তে বঞ্চিত কর্‌লে। মন যেন নিরাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। জীবনে আর কোন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিব, সুপথে চালিত হইব,বলিয়া মনে হয় না। দয়াময়! এ পরিবর্ত্তনের মাঝে কোন্ পাপশক্তি কার্য্য করিতেছে বুঝি না। তোমার করুণা-হারা হয়ে এখন যে সংসার সাগরে কেঁদে মর্‌ছি। যখন ভাবি দরিদ্রতার কথা—যখন তোমার শক্তি ভুলে নিজের

ক্ষুদ্র শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া লাঞ্ছিত হই, তখন সংসারের প্রতি আর শ্রদ্ধা থাকে না। ঐ যে রাস্তায়—অসংখ্য মানব যাতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে কয়জন প্রকৃত সুখী? সকলেই সংসারের গঞ্জনায়, প্রলোভনে, অত্যাচারে, অবিচারে অশান্তিতে জর্জ্জরিত। দয়াময়! তবে কি সংসারকে এমনি শ্মশানতুল্য করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছ। আজ যাহাকে সুপথে চলিতে দেখিতেছি, তোমার শক্তি-বলে যাহাকে নূতনভাবে ও আশা দ্বারা অনুপ্রাণিত দেখিতেছি, সংসারের সামান্য দুর্ঘটনায় আবার তাহাকে উৎকণ্ঠিত, জ্ঞানহীনের ন্যায় উন্মত্ত অবস্থায় দেখি কেন প্রভু? তোমাকে বুঝিয়া আবার তোমাকে হারান যে বড়ই কষ্টের কথা, বড়ই অস্বাভাবিক ব'লয়া মনে হয়। দয়াময়! এ সব দেখিয়া মনে হয় তুমি নাই। সংসার কখন সুখের স্থান নয়। অমনি জীবনের সমস্ত লক্ষ্য ভুলে যাই। নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু আবার তোমার কি অদ্ভুত কৌশল যে, অধিকক্ষণ এ ভাব থাকে না। তুমি যেন আবার হৃদয়ে গর্জ্জন করিয়া ভীম স্বরে বলে দাও—সংসার সুখের স্থান, দুঃখের নহে—আমরা অবিবেক, তাই কষ্ট পাই। কুপথে চালিত হয়ে শেষে নৈরাশ্যের কঠোর আঘাতে আত্মঘাতী হতে চেষ্টা করি। কিন্তু তোমার এ উপদেশবাক্য ত হৃদয়ে তখন তেমন কাজ করে না। তখনও সন্দেহ হয়, তুমি আছ কি না? তুমি যদি থাকবে, তবে এত কষ্ট পাই কেন? তোমায় ত কত ডাকৃছি, তুমি সাড়া দাও কই, জীবনে উদ্দীপনা এনে দাও কই? আশায় উদ্দীপিত কর কই? আর যদি এত কষ্ট দিবে, তবে তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা দাও না কেন প্রভু? সংসারকে নূতন করে গড়ে তুলে নিতে শক্তি দাও না কেন? তোমার শক্তি অনন্ত, অসীম, ক্ষুদ্র মানবের বুদ্ধির অগোচর, তবে তোমার সাহায্য ভিন্ন কেমন করে এ দুস্তর সাগর পার হইব প্রভু? তুমি বলে দাও কেমন করে ভেলা তৈয়ার করে পার হ'তে পারব। যেমন কষ্টের ভিতর রাখিয়াছ তেমনি প্রাণে তাহা বহন করিবার শক্তি দাও, নূতন আশা উদ্যম দ্বারা সহায়তা কর। তুমি পতিতের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, দীনের সম্বল। তুমি বলে দাও প্রভু! কোন্ পথে গেলে শান্তি পাব, সংসারের ভিতর স্বর্গের বিমল আনন্দ পাইয়া সুখী হইব। সংসারের ভিতর তোমার সুন্দর ছবি লোকে কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু আমি অধম তাই তোমায় দেখিতে পাই না।

মাতার স্নেহ-অনুরাগ যে তোমার প্রীতি-ছবি তাহা কেন জীবনে অনুভব করি না। দয়াময়! আমি যে ঘোর পাতকী, তাই বুঝি তুমি আমাকে সে জ্ঞানামৃত হইতে বঞ্চিত করেছ। তাই বুঝি আমায় শিক্ষা দিবার জন্য আত্মীয় সজনের স্নেহ করুণা হ'তে বঞ্চিত করেছ। দয়াময়! তুমি এবে দয়া না করলে ত আর প্রাণে

শান্তি পাই না। তুমি অবোধ সন্তান বলে ক্ষমা না করলে আমার কি গতি হবে প্রভু! তুমি দয়ার সাগর, পাপীর উদ্ধার-কর্ত্তা, জীবনের লক্ষ্যস্থল, তুমি টেনে তুলে লও। এ ঘোর পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার কর প্রভু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১লা বৈশাখ ১৩২০ সাল, সোমবার।

পরম পিতা জগদীশ! তোমার করুণায় আজ আমরা নূতন বর্ষে পদার্পণ করিলাম। অতীতের, গত বর্ষের, কথা মনে হইলে প্রাণে দুঃখ হয় যে, জীবনকে লক্ষ্যের দিকে এক পদও চালাইতে পারি নাই। দিন দিন করিয়া কত বৎসর কাটিল, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিলাম না বা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না। আজ নব বর্ষে মনে আবার কত আশা ও চিন্তা উদিত হইতেছে। জীবনকে এবার হইতে আর তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হতে দিব না। তোমার কর্ত্তৃত্বে থাকিয়া সত্যের পথে, কর্ত্তব্যের পথে চলিব। তুমি নূতন বর্ষে আমাদিগকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত কর। প্রাণে সুপথে চলিবার জন্য একটা নূতন উদ্দীপনা প্রেরণ কর। তোমাকে বুঝিতে পারিলে, তোমার শক্তিতে আমরা কত অসাধ্য সাধন করিতে পারিব, বাঙ্গালী পরিবারের নিত্য হাহাকার রব, অশান্তি, অনুৎসাহ দূর করিয়া তাহাকে তোমার প্রেমের নিকেতনে পরিণত করিতে পারিব। দয়াময়, যখন নির্জ্জনে তোমার আরাধনায় বসি, যখন বিশ্বের অনন্ত ছবি মনে হয়, তখন স্বতঃই তোমাকে পাইবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে অনুভব করি। তখন ত কোন উপদেষ্টা সঙ্গে যাইয়া তোমার কথা বলিয়া দেন না, প্রকৃতিই যেন তোমার দিকে মনকে টানিয়া লয়। যতক্ষণ তোমার চিন্তায় কাটাই, যতক্ষণ তোমার অপার মহিমা অনন্ত শক্তির কথা ভাবিতে থাকি, ততক্ষণ সংসারের কোলাহল হৃদয়ে থাকে না, প্রাণে এক অভাবনীয় আনন্দ শান্তি পাই। তুমি অনন্ত তোমাকে যত ভাবি, ততই যেন তোমা হইতে দূরে যাই, কিন্তু তবু তোমার চিন্তা হ'তে মনকে যেন আর নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা হয় না। এ কি অমৃত, কি মধুর ভাব যে, যত তোমায় ভাবি ততই তাহাতে আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

তোমায় আস্বাদন করিতে পারিলে, প্রভু! জীবন তোমাতেই ডুবে থাকতে চায়। দয়াময়, তুমি আজ ভাল করে আমায় বল কোন পথে চলিলে তোমায় বুঝতে পারব। জীবনকে তোমার আদেশানুযায়ী পরিচালিত করে সুখী হইব। নির্জ্জনে তোমার চিন্তায় বসিলে তোমার সত্তা প্রাণে যেমন অনুভব করি, সংসারের ভিতর থাকিয়া তোমার মহিমা তেমন উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? সংসারে অশান্তি পাই বলিয়াই ত তোমাকে ধীরভাবে ভাবিতে পারি না। সংসারের দুঃখ দুর্ঘটনায় মনকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। কিন্তু সে তোমারই দান। তুমি সেই দুঃখ, বিপদ

কেবল আমাদিগকে তোমার দিকে লইয়া যাইবার জন্যই প্রেরণ কর। সংসারের কোলাহল, অশান্তি সর্ব্বদা বলে দেয় যে, তুমিই শান্তির একমাত্র আস্পদ। সংসারে আমি সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারি যদি তাহাতে তোমার করুণা ও শক্তি অনুভব করি। তোমার কথা ভুলে গিয়ে সংসারকে নিজের ইচ্ছামত চালাইতে চাই, তাইত অশান্তি ভোগ করি ও মনে করি সংসারের কোলাহল হইতে দূরে না গেলে তোমাকে বুঝিতে পারিব না। কিন্তু এ শিক্ষা আবার মুহূর্ত্ত পরেই ভুলে যাই কেন? তুমি এ শিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দাও। জননীর নিঃস্বার্থ ভালবাসায়, ভ্রাতা ও ভগিনীরমধুময় স্নেহে, পত্নীর পবিত্র প্রেমে যেন তোমার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। তুমি সংসারে পাঠাইয়াছ—সংসার ত্যাগ করিবার জন্য নহে। সংগ্রামে পরাজিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিলে তোমার আদেশ পালন করা হইল না। সংসারে থাকিয়া তোমার নামরূপ অসি লইয়া, সমস্ত কুভাবকে দমন করিতে হইবে,তবেই ত তোমায় বুঝিতে পারিব ও তোমার শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইব। জীবনের চরম লক্ষ্য তোমায় লাভ করা,তোমার আদেশ পালন ও তোমার শক্তি অনুভব করিয়া কর্ত্তব্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। ধর্ম্ম বলিলে আমরা ইহাই বুঝি যে, যাহাতে সত্যকে বুঝিতে পারা যায় ও তোমার সত্তা উপলব্ধি করিয়া জীবনে প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

তাই প্রভো, তুমি সংসারে সুখ ও দুঃখ রাখিয়াছ। যে তোমায় ভুলে, কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হয়, তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আর যে জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, নীতির পথানুসরণ করে, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তোমার উপর নির্ভর করে, সে মানবজীবনের সুখ ও শান্তি ভোগ করিয়া ধন্য হয়। দাও পিতা, সেই পথ দেখাইয়া দাও, যে দিকে জীবনকে চালিত ক'রে স্বর্গের ন্যায় বিমল আনন্দ পাইব। এখন থেকে নীতি কি তাহা বুঝিতে দাও ও প্রাণে তাহার অনুসরণ করিবার উপযুক্ত বল ও আশার সঞ্চার ক'রে দাও। উচ্ছৃঙ্খল মানব কখনও জীবনে উন্নতি করিতে পারে না। কখনও সুখলাভে সমর্থ হয় না। যে কাজ জীবনকে উন্নতির দিকে অগ্রসর না করে, সে কাজ দুষ্কর্ম্ম বলিয়া গণ্য, যাহাতে প্রাণে শান্তি আরাম না পাই, যাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হইবে এমন কাজ যেন না করি। দয়াময়! তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন কখনও সংসারের প্রলোভনে ভুলি না। সংসারে তুমি ভাল মন্দ দুইই প্রেরণ করিয়াছ, প্রত্যেকের জীবনে এ সংগ্রাম দিবানিশি চলিতেছে। প্রভু, আমার মন যে বড় দুর্ব্বল, বিবেক যে শক্তিহীন, তুমি নব বলে বলীয়ান্ কর যেন এ সব প্রলোভন হ'তে মনকে দূরে রাখিতে পারি। দয়াময়! তুমিইত পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, সমস্ত জগৎ

খুঁজিয়াও তোমার স্থায় পাপীর বন্ধু মিলিবে না। তুমি নিজে এসে পাপীকে তোমার করুণা দ্বারা সুপথে টানিয়া লও। তোমাতেই তাহার বল, তুমি তাহার নিকট শক্তির উৎস। তোমার চিন্তায় দুর্ব্বল প্রাণে যে বল আসে, তোমার চিন্তায় প্রাণে পুনঃ যে আশার সঞ্চার হয়, তাহার তুলনা নাই। তাই প্রভো! তোমায় পাইতে ইচ্ছা হয়। এমন দয়াল যিনি, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা যিনি, দুর্ব্বলের সহায় যিনি, সেই চির আকাঙ্ক্ষিত ধন তোমাকে জানিতে ইচ্ছা হয়। দয়াময়! তুমি নব বর্ষের দিনে প্রাণের মলিনতা দূর কর ও নব উৎসাহের বহ্নি প্রজ্বলিত কর। নৈরাশ্যে যেন হৃদয়কে নিস্তেজ করি না। তোমার স্বরূপ চিন্তনে যেন হৃদয়ে শক্তি অনুভব করিয়া কর্ত্তব্যের দিকে অগ্রসর হই। এই কর, প্রভু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কালষষ্ঠী।

(পুত্র-শোকাকুল পিতার কাতরোক্তি)।

(১)

বাসন্তী পঞ্চমী কালি গিয়াছে চলিয়া,—
বঙ্গবাসী ঘরে ঘরে বাণীর চরণ
পুজিয়াছে ভক্তিভাবে আনন্দে মাতিয়া,
দুখের বারতা কা'র ছিল না তখন।

(২)

কিবা ছোট কিবা বড় ছিল না বিচার,
নতশিরে বাণী-পদে প্রণিপাত করি,
মাগিয়াছে বিদ্যারত্ন সুখের ভাণ্ডার,
চারি দিকে ছুটিয়াছে উৎসাহ লহরি।

(৩)

চূতপত্র, ফুলমালা, রম্ভাতরু দ্বারে,
সিন্দুরের কৌটা গায় নারিকেল ফল
পূর্ণকুম্ভমুখে ওই পূজার আগারে,
দেবী-আগমন বার্ত্তা ঘুষিছে কেবল।

(৪)

বাগ্‌দেবী বীণাপাণি ভারতী-মাতার
বিদ্যালয়ে ভক্তবৃন্দে স্তুতি গান করে,
সুকুমার ছাত্রদলে আনন্দ অপার,—
দেবী-আরাধনা করে বিদ্যালাভ তরে।

(৫)

পঞ্চমীর অবসানে দিল দরশন
কাল-ষষ্ঠী বঙ্গে আজ কাঁদাতে সবায়,—
সরস্বতী জননীর হ'ল নিরঞ্জন,
সেই সঙ্গে পুত্র মম গেল রে কোথায়!

(৬)

প্রাণের দেবেন মম স্নেহের আধার,
বাণী-সনে ঝাঁপ দিলে কাল-সিন্ধু-জলে!
কোথা বাছা গেলে চলে—কি দোষ আমার,
তব জননীরে আমি বুঝাব কি বলে!

শুনিবার আগে কেন তাজিলে না প্রাণ?

৯

...র,
(ভগ্নি, বিধাতা কি তোর ভালে এই ...রে?

...র দুয়ার,
(কত) আদরে ...
... যাও হরিষ অন্তরে।

(৮)

পর পারে যা'ব যবে হইবে মিলন,
আশায় বাঁধিয়া বুক রহিনু দুজনে,—
আবার আসিলে ষষ্ঠী হইবে স্মরণ,
তোর ওই প্রেম-মাখা পবিত্র আননে।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

গত ২০শে মার্চ্চ শনিবার মেরি কার্পেণ্টার হলে ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চন্দন-নগরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের পত্নী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রায় ২০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অন্তঃপুর-শিক্ষা-কার্য্যে দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সহানুভূতি ও উৎসাহ আছে। যে সকল ছাত্রী গত ডিসেম্বর মাসের পরীক্ষায় খুব সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনকে স্বর্ণপদক ও দুই জনকে রৌপ্যপদক দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রীদের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালা আবৃত্তি ও একজন ইংরাজী আবৃত্তি করে। তাহারা ২।৩টী জাতীয় সঙ্গীতও অতি সুন্দররূপে গাইয়া দর্শকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। সিক্রেটারী গত বৎসরের যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে দেখা যায় যে, গত বৎসরে সমিতির কিছু লোকসান সত্ত্বেও ইহার আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। গত বৎসরের প্রথমেই সমিতি ১৯১৩ সালের ১৩০০৲ টাকার মধ্যে ৮০০৲ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিতে পারিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে যাহাতে শিক্ষয়িত্রী-ভবনের পত্তন হয়, সমিতি এখন প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

যিনি,সেই চির আকাঙ্ক্ষিত ধন তোমাকে
নিতে ইচ্ছা হয়। দয়াময়! তুমি নব
দিনে প্রাণের মলিনতা দূর কর
াহের বহ্নি প্রজ্বলিত কর।
নিস্তেজ করি না।

বামারচনা

মর্ম্মগাথা। *

১

আজি, বল মোরে বল—
সোণার প্রতিমা কেন ফেলে অশ্রুজল?
যে মুখ হেরিলে পরে
শত দুঃখ যায় দূরে,
হেরিলে সৌন্দর্য্য যার হাসিত ভূতল
তার কেন অশ্রু ঝরে,—বল মোরে বল!

২

সোণার প্রতিমা কেন ফেলে অশ্রুজল!
(যার) ফুটন্ত পদ্মের মত,
আঁখি দুটী উজলিত,
স্বর্গীয় অমিয়-মাখা যে মুখ কমল,
কেন তার অশ্রু ঝরে বল মোরে বল?

৩

স্বর্ণ-প্রতিমার চোখে কেন দেখি জল!
যে মুখ হাসিতে ভরা
হাসিতে ভুলা'ত ধরা,
কভুতো হেরিনি তার অশ্রুভরা জল!
আজ তবে হিরণ্ময়ী কেন কাঁদে বল?

৪

(আজি) স্বর্ণ-প্রতিমার চোখে কেন দেখি জল?
যাহার সুন্দর কান্তি
হেরিলে ঘটিত ভ্রান্তি—
দেবী কি মানবী! মন হ'তো টলমল!
হিরণ্ময়ী কেন কাঁদে বল মোরে বল?

৫

আজি মোরে বল তোরা একবার বল—
তার সেই মুখ স্মরি
আর যে থাকিতে নারি,
হ'তেছে শতধা চূর্ণ মোর হৃদিতল—
সে কেন বিষণ্নমনা বল মোরে বল!

৬

আমি কি ভ্রমেতে পড়ি হেরিতেছি ভুল?
না-না, সেতো একমনে
বসে, দেখি নিরজনে
নীরবে নিশীথে ধীরে ঢালে অশ্রুজল!
আমার তো ভ্রম নহে, কি হয়েছে বল।

৭

(অয়ি) স্বর্ণপ্রতিমা! কেন ভাস অশ্রুজলে?
বুঝেছি বুঝেছি সতী,
তোর যে দেবতা পতি
কাঁদায়ে গিয়াছে বুঝি,—নাই ধরাতলে।
তাই কিগো হিরণ্ময়ি ভাস অশ্রুজলে?

৮

(হায়) কে মোরে হানিল আজি এ নিঠুর বাণ?
যে শুনা'ল এই বাণী,
(তার) কিবা প্রাণ নাহি জানি—
এ নিঠুর বাণী কেন শুনিলিরে কাণ!

* কোন সুন্দরী পরিচিতা বাল-বিধবা- দর্শনে লিখিত।

শুনিবার আগে কেন ত্যজিলে না প্রাণ ?

৯

(ভগ্নি, বিধাতা কি তোর ভালে এই লিখে ছিল ?
(কত) আদরের আদরিণী
(করে) রেখেছিল শ্বশ্রূরাণী,
বধূরূপে ছিলে তাঁর ঘর করি আলো।
কেন এ সুখের মাঝে অনল জ্বলিল ?

১০

(তাই) মোর সাথে আলাপন করেছিলে বলে,
তাই কি এমন আজি ঘটিল কপালে ?
(হায়) অভাগা যথায় যায়
সাগর (ও) শুকায়ে যায়,—
তাই বুঝি মোর স্পর্শে, কমল মুকুলে
ফুটিতে না ফুটিতেই অকালে শুকালে ?

১১

(আজি) আয়রে ভগিনী তোরে হৃদে ধরি আয়,—
কি ব্যথা পেয়েছ আজি জানাবে তা কায় ?
(এ) অসহ্য বেদনা জ্বালা
কোথায় জুড়াবে বালা ?
সম-দুঃখী না হ'লে কে বুঝিবে বেদন ?
তাই বুঝি আজি মোর পুড়িতেছে প্রাণ ?

১২

আয়রে ভগিনি, আজি ধরি হৃদয়েতে,
তুমিও আমার মত দুঃখী এ জগতে।
কি ব'লে বোঝাব ভাই,
ক্ষমতা কি আছে ছাই,
(তবে) ধর্ম্মের পথেতে সদা রাখি প্রাণমন
"দেবী হিরণ্ময়ী" নাম করিও ধারণ।

১৩

আমিতো সামান্য ভাই কিছুই জানিনে।
(ভাই) যেখানে যে ভাবে থাকো,
তাঁহারে হৃদয়ে রেখো,
সংসারের পথে ভাই নানা প্রলোভনে
"ভুলনা" তাদের ডাকে সেই "ভগবানে।"
সবে তব চৌদ্দ বর্ষ,
(আছে) কত দুঃখ কত হর্ষ,
কঠিন পরীক্ষা মাঝে কত যে পড়িবে—
সে সবার মাঝে কভু "তাঁরে" না ভুলিবে।
(ভাই) দেখো করি তন্ন তন্ন,
সেই এক তিনি ভিন্ন,
সুখে দুখে চিরবন্ধু নাই অন্য জন,
(দেখ) তাঁহারে পূজিতে ভাই ভুলনা কখন।

তোমার সমদুঃখিনী ভগিনী

শ্রীপ্রি—

বর্ণমালানুসারে ১৩২১ সালের বামাবোধিনীর সূচী।

বামারচনা।

৩৭ নং মথুরার লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।